

ব্যবসায় সংগঠনের ভূমিকা

[বাণিজ্য ধারার জন্য]

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ অফ্ কমার্স এণ্ড বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন

যতীন্দ্রনাথ দত্ত

অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য-বিভাগ)

এবং

শঙ্কর প্রসাদ বসু

অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য-বিভাগ)

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট * কলিকাতা

প্রকাশক :

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এম্-সি.

১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর :

শ্রীনন্দকুমার পান

রূপ-লেখা প্রেস

৭৮নং কারবালা ট্যাক্স লেন

কলিকাতা-৬

শ্রীনিয়ঞ্জন বহু

নর্দার্ন প্রিন্টার্স

৩৪১২ বিভন স্ট্রিট

কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

গোডার কথা (Introduction) : মাহুষের অভাববোধ ও উহার তৃপ্তি, মাহুষের অভাবের ধারা, অভাবের বৈশিষ্ট্য ; সম্ভোগ বা অভাবের তৃপ্তি ; উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান ; শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণ ; বিশেষীকরণ ও বিনিময় ; প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার অস্থবিধা ও পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার উদ্ভব ; বিনিময় ও সহযোগিতা ; দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা, মাহুষের অভাবপূরণের বিবিধ উপায় ; পরোক্ষ উৎপাদন ও বিবিধ আর্থিক কার্য ; অভাবপূরণের জগ্গই মাহুষের অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ; বাণিজ্যতত্ত্ব ও অর্থনীতি

১-১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবসায়ের বিবিধ ভাগ (Division and Subdivision of Commerce) : উৎপাদকের শ্রেণীবিভাগ, কারবারের বিভিন্ন রূপ, কারবারের সহায়ক, মালগুদাম, বীমা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পরিবহন

১৭-২৮

তৃতীয় অধ্যায়

আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় (Home Trade) : পাইকারের কাজ, খুচরা ব্যবসায়, খুচরা ব্যবসায় সংগঠনে যে-সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ; বিভাগীয় বিপণি বা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, বিভাগীয় বিপণির বৈশিষ্ট্য, বিভাগীয় বিপণির স্থবিধা, বিভাগীয় বিপণির অস্থবিধা, বহু-বিপণি, বহু-বিপণির বৈশিষ্ট্য, বহু-বিপণির স্থবিধা-অস্থবিধা ; চেন ষ্টোর্স, ডাকযোগে ব্যবসায়, ডাক মারফত ব্যবসায়ের নিয়ম, ডাক মারফত ব্যবসায়ের স্থবিধা ; একমূল্যের দোকান ; খুচরা সমবায় বিপণি, কিস্তিবন্দীতে ক্রয় ; ভাড়া ক্রয় ; ভাড়া-চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, ভাড়া-চুক্তি ক্রয়ের স্থবিধা-অস্থবিধা, কিস্তিবন্দীতে ও ভাড়া ক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য ; ফড়িয়া, দালাল, প্রতিনিধি, আশ্বাসদায়ী অথবা ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি, নিলামদার

২৯-৫৭

চতুর্থ অধ্যায়

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় (Buying and Selling of Goods) : ক্রেতার শ্রেণীবিভাগ—উৎপাদক-ক্রেতা, পাইকারী ক্রেতা, খুচরা ক্রেতা, ভোগকারী ক্রেতা ; ট্রেডমার্ক এবং পেটেন্ট অধিকার ; মাল খালাস ; মূল্য পরিশোধ ; মূল্য পরিশোধের উপায় ; বাট্টা ; টেণ্ডার ; দর উন্মেষ (মূল্য বেদন) ; চুক্তি

৫৮-৭৮

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম (Illustration of Business Activities) : অল্পসঙ্কান পত্র, অল্পসঙ্কান পত্রের নমুনা, অর্ডার পূরণ, চালান পত্র, লেনদেনে ভুলত্রুটি সংশোধন, মূল্য বিষয়ক ভুল, দ্রব্য বিষয়ক ভুল, হিসাবে ভুলচুক সংশোধনের উপায়, পাওনালিপি, দেনালিপি, দেনালিপি ও পাওনালিপির ব্যবহার; হিসাব বিবরণী, মূল্য পরিশোধ, প্রাপ্তিস্বীকার, বিল, চালান ও বিলের পার্থক্য, বিল ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য, চালান ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য

৭২-২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা (Capital, Turnover and Profit) : মূলধনের সংজ্ঞা, মূলধনের বিভিন্ন রূপ—উৎপাদন মূলধন, উৎপাদন মূলধনের রূপ; রাজস্বপ্রদায়ী মূলধন, সহায়ক মূলধন, মজুরি মূলধন, স্থায়ী মূলধন, সামাজিক মূলধন বা জাতীয় মূলধন, পরিচল মূলধন, কার্যকরী মূলধন; সম্পদ পুনর্গঠনের উপায়; মূলধন বাড়াইবার উপায়; মূলধন গঠন; যে-সকল কারণে সঞ্চয় হয়; আবর্তন, আবর্তনের গুরুত্ব; সম্ভার আবর্তন বাহির করার নিয়ম; মুনাফা

২২-১২৭

সপ্তম অধ্যায়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Business Unit) : এক-মালিকানা ব্যবসায়, ইহার স্থবিধা ও অস্থবিধা; যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায়, যৌথ হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য; অংশীদারী ব্যবসায়, অংশীদারী ব্যবসায় গঠন, অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রকারভেদ, অংশীদারের প্রকারভেদ, দায় সীমাবদ্ধ বা সসীমদায় অংশীদার ও অসীমদায় অংশীদার, অংশীদারী চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা, অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু, অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য, অংশীদারী ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকরণ ও ইহার স্থবিধা, অংশীদারী ব্যবসায় গুটাইবার উপায়; যৌথ কারবার ও ইহার বৈশিষ্ট্য, যৌথ কারবারের প্রকারভেদ—অসীমদায়, সসীম দায়, দায়িত্বের অসীমায়ুক্ত, ঘরোয়া ও সাধারণ, সরকারী, সংবিধিবদ্ধ, ব্যক্তিগত; রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, মিশ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ; যৌথ কারবার গঠনের পদ্ধতি; যৌথ কারবার নিবন্ধনের পদ্ধতি; স্মারকলিপির গুরুত্ব; স্মারকলিপির বিষয়বস্তু, মূলধন ধারা, সংস্থাপন ধারা, পরিমেল নিয়মাবলী ও ইহার বিষয়বস্তু; অল্পসঙ্কানপত্র বা বিবরণপত্র ও ইহার বিষয়বস্তু; অংশপত্র বণ্টন; ব্যবসায়ের কার্য আরম্ভ, অবলেনন; ন্যূনতম টাঁকা; যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন—অল্পমোদিত, বিলিকৃত, প্রতিশ্রুত বা বিক্রীত, তলবী আদায়ীকৃত, সঞ্চিত, বকেয়া তলবী, অগ্রিম আদায়ী

তলবী, সংলগ্ন ; অংশপত্রের প্রকারভেদ, পূর্বাধিকার অংশপত্র ; সাধারণ অংশপত্র ; সংস্থাপকের অংশপত্র, অনাঙ্কিক মূল্য অংশপত্র, ঋণপত্র ও ইহার প্রকারভেদ ; ষ্টক ও অংশপত্র, অংশপত্র ও ঋণপত্র ; ঘোষণাকারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ; পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন ; পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য ও অধিকার ; ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা পরিচালন প্রতিনিধি ; পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি ও কর্তব্য, পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থার ক্রটি ; পরিচালন প্রতিনিধি প্রথার দোষক্রটি দূরীকরণের প্রয়াস ; সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স' ব্যবস্থাপক-পরিচালক ও তাঁহার ঘোগ্যতা ; তাঁহার উপর প্রযোজ্য অত্যাশ্রিত সর্ত ; ব্যবস্থাপক ; বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ও ইহার কার্যসূচী ; সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন ও ইহার কর্মসূচী ; বিশেষ উদ্দেশ্য অধিবেশন, জরুরী স্ফাধারণ অধিবেশন ; ভোট প্রতিনিধি, সমবায় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ; সমবায় সমিতির বিভিন্ন রূপ—সমবায় ঋণ সমিতি, সন্তোষকারী সমবায় সমিতি, সেবা সমবায় সমিতি

১২৮-২০১

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় (Banking) : ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উৎপত্তি, ব্যাঙ্কের ভাগ ও তাহাঙ্কের কার্য—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ; ব্যাঙ্কে আমানতের প্রকারভেদ—চলতি আমানত, মিয়াদী আমানত, সঞ্চয় আমানত ; ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান, অধিবিক্রয় বা বিনা জামানত ঋণ ; ব্যাঙ্ক প্রভার ; ব্যাঙ্ক বিবৃতি ; বিনিময় ব্যাঙ্ক ; শিল্প ব্যাঙ্ক, জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক ; সমবায় ব্যাঙ্ক ; ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্কের হার ; সরাসরি ক্রেয়-বিক্রেয়, সঞ্চিতি অল্পপাত, বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক প্রভাব ; মূল্যের মূল্যমানের বা বিনিময়-হারের স্থিতিকরণ ; কৃষিঋণ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ; ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ ; নোট ছাপাইবার নিয়ম ; ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে কিভাবে ; চেক এবং ইহার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ ২০২-২৪০

নবম অধ্যায়

বীমা (Insurance) : বীমার সর্ত ; বিভিন্ন প্রকারের বীমা—অগ্নিবীমা, সামুদ্রিক বীমা বা নৌ-বীমা, সামুদ্রিক বীমার জন্ম—বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক বীমাপত্র, জীবনবীমা, বিভিন্ন প্রকারের জীবনবীমা—আয়ুত্যা বীমাপত্র, মিয়াদী বীমা : মৃত্যুর পর বীমার মূল্য দেয়, বার্ষিক বৃত্তি, বীমা সঞ্চয়ের উপায়, মূল্যায়ন বীমাগ্রহীতার অংশগ্রহণ, জীবনবীমায় অধিলাভ, একক বীমা এবং ঋণ জীবনবীমা, জীবনবীমায় জাতব্য বিষয়, আদায়ীকৃত বীমাপত্র, ভারতে জীবনবীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ ; মোটর বীমা, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা, অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা, অপহরণ বীমা, অর্থপ্রেরণ বীমা, কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা

২৪১-২৬৩

দশম অধ্যায়

যানবাহন ব্যবস্থা (Transport) : যানবাহনের তুলনামূলক বিচার, জলপথে মাল চলাচলের সুবিধা ও অসুবিধা ; সমুদ্রপথে যানবাহন ; নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ, অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ ; নৌভাটক, জাহাজে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি, আভ্যন্তরীণ জলপথ, স্থলপথে পরিবহণ, সড়ক পরিবহণের সুবিধা-অসুবিধা, সড়ক পরিবহণে মাল প্রেরণের পদ্ধতি, রেলপথের সুবিধা-অসুবিধা, রেলপথের মাণ্ডল নির্ধারণ, রেলপথে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি, বরাবর পরিবহণ, ভারতবর্ষে রেলপথ, বিমান পরিবহণ

২৭০-২৯৩

একাদশ অধ্যায়

কারখানা ও অফিস-সংগঠন (Factory and Office Organisation) : ক্রয় বিভাগ, ভাণ্ডার বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, বিলি বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগ, অফিস ও কর্মচারী বিভাগ, ক্যাশ বিভাগ, হিসাব রক্ষণ বিভাগ, রেকর্ড বিভাগ, নথিকরণ বিভাগ, অফিসের কার্যপ্রণালীর উদাহরণ, বিভিন্ন প্রকারের নথিকরণ, অফিসে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, ব্যবসায় প্রাতিষ্ঠানের আসবাব-সজ্জা, বাণিজ্যিক পত্র লিখন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় ; বাণিজ্যিক পত্র লিখনের নমুনা

২৯৪-৩২৮

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade) : বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণ, অবাধ বাণিজ্য কিংবা সংরক্ষিত বাণিজ্য ; সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ও পন্থা, সংরক্ষণের বোঝা, বাণিজ্য ও অন্তঃস্ফুট, মূল্যানুসার স্ফুট, বাণিজ্য স্ফুট আদায়, আদায়ীকৃত স্ফুট ফেরত, বিদেশে সন্তায় মাল বিক্রয়, সমকারী কর বা প্রতিকর, বাণিজ্য উদ্ভূত ও আদানপ্রদান সমতা

১-১৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রপ্তানি এবং আমদানি (Exporting and Importing) : রপ্তানি ব্যবসায় : বাজার সমীক্ষা ; রপ্তানি পদ্ধতি, বহনপত্রের প্রয়োজনীয়তা, বীমাপত্র, রপ্তানি পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার, আমদানি পদ্ধতি, আমদানি পদ্ধতির সারমর্ম

১৯-৩৩

চতুর্দশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানপ্রদান (Payment in Foreign Trade) : বিনিময় হার, টাঁকশালী দর, স্বর্ণ আগম নির্গম দর, ক্রয়শক্তি-সমতা, মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব, বিনিময় হারের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক, বিনিময় পত্রের বিভিন্ন প্রকার মূল্য, অন্তর্গমন কারবার, চেক, বিনিময়পত্র এবং প্রত্যর্থপত্র, বিনিময়পত্রের ব্যবহার, বৈদেশিক বাণিজ্যে দর উল্লেখ

৩৩-৫৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাজার (Market) : ব্যাপক বাজারে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ; ব্যাপক বাজারের বৈশিষ্ট্য ; বাজারের বিভিন্ন প্রকার — ষ্টকের বাজার, শেয়ার বাজার ও ইহার কার্য, শেয়ার বাজারে লেনদেন, শেয়ার বাজারে লেনদেনের সমাপ্তি, শেয়ার বাজারে কুঁকিদারের প্রকার, শেয়ার বাজারের অবস্থা, শেয়ারের দর উল্লেখ ; উৎপন্ন পণ্যের বাজার ; ভাবী বাজারের কেনাবেচায় লোকসান বীমা ; শেয়ার বাজারের সহিত পণ্যের বাজারের পার্থক্য ; নিলাম বাজার

৫৫-৭২

ষোড়শ অধ্যায়

মাল গুদাম (Warehouse) : গুদামঘরের প্রকার, গুদামঘরের সুবিধা

৮০-৮৪

সপ্তদশ অধ্যায়

বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উত্তোগ (Advertisement and Salesmanship) : বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ; বিজ্ঞাপনের সাফল্য ; বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন ; বিজ্ঞাপনের মাধ্যম ; ট্রেডমার্ক, বিজ্ঞাপনের ফলাফল পরিমাপের পন্থা ; বিজ্ঞাপনের পশ্চাৎ-ধাবন ; বিক্রয় কুশলতা ; বিক্রয় বিশেষজ্ঞের গুণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার ; বিজ্ঞাপন তৈয়ার করিতে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়

৮৫-৯২

অষ্টাদশ অধ্যায়

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র (Commerce and State) : রাষ্ট্রের কার্য ; রাষ্ট্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ ; রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয়করণের সুবিধা ; রাষ্ট্রীয়করণের অসুবিধা ; ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ; রাজস্ব নীতি ; সংরক্ষণনীতি ; করনীতি ; শিল্পে অর্থ সংস্থানের পন্থা, রাজ্য অর্থসরবরাহ সংস্থা, ভারতের শিল্পীয় ঋণ এবং বিনিয়োগ সংস্থা ; শিল্পীয় পুনঃ অর্থসরবরাহ সংস্থা ; জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা ; আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ; মুদ্রা ও ঋণদান নিয়ন্ত্রণ ; যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ; আইনের সাহায্যে ব্যবসায়ের সহায়তা ; শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর ; কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ ; অমুক্ত প্রদানকারী কমিটি ; জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা ; কেন্দ্রীয় আমদানি-রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ ; রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ; শুষ্ক কমিশন ; বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংস্থা ; জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ; কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দপ্তর ; রেলওয়ে বোর্ড ; জাতীয় উৎপাদন পরিষদ ; পরিকল্পনা কমিশন

১০০-১২৪

পরিশিষ্ট

১২৫-১২৮

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

১০১২৯-১৩৬

SYLLABUS FOR ELEMENTS OF COMMERCE

(Including Business Method and Correspondence)

CLASSES—IX-X

1. Introductory :

Human needs and their satisfaction ; Division of Labour ; Specialisation and Exchange ; National and International inter-dependence and co-operation through Commerce ; Complex process through which human wants are satisfied giving rise to various types of business activities and occupations.

Classification of business activities and services—Industry, trade and commerce ; Distribution of the working population over these.

Meaning of the word “Commerce” : Commerce in a broader sense comprises all those activities which are concerned with distribution of the goods and services so that these may reach the consumers with a minimum of inconvenience.

2. Divisions and Sub-divisions of Commerce :

Trade, transport, banks, insurance, warehousing, advertising, stock and commodity markets, post office, direct services specially professional and Governmental services for regulation and information.

(General idea about the purposes and functions is only to be given with reference to conditions in West Bengal and India).

3. Home Trade :

(a) Retail : Functions of the retailer—factors to consider in organising a retail business—types of retail business : Unit retailer, Multiple shop, Chain store. One-price shop : Departmental store. Mail order House, Retail Co-operative Society.

(b) Wholesale Trade : Functions of the wholesaler—his role as a middleman—Organisation of the wholesale business.

(The purposes and functions of the different units of trade are only to be discussed and not the procedures and methods adopted).

4. Buying and Selling Goods :

(a) Three aspects of a buying-selling transaction—goods, delivery of goods and payment.

(b) Goods : Quality, Trade Mark or Brand, Unit of sale, Packing, etc.

(c) Delivery of Goods ; Time of delivery—Mode of carriage—distance, speed and cost of carriage determining the mode. Firm's home delivery service, railway, road, steamer and air.

(d) Payment : (i) Price—Catalogue and price list, Trade and cash discounts.

(ii) Time of Payment—Ready, prompt, credit, deferred, instalment, hire purchase.

(iii) Method of Payment—Cash, postal order, telegraphic money orders, money orders, treasury challans, cheques, bills of exchange or hundi, promissory notes, bank drafts.

[Common trade terms like quotation, tender, contract, etc. are to be explained.]

5. Illustrative Development of a Transaction in Home Trade and Documents and Correspondence Used.

Letter of enquiry, reply, order, packing sheet, invoice and statements, debit and credit notes, letter of remittance and the forms of the instruments of remittance, receipt.

6. Capital, Turnover and Profit :

(a) Functions, types and forms of capital for a trader—means of raising capital.

(b) Turnover—means of increasing turnover, buying for a large turnover.

(c) Profits—Gross and net profits, Marking goods or "Mark-up", ascertained gross profits over a period—net profit as a percentage on turnover—gross profits as a percentage on turnover, expenses as a percentage on turnover.

(d) Profits and Capital.

7. Different forms of Business Units :

Sole trader—Family Business, Partnership, Private and Public Limited Companies—Government Companies, Co-operative Societies—State Undertakings.

The distinctive features of each with particular reference to ownership, methods of raising capital and distribution of profits or surplus.

(The idea of limited liability to be introduced and the types of capital and/or shares are to be briefly explained. The details of organisation should be avoided and only the broad purposes of these different forms are to be discussed. In the case of companies, a brief idea about Memorandum of Association and Articles of Association, Prospectus and the divorce between ownership and control are to be indicated.)

8. Internal Organisation of a Merchant's Office :

(i) The functions of the office ; a general view of its work. The work in a small office. The work in a large office. The allocation of duties and the services performed by Juniors.

(ii) Various departments and sections—Cash, Accounts, Purchase, Sales, Type, Despatch, Record, Filing, Stores, etc,

(iii) Office Routine : Treatment of incoming letters, receiving orders, indexing of letters, precis writing, office notes, despatch, filing, etc.

(iv) Communications : Telephones, Teleprinters, Telegrams, Cablegrams. Simple codes, Phonograms.

(v) Commercial Correspondence : Features of business letters. Need for simplicity, brevity and precision, Drafting of advertisements, announcements and telegrams, notices of meetings and minutes.

(vi) Usual office equipment and organisation of office works : Typewriters, Duplicating Machines, Telephones, various types of files, Dictaphone, Speakophone, Franking Machines, Stock recorders, various calculating machines and accounting machines.

(vii) Postal communication and Services—as means of communication and making payments. General knowledge about the rules as to posting—registration, parcel, express delivery, etc.

9. Banking :

- (i) Saving Banks—Saving Bank Accounts :
- (ii) Commercial Banks—Functions—Deposit and current accounts—Loans and Overdrafts. Cheque system—various kinds of cheques, Banking Clearing System.

10. Transport :

Development and functions of transport—suitability of different forms of transport : Railway, Inland Waterway, Sea and Air.

A brief outline of the procedure for booking goods for Railway transport and the documents used.

11. Insurance :

General principles underlying different types of insurance—Fire, Marine and Accident as means for spreading of business risks. Fidelity Guarantee Bond, Cash in transit Insurance, Workmen's Compensation. Employees' State Insurance. The procedure followed in taking out a policy and in making a claim.

The idea of "insurable interest" and of utmost good faith in Insurance contracts.

CLASS—XI

1. Reasons for foreign Trade—Nature, extent and general pattern of foreign trade of India—Outline of the general procedure in the Import and Export of goods. Organisation of Foreign Trade—Documents used in Import and Export Trade.

Customs and Excise Duties. Advalorem and Specific basis of levy. Purposes of the levies. Different types of invoices on the basis of apportionment of delivery cost between the importer and exporter.

Method of payment in foreign trade—Bills of Exchange, Letters of Credit.

2. Special market—Commodity Exchange, Auctions and Stock Market.

3. Warehousing of goods—Services of a warehouse and their importance in business.

4. Salesmanship and Advertisement—Personal qualities of good salesman. Objects of advertisement and publicity—different media of advertisements.

5. Government and the Business World : Influence of Government over business—Maintenance of security, Promotion of goodwill at home—Encouragement to business enterprises—Passing laws to facilitate business, Equitable taxation, Establishment of a sound monetary system—Organisation of Departments to guide, regulate and control business activities.

[Some idea about the fact that there are various laws relating to business and there are various Government departments directly connected with the business world, should be provided to the pupils. It should be indicated how State control aids and owns commercial enterprises.]

প্রথম অধ্যায় গোড়ার কথা (Introduction)

ব্যবসায় কি ? উহার আবশ্যকতা কি ? ইত্যাদি বহু প্রশ্নই সাধারণত ছাত্রদের মনে প্রথমে উদয় হয়। ব্যবসায় বলিতে আমরা সহজ কথায় বুঝি 'বিনিময়' (exchange)। বিনিময় কেন হয় ? অল্প কথায় বলিলে বলিতে হয় যে, যে-দ্রব্য আমার নিকট উদ্ভূত উহার পরিবর্তে আমার যে-দ্রব্যের অভাব আছে সেই ব্যবসায়ের সংজ্ঞা। দ্রব্য গ্রহণ করা। যাহার নিকট হইতে আমার অভাবপূরণ

ও উৎপত্তি করার মত দ্রব্যটি পাইলাম তাহার নিকট ঐ দ্রব্যটি উদ্ভূত। পরিবর্তে সে তাহার অভাবপূরণের মত দ্রব্যটি আমার নিকট হইতে লইল। বর্তমান যুগে অবশ্য এ-কথাটি খাটে না। কারণ, বর্তমান যুগে 'অর্থ' (money) থাকিলে যে-কোনও দ্রব্যের অভাব পূরণ করা সম্ভব। তাই দেখিতে পাই যে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক 'অর্থ' উপার্জন করার জন্ত পরিশ্রম করিতেছে। উপার্জিত অর্থ দ্বারা মানুষ অভাবপূরণ করার মত দ্রব্যের অধিকারী হয়।

মধ্যবিত্ত, গরীব, নিঃস্ব সকলেরই অভাব রহিয়াছে। এই অভাববোধ আছে বলিয়াই মানুষ পরিশ্রম করে। যেদিন মানুষ বলিতে সমর্থ হইবে যে মানুষের কোনও অভাব নাই সেদিন মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাও
অভাববোধই হইবে। অভাবই যদি না থাকে তাহা হইলে কর্মপ্রচেষ্টার
মানব-সমাজের প্রয়োজন কোথায় ? অভাবই যদি না থাকে তাহা হইলে কর্ম
উন্নতির মূল করিবে কিসের জন্ত ? যেদিন সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে
সেদিন মানব-সমাজ হইবে নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ। মানবজাতির উন্নতির মূলেও
রহিয়াছে ঐ অভাববোধ। কোন মানুষই নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন
করিতে সমর্থ নয় বলিয়াই ব্যবসায়ের প্রয়োজন।

একটি উদাহরণ দ্বারা ব্যবসায় কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা যাহারা চাকরিজীবী তাহারা চাকরি করিয়া অর্থ উপার্জন করি। সেই অর্থ নানা-ভাবে ব্যয় করি। তাহার মধ্যে যেটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাহা হইতেছে খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান। ব্যক্তিগতভাবে আমি অথবা তুমি কেহই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করি না অথচ খাদ্যের অভাববোধ জীবমাত্রেরই আছে। কৃষক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে ; কারণ, তাহার কার্যই কৃষিকর্ম দ্বারা খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা। এখন এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে কৃষক ও খাদ্যদ্রব্য ভোগকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে সমর্থ। যে-ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিবে সে ব্যবসায়ী। যে-ব্যক্তির কোন দ্রব্যের অভাব আছে এবং যে-ব্যক্তির সেই দ্রব্য যোগানের ক্ষমতা আছে, উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কার্যকে বলা হয় 'ব্যবসায়'।

(মানুষের অভাববোধ ও উহার তৃপ্তি (Human wants and their satisfaction) : মানুষের অভাববোধ সীমাহীন। মানুষ বলিতে অবশু সামাজিক মানুষকেই বুঝায়। হিমালয়ের গভীর জংগলে তপস্শ্রাবত সন্ন্যাসীর অভাব এতই সীমাবদ্ধ যে তাহার অভাব হয়ত জংগলের ফলমূল, গাছের বন্ধল ইত্যাদিতেই মিটিয়া যায়। তাই যখনই আমরা অভাববোধ অথবা উহার তৃপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করি তখনই এমন মানুষ সম্বন্ধে বিবেচনা করি যে সমাজবদ্ধ জীব। আবার এমন মানুষ নিয়াও ব্যবসায়িগণ বা অর্থবিশারদগণ কোনরূপ আলোচনা করেন না যে নিজেই তাহার সকল অভাবপূরণে সমর্থ।

মানুষের অভাবের ধারা (Nature of wants) : অভাববোধ অপারিসীম হইলেও প্রত্যেক মানুষের অভাবের একটি ধারা এই যে প্রথমে সে তাহার জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য দ্রব্যগুলিই ব্যবহার করে। এই পর্যায়ে অভাববোধ অপারিসীম পড়ে থাকে, পরিধেয় ও বাসস্থান। মানুষের এই অপরিহার্য অভাব পূরণ হইলে, অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে মানুষ কিঞ্চিৎ আরাম চায়। যে-সমস্ত দ্রব্য—যেমন, মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি আরাম উপভোগ করার মত যদিও অপরিহার্য নয় তথাপি উহা অবস্থা বিশেষে অপরিহার্যও হয়। ধনিকশ্রেণীর পক্ষে এই সমস্ত দ্রব্য অপরিহার্য। আবার চিকিৎসকের পক্ষে একখানা মোটর-গাড়ী শুধু যে তাহার আরামের জন্ত প্রয়োজন তাহা নহে। মোটরগাড়ী থাকার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বহু রোগীর সেবা করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে অবশু অভাববোধ 'শ্রেণীবোধ' (Class Consciousness) হইতে উদ্ভূত হয়। একই শ্রেণীর অপর কয়েকজনের যে-দ্রব্য আছে, সেই দ্রব্য আমার কেন থাকিবে না—এই ধারণা হইতেও অভাববোধ উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। আবার অনেক সময়ে সমাজে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়ও লোকে অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় করে। যে-দ্রব্যে অর্থ ব্যয়িত হয় সেই দ্রব্যের হয়ত প্রকৃতই কোন অভাব নাই, তথাপি সমাজে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইবার বাসনাও অভাববোধ জাগায়।

অভাবের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of wants) : অভাব অপারিসীম হইলেও অভাবের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি অভাব পৃথক পৃথক ভাবে পরিপূরণযোগ্য। কোনও একটি দ্রব্যের অভাববোধ সীমাহীন নহে। যাহার মোটেই পাছকা নাই সে যখন একজোড়া জুতা কিনিতে সমর্থ হইল তখন তাহার পক্ষে দ্বিতীয় জোড়ার চাহিদা প্রথম জোড়ার মত প্রবল নহে; এবং সে যদি দ্বিতীয় জোড়া জুতা ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে আপাতত তাহার জুতার অভাববোধ পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত হইল।

অভাবের বৈশিষ্ট্য :

১। কোনও একটি

দ্রব্যের অভাব

পরিপূরণযোগ্য

অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে যখনই মানুষ কোনও একটি দ্রব্যের অভাবপূরণ করিতে সমর্থ হয় তখনই তাহার মনে নূতন ২। সামগ্রিকভাবে অভাববোধ জাগে। তাই সামগ্রিকভাবে মানুষের অভাব কখনই পূরণ হয় না।

তৃতীয়ত, অভাববোধ প্রতিযোগিতাপরায়ণ। অভাবের যখন কোনও সীমা নাই, তখন অভাবগুলিই একই সময় মানুষের মনে ভিড় করে এবং কোনটি আগে পূরণ করা হইবে, কোনটি পরে পূরণ করা হইবে এই নিয়ম ৩। অভাববোধ দেখা দেয় মানুষের মনে দ্বন্দ্ব। প্রত্যেকটি অভাব তখন সর্বাগ্রে পরস্পর প্রতিযোগী পূরণ করার স্পৃহা জাগে। যেমন একই সময় যখন একটি ঘড়ি ও একটি কলমের চাহিদা অনুভূত হইলে, উভয়েরই অভাব তখন সমান প্রবল বলিয়া মনে হয়। তখন মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় কোন অভাববোধটি প্রথম পূরণ করা প্রয়োজন। অবশ্য যে অভাববোধ পূরণ করা হইলে সর্বাধিক তৃপ্তি পাওয়া যাইবে সেইটিই প্রথম পূরণ করা হয়।

শেষত, অভাব প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিপূরক। একটি দ্রব্যের অভাব ৪। অভাববোধ অনেক ক্ষেত্রে অপর আর একটি দ্রব্যের অভাববোধ জাগায়। যেমন, দেখা যায় ধূতির অভাবের সংগে জামার পরিপূরক অভাববোধ জাগে।)

সন্তোষ বা অভাবের তৃপ্তি (Consumption) : মানুষ যে-দ্রব্যের অভাব বোধ করে সেই দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হইলে মানুষের অভাবের তৃপ্তি হয়। সুতরাং অভাববোধ ও অভাবের তৃপ্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অভাবপূরণ করার সামর্থ্য না থাকিলে কারণ, অভাববোধ কখনই অভাববোধ বলিয়া ধরা হয় না তাহা অভাব নহে যতক্ষণ সেই অভাববোধকে তৃপ্ত করার জন্ত আবশ্যকীয় অর্থ-ব্যয় করিতে মানুষ ইচ্ছুক বা সমর্থ নহে। অর্থনীতি ও বাণিজ্য শাস্ত্রে অভাবের তৃপ্তিকেই 'ভোগ' বলা হয়। কোনও দ্রব্যের অভাব পূরণ করিয়া কতটুকু সন্তুষ্টি পাওয়া গেল তাহা প্রকৃতই পরিমাপ করা যথেষ্ট কষ্টকর। কারণ তৃপ্তি মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এইজন্য অর্থনীতি ও বাণিজ্য শাস্ত্রে কোনও দ্রব্যের অভাব পূরণ করার জন্ত যে-মূল্য দিতে হয় সেই মূল্যই অভাববোধের এবং তৃপ্তির পরিমাপ। যাহার অভাববোধ প্রবল এবং অভাবপূরণ করার সামর্থ্যও আছে তাহার অভাবই প্রকৃত অভাব।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে মানুষের অভাব সীমাবদ্ধ নহে। তাই আদিমকাল হইতেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াই দেখিল যে প্রকৃতির দান হিসাবে যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাতে তাহাদের সকল অভাবপূরণ করা সম্ভব নহে। প্রকৃতির দান হিসাবে যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার যোগানও সর্বদা অক্ষুণ্ণ নহে। প্রকৃতির দান হিসাবে যে-দ্রব্য

পাওয়া যায় উহার অধিকাংশই থাকে প্রাথমিক অবস্থায় এবং তাহা সরাসরি ভোগ করা যায় না। সেই সকল দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া শিল্পজ দ্রব্যে পরিণত করিতে হয়। সুতরাং দেখা দিল মানুষের কার্যিক প্রচেষ্টায় উৎপাদন বিধি।

উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান (Production and Factors of Production) : উৎপাদনের অপর নামই 'উপযোগিতা তৈয়ারি'। উপযোগিতা

উপযোগিতা গঠন

ও উৎপাদন

সমার্থবোধক

তৈয়ারি আবার অভাববোধ তৈয়ারি অর্থেও ব্যবহার করা যায়।

কারণ, অভাবপূরণ করিতে যেমন দ্রব্য উৎপাদন করা প্রয়োজন

তেমনি কোনও দ্রব্য উৎপাদন হইলে তাহাতেও অভাববোধ বা

উপযোগিতা তৈয়ারি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় টেবিলের

অভাববোধ করিলে উহার তৃপ্তির জন্ত প্রয়োজন টেবিল তৈয়ার করা। আবার

যতদিন টেবিল উৎপাদন না হইয়াছিল ততদিন টেবিলের অভাববোধও ছিল না।

এখন দেখা যাউক, একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে কি কি উপাদান প্রয়োজন। মনে

কর একখানা কাপড় তৈয়ার হইবে। প্রথমত, একখানা কাপড়

উৎপাদনের উপাদান তৈয়ার করিতে আবশ্যিক 'তুলা'। ঐ তুলাকে বলা হয় কাঁচামাল।

১। কাঁচামাল কাঁচামাল বলিতে আমরা সেই দ্রব্যকেই বুঝি যে-দ্রব্য দ্বারা

২। শ্রম অপর কোনও দ্রব্য উৎপন্ন হইলে দ্রব্যটির মৌলিক রূপ আর

৩। মূলধন থাকে না। কাঁচা তুলা কাঁচামাল। কারণ, কাঁচা তুলা হইতে

৪। সংগঠক যে-সুতা তৈয়ারি হইল তাহাতে তুলার মৌলিক রূপ থাকে না।

দ্বিতীয়ত, তুলা হইতে সুতা কাটা এবং সুতা দ্বারা কাপড় বুনার জন্ত দরকার শ্রম। শ্রম কার্যিক ও মানসিক দুইই হইতে পারে।

তৃতীয়ত, তুলা ক্রয় করার জন্ত, শ্রমিকের বেতন ইত্যাদি ব্যয়ের জন্ত এবং সুতা কাটার ও কাপড় বুনার যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্ত প্রয়োজন অর্থ (money)।

ঐ অর্থকে বলা হয় মূলধন।

চতুর্থত, এমন একজন লোকের প্রয়োজন যিনি শ্রম, মূলধন ও কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া এই তিনটি উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন সফল করিবেন। তাঁহার কাজ হইতেছে তিনটি উপাদানকে সংগঠিত করা। তাই তাঁহাকে বলা হয় সংগঠক।

(শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণ (Division of Labour and Specialisation) : ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'Practice makes a man perfect.'

অর্থাৎ, ক্রমাগত একই কাজ করিতে করিতে মানুষ সেই কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। এই কথাও যেমন সত্যি তেমনি বাংলা প্রবাদ আছে

শ্রমবিভাগের ফলই "যার যে কাজ সাজে অন্তের তাতে লাঠি বাজে"। অর্থাৎ,

বিশেষীকরণ প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি বিষয়ে সহজাত দক্ষতা থাকে।

তাই তিনি যত সহজে ঐ কাজটি করিতে পারেন অপর কেহ হুয়ত তত সহজে ও অল্পরূপ দক্ষতার সহিত সেই কাজটি করিতে পারে না। আবার ইহাও দেখা যায়

পারিপাশ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও মানুষ নানারূপ কাজে শিক্ষালাভ করে—যেমন, কৃষক পরিবারের ছেলে কৃষিকার্য করার সুযোগ পায় ছোটবেলা হইতেই।

এখন একজন মানুষকে যদি তাহার আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য নিজেকেই তৈয়ার করিতে হয় তাহা হইলে তাহাব পক্ষে কোনদিনই তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভব হইবে না। কারণ, একই লোকের পক্ষে চাষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা, তুলা হইতে সূতা কাটা এবং সূতা হইতে কাপড় বুনা, মাটি দিয়া

ইট তৈয়ারি করা এবং বাড়ী-ঘর নির্মাণ করা কখনই সম্ভব
 শ্রমবিভাগ ও নহে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন লোক
 বিশেষীকরণের ফল: ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যে
 ১। উৎপাদনবুদ্ধি লিপ্ত থাকে। কৃষক কৃষিকার্য নিয়াই ব্যাপৃত, সে কৃষিকার্যেই
 ২। উৎপাদনব্যয়ের সর্বাধিক পারদর্শিতা লাভ করে। যে তাঁতি সে তাঁত কার্যেই
 সংকোচ লিপ্ত। ইহাতে যে শুধু ব্যক্তিগত লাভ তাহাই নহে, সমষ্টিগত-
 ৩। স্বল্প উৎপাদন ভাবে সমাজও ইহাতে লাভবান হয়। কারণ, সমাজ এই প্রকার
 শ্রমবিভাগ দ্বারা শ্রমিকের নিকট হইতে সর্বাধিক কাজ পায়। যে-জমি কর্ষণ করিতে
 একজন কৃষকের ১ ঘণ্টা লাগিবে সেই জমি কর্ষণ কবিতাই আমাদের মত কৃষি-
 অনভিজ্ঞ লোকের হয়ত ১০ ঘণ্টা লাগিবে। আবার একজন তাঁতির পক্ষে যত
 সহজে কাপড় তৈয়ার করা সম্ভব, একজন কৃষকের পক্ষে কোনদিনই হয়ত তত
 সহজে কাপড় তৈয়ার করা সম্ভব হইবে না।

এই অতীব সত্যটি মানুষ সভ্যতার গোড়ার দিকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় গ্রামে। তাই আজও বহু পুরাতন গ্রামের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই যে এক একটি গ্রাম যেন অল্প সকল গ্রাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; এবং প্রত্যেকটি গ্রাম অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের লোকসমূহের কার্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যাহাদের কাজ শুধু কৃষিকার্য করা; আবার একদল লোক আছে যাহাদের কাজ হয়ত মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করা। এইভাবে গ্রামে কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাইবে। এই যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য করে ইহাকেই বলে শ্রমবিভাগ। এই প্রকার শ্রমবিভাগকে বলা যায় **বৃত্তিভিত্তিক (Occupational)**।

বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থা এতই জটিল যে প্রত্যেকটি দ্রব্য উৎপাদনেও শ্রমবিভাগ-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কাপড়ের কলে একদল শ্রমিক তুলা হইতে সূতা কাটে; দ্বিতীয় দল সূতা হইতে 'গুলি' তৈয়ার করে; তৃতীয় দল সূতা দ্বারা কাপড় বুনে; ইত্যাদি। কাজেই একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে কতিপয় স্তরবিভাগ হয়। প্রত্যেক স্তরেই শ্রমের বিশেষীকরণ

হয়। এই প্রকার শ্রমবিভাগকে বলা হয় Division of labour into processes.

শ্রমবিভাগের যে বিশেষ ফলটি আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতেছে এক একটি কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা বা বিশেষীকরণ (Specialisation) লাভ করা। যে যে কার্যে পারদর্শী সে সেই কার্যে বিশেষীকরণের সুযোগ পায়।

শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুবিধা মানব-সমাজ সৃষ্টির প্রথম হইতেই মানুষ বুঝিয়াছিল। যখন 'আদম' বনে-জংগলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিত, 'ঈভ' তখন গৃহে থাকিয়া আহৃত দ্রব্য খাটোপযোগী করিয়া তৈয়ারী করিত। আজ পর্যন্তও সেই ধারার পরিবর্তন হয় নাই—একটি পরিবারের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবে যে সেখানেও শ্রমবিভাগ কিভাবে কাজ করিতেছে। পরিবারের কর্তা চাকরি করিয়া বা ব্যবসায় করিয়া অর্থ উপার্জন করেন। পরিবারের কর্ত্রী রান্নাবান্না ও ঘর-সংসার দেখাশুনা করেন। এই ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে যে-ব্যক্তিকে ১০টায় আপিসে উপস্থিত হইতে হইবে তাহার পক্ষে ভোর ৫টায় উঠিয়া রান্নাবান্না করিয়া সময়মত আপিসে যোগদান করা কখনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ হইতে যে যথেষ্ট লাভ হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।)

বিশেষীকরণ ও বিনিময় (Specialisation and Exchange) :

বিনিময়ের গোড়ার কথাই বিশেষীকরণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক লোকই যদি তাহার আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে সমর্থ হইত তাহা

হইলে কেহই কাহারও উপর নির্ভরশীল হইত না। প্রত্যেকেই পারস্পরিক নির্ভর-
শীলতাটী বিনিময়ের
মূলকথা

হইবে যখন নিজের পক্ষে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়, অথবা উৎপাদন সম্ভব হইলেও যে পরিমাণ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইবে তাহার তুলনায় অল্প পরিশ্রমে ও সময়ে অপর কেহ সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে। শ্রমবিভাগও এই সাধারণ নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। তাই শ্রমবিভাগের ফল হিসাবে যাহার যে-দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা বেশী সে কেবলমাত্র সেই দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলে সে যাহা উৎপাদন করে তাহার পরিমাণ হয় তাহার নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। এখন এই অতিরিক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে সে তাহার আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে।

(মানব-সমাজের গোড়ায় যে বিনিময়-ব্যবস্থা ছিল উহাকে বলা হয় **প্রাথমিক বিনিময়** বা **দ্রব্য বিনিময় (Barter)**। এই ব্যবস্থায় যাহার নিকট যে-দ্রব্য উদ্ভূত সে সেই দ্রব্য বিনিময় করিয়া তাহার যে-দ্রব্যের অভাব সেই দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া

থাকে। যেমন রামের নিকট চাউল উদ্ধৃত আছে কিন্তু তাহার কাপড় নাই।

এমতবস্থায় রাম যদি এমন একজন লোককে পায় যাহার
১। দ্রব্য বিনিময় নিকট কাপড় উদ্ধৃত কিন্তু চাউলের অভাব, তাহা হইলে
বা সরাসরি বিনিময় দুইজনই উদ্ধৃত পণ্যের পরিবর্তে যে-দ্রব্যের অভাব তাহা ক্রয়
করিতে পারে। এইরূপ বিনিময়-ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা আছে। বর্তমান যুগে
তাই প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা অচল।

প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার অসুবিধা ও পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার উদ্ভব
(Disadvantages of Barter and Emergence of Exchange through Money) :

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা : যায় তাহার মধ্যে প্রথমত অভাবের অমিল। যেমন, উপরি-
উক্ত উদাহরণে বলা হইয়াছে যে এক ব্যক্তির নিকট চাউল উদ্ধৃত
১। অভাবের আছে আর তাহার কাপড়ের অভাব আছে। এখন যে-ব্যক্তির
অমিল কাপড় উদ্ধৃত আছে তাহার যদি চাউলের অভাব থাকে তবেই
বিনিময় সম্ভব, নচেৎ নহে। এরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে যাহার কাপড়
উদ্ধৃত আছে তাহার হয়ত তৈলের অভাব আছে, আর যাহার তৈল উদ্ধৃত রহিয়াছে
তাহার চাউলের অভাব আছে। সুতরাং কাহারও অভাব অগ্র আর একজন
পূরণ করিতে পারিতেছে না।

উদাহরণ : ক—চাউল উদ্ধৃত—কাপড়ের অভাব

খ—কাপড় উদ্ধৃত—তৈলের অভাব

গ—তৈল উদ্ধৃত—চাউলের অভাব

এই উদাহরণটি হইতে দেখা যায় প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থায় ক, খ ও গ কেহই
অপর একজনের অভাবপূরণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, যদি বা অভাবের মিল হইল, এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে যখন
একটি দ্রব্যকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করা যায় না বলিয়া অভাবপূরণ সম্ভব হয় না।

যেমন, ক-এর নিকট ৫০ কিলোগ্রাম চাউল উদ্ধৃত আছে।

২। দ্রব্য

বিভাজনে অসুবিধা

তাহার আবশ্যক ১ কিলোগ্রাম মাংস। আর ঘ-এর নিকট

একটি মেঘ আছে তাহার আবশ্যক ১০০ কিলোগ্রাম চাউল।

ঘ যদি ১০০ কিলোগ্রাম চাউল পায় তাহা হইলে তাহার মেঘটি হস্তান্তর করিতে
রাজী। এ-ক্ষেত্রে যদিও ক-এর ৫০ কিলোগ্রাম চাউল উদ্ধৃত আছে তথাপি ঘ ৫০
কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে ক-কে আধখানা মেঘ দিবে না, কারণ সে-ক্ষেত্রে
বাকী আধখানা মেঘ তাহার অকেজো পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং দ্বিতীয় অসুবিধা
হইল অংশ ভাগ করার অসুবিধা।

তৃতীয়ত, পণ্যের মূল্যানুপাত স্থির করার অসুবিধা। একটি পণ্যের পরিবর্তে
যখন বহু পণ্য বিনিময় করিতে হয় তখন দেখা দেয় এই অসুবিধা। ক-এর নিকট

চাউল উদ্ধৃত; আর খ-এর নিকট ডাইল উদ্ধৃত। উভয়েরই প্রয়োজন কাপড়।

৩। মূল্যানুপাত এখন একথানা কাপড়ের জন্তু কত চাউল দিতে হইবে এবং স্থির করার অস্ববিধা একথানা কাপড়ের জন্তু কত ডাইল দিতে হইবে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে স্থির করিতে হইবে। কাপড়ের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ের বা মূল্যের অনুপাত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হইতেছে।

কিন্তু বর্তমান যুগে যে বিনিময়-ব্যবস্থা চালু আছে তাহাতে এই অস্ববিধাগুলি বড় দেখা যায় না। এখন আর প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা দেখা যায় না। তাহার পরিবর্তে পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। পরোক্ষ বিনিময়ে সরাসরি বা দ্রব্য বিনিময়ের অস্ববিধা দূর হয়। পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থায় কোনও দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্য গ্রহণ করা হয় না। তোমাদের সকলেরই এই অভিজ্ঞতা আছে যে বাজার হইতে মাছ ডাল তরকারি মাংস ডিম সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছুই কিনিতে ইচ্ছা কর, যদি তোমাদের নিকট পয়সা থাকে তবে কোন দ্রব্যই তোমাদের পাইতে অস্ববিধা হয় না। যে-কোন দ্রব্যই পয়সার বিনিময়ে কিনিতে পার।

এই উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে পয়সা সকলেই গ্রহণ করিতেছে এবং সকলেই পয়সার সাহায্যে যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই পাইতে পারে। সুতরাং পয়সাকে বলা হয় বিনিময়ের মাধ্যম। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পয়সার উৎপত্তির পূর্বে আমাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা'র নিকট মাধ্যম সর্বজনগ্রাহ্য পয়সার গল্পে শুনিয়াছি 'কড়িই' বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যখন সকলের নিকট গ্রহণোপযোগী (সর্বজন-গ্রাহ্য) একটি দ্রব্য 'পয়সা' বা 'কড়ি' চলিতে লাগিল তখন হইতেই প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অস্ববিধা দূর হইল। অথবা এই কথা বলাই বোধ হয় সংগত হইবে যে, মাল্লুষ এই অস্ববিধা দূর করিবার জন্তু উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ দ্বারা সর্বজন-গ্রাহ্য 'পয়সা' আবিষ্কার করিল। এখন যে-ব্যক্তি চাউলের বিনিময়ে কাপড় কিনিতে চাহে তাহার আর এমন কোন ব্যক্তির জন্তু অপেক্ষা করিতে হইবে না যাহার চাউলের অভাব আছে। কারণ, যে-ব্যক্তি কাপড় কিনিবে সে চাউলের বিনিময়ে 'পয়সা' পাইলে সেই পয়সা দ্বারা যাহা খুশী তাহাই কিনিতে পারে। কাজেই পরোক্ষ বিনিময়ে 'অভাবের অমিল' এই অস্ববিধা দূর হইল।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্য অংশীকরণের অথবা বিভাজনের অস্ববিধাও দূর হইল। কারণ, এখন কেহ ১ কিলোগ্রাম মাংস কিনিতে চাহিলে ১ কিলোগ্রাম মাংসের জন্তু কত দিতে হইবে তাহা পয়সা দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

তৃতীয়ত, দ্রব্যের মূল্যানুপাতের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন করার প্রয়োজন নাই। সকল দ্রব্যই ঐ সর্বজনগ্রাহ্য 'পয়সার' সহিত অনুপাতে স্থির হয়। কয় পয়সার

বদলে ১ কিলোগ্রাম তৈল, কম পয়সার বদলে ১ কিলোগ্রাম চিনি পাওয়া যাইবে উহাই এখন দ্রব্যের মূল্যানুপাত। সকল দ্রব্যের মূল্য এখন পয়সায় স্থিরীকৃত হয়। তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্র ভার্জিনিয়াতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও তামাকই ছিল; বিনিময়ের মাধ্যম। তামাক ভার্জিনিয়াবাসী সকলেই ব্যবহার করিত বলিয়া সকলেই দ্রব্য বিনিময় করিত তামাকের মাধ্যমে।

যতদিন বিনিময় গ্রামের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন কোনরূপে প্রত্যক্ষ বিনিময় চলিত। কিন্তু ধীরে ধীরে দ্রব্য বা পণ্য বিনিময় গ্রামের গণ্ডি ছাড়াইয়া পড়িল দূর দেশ-দেশান্তরে। যে-যুগে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ সে-যুগে প্রত্যক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কিন্তু বর্তমানে কোন গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে।

প্রত্যক্ষ বিনিময় ক্ষুদ্র বরং এই কথা বলাই বোধ হয় সমীচীন হইবে যে অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে সম্ভব ক্ষেত্রে—অর্থাৎ, দ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণে শ্রমবিভাগ ও বিশেষী-করণেব ফল হিসাবেই দেখা দিল পরোক্ষ বিনিময়-ব্যবস্থা।

ধীরে ধীরে দূর দূর দেশেব সহিত দ্রব্যেব আদান-প্রদান—অর্থাৎ, ব্যবসায় আরম্ভ হইল। যে-সমস্ত স্থানে দূর দূর দেশের সহিত দ্রব্য আদান-প্রদানের কাজ চলিতে লাগিল সেই সকল স্থান বড় বড় ব্যবসায়স্থল হিসাবে খ্যাতিলাভ করিতে লাগিল এবং গড়িয়া উঠিল বড় বড় সহর ও বন্দর। এই বড় বড় সহর ও বন্দরের সাহায্যে গড়িয়া উঠিল দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য (Trade and Commerce)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগের জন্ম গড়িয়া উঠিল সহর ও বন্দর; আবার সহর ও বন্দর গড়িয়া উঠার ফলে প্রসারলাভ করিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সম্পদের খ্যাতি এককালে টানিয়া আনিয়াছিল ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সাহসী ব্যবসায়ীদের। জব চার্ণক যখন দেখিলেন যে হুগলী নদীর তীরবর্তী স্থতাহুটিকে একটি সুন্দর বন্দরে রূপান্তরিত করা চলে; তিনি গোড়াপত্তন করিলেন কলিকাতা মহানগরীর। আবার কলিকাতা যখন মহানগরীতে পরিণত হইল তখন দেখা গেল কলিকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করিয়া অফুরন্ত বাণিজ্যিক কার্য চলিতে লাগিল। ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল হইতে রপ্তানি উপযোগী দ্রব্য আসিতে লাগিল; এবং কলিকাতা মহানগরীর মাধ্যমে ইউরোপ, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সহিত চলিতে লাগিল ব্যবসায়-বাণিজ্য।)

বিনিময় ও সহযোগিতা (Exchange and Co-operation) : একদিকে যেমন অভাববোধ, শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ বিনিময়ের পথ সুগম করে অন্তরিকে তেমনি সহযোগিতা ব্যতীত বিনিময় সম্ভব নহে। আমার নিকট যে-দ্রব্যের

প্রাচুর্য আছে আমি যদি সেই দ্রব্য বিনিময়ে সহযোগিতা না করি তাহা হইলে যেমন বিনিময় সম্ভব নহে; তেমনি একটি দ্রব্য যে-দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই দেশ যদি সেই দ্রব্য বিনিময়ে রাজী না হয় তাহা হইলেও বিনিময় সম্ভব নহে। সুতরাং কেবলমাত্র অভাববোধ ও দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকিলেই বিনিময় হয় না। বিনিময় করিতে হইলে চাই পারস্পরিক সহযোগিতা। সহযোগিতার প্রশ্ন প্রবল হয় তখনই যখন দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ।

দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি অর্থনৈতিক দ্রব্য। অর্থাৎ, যে-দ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় করা হয়। যে-দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ নহে সেই দ্রব্য লইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা অর্থনীতি জড়িত নহে। যে-দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ নহে সেই দ্রব্যের বিনিময়ে কোন সমস্যা দেখা যায় না। তাই সহযোগিতারও কোন প্রশ্ন উঠে না। মাহুষের অভাব যখন অপরিসীম এবং অভাবপূরণ করার মত দ্রব্যের যোগান যখন সীমাবদ্ধ তখন যাহাতে সীমাবদ্ধ যোগান দ্বারা অপরিসীম অভাবপূরণ করা যায় তাহার জ্ঞানই আবশ্যিক সহযোগিতা। অল্প দ্রব্যের দ্বারা যখন বহুর অভাবপূরণ করার প্রয়োজন তখন যে সমস্তার ও জটিলতার উদ্ভব হয় উহার সমাধানই আমরা পাই সহযোগিতায়। এই জটিল সমস্যা বিনিময়ের নানা নিয়ম ও উপায় দ্বারা সমাধান হয়। যে নিয়ম ও উপায় দ্বারা জটিল সমস্তার সমাধান হয় তাহাই সহযোগিতার নিয়ম।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা (National and International Dependence and Co-operation) : একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যবসায়ের ভিত্তি অভাব এবং অভাবপূরণের জ্ঞানই ব্যবসায় চলিতেছে। যেমন, কোন ব্যক্তিই আজ একথা বলিতে সমর্থ নহে যে সে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাহার কোনও দ্রব্যের অভাব নাই তেমনি বৃহৎভাবে চিন্তা করিতে গেলে একথাও সমানভাবে সত্য যে কোন জাতিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কোন ব্যক্তির যেমন অভাববোধ থাকিলেই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় না; কোন জাতিও তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইলেই ব্যবসায় করিতে প্রস্তুত থাকে না।

ব্যবসায় কখনই একপাক্ষিক নহে। ব্যবসায়ে অন্তত দুইটি পক্ষ থাকিবে যাহাতে দ্রব্যের আদান-প্রদান হইতে পারে। একই দ্রব্যের দুইটি ভিন্ন নাম—যাহা রাম বিক্রয় করিতেছে তাহাই শ্রাম ক্রয় করিতেছে। কিন্তু শ্রামের কোনও দ্রব্যের অভাব আছে আর রামের নিকট সেই দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে বলিয়াই যে দুই-এর মধ্যে আদান-প্রদান চলিবে তাহা নহে। কারণ, এখন উভয়েরই ব্যবসায় করার ইচ্ছা থাকা চাই। অর্থাৎ, দুই দলের মধ্যে সহযোগিতা থাকা

নির্ভরশীলতা ও
সহযোগিতা ব্যতীত
ব্যবসায় চলিতে
পারে না

চাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশ হিসাবে ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্যদ্রব্য অনেক উদ্ধৃত আছে। এ-ক্ষেত্রেও কিন্তু পাকিস্তান ভারতে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করিতেছে না, তাহার কারণ উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অনেক অভাব।

পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন ব্যবসায় প্রসারের পক্ষে সহায়ক, তেমনিই ব্যবসায়ের মাধ্যমেও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে অবশ্য সহযোগিতার পরিবর্তে সামরিক ও রাজনৈতিক কারণই অধিক কার্যকর ছিল তথাপি ধীরে ধীরে যখন মানুষ বুঝিতে পারিল যে সহযোগিতা ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্য কখনই সম্ভব নহে তখন মানুষ নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল।

সহযোগিতা ব্যতীত যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্ভব নয় তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের অসহযোগ আন্দোলন। আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর হয় তাহাও অধিকরূপে প্রমাণিত হয় বিগত কয়েক বৎসরের ভারতের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্ক দেখিয়া। যে বৃটিশ জাতি ২০০ বৎসরের অধিক ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছিল সেই বৃটিশ জাতির সহিত আজ আমাদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহার কারণ ভারতবর্ষ এখনও এমন অনেক দ্রব্য উৎপাদন করিতে অক্ষম যাহা না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি কখনই সম্ভব নহে। যেমন, যন্ত্রশিল্পে ভারত এখনও এত

পারস্পরিক

সহযোগিতার

কয়েকটি দৃষ্টান্ত

অল্পমত যে গ্রেট ব্রিটেনের মত শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত সহযোগিতা না রাখিলে ঐ সকল দ্রব্যের অভাব কোনদিনই ভারতবর্ষ মিটাইতে পারিবে না। সহযোগিতা দ্বারা যে কেবল

এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্যের আদান-প্রদান সহজ হয় তাহা নহে, উন্নত দেশের সহিত সহযোগিতায় অল্পমত দেশ সহজে উন্নতিলাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষে প্রথম দুইটি যোজনায় আর্থিক উন্নতির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে উহাকে ফলবতী করার জগুই গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত ভারত সরকার আর্থিক সাহায্যের কতিপয় চুক্তি করিয়াছে। রাউরকেল্লার লৌহশিল্প, হুগাঁপুরের টালাই কারখানা, ভিলাইয়ের ইস্পাতশিল্প উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। একদিকে যেমন ভারতবর্ষ এই সমস্ত দেশের সাহায্য ও সহযোগিতায় উন্নতির চেষ্টা করিতেছে তেমনি এই সকল দেশও তাহাদের দেশে যে-সকল দ্রব্য উৎপাদনে যথেষ্ট অসুবিধা আছে সেই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করিতেছে। ইহাতে উভয় দেশেরই মঙ্গল।

মানুষের অভাবপূরণের বিবিধ উপায় (Different ways of satisfying human wants) : মানুষের অভাবপূরণের জগু যে-সকল উপকরণ

বা দ্রব্য আবশ্যক তাহা নানাবিধ উপায়ে সংগৃহীত হয়। অর্থনৈতিক সমাজের গোড়ার দিকে মানুষের অভাব কেবলমাত্র প্রকৃতির দান হইতেই পাওয়া যাইত।

এই অবস্থাকে বলা হয় আদিম যুগ। আদিম যুগে মানুষ বনে-আদিম যুগে প্রকৃতির জংগলে বাস করিত। মানুষের আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব দানই মানুষের বন-জংগলের ফলমূল আহরণ ও পশু ইত্যাদি হত্যা করিয়াই অভাব মিটাইত পূরণ করা হইত। ফলমূল ও পশুর মাংস হইতে পাইত খাদ্য এবং পশুর চামড়া হইতে তৈয়ার করিত পোশাক, এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। আজও মক্ক অঞ্চলে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য চামড়ার বড় বড় থলি ব্যবহার করা হয়। বাসস্থান হিসাবে ঘর, কুটির ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও বন-জংগল হইতে সংগ্রহ করা হইত। পাহাড়-পর্বতের গুহায় অনেক লোক বাস করিত। আবার অনেকে বন-জংগলের গাছপালা দিয়া কুটির তৈয়ার করিত।

এইরূপে যখন একই জায়গায় বহু লোকের বাস হইতে আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে প্রকৃতির দান হিসাবে যে-দ্রব্য পাওয়া যায় উহা দ্বারা আর সকলের অভাব-

জনসংখ্যার বৃদ্ধির
সহিত বহু মানুষ
ক্রমশ চতুর্দিকে
ছড়াইয়া পড়িতে
লাগিল

কেবলমাত্র প্রকৃতির
দান দ্বারা মানুষের
অভাব মিটানো
সম্ভব নহে

অর্থনৈতিক কার্যের
আরম্ভ ও বিকাশ

পূরণ করা সম্ভব নয়। কোন বনে বা জংগলে এমন অফুরন্ত ফলমূল ও বন্যপশুর সরবরাহ থাকে না যাহাতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বাড়তি চাহিদা সেই বনের ফলমূল ও বন্যজন্তুর যোগান হইতেই মিটানো যায়। তাই কোন অঞ্চলে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত তখন চেষ্টা চলিত নতুন নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করার, যে-অঞ্চলে পুনরায় খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান হইবে। ধীরে ধীরে মানুষ বুঝিল যে কেবলমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না, নিজেদের চেষ্টায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। তাই মানুষ আবিষ্কার করিল 'কৃষি-ব্যবস্থা'। কৃষিকেই বলা যাইতে পারে অর্থনৈতিক কার্যের প্রথম সোপান। অর্থনৈতিক দ্রব্য উৎপাদনে যে শ্রমবিভাগ দেখা যায় তাহারও আরম্ভ হয় এই কৃষিকাণ্ড আবিষ্কারের সংগে।

কৃষিজ দ্রব্য হইতে আবার সমস্ত অভাবপূরণ করা সম্ভব নহে। তাই আরম্ভ হইল শিল্পে উৎপাদন। শিল্পের আবার প্রথম দিকে ছিল কুটিরশিল্প। ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল এক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে শিল্পে

১। কৃষি

ক্রমশ কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে ব্যবহার হইতে লাগিল খনিজ শক্তির। খনিজ শক্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময়কেই বলা হয় শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবের অনিবার্ণ ফল হিসাবে দেখা দিল শ্রমের সূক্ষ্ম বিভাগ এবং শ্রমের বিশেষীকরণ। আর আসিল বহুল উৎপাদন নিয়ম। বহুল উৎপাদনের একটি সূফল এই যে উৎপাদন-ব্যয় পড়ে

কম। তাই যে-সমস্ত দেশে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিল এবং যন্ত্রের সাহায্যে

২। কৃটির শিল্প বহুল উৎপাদন আরম্ভ হইল সেই সমস্ত দেশ উৎপাদিত দ্রব্য

৩। যন্ত্র শিল্প নিজ দেশের বাহিরে বিক্রয় করার স্বযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে দেখা যায় আর একপ্রকার বিপ্লব।

পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশই নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাই পর্তুগীজ, ফরাসী এবং বৃটিশ

নোঙর গাডিল স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে। দেশ আবিষ্কারের পরিবহণ-ব্যবস্থার

উন্নতির সহিত প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হইল কয়েকটি পথ, যে-পথে পৃথিবীতে ইহার

পূর্বে কোন লোক চলাচল করে নাই। আবিষ্কার হইল

উত্তমাশা অন্তরীপ, আবিষ্কার হইল হর্প অন্তরীপ ইত্যাদি।

নূতন দেশ জয় করিতে প্রয়োজন সমুদ্রপোত। প্রয়োজনের তাগিদেই গ্রেট ব্রিটেন,

স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী ইত্যাদি দেশসমূহ তৈয়ার করিতে লাগিল সমুদ্রপোত।

সমুদ্রপোত যখন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হইল তখন এক দেশ হইতে অত্র দেশে

লোক চলাচল, দ্রব্য বিনিময় সহজ হইল। এক দেশের সহিত অত্র দেশের দ্রব্য

বিনিময় সমুদ্রপোত ব্যতীত সম্ভব নয়, বরং সমুদ্রপোত গঠনের পরই এক দেশ হইতে

অত্র দেশে দ্রব্যাদি চলাচলের পথ হইল স্বগম। একই রূপে দেশাভ্যন্তরেও এক

অঞ্চল হইতে অত্র অঞ্চলেব সহিত বিনিময় কখনই সম্ভব নয়, যতদিন পরিবহণ-ব্যবস্থা

যথেষ্ট উন্নত না হয়। আজও ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রামের এমন অনেক গ্রাম আছে

যে-স্থানের সহিত স্তম্ভ পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় নাই।

পরোক্ষ উৎপাদন ও বিবিধ আর্থিক কার্য (Indirect production

and various economic activities) : মানুষের অভাব যতই বাড়ে

অভাবপূরণের উপকরণ বা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থাও ততই জটিল আকার ধারণ

করে। মানুষের অভাব যতদিন থাকে, পবিধেয় এবং বাসস্থানের

মাছুষের অভাব যত মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল অভ্যস্ত

বাড়ে অভাবপূরণের সরল ও সহজ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক পরিধেয় দ্রব্য।

উপকরণের উৎপাদন হয় জটিল মানুষ যখন বনে-জংগলে শিকার করিয়াই মাত্র জীবনযাপন

করিত তখন তাহারা যে পশু শিকার করিত উহার চামড়াই তাহারা পরিধেয় হিসাবে

ব্যবহার করিত। কিন্তু মানুষ যতই উন্নততর জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিল

তখন দেখা গেল যে পশুচর্ম আর পরিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় না; পরিবর্তে আসিল

সূতী, রেশম ও পশম বস্ত্র। সূতী বস্ত্র উৎপাদন ধরিলে দেখা যাইবে যে প্রথম

কৃষিকার্যের সাহায্যে উৎপাদন হয় কাঁচা তুলা। কাঁচা তুলা হইতে তৈয়ার হয়

সূতা। বয়ন শিল্পের সাহায্যে সূতা হইতে উৎপাদন হয় সূতী বস্ত্র। তাহা হইলে

দেখা যাইতেছে তুলা হইতে সূতী বস্ত্র উৎপাদন করিতে অন্তত তিনটি স্তর উত্তীর্ণ

হইতে হয়। এই প্রকার উৎপাদনই পরোক্ষ উৎপাদন।

যে-দ্রব্য উৎপাদন হওয়া মাত্রই চাহিদা পূরণে সমর্থ নহে তাহাই পরোক্ষ উৎপাদন। পরোক্ষ উৎপাদনে দেখা যায় যে উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন-স্তর আছে বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক কার্যকলাপ দেখা যায়। উৎপাদন পরোক্ষ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় হইলেই যে সে-দ্রব্য ব্যবহার হইল তাহা বলা যায় না। নানা প্রকার কারণ উৎপাদনের পরই বটন। বটনের জন্তও নানাবিধ আর্থিক কার্যের উদ্ভব হয়। শিল্পে যখন প্রচুর উৎপাদন হইল তখন প্রধানত জানা প্রয়োজন কোন্ অঞ্চলে সেই দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে এবং সেই অঞ্চলে ঐ দ্রব্য পৌছাইবার ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে-অঞ্চলে অভাব আছে সেই অঞ্চলের সহিত উৎপাদন অঞ্চলের যোগস্বত্ব স্থাপন করার জন্ত প্রয়োজন পরিবহণ-ব্যবস্থা। আবার পরিবহণ-ব্যবস্থার সহিত প্রয়োজন গুদামঘরের ব্যবস্থা করা। ব্যবসায়ীর পক্ষে একসময়ে বহু পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইলে প্রয়োজন নগদ অর্থ। সেই অর্থ ব্যবসায়ীর নিকট মজুত না-থাকারই সম্ভাবনা বেশী। তাই তাহার পক্ষে প্রয়োজন কর্জের। কর্জ দিয়া থাকে ব্যাংক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই প্রকার পরোক্ষ উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় নানাবিধ কার্যের প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে কোন একটি বিশেষ কার্যকেই ব্যবসায় বলা সংগত নহে। প্রত্যেকটি ধাপই ব্যবসায়ের এক একটি অংশ।

(অভাবপূরণের জন্তই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা) (Economic activities to satisfy wants) : মানুষের অভাবপূরণের জন্ত যে-সমস্ত উপকরণ বা দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহা কোন মানুষই সম্পূর্ণ তৈয়ার করিতে পারে না; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যখন কোনও ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না তখনই বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় অর্থাৎ, ‘অর্থের’ পরিবর্তে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়। অর্থ কোথা হইতে আসে? অর্থ উপায় করার জন্ত যে-প্রচেষ্টা তাহাকেই অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বলে।

বাণিজ্যতত্ত্ব ও অর্থনীতি (Commerce and Economics) : ব্যবসায়ের গোড়ার কথা আলোচনাকালে একথা বলা হইয়াছে যে মানুষের কর্মজীবন যে একটি বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে তাহা হইতেছে ‘অর্থ’ (money)। অর্থনীতির একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে ইহা মানুষের সম্পদ আহরণ ও ব্যয়, এই দ্বিবিধ কার্য পর্যালোচনা করে। “Economics is the study of man in his wealth getting and wealth spending activities.” এখানে সম্পদ ও অর্থকে একই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যও অর্থনীতির একটি অংশ মাত্র। ব্যবসায়-বাণিজ্য কেবলমাত্র দ্রব্য বিনিময় অথবা দ্রব্য বিনিময়ে সাহায্য করিয়া অর্থ উপার্জনকেই

বুঝায়। সেই দিক হইতে অর্থনীতি বাণিজ্যতত্ত্ব বা ব্যবসায়তত্ত্ব হইতে অনেক ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হয়।

অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ। সমাজবিজ্ঞানের যে-অংশ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, অর্থ, ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করে উহাই অর্থনীতির অন্তর্গত। সেই দিক হইতে বাণিজ্যতত্ত্ব অর্থনীতি হইতে খুব পৃথক নহে। কারণ বাণিজ্য বা ব্যবসায়তত্ত্বও উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ এই তিনটি বিষয়ই আলোচনা করিয়া থাকে। অর্থনীতি ও বাণিজ্যতত্ত্ব এমন অংগাঙ্গীভাবে জড়িত যে ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্থনীতির মূলতত্ত্বসমূহের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর পক্ষে জানা প্রয়োজন কোন দ্রব্য কোথায় উৎপন্ন বা উৎপাদন হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির বিষয়সমূহের মধ্যে মূল্যতত্ত্ব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। ব্যবসায়ীর পক্ষেও কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান উভয়ের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া মূল্য স্থির করা প্রয়োজন। নতুবা হয়ত 'অধিক লাভের আশায় দ্রব্যের মূল্য এমন স্থির করা হইল যে—বাজারে চাহিদা সংকোচ হইল। ফলে ব্যবসায়ী দ্রব্য বিক্রয়ে কৃতকার্ণ না হইয়া বরং লোকসান স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আবার এমনও হইতে পারে যে কোন দ্রব্যের চাহিদা আছে অথচ কি উপায়ে কোথা হইতে সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করা যায় তাহা হয়ত ব্যবসায়ীর জানা নাই। ফলে সেই দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ী অজ্ঞতার জন্ত দ্রব্য বিক্রয়ে অসমর্থ হয়।

ব্যবসায়ীর অর্থনীতির অগ্ৰাণ্ত বিষয় সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ব্যবসায়ী সর্বদা নিজের সম্বন্ধে বিনিয়োগ করিয়াই ব্যবসায় গঠন করে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী কর্তৃক করিয়া ব্যবসায় করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং অর্থসূচী, বিনিয়োগ সম্বন্ধে—অর্থাৎ, টাকার বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কি অবস্থায় সহজে 'অর্থ' (money) সংগ্রহ করা যায় তাহা ব্যবসায়ী জানিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অর্থনীতির তিনটি মূলতত্ত্ব লইয়া ব্যবসায়তত্ত্ব জড়িত—উৎপাদন, বিনিময় ও সন্তোষ। বাণিজ্যতত্ত্বকে বস্তুত ফলিত (applied) অর্থনীতি বলা যাইতে পারে। অর্থনীতি আলোচনা করিয়া বাণিজ্যতত্ত্ব যে-জ্ঞান আহরণ করা যায় উহাই ব্যবসায়ী ব্যবসায় প্রয়োগ করিয়া থাকে। তবে অর্থনীতির জ্ঞান না থাকিলে ভাল ব্যবসায়ী হওয়া যায় না, ইহার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা থাকিলেও, একথা কোন সময়েই প্রকৃত ব্যবসায়ী স্বীকার নহে যে কৃত্তী ব্যবসায়ী অর্থনীতিবিশারদ। অনেকের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ মতে অর্থনীতির জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে এমন না করিয়া ব্যবসায়ী তত্ত্বপরায়ণ করিয়া তোলে যে সে অর্থনীতির তত্ত্ব প্রয়োগ হইতে পারে করিতে গিয়া ব্যবসায় প্রায় বারবার হোঁচট খাইতে থাকে। তাই অনেকে বলেন

Exercises

1. Explain "Wants". What are its characteristics ?

অভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর। অভাবের বৈশিষ্ট্য কি ?

2. What are the advantages of Division of Labour ?

শ্রমবিভাগের সুবিধা কি ?

3. What are the disadvantages of Barter ? How these disadvantages can be removed ?

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা কি কি ? প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা কিভাবে দূর করা যায় ?

4. What different economic and commercial activities originate from indirect production ?

পরোক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থায় কি কি বিভিন্ন আর্থিক ও বাণিজ্যিক কার্যের উদ্ভব হয় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবসায়ের বিবিধ ভাগ

(Division and Subdivision of Commerce)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একথা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে যে কোনও মানুষই তাহার সকল অভাব পূরণ করিতে পারে না। অভাবের পরিতৃপ্তির জন্ত অল্পের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যে-সকল কার্যের ফলে মানুষের অভাব পূরণের পথে বাধাসমূহ দূরীভূত হয় সেই সকল কার্যকেই ‘ব্যবসায়’ (Business) বলা হয়। অর্থনীতি ও বাণিজ্যতত্ত্বে যাহারা দ্রব্য (Goods) ও সেবার (Services) যোগান দ্বারা অপরের অভাবপূরণে সাহায্য করে তাহাদের উৎপাদক (Producer) বলা হয়। আর যাহারা অভাবের পরিতৃপ্তির জন্ত দ্রব্য (Goods) ও সেবা (Services) গ্রহণ করে তাহাদের বলা হয় ভোগকারী (Consumer)।

উৎপাদকের শ্রেণীবিভাগ

উৎপাদকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—শিল্পকর্মী (Industrial workers) ; প্রত্যক্ষ সেবা প্রদায়ী কর্মী (Direct service workers) এবং ব্যবসায়ী (Commercial workers)।

উৎপাদক

(Producers)

শিল্পকর্মী (Industrial workers)	প্রত্যক্ষ সেবা প্রদায়ী কর্মী (Direct service workers)	ব্যবসায়ী (Commercial workers)
---	---	--

শিল্পকর্মীগণ (Industrial workers) প্রকৃতির (Nature) দানের সহায়তায় নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করে এবং সেই সমস্ত দ্রব্য শিল্পীয় প্রণালী (Industrial Process) পরিণত দ্রব্যে (finished goods) রূপায়িত করে।

শিল্পকর্মী পর্মাণে যাহারা আসে তাহাকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : আহরণকারী শিল্পকর্মী (Extractive industrial worker)—যে-সকল কর্মী প্রকৃতির দান (Gifts of nature)—যেমন কয়লা, আকরিক লোহ, খনিজ তৈল ইত্যাদি আহরণ করে তাহাদের বলা হয় আহরণকারী শিল্পকর্মী। দ্বিতীয়ত, যে-সকল শ্রমিক কৃষিজ, খনিজ দ্রব্য হইতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অপর কোনও দ্রব্য

উৎপাদন করে তাহাদের শিল্পশ্রমিক (Industrial workers) বলা হয়। তৃতীয়ত, যে-সকল শ্রমিক খনিজ, বনজ দ্রব্যাদির সাহায্যে রাস্তা ঘাট ইত্যাদি তৈয়ারি করে তাহাদের বলে গঠন শ্রমিক (Constructive workers)।

প্রত্যক্ষ সেবা প্রদায়ী কর্মী (Direct service workers) বলিতে সেই সকল কর্মীদের বুঝায় যাহাদের সেবা লইতে হইলে কোনও মধ্যগের (Middleman) প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চিকিৎসকের সেবা। রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইলে অপর কাহারও সাহায্য লইতে হয় না।

সর্বশেষে আসে ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায়িক কর্মী (Commercial workers)। যাহারা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে অর্থাৎ, কারবারী (Trader) এবং যাহারা উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌছিতে বিভিন্ন স্তরে সাহায্য করে তাহাদের কার্যকেই ব্যবসায় (Commerce) অথবা ব্যবসায়িক কার্য (Commercial activities) বলে।

এই পুস্তকে আমরা ব্যবসায়িক কার্যের সহিতই সংশ্লিষ্ট।

মনে কর তোমার এক কিলোগ্রাম চিনির প্রয়োজন অর্থাৎ অভাব আছে। কি উপায়ে সেই অভাব মিটাইতে পার। তুমি নিজে চিনি উৎপাদন করিতে পার না। সুতরাং চিনি উৎপাদকের নিকট হইতে এক কিলোগ্রাম চিনি কিনিতে হইবে। চিনি উৎপাদকের পক্ষে যেমন এক কিলোগ্রাম চিনি উৎপাদন লাভজনক নহে, তোমার পক্ষেও কয়েক শত মাইল দূরবর্তী চিনি উৎপাদকের সহিত যোগ স্থাপন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই তুমি তোমার পাড়ার দোকানদারের নিকট এক কিলোগ্রাম চিনি কিনিতে গেলে। তোমার আমার মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রেতা যখন একজন দোকানদারের নিকট হইতে চিনি কিনিতে চাই, তখন সেই দোকানদার একই সময় অধিক পরিমাণে চিনি কিনিতে পারে এবং উহা হইতে খুচরা ক্রেতাদের চাহিদা মিটাইতে পারে। সুতরাং যে-ব্যক্তি তোমার আমার মত ভোগকারীদের দ্রব্য ভোগ করিতে সাহায্য করিল সে ব্যবসায়ী। এই প্রকার ব্যবসায়কে ইংরেজীতে বলা হয় 'Trade'; বাংলায় বলা যায় 'কারবার'। ইহাদের কার্যই হইল দ্রব্য ক্রয় করিয়া পুনরায় দ্রব্য বিক্রয় করা। একথা বলা নিম্প্রয়োজন যে ক্রয় মূল্য হইতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলেই তাহার লাভ হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী (Trader) থাকিলেই চলে না। দূর দূরান্তল হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করার মত পরিবহণ-ব্যবস্থা না থাকিলে উৎপাদক ও ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীর (Trader) সহিত যোগ সাধন সম্ভব নহে। সুতরাং উৎপাদনস্থল ও ভোগস্থলের মধ্যে দূরত্ব ব্যবসায়ের একটি প্রতিবন্ধক। দূরত্বের বাধা দূর করে পরিবহণ (Transport) ব্যবস্থা।

বহুদূর হইতে, মনে কর, জাভা হইতে সমুদ্রপথে চিনি জ্ঞানয়ন করা হইবে। সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ব্যবসায়ীর এই

প্রকার দৈব-দুর্বিপাকজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। ইহাকেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি (Risk) বলে। বর্তমানে বীমাপ্রথার সাহায্যে ব্যবসায়ী তাহার ঝুঁকির পরিমাণ ছড়াইয়া দিতে পারে বলিয়া দিন দিন ব্যবসায় প্রসারলাভ করিতেছে। ঝুঁকি ব্যবসায় প্রসারে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক এবং এই প্রতিবন্ধক দূর হয় বীমার (Insurance) মাধ্যমে।

এইভাবেই দেখা যায় যে কোনও ব্যবসায়ী দ্রব্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিল। কিন্তু সংগে সংগেই সেই দ্রব্যের চাহিদা (Demand) দেখা দিল না। সুতরাং ব্যবসায়ীকে ঐ দ্রব্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্যবসায়ের তৃতীয় প্রতিবন্ধক সময়ের ব্যবধান (Difference of time)। যে সময় দ্রব্য ক্রয় করা হয় এবং যখন বিক্রয় করা হয় ত্বয়ের ব্যবধানে দ্রব্য মজুত রাখার প্রয়োজন মিটায় গুদামঘর (Warehouse)।

আবার এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে আইনামুগ চলিত মুদ্রা নহে। অষ্ট্রেলিয়া-বাসী কোনও ব্যবসায়ী ভারতের কোনও ব্যবসায়ীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিলে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত অর্থের মূল্য চাহিবে। উহা কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে? আবার ব্যবসায়ীর পক্ষে হয়ত প্রচুর পরিমাণ মাল মজুত করার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। এই সকল প্রতিবন্ধকতা ব্যবসায় প্রসাবে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রকার বাধা দূর করে ব্যাংক।

সর্বশেষ প্রতিবন্ধক হইতেছে সংবাদ সরবরাহ। কোন দেশে কোন নূতন দ্রব্য উৎপাদন হইতেছে তাহা জানিতে বা জানাইতে না পারিলে ব্যবসায় সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য দ্বারা দ্রব্যের অস্তিত্ব জানানো হয়।

এ-বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

উপরের উদাহরণটি হইতে একথা পরিস্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে উৎপাদকের ঘর হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌঁছিতে কতিপয় স্তর উত্তীর্ণ হইতে হয়। উৎপাদকের নিকট হইতে পাইকার দ্রব্য ক্রয় করে। পাইকারের নিকট হইতে খুচরা ব্যবসায়ী সেই দ্রব্য ক্রয় করে, এবং খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করে ভোগকারী। সুতরাং পাইকার এবং খুচরা বিক্রেতা উভয়ই কারবারী (Trader)। ইহাদের কার্ঘ্যই হইল দ্রব্য ক্রয় করিয়া পুনরায় উহা বিক্রয় করা।

এইভাবে উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌঁছাইতে মধ্যবর্তী অবস্থায় আরও নানাপ্রকার কার্ঘ্য দেখা যায়। যেমন পরিবহণ কার্ঘ্য, অর্থলগ্নী, বীমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যবসায় সম্ভব নহে। তাই ইহাদের বলা হয় কারবারের সহায়ক (Aids to trade)। সুতরাং ব্যবসায় বলিতে মোটামুটি কারবারী কার্ঘ্য (Trade) এবং কারবারী কার্ঘ্যের সহায়ক কার্ঘ্যকে (Aids to trade) বুঝায়। কারবারী কার্ঘ্যের সহায়ক হিসাবে যাহারা কার্ঘ্য করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য

পৌছিতে যে-সকল বাধা আছে তাহা দূরীভূত করে। তাহা হইলে ব্যবসায়ের (Commerce) সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া যায়—“যে-সকল কার্যের দ্বারা উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট দ্রব্য পৌছিতে বাধাসমূহ দূরীভূত হয় তাহাই ব্যবসায়”।

ব্যবসায় (Commerce)

কারবার (Trade)

কাববারের সহায়ক
(Aids to trade)

কারবারের বিভিন্ন রূপ (Different forms of trade) : কারবারী (Trader) যখন তাহার কার্যকে নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে তখন তাহাকে আভ্যন্তরীণ কারবার অথবা ব্যবসায় (Home Trade) বলে। এই প্রকার ব্যবসায় দেশের মধ্যেই দ্রব্য ক্রয় করে এবং দেশের মধ্যেই দ্রব্য বিক্রয় করে।

আভ্যন্তরীণ কারবারের মধ্যে দেখিবে এক সম্প্রদায় আছে যাহারা একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে আবার প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করে। যেমন, কলিকাতা বড়বাজার অঞ্চলের ব্যবসায়ীগণ কখনও এক কিলোগ্রাম পাঁচশত গ্রাম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় অথবা বিক্রয় করে না। ইহাদেরই বলা হয় পাইকার (Wholesalers)। আবার পাড়ার মুদিওয়ালার নিকট দশ কুইন্টেল তৈল চাহিলে সে বিপন্ন বোধ করিবে। সে ক্রয়-বিক্রয় করে এক কিলোগ্রাম পাঁচশত গ্রাম পরিমাণ। তাহাকে বলা হয় খুচরা কারবারী (Retailer)।

আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় (Home Trade)

পাইকারী ব্যবসায়
(Wholesale trade)

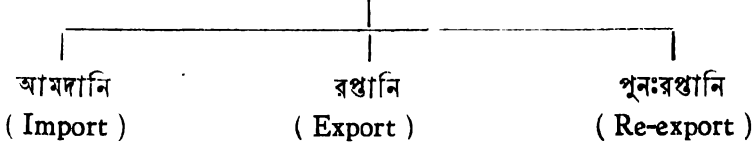
খুচরা ব্যবসায়
(Retail trade)

কারবারী যখন বিদেশ হইতে দ্রব্য ক্রয় করে অথবা বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করে তখন তাহাকে বলে বৈদেশিক ব্যবসায় (Foreign Trade)। বৈদেশিক ব্যবসায়কে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যখন বিদেশ হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজ দেশে আনা হয় তখন তাহাকে বলে আমদানি ব্যবসায় (Import Trade)। অবশ্য এই আমদানিকৃত দ্রব্য ব্যবসায়ী পুনরায় বিক্রয় করিবে।

কিন্তু যখন বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তখন তাহাকে বলা হয় রপ্তানি ব্যবসায় (Export Trade)।

এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করিয়া পুনরায় সেই দ্রব্য অপর কোনও বিদেশে বিক্রয় করা হয়। যেমন ইংলণ্ড ভারত, সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ হইতে চা আমদানি করে এবং সেই আমদানিকৃত চা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকাতে রপ্তানি করে। এই প্রকার ব্যবসায়কে বলে পুনঃরপ্তানি (Re-export অথবা Entrepot) ব্যবসায়।

বৈদেশিক ব্যবসায়



তোমরা একথাও বুঝিতে পারিয়াছ যে উৎপাদনকারীর নিকট হইতে ভোগকারীর নিকট পৌছিতে যে-সকল অস্থবিধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা স্থানের দূরত্ব (Distance of space) ; ঝুঁকি (Risk) ; সময়ের ব্যবধান (Distance of time) ; অর্থ (Money) এবং প্রচার (Publicity)। ইহাও সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে যে স্থানের দূরত্বের (Distance of time) অস্থবিধা দূরীকরণে পরিবহণ (Transport) সাহায্য করে। এইরূপে ঝুঁকির অস্থবিধা দূর করে বীমা (Insurance), অর্থের অস্থবিধা দূর করে ব্যাংক (Bank) সময়ের ব্যবধানের অস্থবিধা দূর হয় গুদামঘরের (Warehousing) সাহায্যে এবং প্রচারের অস্থবিধা দূর করে বিজ্ঞাপন (Advertisement)।

উপরি-উক্ত অস্থবিধাসমূহ দূরীকরণের উপায় আছে বলিয়াই ব্যবসায় চলিতে পারে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কারবারের সহায়ক (Aids to trade) : কারবার (Trade) ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তর্গত বিভাগ পণ্যের বা দ্রব্যের বিনিময়কে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছে। তাই তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়ক (Aids)। দ্রব্য উৎপাদন-কেন্দ্র ও ভোগ-কেন্দ্রের মধ্যে যদি যোগাযোগ না থাকে তাহা হইলে ব্যবসায় চলিতে পারে না—অর্থাৎ, দ্রব্য বিনিময় হইতে পারে না—ইহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায় প্রসারের পক্ষে প্রথম প্রতিবন্ধক হইতেছে যানবাহন বা চলাচলের ব্যবস্থার অস্থবিধা। বহুল উৎপাদন, শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ কখনই সাফল্য লাভ করিত না যদি পরিবহণ-ব্যবস্থা উন্নত না হইত। একথা আমরা সকলেই স্বীকার করিব যে এখনও দূর দূর গ্রামাঞ্চলের সহিত কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নাই বলিয়া সেই সকল অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার-লাভ করে নাই। কি আভ্যন্তরীণ, কি বৈদেশিক, ব্যবসায় প্রসারের জন্ত যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য। রেল কোম্পানী বা জাহাজী কোম্পানী কর্তৃক চলাচলের ব্যবস্থা করার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে কৃষিজ সম্পদ উৎপন্ন হয় উহা

শিল্পাঞ্চলে আনার সুযোগ হয়। শিল্পাঞ্চলে কৃষিজ দ্রব্য হইতে শিল্পজ দ্রব্য উৎপাদন হয়। যানবাহনের অসুবিধা হইয়াছে বলিয়াই কৃষক খাটোপযোগী কৃষি-দ্রব্য

ব্যতীতও শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল—যেমন পাট, তুল ১। স্থানের দূরত্ব ও ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। আবার যদি যানবাহনের যানবাহন ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলেও সহরাঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনের

আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত না। কলিকাতা সহরে এমত ব্যবস্থা নাই যে কলিকাতার অধিবাসীদের জন্ত আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য—চাউল, ডাইল, তরিতরকারি,

মাছ ইত্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। তাই কলিকাতায় এই যানবাহন ব্যতীত সমস্ত ব্যবসায় যানবাহন ব্যবস্থার সাহায্য ব্যতীত কখনই বর্তমান যুগে ব্যবসায় সম্ভব হইত না। কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হওয়ার চলিতে পারে না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে হুগলী নদী

কলিকাতার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত না হইলে কলিকাতা মহানগরী হইত না। তোমরা সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবে যে হুগলী নদী মজিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় সরকারী মহলে, ব্যবসায়ী মহলে এবং জনসাধারণের মনে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। তাহার কারণ এই যে হুগলী নদী মজিয়া গেলে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে যে-ব্যবসায় চলিতেছে তাহা আর সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারিবে না। তাই প্রস্তাব চলিতেছে ফরাক্কা বাঁধ দ্বারা হুগলী নদীতে পলি পড়া বন্ধ করা হইবে।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের সহিত নেপাল, তিব্বত, ভূটান, সিকিম ইত্যাদি অঞ্চলের ব্যবসায় প্রসারলাভ না করার একটি কারণ যানবাহনের অসুবিধা। যানবাহনের অসুবিধা না থাকিলে ভারতের উত্তরে অবস্থিত এই সমস্ত দেশ হইতে পশম, চামড়া, পশুর হাড় ইত্যাদি অতি সহজে আমদানি করা যাইত এবং পরিবর্তে শিল্পে অনগ্রসর ঐ দেশসমূহে পশমজাত, চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করার সুযোগ হইত। এই সকল দেশের সহিত যানবাহনের ব্যবস্থা এতই অসুবিধাজনক যে এখনও মেঘ, গাধা, ঘোড়া এই সকল জন্তুই দ্রব্যাদি বহন করিয়া থাকে। ইহাতে ব্যয়ও যেমন অধিক, সময়ও লাগে প্রচুর। তাই স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করা যায় তাহার জন্ত প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু যানবাহন-ব্যবস্থা। একদিকে যেমন যানবাহন ব্যতীত ব্যবসায় প্রসারলাভ করে না, অগ্নিদিকে তেমনি ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়াই যানবাহন-ব্যবস্থা প্রসারলাভ করে। উভয়ই উভয়কে সাহায্য করিয়া থাকে। পণ্য বা দ্রব্য বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকিলেই

যানবাহন-ব্যবস্থার প্রসার হয়। একসময় ছিল যখন বাংলা দেশের সহিত সমগ্র উত্তর ভারতের ব্যবসায় চলিত গংগা নদীর উপর দিয়া। তখন কলিকাতা হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত দ্রব্য আদান-প্রদান চলিত বড় নৌকা বা বাজরায়। ইহাতে

যে সময় ব্যয়িত হয় তাহা সংক্ষেপ করার জন্ত আরম্ভ হইল রেল স্থাপন। রেল স্থাপনের পর রেল কোম্পানী অনেক পরিমাণে ব্যবসায় নৌ-পরিবহণের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

পরিবহণ-ব্যবস্থা আবার অনেক প্রকারের হইতে পারে—যেমন সড়ক (রাস্তা) পরিবহণ (Road Transport), রেল পরিবহণ (Rail Transport), নৌ-পরিবহণ (Water Transport), বিমান পরিবহণ (Air Transport)। ইহাদের পারস্পরিক স্তবিধা-অস্তবিধা পরে আলোচনা করা হইবে।

ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। একথাও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে এমন অনেক দেখা আছে যেখানে অর্থের যোগানের অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে নাই এবং ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহার অনগ্রসর। অর্থের প্রয়োজন নানা কারণেই হইতে পারে। ২। অর্থ ও ব্যাংক তাহার মধ্যে এইটুকুমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্তমান ব্যবসায় উৎপাদন-পদ্ধতিতে কখনই চাহিদা উদ্ভূত হওয়ার পর দ্রব্য উৎপাদন করা হয় না। পরন্তু, চাহিদা হইবে এইরূপ অনুমান করিয়াই পণ্য উৎপাদন করা হয় (Production in anticipation of demand)।

আবার আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বহুল উৎপাদন করাই রীতি। তাই কোন শিল্পপতির পক্ষে প্রথম প্রয়োজন কাঁচামাল খরিদ করার জন্ত অর্থ, শ্রমিক নিয়োগ করিয়া শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্ত অর্থ, যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্ত অর্থ, প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে শিল্পের চাই প্রচুর অর্থ। কারণ, শিল্পপতি প্রথমে এই সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে এবং পরে সেই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে। আবার কাঁচামাল বেনীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষিজ পণ্য। তাই যখন শস্ত উত্তোলন হয় তাহার পরই শিল্প-মালিকগণ প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল মজুত করিয়া রাখে, যাহাতে পরবর্তী শস্ত উত্তোলনের সময় পৰ্যন্ত শিল্প কাঁচামালের অভাবে অকেজো হইয়া বসিয়া না থাকে। আবার যাহারা পণ্য লেনদেন করে তাহাদেরও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কারণ যদিও সে খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকে তথাপি যাহাতে কোন সময়ই পণ্যের অভাব না ঘটে—অর্থাৎ, চাহিদানুযায়ী যাহাতে সর্বদাই পণ্য সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্ত পণ্য-বিক্রেতা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে পণ্য মজুত রাখিতে বাধ্য হয়। একই সময়ে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্ত প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। এখন প্রশ্ন হইতেছে অর্থ আসিবে কোথা হইতে। যখন নিজের ‘অর্থ’ অপ্রচুর তখন একমাত্র উপায় কর্ত্ত করা। কর্ত্ত করিতে হইলে এমন লোক থাকা প্রয়োজন যাহার নিকট নিজের প্রয়োজনানতিরিক্ত অর্থ আছে। এখনও আমাদের দেশে দেখিতে পাইবে একদল লোকের কাজই হইল অঙ্ককে অর্থ ধার দেওয়া। ধার দিয়া সে ‘সুদ’ আয় করে।

ব্যবসায়ী বা শিল্প-মালিকের পক্ষেও ‘সুদ’ না দিয়া কোন গতান্তর নাই। কারণ সুদ দিয়া ধার না করিলে তাহার পক্ষে দ্রব্য সংগ্রহ বা মজুত করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যে-ব্যক্তির কাজ হইল অর্থ ধার দেওয়া, তাহার নিকট হয়ত’ এমন পরিমাণ অর্থ না-ও থাকিতে পারে যে সর্বদা ঋণের বা ধারের চাহিদা মিটাইতে পারে। তাই তাহার পক্ষেও আবার অত্রের নিকট হইতে ধার করার প্রয়োজন হয়। এই প্রকার ব্যবসায়কে বলা হয় ‘মহাজনী ব্যবসায়’।

দেশের আর্থিক কার্খের প্রসারের সংগে সংগে ধারের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। তাই শিল্প ও ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যাংক ব্যবসায়। ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান দুইটি কর্তব্য হইল—অত্রের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা এবং অত্রকে ঋণ প্রদান করা। অত্যাশ্রয় আর্থিক ব্যবসায়ের মত ব্যাংক ব্যবসায়ও পণ্য

লেনদেনের সহিত অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ ব্যাংক ব্যাংকের কার্য হইতে প্রয়োজনবোধে অত্রের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ প্রসারের পথ সুগম হয়। আবার ব্যবসায় প্রসারের সংগে সংগে ব্যাংক ব্যবসায়ও প্রসারলাভ করে। আমাদের দেশে শিল্পে অনগ্রসর অবস্থার একটি কারণে বলা হইয়াছে ব্যাংক ব্যবসায়ের অভাব ও ক্রটি। অনেক সময়ে ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারের পক্ষে ধর্মের বিধিনিষেধ প্রতিবন্ধকস্বরূপ কাজ করে। যেমন—ইসলাম ধর্মে ‘সুদ’ গ্রহণ করা অপরাধ। তাই যতদিন পর্যন্ত ইসলাম রাজ্যসমূহ ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা শাসিত হইত ততদিন ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারলাভ করে নাই এবং ফলে সেই সমস্ত দেশ শিল্পে অনগ্রসর রহিয়াছে।

আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষেও ব্যাংক ব্যবসায় অপরিহার্য। আমদানি ও রপ্তানির জন্ত যে লেনদেন হয় উহার মূল্য শোধ করিতে ব্যাংকসমূহই একমাত্র মাধ্যম। কারণ একজন ভারতবাসী যখন ভারতের কোন অংশ হইতে দ্রব্য ক্রয় করে তখন সে ভারতবর্ষে প্রচলিত মুদ্রায়ই মূল্য শোধ করিতে ব্যাংক বৈদেশিক পারে, কিন্তু যখন তাহাকে ভারতের বাহিরের কোন দেশ বাণিজ্যের সহায়ক হইতে—মনে কর, ইংলণ্ড হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তখন সে আর ভারতীয় মুদ্রায় দ্রব্যের মূল্য শোধ করিতে পারে না। কারণ ইংলণ্ড-বাসী ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণ করিবে না কারণ সেই অর্থ সে ইংলণ্ডে ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাই এইসব ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে উভয় দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হারে মূল্য আদান-প্রদান হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসায়ের পক্ষে ব্যাংকের সাহায্য অপরিহার্য, আবার ব্যবসায় প্রসারের সংগে ব্যাংক ব্যবসায় প্রসারলাভ করে।

মালগুদাম (Warehouse) : আমরা দেখিতেছি যে বর্তমানকালে উৎপাদন ও বিনিময় উভয়ই ব্যাপক পদ্ধতিতে করা অর্থাৎ, ব্যাপক বা বহুল উৎপাদন করাই বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার নিয়ম। আবার যাহারা বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে

ক্রয় করে তাহারাও ক্রয় করে বহুল পরিমাণে। সুতরাং শিল্প-মালিক যাহারা দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ব্যবসায়ী যে দ্রব্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ক্রয় করে উভয়কেই ৩। মালগুদাম বহুল সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল অথবা পরিণত দ্রব্য মজুত রাখিতে হয়। মজুত রাখিতে হইলে প্রথমত দরকার স্থান; দ্বিতীয়ত মজুত মাল সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা। শিল্প-মালিক অনেক ক্ষেত্রেই নিজের শিল্পের ভিতর মাল মজুত রাখার স্থান সংকুলান করিতে পারে না, আবার ব্যবসায়ীর পক্ষেও সর্বদা দোকানে বা বিক্রয়স্থলে প্রচুর মাল মজুত রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তাই শিল্প ও ব্যবসায় প্রসারের সংগে প্রসারলাভ করিয়াছে একপ্রকার ব্যবসায়—উহা হইতেছে মালগুদামের ব্যবসায়।

মালগুদামের ব্যবসায় শুধু যে শিল্প-মালিকের কাঁচামাল, পরিণত দ্রব্য বা ব্যবসায়ীর ক্রীত দ্রব্য মজুত রাখিতেই প্রয়োজন হয় তাহা নহে। পরন্তু, এক স্থান হইতে অত্র স্থানে প্রচুর মাল প্রেরণ করিতেও মালগুদামের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একাদিক্রমে কয়েকদিন মাল মজুত রাখার প্রয়োজন হইলে মালগুদামে মাল রাখা হয়। এই প্রকার নানাবিধ কার্যের জন্ত মালগুদামের গুরুত্ব দিন দিন অল্পভূত হইতেছে। আবার অনেক সময়ে আমদানিকারক দ্রব্য আমদানি করিয়া আমদানি-শুল্ক দিতে অপারগ হইলে ত্রায্যত জাহাজ হইতে মাল খালাস করিতে অল্পমতি পাইতে পারে না। কিন্তু জাহাজ ত' আর মাল ভর্তি অবস্থায় বহুদিন পোতাশ্রয়ে আটক থাকিতে পারে না। তাই সরকার হইতে আমদানিকারককে এই সুবিধা দিয়া থাকে যে যতদিন আমদানি-শুল্ক পরিশোধ না করিবে ততদিন এমন এক জনের অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে মাল গচ্ছিত রাখা হইবে যে আমদানিকৃত মালের উপর দেয় শুল্ক পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মাল আটক রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রকার মাল যে-মালগুদামে রাখা হয় তাহাকে বলে শুল্কধীন মালগুদাম (Bonded Warehouse)। আমদানিকারক তাহার আর্থিক অবস্থায় যখন যে পরিমাণ আমদানি-শুল্ক দিতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব্য খালাস করিতে পারে। রেল বা জাহাজে মাল চলাচলকালে প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-দ্রব্য বাহিরে প্রেরণ করা হইল বা বাহির হইতে যে-দ্রব্য আমদানি করা হইল তাহা জাহাজে বা রেল ভর্তি করিতে বা খালাস করিতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। এই কারণেই মাল রেল সংল বা পোতাশ্রয় সংলগ্ন গুদামঘরে গচ্ছিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মালগুদাম ব্যবসায় যথেষ্ট নাই বলিয়া ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে—উহার নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন' (West Bengal Warehousing Corporation)। এই কর্পোরেশনটি সরকার ও সাধারণের যৌথ মূলধনে স্থাপিত হইয়াছে।

বীমা (Insurance) : বীমা বলিতে হয়ত' তোমাদের জীবনবীমার কথাই মনে হইতে পারে। জীবনবীমাও ব্যবসায় বটে। তবে এখানে যে-বীমার প্রসংগ

৪। বীমা
ব্যবসায় বিশেষ
বিশেষ ক্ষতির
ঝুঁকি লব

উল্লেখ করা হইতেছে তাহা হইতেছে বাণিজ্যিক বীমা। পূর্বে
উল্লেখ করা হইয়াছে শিল্প-মালিকের এবং ব্যবসায়ীর একসময়
প্রচুর মাল গুদামজাত করিয়া রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।
গুদামে থাকাকালে কোনও দৈব-দুর্ঘটনায় গুদামে আগুন
লাগিয়া সমস্ত মাল পুড়িয়া গেল। উহার জন্ত কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ?

নিশ্চয়ই যে-ব্যক্তির মাল গুদামজাত করা হইয়াছে সে। তাহা হইলে তাহার পক্ষে
খুবই সুবিধা হয় যদি এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এমন
আশ্বাস পাওয়া যায় যে অগ্নিকাণ্ডে তাহার মজুত মালের কোন ক্ষতি হইলে
সেই প্রতিষ্ঠান তাহার ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করিবে। অগ্নিকাণ্ড খুব হামেসাই
ঘটে না। যে-সকল ব্যবসায়ী এই প্রকার ক্ষতিপূরণের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া
ব্যবসায় করে তাহার। পরিসংখ্যানের সাহায্যে খতিয়ান করিয়া দেখিয়াছে
যে গুদামজাত মালের হয়ত' শতকরা ২ বা ৩ ভাগ অব্য অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়।
তাহা হইলে যদি মালের মালিকগণ অগ্নিকাণ্ড হইতে লোকসান এড়াইতে চাহেন
তাহা হইলে যাহারা ক্ষতিপূরণের ঝুঁকির ব্যবসায় করেন তাহাদের ক্ষতিপূরণের
প্রতিশ্রুতির জন্ত কিছু মাসুল বা টাঙ্গা (Premium) দিয়া মাল বীমা করিয়া
রাখিতে পারে। তাহাতে মালের মালিকও অনেকটা আশ্বস্ত থাকিবে যে তাহার
মাল সম্ভাব্য লোকসান হইতে মুক্ত। বর্তমান যুগে এই প্রকার বীমা ব্যবসায়ের
যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যেও দেখা যায় দূর দূর দেশ
হইতে জাহাজ যোগে মাল প্রেরণ করা হয়। সে-ক্ষেত্রে যদি দৈব-দুর্ঘটনাকে কোন
জাহাজ ডুবিয়া যায় তাহা হইলেও যাহাতে ক্রেতার কোন লোকসান না হয়
তাহার জন্ত ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া কোন কোন প্রতিষ্ঠান বীমা করিয়া থাকে।
ইহাকে বলা হয় নৌ-বীমা। নৌ-বীমার পথপ্রদর্শক ইংলণ্ডের 'লয়েডস্'। লয়েডস্
বলিতে এখন নৌ-বীমার অবলম্বকদের মধ্যে যাহারা লয়েডস্ নিয়মাবলী মানিয়া
চলে তাহাদের বুঝায়।

বিজ্ঞাপন ও প্রচার (Advertisement and Publicity) : স্থানান্তরে
উল্লেখ করা হইয়াছে যে আধুনিক উৎপাদন-প্রণালী চাহিদা উদ্ভূত হওয়ার
পূর্বেই অব্য উৎপাদন হয়। অব্য উৎপাদনের অর্থই অর্থনীতিতে

৫। বিজ্ঞাপন ও
প্রচারকার্য ব্যতীত
অব্যের উপযোগিতা
ভৈয়ারি করা কঠিন

উপযোগিতা উৎপাদন। কিন্তু উপযোগিতা উৎপাদন হইলেই
যে ভোগকারী সেই অব্য তৎক্ষণাৎ ভোগ করিবে তাহার
কোনও নিশ্চয়তা নাই। তাই প্রথম যখন কোনও অব্য উৎপাদন
হয় তখন প্রয়োজন প্রচারকার্যের। প্রচারকার্যের সাহায্যে

অব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের ওয়াকিবহাল করা

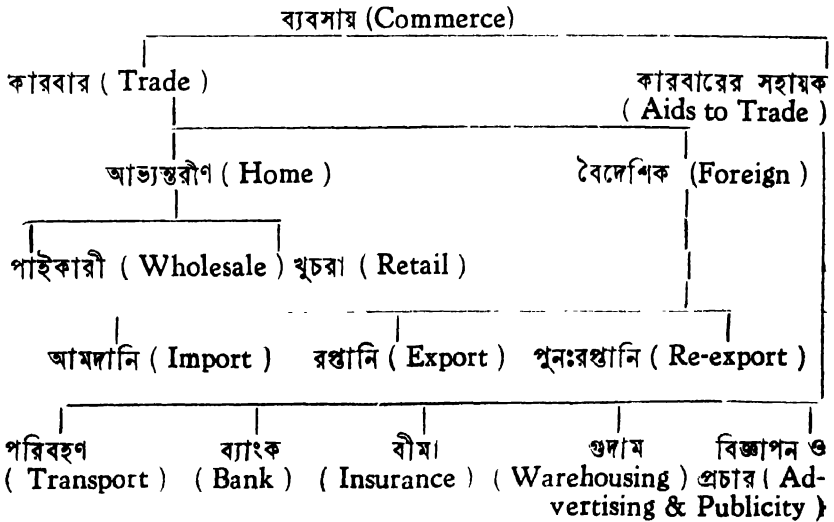
হয়। প্রচারকার্যের একটি উপায় হইল বিজ্ঞাপন—যদিও বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

প্রচারকার্যের মাধ্যমে দ্রব্যের চাহিদা উদ্ভূত হইলেই প্রচারকার্যের বা বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা ফুরাইয়া যায় না। কারণ একবার চাহিদা তৈয়ারি করার পর যাহাতে সেই চাহিদা অব্যাহত থাকে তাহার জন্ত প্রয়োজন প্রচারকার্য চালাইয়া যাওয়া। বস্তুত, বর্তমান যুগে ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রচারকার্যের উপর। কারণ ব্যবসায়ে সর্বদাই এত প্রতিযোগিতা যে, যে-ব্যবসায়ী অধিক-সংখ্যক ক্রেতার অল্পগ্রহ লাভে সমর্থ হয় সেই ব্যবসায়ীই হয় সফল ব্যবসায়ী।

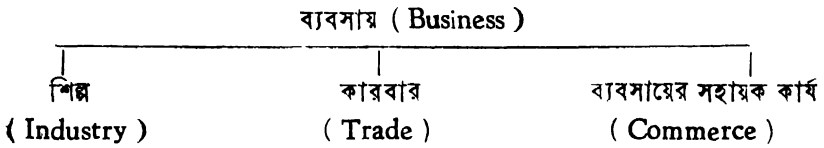
ক্রেতার অল্পগ্রহ লাভ করিতে প্রয়োজন ক্রেতার মানসিক প্রচারকার্যের মাধ্যমে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রচারকার্য চালানো। প্রচারকার্যের ক্রেতা সংগ্রহ করা হয় উদ্দেশ্য, যে-ব্যক্তি কোনও দিন কোন বিশেষ দ্রব্য ক্রয়েই হয়ত' এতটুকু আগ্রহশীল নহে তাহাকে ক্রেতারূপে পরিণত করা। প্রকৃত প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যও তাহাই। সুতরাং ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচারকার্য অপরিহার্য।

ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্ত একপ্রকার বিশেষ ব্যবসায় অধুনা প্রসারলাভ করিয়াছে। এই প্রকার ব্যবসায়ীদের কায়, যে-সকল ব্যবসায়ী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিবে তাহাদের সহিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম, যেমন পত্রিকা-যোগাযোগ, ঘটানো। বস্তুত, প্রচারকার্যে লিপ্ত ব্যবসায়িগণ বিক্রেতাকে প্রচারকার্য ও বিজ্ঞাপনের উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাপারণের নিকট দ্রব্যের পরিচয় ঘটানো হয়।

তাহা হইলে ব্যবসায় (Commerce) অথবা ব্যবসায়িক কার্যাবলীর (Commercial activities) বিভিন্ন ভাগ নিম্নের চিত্র হইতে পাওয়া যাইবে।



এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবসায় বুঝাইতে Business কথাটিও প্রয়োগ হয়। সেক্ষেত্রে Business এবং Commerce সমার্থবোধক। কিন্তু কোন কোন অর্থনীতিবিদ (Economist) ও ব্যবসায় বিশারদদের (Commercial expert) মতে ব্যবসায় কথাটি বুঝাইতে Business কথাটিই প্রয়োগ করা উচিত। তাহাদের মতে ব্যবসায়কে (Business) তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—শিল্প (Industry); কারবার (Trade); এবং কারবারের সহায়ক (Commerce)। এই সম্প্রদায়ের মতে যাহারা দ্রব্য উৎপাদন করে তাহারাও ব্যবসায়ে (Business) লিপ্ত। ইহাদের মতে যাহারা দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের বলা হয় শিল্প (Industry)। দ্বিতীয়ত, যাহারা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাহাদের কারবারী (Trader) এবং তাহাদের কার্যকে কারবার (Trade) বলিয়া ধরিয়াছেন। তৃতীয়ত, শিল্প ও কারবারের কার্য সুগম করিবার জন্ত যাহারা সাহায্য করে যেমন পরিবহণ, বীমা, বিজ্ঞাপন, গুদাম, ব্যাংক ইত্যাদি তাহাদের Commerce-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহাই আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনীয় Aids to trade বলা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে ব্যবসায়ের (Business) বিভাগ নিম্নরূপ :



Exercises

1. Explain the different branches of Commerce.

ব্যবসায়ের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

2. Into how many classes can commerce be divided ?

ব্যবসায়িক কার্য বা বাণিজ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

3. What are the hindrances to Commerce ? How these hindrances can be removed ?

ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক কি কি ? উহা কি উপায়ে দূর করা যায় ?

4. Into how many classes Trade can be divided ?

কারবারী ব্যবসায়কে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

তৃতীয় অধ্যায় আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় (Home Trade)

শিল্প গঠনের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে বিশেষ বিশেষ শিল্প বিশেষ বিশেষ এলাকায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প, বোম্বাই ও আমেদাবাদে সূতীশিল্প, কানপুর ও দিল্লী এলাকায় পশমশিল্প, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রান্তে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি। যে-সমস্ত কারণে এক একটি অঞ্চলে এক একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় তাহার মধ্যে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ; শ্রমিকের যোগান ; যানবাহনের সুবিধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবিভক্ত বাংলার কাঁচা পাটের যোগানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বাংলার পাটশিল্প। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে পাওয়া গিয়াছে মূলতঃ শ্রমিক। হুগলী নদীর মাধ্যমে কাঁচা পাট আগম ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে সুগম। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয় ও বন্দর। তাই কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন শিল্প কেন্দ্রীভূত করা খুবই সুবিধা ও অনায়াসলব্ধ। অমূরূপ সুযোগ রহিয়াছে হয় কেন ? বোম্বাই-এ। বোম্বাই প্রদেশের কালোমাটিতে জন্মে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা। বোম্বাই-এর আবহাওয়া বস্ত্রবয়ন শিল্পের পক্ষে বিশেষ অমূকূল। বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে আফ্রিকা ও ইউরোপ অঞ্চলের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করা খুবই সহজ। বোম্বাই-এ রহিয়াছে লম্বীকারী ব্যাংক। তাই এই দুই অঞ্চলে দুইটি বিশেষ শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার মুখ্য কারণ বাদে গোণ কারণও রহিয়াছে। গোণ কারণের মধ্যে কোন বিশেষ স্থানে উৎপাদিত কোন দ্রব্য যখন বাজারে সুনাম (Goodwill) অর্জন করে তখন সেই দ্রব্য যাহাতে ঐ স্থানের সুনামের সুযোগ পায় তাহার জন্য একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোনও দেশের সর্বত্রই সকল দ্রব্য উৎপাদন করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু ভোগকারী ছড়াইয়া থাকে দেশের সর্বত্র। তাই প্রয়োজন এমন একদল লোকের যাহারা উৎপাদন-অঞ্চল হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারীদের নিকট পৌছাইয়া দিবে। ইহারাই মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী (Middleman or Intermediary businessman)। পাইকার এই প্রকার একজন মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী।

পাইকারের কাজ : যখন শিল্পে পণ্য উৎপাদন হয় তখন তাহা পাইকার ক্রয় করিয়া লয়। ইহাতে শিল্প-মালিকের ও খুচরা ব্যবসায়ীর উভয়েরই সুবিধা ; কারণ পাইকার উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়ের মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করে। পাইকার যদি না থাকিত তাহা হইলে উৎপাদকের সহিত উৎপাদককে খুচরা বিক্রেতার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইত। উৎপাদকের যে একটি কার্খভার গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতেছে খুচরা বিক্রেতা সংগ্রহ করা এবং তাহার সহিত উৎপাদকের যোগাযোগ স্থাপন করা।

দ্বিতীয়ত, পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে যখন দ্রব্য ক্রয় করে তখন উৎপাদক উৎপাদনের জন্ম যে-অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা দ্রব্য পাইকার বিক্রয় হওয়ার পূর্বেই পাইয়া থাকে। দ্রব্য বিক্রয় হওয়ার পূর্বেই অর্থ পায় বলিয়া উৎপাদক উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখিতে পারে। নতুবা উৎপাদককে উৎপাদিত দ্রব্য যতদিন বিক্রয় না হইবে ততদিন অর্থের অভাবে হয়ত শিল্প বন্ধ রাখিতে হইবে। ইহাতে শুধু যে শিল্পেরই ক্ষতি হইবে তাহা নহে সমগ্র অর্থনৈতিক সমাজে ইহাতে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

তৃতীয়ত, শিল্পে দ্রব্য উৎপাদন হওয়ার পর যতদিন দ্রব্য বিক্রয় না হইবে ততদিন শিল্পজাত দ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখার প্রয়োজন। পাইকার এই কাজটিও অনেকাংশে পাইকার করিয়া থাকে। একই গুদামজাত করে সময় প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া পাইকার শিল্প-মালিককে দ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখার দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয়া থাকে।

চতুর্থত, শিল্প-মালিক সর্বদাই চাহিদা উদ্ভূত হইবে এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে তাহার অনুমান মিথ্য হইয়া তাহার জন্ম আবশ্যকীয় সংবাদ পাইকারই যোগাইয়া থাকে। কেন না, পাইকার খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে।

পঞ্চমত, পাইকার যখন প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে তখন যাহাতে সেই দ্রব্য সমস্তই বিক্রয় হয় এবং যাহাতে তাহার লোকসান না হয় তাহার জন্ম আবশ্যকীয় প্রচারকার্য ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রে পাইকারই বহন করিয়া থাকে।

চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান
করিয়া মূল্য স্থির রাখে
ইহাই হইল পাইকার শিল্প-মালিককে যে সেবা দিয়া থাকে তাহার আলোচনা। পাইকার খুচরা ব্যবসায়ীকেও অনুন্নতভাবে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। পাইকার প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিয়া খুঁকি লইয়া থাকে। আবার খুচরা বিক্রেতাকে অনুন্নত খুঁকি হইতে অনেকটা রেহাই দিয়া থাকে ; কারণ খুচরা বিক্রেতা পাইকারের মত প্রচুর মূলধন আটক রাখিতে

পারে না। তাই খুচরা বিক্রেতাকে ধারে ক্রয় করার সুযোগ দিয়া থাকে পাইকার। পাইকার এই সুযোগ না দিলে অনেক ক্ষেত্রেই খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসায় গঠন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যদিও পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে যে এই প্রকার মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী না থাকিলে ক্রেতা হিসাবে ভোগকারী কম মূল্যে দ্রব্য ভোগ করিতে পারে। এই যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে পাইকার না থাকিলে খুচরা ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের সুযোগ পাইত খুব কম। ফলে ভোগকারী দ্রব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহালও থাকিত কি না সন্দেহ।

মধ্যগ হিসাবে দেখা যায় পাইকার উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং দ্রব্য উৎপাদনের পর বিক্রয়ের অনেকটা ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্যবসায়ের অর্থই হইল ঝুঁকি গ্রহণ। ঝুঁকি যত বেশী *ছড়াইয়া দেওয়া যায়, ব্যবসায়ও তত বেশী প্রসারলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবসায়ী হিসাবে পাইকার, উৎপাদকের ও খুচরা ব্যবসায়ীর ঝুঁকির অংশ গ্রহণ করিয়া দ্রব্য বন্টনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

বাজারের অবস্থা জ্ঞাপন ব্যতীতও পাইকার আর একটি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে—উহা হইতেছে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দ্রব্যের মূল্য স্থিতি রাখা। পাইকার প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য গুদামজাত করিয়া রাখে। তাই যখন কোনও দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তখনই সে চাহিদানুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে। তাহার পক্ষে যদি চাহিদা বাড়ার সংগে সংগে দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে মূল্যনীতির নিয়ম অনুসারে দ্রব্যের মূল্য অহেতুক বাড়িয়া যায়। আবার পাইকার সর্বদাই বাজারের চাহিদা ও যোগানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। যদি মনে করে অদূর ভবিষ্যতে কোনও দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে তাহা হইলে যাহাতে উৎপাদক সময়মত চাহিদানুসারে দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্ত পূর্বেই উৎপাদককে হুঁসিয়ার করিয়া দেয়। তাহা হইলে যোগান ও চাহিদার সমন্বয় করা এবং দ্রব্যের মূল্য স্থির রাখা—এই দ্বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য মধ্যগ হিসাবে পাইকার করিয়া থাকে। এই সমন্বয়ের অভাবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় গোলযোগ। দেশের আর্থিক সুস্থতার একটি লক্ষণ হইতেছে মূল্য স্থির থাকা যাহা চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় ব্যতীত সম্ভব নহে।

খুচরা ব্যবসায় (Retail Trade) : পাইকারের মতই খুচরা ব্যবসায়ীও একজন মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। পাইকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে পাইকার উৎপাদক ও ভোগকারীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু খুচরা বিক্রেতার সাহায্য ব্যতীত পাইকার উৎপাদক ও ভোগকারীর সহিত

খুচরা ব্যবসায়ীও
বাণিজ্যের অপরি-
হার্য অংশ

যোগ স্থাপন করিতে পারে না। কারণ খুচরা ব্যবসায়ীই ভোগকারীর সংস্পর্শে আসে। ভোগকারীর চাহিদা সম্বন্ধে খুচরা ব্যবসায়ীই সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া সে পাইকারকে দ্রব্য উৎপাদন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকে। সুতরাং খুচরা ব্যবসায়ীর বাজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উপর পাইকার ও উৎপাদকের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

পাইকারকে বাজার (চাহিদা ও যোগানের অবস্থা) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাই খুচরা ব্যবসায়ীর একমাত্র কর্তব্য নহে। ভোগকারী দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিবিশেষে চাহিদা স্বল্প। পাইকার বা উৎপাদক যদি সরাসরি বিক্রয় করে তাহা হইলেও তাহাদের বিক্রয় করিতে হয় ‘খুচরা’ অর্থাৎ খুব অল্প পরিমাণে। কোন এক ব্যক্তিই দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দ্রব্য ক্রয় করে না। তাই অসংখ্য ভোগকারীর চাহিদা মিটাইবার জন্তই

প্রয়োজন খুচরা ব্যবসায়ের। কলিকাতার পোস্তা অঞ্চলে গিয়া খুচরা ব্যবসায়ী না থাকিলে খুচরা ক্রেতা ভোগের সুযোগ পাইত না। যদি কোন আলু-ব্যবসায়ীর নিকট কেহ এক কিলোগ্রাম আলু ক্রয় করিতে চাহে তবে তাহাকে বাতুল বলিয়াই ফিরাইয়া দিবে। এক কিলোগ্রাম আলু ক্রয় করার স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার।

তাহা হইলে যদি খুচরা ব্যবসায়ী না থাকে তাহা হইলে যাহার প্রয়োজন মাত্র এক কিলোগ্রাম আলু হয়ত তাহাকে আলু ভোগ করা ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা এমন বাজারের খোঁজ করিতে হইবে যেখানে সে এক কিলোগ্রাম আলু ক্রয় করিতে পারে। আবার যদি এমন কোন ব্যবসায়ী পাওয়া না যায় যে এক কিলোগ্রাম আলু বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলেই বা আলু-উৎপাদক আলু উৎপাদন করিবে কি জন্ত? কারণ ‘আলু ত’ আর কেহ কুইন্টেল কুইন্টেল কিনিবে না। আলুর বেলাতে যে-কথা খাটে অন্তান্ত দ্রব্যের বেলাতেও সে-কথা খাটে। কোন দ্রব্যই উৎপাদক যে-পরিমাণে উৎপাদন করে ভোগকারী একক হিসাবে সেই হিসাবে কেনে না। তাই প্রয়োজন খুচরা ব্যবসায়ের।

মনে কর তুমি Fountain Pen কিনিবে। তোমার পক্ষে প্রথম জানা প্রয়োজন কোথায় গেলে একটি Fountain Pen কিনিতে পারিবে। এখন Fountain Pen বিক্রেতার দোকানে গেলে তোমাকে যদি বাছাই করিয়া একটি কলম কেনার সুযোগ দেওয়া না হয় তাহা হইলে তুমি কলমটি না কিনিয়া ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কোন পাইকারের ঘরে কলম কিনিতে গেলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে কি কলম চাই এবং কতটি চাই। তোমার আর বাছিয়া লওয়ার সুযোগ রহিল না। সুতরাং ক্রেতার পছন্দমত বাছিয়া লওয়ার সুযোগ দিয়া যে বিক্রয় করা তাহা খুচরা ব্যবসায়ীই করিয়া থাকে।

আবার লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, পাইকার কখনই ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে না। কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ী সর্বদাই দ্রব্যাদি

সাজাইয়া সজ্জাব্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হামেসাই মানুষের
 সন্মোহন রুচি খুচরা
 ব্যবসায়ীই পাইকার
 ও উৎপাদককে
 জ্ঞাপন করে
 পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নূতন রুচি অনুযায়ী দ্রব্য
 সরবরাহ করা যায় তাহার জ্ঞাত ও খুচরা ব্যবসায়ীই অগ্রণী
 হিসাবে কাজ করে।

তাহাইলে দেখা যাইতেছে যে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী উভয়ই ব্যবসায় জগতে
 মধ্যগ (মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী) হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

খুচরা ব্যবসায় সংগঠনে যে-সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন
 (Factors to consider in organising retail business) :

খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে সাফল্যের জন্য যেটি প্রধান আবশ্যক তাহা হইতেছে ব্যবসায়ের
 স্নানাম (Goodwill)। ব্যবসায়ের স্নানাম যে-সমস্ত কারণে গঠন হয় তাহার মধ্যে

খুচরা ব্যবসায়
 সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ
 বিষয়
 কয়েকটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, স্নানাম
 গঠনে ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন একটি প্রধান সহায়ক। বিশেষ
 বিশেষ স্থানে ব্যবসায় সত্ত্বই স্নানাম অর্জন করিয়া থাকে।

ব্যবসায়ের একটি ধর্ম হইতেছে যে এক একটি স্থানকে কেন্দ্র
 করিয়া এক এক প্রকার ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে। জুতার দোকান যেমন সমগ্র

১। স্থান নির্বাচন
 ইত্যাদির দোকান দেখা যায় সমস্ত ধর্মতলা স্ট্রিটের উপর। তাই
 যখনই খুচরা ব্যবসায়ী ব্যবসায় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয় তখনই প্রয়োজন
 নিতুলভাবে স্থান নির্বাচন করা।

দ্বিতীয়ত, খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে বিক্রয় কুশলতার
 (Salesmanship) উপর। বিক্রয় কুশলতার দ্বারা খুচরা ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের স্নানাম
 গঠন করিয়া থাকে। ক্রেতা যদি ব্যবসায়ীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হয়; তাহা হইলে
 সে ব্যবসায়ীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিবে না।

২। বিক্রয়
 কুশলতা
 অমায়িক ব্যবহার দ্বারা যদি ব্যবসায়ী ক্রেতাকে মুগ্ধ করিতে
 পারে তাহা হইলে ব্যবসায়ী যে-স্নানাম অর্জন করিল তাহাতে

পুরাতন ক্রেতা ত' বরাবর দ্রব্য কিনিতে আসিবেই, উপরন্তু পুরাতন ক্রেতার
 মাধ্যমে নূতন ক্রেতা সংগ্রহও সহজ হয়। যে-উপায়ে পুরাতন ক্রেতার সহিত
 ব্যবসায়িক সম্বন্ধ বজায় রাখা যায় এবং নূতন ক্রেতা পাওয়া যায় উহাই 'স্নানাম'।
 স্নানাম কখনই গঠন হইতে পারে না যদি ব্যবসায়ীর বিক্রয় কুশলতা না থাকে।
 বিক্রয় কুশলতা কত প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত দেশসমূহের
 সহিত তুলনা করিলে। আমাদের দেশে পেশাদারী-বিক্রেতার (Salesman)

শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রেট ব্রিটেনে বাণিজ্যিক শিক্ষাবস্তুর মধ্যে 'বিক্রয় কুশলতা' (Salesmanship) একটি বিষয়বস্তু।

তৃতীয়ত, খুচরা ব্যবসায়ের পক্ষে বিজ্ঞাপন একটি অত্যাৱশ্যক অঙ্গ। খুচরা বিক্রেতা সাধারণত সজ্জা পারিপাট্যের সাহায্যেই ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের কাজ করিয়া থাকে। রাস্তার পাশে স্বেচ্ছাসিদ্ধভাবে নানা দ্রব্য ৩। বিজ্ঞাপনের সর্বসাধারণের সমক্ষে ধরিয়া রাখিলে স্বতই বিজ্ঞাপনের কাজ আবশ্যকতা হয়। নানাবিধ দ্রব্য যখন সজ্জিত থাকে ক্রেতা হউক বা নাই হউক একবার স্বেচ্ছাসিদ্ধ দ্রব্যসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া উহার মূল্য সম্বন্ধে উৎসুক বোধ করে। ধীরে ধীরে যদি দেখে যে বিক্রয় মূল্য তাহার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে তখন অনেক সময়েই দ্রব্য কিনিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই দ্রব্যের প্রয়োজন খুব অতিরিক্ত না হইলেও ক্রেতা শেষ পর্যন্ত সজ্জা পারিপাট্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই দ্রব্যটি কিনিয়া ফেলে। বিজ্ঞাপন ছাড়া যে ব্যবসায় সম্ভব নয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুচরা ব্যবসায়।

খুচরা ব্যবসায়ীর সাফল্য অনেকাংশে মূলধন নিয়োগের উপরও নির্ভর করে। কেবলমাত্র স্থান নির্বাচন, বিক্রয় কুশলতা, ক্রয় কুশলতা এবং সজ্জা পারিপাট্যের উপরেই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে না। অনেক ক্ষেত্রে খুচরা ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে কত মূলধন খাটিতে পারে তাহার উপর মূলধন বিনিয়োগ লক্ষ্য না রাখিয়া অধিক মূল্যের আশায় প্রচুর মূলধন নিয়োগ করিয়া থাকে। পরে হয়ত ব্যবসায়ী দেখিতে পায় যে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করিয়া যে দ্রব্যনিচয় মজুত করা হইয়াছে উহা বিক্রয় হয় না, ফলে অনাবশ্যক মূলধন আটক থাকে। এই মূলধন হয়ত অন্ততাবে খাটাইলে তাহার লাভ হইত। আবার এমনও হইতে পারে যে, ব্যবসায়ে যে-পরিমাণ মূলধন খাটানো যাইতে পারে ব্যবসায়ী খুব হুঁসিয়ার হওয়ার ফলে তাহার চেয়ে কম মূলধন নিয়োগ করিয়া কুঁকির পরিমাণ কমাইতে চাহে। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আবশ্যকীয় মূলধন না খাটাইবার ফলে ব্যবসায়ী সর্বদা চাহিদার অল্পপাতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে অথবা আবশ্যকমত বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে না। ইহাও ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভজনক নহে। সুতরাং ব্যবসায়ীকে এমনভাবে মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনাত্মিক অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম মূলধন নিয়োগ না হয়।

যে সমস্ত ব্যবসায়ে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মূল্য কম অথচ ক্রেতার প্রয়োজনাত্মিক সংখ্যা হয় বেশী, সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত কম মূলধনেই মূলধন নিয়োগ কার্য চলে এবং মূলধন পুনঃ পুনঃ আবর্তনের ফল লাভও হয় বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ছোটখাটো মুদি মশলা ইত্যাদির ব্যবসায়। আবার খুচরা বিক্রয় করিলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবসায়ের আকার ও প্রকৃতি অনুযায়ী মূলধনও প্রচুর আবশ্যক

হইতে পারে, যেমন—চাউল ব্যবসায়ী। তবে ব্যবসায়ীর সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়

যে ব্যবসায় সম্প্রসারণের স্বযোগ থাকিলে উপযুক্ত পরিমাণ
আবার প্রয়োজনের মূলধন যেন সর্বদাই নিয়োগ করা হয়। নচেৎ অন্তান্ত সম্ভাব্য ব্যবসায়ীর
কম মূলধন নিয়োগও সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠার সম্ভাবনা খুবই কম।
ব্যবসায়ের

পক্ষে মঙ্গল নহে

আমরা এই পর্বায়ে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ইহা
পরিষ্কার হইবে যে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা মধ্যগ—যেমন

পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী, সমাজের পক্ষে একটি অপরিহার্য অমঙ্গল (necessary
evil)। ক্রেতার দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের অস্তিত্ব অনেকেই বরদাস্ত
করিতে রাজী নহে। একথা খুবই সত্য যে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর অস্তিত্বের জন্তই

মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী
অপরিহার্য অমঙ্গল

ক্রেতা (ভোগকারী) উৎপাদন মূল্যের অনেক বেশী মূল্যে
দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী না থাকিলে
ভোগকারী অনেক কম মূল্যে উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য
ক্রয় করিতে পারে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ অধিক লাভের আশায় অনেক সময়ে

অতিরিক্ত মুনাফার
স্পৃহার জন্য মধ্যবর্তী
ব্যবসায়ী অপ্রাকৃত
অভাব সৃষ্টি করে

তাহাদের ইচ্ছামত বাজারে দ্রব্যের অপ্রাকৃত অভাব (artifi-
cial scarcity) ঘটায়। যুদ্ধের সময়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি
যে দ্রব্যমূল্য ও দ্রব্যের বটন নিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়া, সাধারণ
ভোগকারী সর্বদা প্রয়োজনানুসারে দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ
হইত না। যাহারা খুব উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে পারিত

তাহারাই দ্রব্য ভোগ করিতে পারিত। মধ্যবিত্ত ও গরীব সম্প্রদায় প্রয়োজনের
তুলনায় অনেক কম দ্রব্য ভোগ করিতে বাধ্য হইত।

অনেকেই মনে করেন যে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর কোন অস্তিত্ব থাকাই উচিত নহে।
এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত যাহাতে ভোগকারী সরাসরি উৎপাদকের নিকট
হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। মধ্যগদের বাদ দিয়া ব্যবসায় তখনই চলিতে
পারে যখন উৎপাদক নিজেই পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার করণীয় কর্তব্য সম্পাদন
করিতে পারে।

উৎপাদকের পক্ষে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করা

উৎপাদক নিজেও
পাইকার হইতে
পারে

কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

উৎপাদকই যদি উৎপাদিত দ্রব্যের জন্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে,
আবশ্যকবোধে দ্রব্য গুণামজাত করার ব্যবস্থা করে, আবার
প্রয়োজনানুযায়ী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাল প্রেরণের
ব্যবস্থা করে তাহা হইলে পাইকার না থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

আবার, খুচরা বিক্রেতার করণীয় কর্তব্যও উৎপাদক নিজে অনেকটা সম্পাদন
করিতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ীর সাহায্যে ভোগকারীর সহিত উৎপাদকের
রাসরি যোগাযোগ সাধিত হয় এবং বাজারে চাহিদা সম্বন্ধে উৎপাদক

ওয়াসিবহাল হয়। ইহা ব্যতীত খুচরা ব্যবসায়ীই দ্রব্য বিক্রয়ে সরাসরি উৎপাদক খুচরা সাহায্য করিয়া থাকে। এখন উৎপাদক নিজেই যদি নানা বিক্রয় ব্যবসায়ও স্থানে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে তাহা হইলে গ্রহণ করিতে পারে খুচরা বিক্রেতার অস্তিত্ব না থাকিলেও ক্ষতি হয় না।

অপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে উৎপাদকের পক্ষে পাইকার বা খুচরা ব্যবসায়ীর কর্তব্য গ্রহণ করা খুব কষ্টসাধ্য নহে। তবে সকল ক্ষেত্রে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাকে বাদ দিয়া ব্যবসায় চলিতে পারে না। বড় বড় শহরাক্ষেত্রে যেখানে ক্রেতার সংখ্যা প্রচুর এবং বিক্রয়ের পরিমাণও খুব বেশী হওয়া স্বাভাবিক সেই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদক নিজে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর কর্তব্য গ্রহণ করিলে তাহার পক্ষে লোকসানের সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু বড় বড় শহরাক্ষেত্রে বাহিরে উৎপাদকের পক্ষে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা খুবই কষ্টসাধ্য এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লাভের আশাও খুবই কম। কারণ শহরাক্ষেত্রে বাহিরে গ্রামাক্ষেত্রে ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম এবং তাহাদের ক্রয়ের পরিমাণও খুবই সীমাবদ্ধ। তাই গ্রামাক্ষেত্রে উৎপাদককে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্ত যে-অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন তাহার তুলনায় উৎপাদক যে লাভ আঁয় করিতে পারে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই তাহার মনে করে। গ্রামাক্ষেত্রে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রামাক্ষেত্রে খুচরা বিক্রয়ের জন্ত দোকান খুলিয়া মূলধন আটক রাখা লাভজনক নহে। সুতরাং শহরাক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়া উৎপাদক খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে কিংবা পাইকারের কর্তব্যকর্ম, যেমন এক সময় প্রচুর মাল গুদামজাত করিয়া রাখা তাহাও, করিতে পারে কিন্তু গ্রামাক্ষেত্রে জন্ত পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

অধুনা আমরা দেখিতে পাইতেছি বড় বড় শহরাক্ষেত্রে, যেমন—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে উৎপাদক খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে এবং বৃহদাকার খুচরা ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করিতেছে। নিম্নে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে :

১. **বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান :** আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে বৃহদায়তন খুচরা উৎপাদকের উৎপাদন কখনই কার্যকরী হয় না যদি উহা ভোগ-ব্যবসায়ের উদ্ভবের কারী ভোগ করার স্বযোগ না পায়। ভোগকারীর নানা স্ববিধা-অস্ববিধা এবং তাহার চাহিদার রকম ইত্যাদি খুচরা বিক্রেতাই উৎপাদকের নিকট পৌছাইয়া দেয়। তাই খুচরা বিক্রেতাকে বাদ দিয়া ব্যবসায়ের বন্টন পদ্ধতি কখনও কার্যকরী আকর্ষণের স্বযোগ হয় না। অধুনা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বড় বড়

নগরীতে একপ্রকার খুচরা ব্যবসায় ক্রমশ প্রসাধিত করিতেছে। উহারা প্রকৃতপক্ষে একাধিক খুচরা ব্যবসায়ের সম্মেলন। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতা মহানগরীতে কমলালয় ষ্টোর্স, বেঙ্গল ষ্টোর্স ইত্যাদি কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা প্রকৃতই খুচরা ব্যবসায়ী। এই প্রকার বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায় এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রাধান্যলাভ করে।

যে-সমস্ত খুচরা ব্যবসায় বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা প্রচুর পরিমাণে খুচরা ক্রেতা আকর্ষণ করিতে পারে তাহারা খুচরা ব্যবসায়কে নানাভাবে প্রসার করিতে পারে। প্রথমত, যে-স্থানে ব্যবসায়টি শাখা স্থাপন কিংবা পণ্ডিত হইয়াছে সেই স্থানেই ব্যবসায়টিতে যাহাতে বিক্রয় বিভাগ গঠন বাড়ে তাহার জন্ত চেষ্টা করা। অর্থাৎ, অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় ও মজুত করিয়া ব্যবসায়টিকে বাড়াইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়টি যখন সুনাম অর্জন করিয়াছে, সুনামের জন্তই শহরের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবসায়ের শাখা স্থাপন করিতে পারে। অবশ্য দ্বিতীয় পদ্ধতিটিতে শাখা পরিচালনার জন্ত নানান সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে।

বিভাগীয় বিপণি বা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর (Departmental Store) : বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়েরও এমন কয়েকটি স্থবিধা আছে যে কারণে খুচরা ব্যবসায়ীও ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়। বিভাগীয় বিপণি (Departmental Store) এই প্রকার একটি বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়। বিভাগীয় বিপণি বলিতে এমন একটি ব্যবসায়কে বুঝায় যেখানে নানাবিধ দ্রব্য খুচরা ক্রয় করা যায়। বিভাগীয় বিপণি বা দোকান কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। এক একটি বিভাগে এক এক প্রকার দ্রব্য বিক্রয় হয়—যেমন, কমলালয় ষ্টোর্স একটি বিভাগীয় বিপণি। এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটিতে কয়েকটি বিভাগ আছে—কাপড় বিভাগ, ছিট-কাপড় বিভাগ, তৈয়ারী জামা-প্যান্ট বিভাগ, হোসিয়ারী বিভাগ, খেলনা বিভাগ, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিভাগকেই এক একটি খুচরা দোকান বলা যাইতে পারে। সম্মিলিতভাবে দোকানটিকে বলা হয় একটি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর বা বিভাগীয় বিপণি।

বিভাগীয় বিপণির বৈশিষ্ট্য : বিভাগীয় বিপণি প্রকৃতপক্ষে একটি খুচরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। ইহার যদিও পাইকারী হারে ক্রয় করিয়া থাকে তথাপি ইহাদের বিক্রয় হয় খুচরা ক্রেতার নিকট। দ্বিতীয়ত, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর কতিপয় খুচরা দোকান বা বিপণির সম্মেলন। পৃথকভাবে দেখিলে হোসিয়ারী বিভাগ স্বতন্ত্র একটি দোকান। আবার তৈয়ারী জামা-প্যান্ট ইত্যাদি বিক্রয় বিভাগও একটি স্বতন্ত্র দোকান। তাই বলা যায় যে ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর কতিপয় খুচরা দোকানের সম্মেলন।

বিভাগীয় বিপণির
বৈশিষ্ট্য :

১। পাইকারের
সমতুল্য

২। কতিপয় খুচরা
দোকানের সম্মেলন

তৃতীয়ত, বিভাগীয় বিপণিতে যে-দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় উহাদের উৎপাদন বা উৎসস্থল নানা দিকে ছড়াইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে-সমস্ত দ্রব্য লইয়া বিভাগীয় বিপণি গঠন হয় উহাদের উৎপাদন বিকেন্দ্রীভূত। ৩। কেন্দ্রীভূত বণ্টন, কিন্তু সমস্ত দ্রব্যই এক স্থান হইতে বিক্রয় বা বিতরণ হয় বিকেন্দ্রীভূত ক্রয় বলিয়া উহাদের বিতরণ বা বণ্টন প্রভৃতি কেন্দ্রীভূত হয়। বিকেন্দ্রীভূত ক্রয় ও কেন্দ্রীভূত বণ্টন বা বিক্রয় বিভাগীয় বিপণির আর একটি বৈশিষ্ট্য।

বিভাগীয় বিপণির সুবিধা : এই প্রকার বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়ের যে-সকল সুবিধা আছে এবং যে সুবিধার জন্ত এই প্রকার বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায় গঠন হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. প্রথমত, একই স্থানে কয়েকটি বিভাগ কাজ করার ফলে ব্যবসায়ের উপরাদ্বিক ব্যয় (overhead charges) একাধিক বিভাগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার সুযোগ থাকে। কোন একটি বিভাগকেই ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ উপরাদ্বিক ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। খাজনা, ভাড়া, আলো, পাখা ইত্যাদি উপরাদ্বিক ব্যয় বাবদ যে-ব্যয় হয়, সমস্ত বিভাগ যৌথভাবে বহন করে বলিয়া কম পড়ে বিক্রয় মূল্য পড়ে কম। এ-বিষয়ে অবশ্য মতানৈক্য রহিয়াছে, কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিভাগীয় বিপণিতে অন্ত্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যে উপরাদ্বিক ব্যয় কম হইলেও সেই সুবিধা কখনও ক্ষেত্র ভোগ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহার। একই সময়ে প্রচুর দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ। তাই ক্রয় হয় পাইকারী হারে। ২। পাইকারী হারে ক্রয়ে লাভ পাইকারী হারে ক্রয় করিতে পারে বলিয়া এই সমস্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়ত, খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকটা উহার সজ্জা পারিপাট্য ও প্রচারের উপর নির্ভর করে। বিভাগীয় বিপণিতে কোন একটি বিশেষ বিভাগের সজ্জা পারিপাট্যের ফল অন্ত্র বিভাগগুলিও ভোগ করিতে পারে। আবার একই সজ্জা পারিপাট্যের ব্যয়ে বহু বিভাগের প্রচারও হয়। এই সুযোগ একক খুচরা ব্যবসায়ীর থাকে না। ৩। এক সজ্জা পারিপাট্যে বহু ফল পায়

চতুর্থত, বিভাগীয় বিপণির কোনও একটি বিশেষ বিভাগ সুনাম অর্জন করিলে, সেই সুনামের ফলভোগী হয় সমস্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটি। ৪। সুনামের অংশ বণ্টন (আবার, একের দুর্নামও অপরের উপর অনেক ক্ষেত্রে বর্তায়।) তাই একের সুনাম অন্ত্রের সুনাম গঠনে সাহায্য করে এবং মোটের উপর ব্যবসায়ের সুনাম অতি সহজে গঠন হয়।

বিভাগীয় বিপণির অসুবিধা : এই সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় বিপণির কয়েকটি অসুবিধা দেখা যায়, যাহার ফলে বিভাগীয় বিপণির সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ। অসুবিধাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত, বিভাগীয় বিপণি স্থাপনের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য বহু খুচরা ক্রেতা আকর্ষণ করা। খুচরা ক্রেতার সংখ্যা বাড়াইবার পক্ষে যেটি সর্বপ্রথম প্রয়োজন

১। যান-চলাচল তাহা হইতেছে প্রকৃষ্ট স্থান নির্বাচন। বিভাগীয় বিপণি এমন স্থানে হওয়া উচিত যে-স্থানে খুচরা ক্রেতা সর্বদা যাতায়াত করিতে পারে। অর্থাৎ, পরিবহণ বা লোক-চলাচলের ব্যবস্থা খুবই সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। বিভাগীয় বিপণি এমন স্থানে হইবে যে-স্থানে সর্বদাই বহু জনসমাগম হয় এবং যে-স্থানে সর্বদা বহু লোক যাতায়াত করে। তাই জনবহুল অঞ্চল ব্যতীত সাধারণত বিভাগীয় বিপণি স্থাপন করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় বিপণি বৃহদায়তন খুচরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বলিয়া, বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়েও সমানভাবে

২। প্রচুর মূলধন বিভাগীয় বিপণিতে প্রয়োজ্য। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পক্ষে সময়মত পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তাই বিভাগীয় বিপণি একমালিকানা স্বত্বে বড় একটি দেখা যায় না। অধিক মূলধনের প্রয়োজন বলিয়া এই প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অংশীদারী অথবা যৌথ কারবারের আকার ধারণ করে।

তৃতীয়ত, বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে সুস্থ ব্যবস্থাপনার উপর। বৃহদায়তন ব্যবসায়ে প্রচুর কর্মচারী কাজ করে; তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া

৩। ব্যবস্থাপনার ব্যবসায় চালাইতে না পারিলে ব্যবসায় সফল হয় না। আবার অনেকগুলি বিভাগ থাকে বলিয়া সমস্ত বিভাগের

সমন্বয় কার্য সমন্বয় করা ব্যবস্থাপনার উপর একটি গুরুভার আনে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অসাফল্যের জন্যই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানও নষ্ট হইয়া যায়।

এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় বিপণি অনেকটা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—বিশেষত বড় বড় শহর ও নগরীতে। তাহার কারণ, ভোগকারী যখন দেখিতে পায় যে পাঁচটি দ্রব্য ক্রয় করিতে পাঁচ দোকানে না ঘুরিয়া একটি দোকানে বিভাগীয় বিপণির গেলেই প্রয়োজনীয় পাঁচটি দ্রব্য পাওয়া যাইবে তখন ভোগকারী সম্ভাবনা থাকা পাঁচ দোকান ঘুরিয়া অহেতুক সময় নষ্ট বা পরিশ্রম না করিয়া সত্ত্বেও প্রদারলাভ একটি দোকান হইতেই তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে নাই : করিবে। জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বিভাগীয় বিপণির সংখ্যা খুব ক্রম বাড়িতে দেখা যায় না তাহার কারণ বিভাগীয় বিপণি প্রায়শঃ মূল্যবান দ্রব্যাদি

বিক্রয় করিয়া থাকে। তাই বিভাগীয় বিপণি অনেক সময় ভোগকারীকে আকর্ষণ

১। উচ্চারণ কারণ

বিভাগীয় বিপণিতে

বিক্রয় মূল্য অধিক

ত' করেই না বরং বিভাগীয় বিপণিতে ক্রয় করিতে ক্রেতাকে

অতুঃসাহী করে। ইহার আরও একটি কারণ আছে। বিভাগীয়

বিপণি সজ্জা পারিপাট্যের উপর এত অর্থ ব্যয় করে যে অনেক

সময়ে মনে হয় সজ্জা পারিপাট্য কেবল ধনশালী সম্প্রদায়কে

আকর্ষণ করিবার জন্তই। পূর্বে অবশ্য একথা বলা হইয়াছে যে এই প্রকার বৃহদায়তন

বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানে উপরাদ্বিক ব্যয় কম পড়ে। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য ইহার বিপরীতই

দেখা যায়। বিভাগীয় বিপণি সাধারণত বড় বড় শহরের

২। গরীব বা নিম্ন

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

চাহিদামুখ্যাবে দ্রব্য

সর্বদা পাওয়া

যায় না।

কেদ্রস্থলেই স্থাপিত হয়। ঐ সমস্ত স্থানের ভাড়া বা খাজনাও

অধিক। সজ্জা পারিপাট্যের ব্যয়, ব্যবস্থাপনার ব্যয় ইত্যাদি

সকলই অগ্রান্ত খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক। তাই

সাধারণ ক্রেতার পক্ষে বিভাগীয় বিপণিতে ক্রয় করা মূল্যের

দিক হইতে লাভজনক নহে। আবার, একথাও কোন কোন

ব্যবসায়ীকে বলিতে শোনা যায় যে বিভাগীয় বিপণিতে দ্রব্যের মূল্য অধিক হওয়ার

কারণ এই যে, যে-সমস্ত দ্রব্য উচ্চ মধ্যবিত্ত বা অবস্থাস্থালী সম্প্রদায়ের নিকট

বিক্রয় করিয়া সহজে স্বনাম অর্জন করা যায় সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া

সাধারণ ভোগকারীর ভোগোপযোগী দ্রব্যের মূল্য বাড়ানো হয়। ফলে বিভাগীয়

বিপণির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মত গরীব দেশের জনসাধারণের

নিকট উহা এখনও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।

বহু-বিপণি (Multiple Shop) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে যদি

মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে ভোগকারী কমমূল্যে

পণ্য পাইতে পারে। আবার একথাও বলা হইয়াছে যে মধ্যগ বা মধ্যবর্তী

ব্যবসায়ী যে-লাভ করে উহা প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক ও ভোগকারীই বহন করিয়া

থাকে। তাই বর্তমানকালে দেখা যায় উৎপাদক সর্বদা মধ্যগ বা মধ্যবর্তী

ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই বন্টনের (Distribution) ব্যবস্থা

করিয়া থাকে। বন্টন বলিতে এক্ষেত্রে খুচরা বিক্রয় ব্যবস্থাকেই বুঝায়। অল্প কথায়

উৎপাদক নিজেই খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। খুচরা

বহু-বিপণির সংজ্ঞা

বিক্রয় করার জন্ত উৎপাদক নিজেই ছোট ছোট দোকান খুলিয়া

নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে। এই প্রকার খুচরা

দোকানকেই বলা হয় বহু-বিপণি (Multiple Shop)। খুচরা বিক্রয়ের জন্ত

বহুসংখ্যক দোকান খুলিয়া উৎপাদক মধ্যগদের বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের হাত হইতে

রেহাই পায়। আবার এই প্রকার বন্টন ব্যবস্থায় উৎপাদক নিজেই সরাসরি ভোগ-

কারীর সহিত যোগস্বত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। পাইকারি অথবা খুচরা

বিক্রেতার উপর আর উৎপাদকের নির্ভর করিতে হয় না। বহু-বিপণি ব্যবসায়ে—

উৎপাদন, পাইকারী ব্যবসায় ও খুচরা বিক্রয়—তিনটিই একই প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবসায়ীর হস্তে শ্রুত থাকে।

বহু-বিপণির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Multiple Shop) :
 বিভাগীয় বিপণি ও বহু-বিপণি দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির ব্যবসায়। বহু-বিপণির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমত, বহু-বিপণিতে (Multiple Shop)
 বহু-বিপণির উৎপাদক নিজেই বটনের ভার গ্রহণ করে এবং নিজেই খুচরা বৈশিষ্ট্য বিক্রয়ের জগৎ একই প্রকারের বহু দোকান খুলিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, বহু-বিপণি নিয়মে উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে যোগস্থাপনের জগৎ কোনও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর বা মধ্যগের প্রয়োজন হয় না। বরং একথাই বোধ হয় সম্ভব যে মধ্যগদের এড়াইবার জগৎই উৎপাদক নিজে বটনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, বহু-বিপণির ক্ষেত্রে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত কিন্তু বটন বা বিক্রয় বিকেন্দ্রীভূত। উৎপাদক কোনও এক স্থানে কারখানায় বহুল উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্য একাধিক বিকেন্দ্রীভূত বিক্রয় দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করে।

চতুর্থত, বহু-বিপণিতে উৎপাদক নিজের উৎপাদিত দ্রব্য ব্যতীত অন্ত্র দ্রব্য বিক্রয় করে না।

পঞ্চমত, বহু-বিপণি নিয়মে ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালনা “কেন্দ্রীয়”। দোকানগুলি কিভাবে পরিচালনা হইবে, কিভাবে দোকান সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা নজ্জিত করা হইবে, তাহাও কেন্দ্র হইতে স্থির করিয়া দেয়। বহু-বিপণিতে প্রত্যেকটি দোকানই এককভাবে স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন হইলেও ইহাদের নীতি গ্রহণ করার কোনও অধিকার থাকে না।

বহু-বিপণির সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of a Multiple Shop) : কোনও প্রকার ব্যবসায়ই সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে।

সুবিধা-অসুবিধা : বহু-বিপণিরও কতকগুলি সুবিধা-অসুবিধা আছে। অসুবিধা থাক। সত্ত্বেও বহু-বিপণি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।
সুবিধা : সুবিধার মধ্যে প্রথমত, বহু-বিপণি থাকার ফলে ক্রেতা কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কারণ মধ্যবর্তী কারবারী অল্পপস্থিত থাকায় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা কারবারী যে-মুনাফা লইত তাহার অংশ ভোগকারী পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, ভোগকারী যদি কোনও বিশেষ উৎপাদকের একবার স্তন্য গঠন উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে একবার নিঃসন্দেহ হয় তাহা হইলে সেই স্তন্য হইলে সে যখনই ঐরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করে তখনই সেই বিশেষ উৎপাদকের উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে ব্যবসায়ের স্তন্য বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, বহু-বিপণির কোনও একটি দোকান যদি স্নানাম প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়, অল্প সকল দোকানই সেই স্নানাম দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে।
 একটি দোকানের স্নানাম অল্প দোকান-উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাটা কোম্পানীর কোনও একটি দোকান-যদি স্নানাম অর্জন করিয়া থাকে তবে বাটা কোম্পানীর অন্যান্য গুলিও ভোগ করে দোকানও সেই স্নানামের অংশভাগী হয়।

চতুর্থত, ভোগকারীর সহিত উৎপাদকের সরাসরি যোগ থাকায় ভোগকারী যেমন কমমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, উৎপাদকও তেমন লাভ পায় বেশী। কারণ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী যে লাভ করিত তাহার অধিকাংশ ফলত উৎপাদক নিজেই পাইয়া থাকে।

পঞ্চমত, ভোগকারীর রুচি ও চাহিদা সম্বন্ধেও উৎপাদককে আর মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করিতে হয় না।

শেষত, একই উৎপাদকের বহু দোকান থাকায় প্রচারকার্যের জন্য যে অর্থব্যয় হয় তাহার ফল সমস্ত দোকানই পাইয়া থাকে। অন্তর্ভাবে বলিলে বলিতে হয় যে প্রচারকার্যের ব্যয় বহু-বিপণিতে কম পড়ে।

এই সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বহু-বিপণির কতকগুলি অসুবিধাও আছে।
 প্রথমত, একই ব্যবস্থাপনায় একাধিক দোকান স্থাপিত হয় অসুবিধা : বলিয়া বহু দোকানের উপর সূচু পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট বহু দোকানের মধ্যে সমন্বয় কষ্টসাধ্য। দোকানগুলি বিক্ষিপ্ত বলিয়া সকল দোকানের মধ্য সমন্বয় পরিদর্শন ও দোকানের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ ঘটানো কষ্টকর করা ব্যয়সাধ্য।

দ্বিতীয়ত, বহু-বিপণিতে সকল দোকানই একই প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া বৈচিত্র্যের অভাব ক্রেতার পক্ষে পাঁচটি দ্রব্য বাছিয়া পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব নহে। অনেক ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে সেই প্রকার দ্রব্যে অরুচি আসিয়া যায়।

তৃতীয়ত, একই পরিচালনাধীনে বহু দোকান থাকে বলিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচুর মূলধন প্রয়োগের আবশ্যক হয়।

চতুর্থত, যেমন একটি দোকান স্নানাম অর্জন করিলে অন্যান্য সকল দোকানই সেই স্নানামের ফলভাগী হয়, তেমনি কোনও একটি দোকান দোকানের স্নানাম যদি স্নানাম অর্জন না করিয়া কোনও কারণে হুঁচক অর্জন করে অল্প দোকানের উপর তাহা হইলে তাহার ক্ষয়লও অল্প সকল দোকানের ক্ষতির প্রতিক্রিয়া আনে কারণ হইতে পারে। অবশ্য একথা বলা চলে যে একই ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকে বলিয়া কোনও একটি দোকানের দোষত্রুটির প্রতিকার সহজেই হইয়া থাকে।

শেষত, বহু-বিপণির বিরুদ্ধে একথাও বলা হইয়াছে যে উৎপাদক খুচরা

বণ্টনের ভার গ্রহণ করে বলিয়া এই প্রকার ব্যবসায় সাফল্যলাভ করিলে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইলে ক্রেতাকে অধিকমূল্য দিতে হইতে পারে। এখন মন্তব্য হইতে পারে যে কোনও একটি দ্রব্য তাহা হইলে কোনও একজন মাত্র উৎপাদক উৎপাদন করিয়া বহু-বিপণির সাহায্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইলে অল্পাংশ খুচরা বিক্রেতার আর অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের দিক হইতে একথা সমর্থনযোগ্য হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ইহা আদৌ সম্ভব নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাটা কোম্পানী এখনও জুতা ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। বাটা কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুচরা জুতা ব্যবসায়ীও ব্যবসায় চালাইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসায়ের ক্ষীতির (Expansion) একটি সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভজনক উপায়ে ব্যবসায় করা সম্ভব নহে।

চেন স্টোর্স (Chain Stores) : Chain শব্দের পরিভাষা যে শৃঙ্খল তাহা তোমরা সকলেই জান। চেন স্টোর্স বলিতে তাই এমন একপ্রকার দোকানকে বুঝায় যাহা শৃঙ্খলের মত একটি আংটার সহিত আরেকটি আংটা যুক্ত থাকে। তুলনাটি অবশ্য ঠিক নহে, কারণ শৃঙ্খল কখনই কার্যকরী হয় না যদি একটি আংটা অপর আংটার সহিত যুক্ত না থাকে। কিন্তু চেন স্টোর্স (শৃঙ্খল বিপণি) অনেকটা সেই প্রকার হইলেও একটি দোকান যে আরেকটি দোকানের সহিত যুক্ত হইবেই তাহা নহে।

চেন স্টোর্স বহু-বিপণির নিয়মেই পরিচালিত হয়। সুতরাং চেন স্টোর্সও বহু-বিপণির মত একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং সূচু ব্যবস্থাপনার জন্ত চেন স্টোর্স ও বহু-বিপণি একই নীতিতে পরিচালিত হয়। চেন স্টোর্সের সহিত বহু-বিপণির ও বিভাগীয় বিপণির সাদৃশ্য ও পার্থক্য সংগঠন ব্যাপারে একই হইলেও মূলত দুইটি দুই রকমের। বহু-বিপণিতে আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদক নিজেই মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়া সরাসরি ক্রেতার সহিত যোগসাদন করিয়া থাকে। কিন্তু চেন স্টোর্সের মালিকগণ নিজেরাই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। তাহার কারণ নিজেদের কোন দ্রব্য উৎপাদন করে না। উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করাই চেন স্টোর্সের কার্য।

চেন স্টোর্সের সহিত বহু-বিপণির দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে বহু-বিপণির মালিক কখনও নিজের উৎপাদিত দ্রব্য ব্যতীত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। কিন্তু চেন স্টোর্স নিজে কোনও দ্রব্য উৎপাদন করে না বলিয়া তাহার পক্ষে কোনও একটি দ্রব্য বিক্রয়ে বিশেষীকরণ সম্ভব নহে। উদাহরণ নানারকম দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। সেদিক হইতে চেন স্টোর্সের সহিত বিভাগীয় বিপণির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

মূল্য শোধ করিতে হয়। মূল্য শোধ করিতে না পারিলে অথবা ক্রেতা দ্রব্যের বিলি না লইলে দ্রব্য বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠানো হয়। ক্রেতা দ্রব্যের বিলি না লইলে ক্রেতা যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করিয়াছে বিক্রেতা উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া থাকে।

ডাক মারফত ব্যবসায়ের সুবিধা এই যে বিক্রেতাকে কোন দোকানের ব্যবস্থা করিতে হয় না, ইহাতে দোকান সম্বন্ধীয় ব্যয়ও বিক্রেতাকে বহন করিতে হয় না। তাহাতে বিক্রেতার পড়তাও পড়ে কম। অনেকের ডাকযোগে ব্যবসার ধারণা যে ডাক মারফত ব্যবসায়ে ক্রেতা অল্পমূল্যে দ্রব্য পরিদ করিতে পারে। ইহার মধ্যে সত্যতা আছে কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে একথা সত্য যে বিক্রেতার দিক হইতে দেখিলে তাহার অনেক ব্যয়-সঙ্কোচ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, দোকানে বসিয়া বিক্রয় করিলে দোকান সুসজ্জিত রাখা, দোকানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা খরচ রহিয়াছে যাহা ডাক মারফত ব্যবসায়ে আবশ্যক হয় না।

এই প্রকার ব্যবসায়ের অনেক ঞ্টিও আছে। ইহার মধ্যে প্রধান এই যে ব্যবসায়ের সাফল্য একমাত্র বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের উপরই নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য ক্রেতার মনে যদি ঔৎসুক্য জাগাইতে না পারে তাহা হইলে এই প্রকার ব্যবসায় মোটেই জনপ্রিয় হয় না।

দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ ব্যবসায় ডাক বিভাগের তৎপরতার উপর নির্ভর করে। ডাকযোগে মাল চলাচলে উহা হারাইয়া যাইতে পারে, আংশিক নষ্ট হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেহই ডাকবিভাগের নিকট হইতে ক্ষতি-পূরণ আদায় করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, ক্রেতা বিজ্ঞাপন ও বিবরণপত্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যে-দ্রব্য ক্রয় করে সে-দ্রব্য যদি পরে তাহার আশাহুরূপ নাও হয় তথাপি তাহার পক্ষে কোন প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নহে। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার ব্যবসায় খুব সস্তা এবং খেলো দ্রব্য লইয়াই কারবার করে এবং তাহাদের স্থায়িত্বও খুব কম।

একমূল্যের দোকান (One Price Shop) : বড় বড় কমমূল্যের দ্রব্য সহরে এক প্রকার খুচরা দোকান দেখা যায় যাহাতে যে-সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহার প্রত্যেকটির মূল্যই এক। আমাদের দেশে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি সহরসমূহে এই প্রকার কতিপয় দোকান আছে। এই প্রকার ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহারা যে-সমস্ত

দ্রব্য লইয়া কারবার করে তাহার মূল্য খুবই কম। যে-সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে উহার স্থায়িত্বও খুব কম। খেলনা, পুতুল ইত্যাদিই সাধারণত এই সকল দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে উহার সহিত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্যও কিছু কিছু দ্রব্য এই প্রকার ব্যবসায়ী বিক্রয় করে, নচেৎ ক্রেতা পাওয়া কষ্টকর হয়।

এই প্রকার ব্যবসায়ের সুবিধা এই যে ইহাতে ক্রেতা জানিতে পারে যে কোনও দ্রব্য লইতে হইলেই তাহাকে কত মূল্য দিতে হইবে। যদি ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে না হয় তাহা হইলেই ক্রেতা এই প্রকার দোকানে যায়।

দ্বিতীয় সুবিধা এই যে নানাবিধ দ্রব্য থাকে বলিয়া কোনও ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য জানিতে পারে একটি দ্রব্যের চাহিদা ক্রেতার নিকট প্রবল না হইলেও দ্রব্যের মূল্য কম বলিয়া যেট বিক্রয়ের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত বাড়ে। ইহাতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির প্রয়োজন হয় না।

একমূল্যের দোকানও বৃহদায়তন করা যাইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে দোকানগুলি সাধারণত বিভাগীয় বিপণিতে রূপান্তরিত হয়। এক এক বিভাগে এক এক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় এবং আবশ্যিকমত দৈনন্দিন জীবনের একমূল্যের দোকান বিভাগীয় বিপণিতে পরিণত হইতে পারে।

একমূল্যের দোকান বিভাগে দ্রব্য পাওয়া যায় এবং আবশ্যিকমত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই কোন না কোন বিভাগ হইতে ক্রয় করা যায়। তবে প্রত্যেকটি বিভাগের দ্রব্যের মূল্য স্থির থাকে। যেমন, একমূল্যের দোকানে জামাকাপড় বিভাগ, খেলনা বিভাগ, জুতা বিভাগ ইত্যাদি নানা বিভাগ থাকিতে পারে। জামাকাপড় বিভাগের প্রত্যেকটির মূল্য ধরা যাউক ৫০ টাকা; জুতা বিভাগের প্রত্যেক বকম জুতার মূল্য ১৫ টাকা, এইভাবে যে-বিভাগেই যাওয়া যাউক, সেই বিভাগেই নির্দিষ্ট মূল্য অমুসারে দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে।

খুচরা সমবায় বিপণি (Retail Co-operative Store) : পূর্বেই উল্লেখ

করা হইয়াছে যে মধ্যবর্তী কারবারীদের উপস্থিতির জন্ত ক্রেতার সমবায় বিপণি কেবল- ক্রয় মূল্য ও বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য অনেক অধিক পড়ে। মাত্র সদস্তদেরই স্বতরাং উভয়ই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে ব্যবসায় দ্রব্যের যোগান দেয় করিতে চাহে। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনও একটি দুর্লভ কার্য, যাহা মধ্যগ ব্যবসায়িগণ করিয়া থাকে। অধুনা এক প্রকার খুচরা ব্যবসায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে।

দ্রব্যের যোগান পর্যাপ্ত — উহা হইল সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যবসায়। এক নির্দিষ্ট না হইলেই ইহার এলাকার কতিপয় লোক একত্রিত হইয়া নিজেদের স্বার্থে একটি উপযোগিতা অধিক সমবায় সমিতি গঠন করে। এই সমবায় সমিতি ব্যবসায় উপলব্ধি করা যায় কার্য চালাইবার জন্ত প্রথমত যে মূলধন প্রয়োজন উহা সমস্তদের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করে। এই প্রকার সমবায় বিপণি

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সদস্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া কারবার করে— যেমন চাউল, ডাইল ইত্যাদি। ইহাদের উপযোগিতা সর্বাধিক অল্পকৃত হইয়াছে যুদ্ধের সময়ে যখন অসামরিক ভোগের জন্ত দ্রব্যের সরবরাহ সরকার-নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের ফলে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছিল এবং ভোগকারীকে প্রায় ক্ষেত্রেই কালোবাজারের সাহায্য লইতে হইত।

খুচরা সম্ভবায় বিপণি প্রধানত উহার সদস্যদের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া মূল্য এমনভাবে স্থির করে যাহাতে ক্রয়মূল্য ও দোকান পরিচালনার ব্যয় মিটাইতে পারে। কারণ এই প্রকার দোকান মুনাফার জন্ত স্থাপিত হয় না। ইহার মূল উদ্দেশ্য সদস্যদের সেবা করা। তবে দ্রব্যের মূল্য বাজার দরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই স্থির করা হয়। সেক্ষেত্রে দোকানের সমস্ত ব্যয় মিটাইয়া যদি কোন মুনাফা থাকে তাহা আবার সদস্যদের মধ্যেই বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

মুনাফা সাধারণত দুই ভাবে বিতরণ করা হয়। প্রথমত, সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে যে যে-পরিমাণ মূলধন যোগাইয়াছে, অর্থাৎ যত মূল্যের অংশগত (Share) ক্রয় করিয়াছে তাহার হারাহারি মতে মুনাফা বন্টন করা হয়। তখন উহাকে বলে লাভাংশ (Dividend)।

দ্বিতীয়ত, লাভাংশ হিসাবে মুনাফা বন্টন না করিয়া, সদস্যগণের প্রাপ্য লাভাংশ তাহাদের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা রাখা হয়। ভবিষ্যতে যখন তাহারা পুনরায় দ্রব্য ক্রয় করে তখন প্রাপ্য লাভাংশ দ্রব্যের মূল্য হইতে বাদ দিয়া মূল্য আদায় করা হয়, উহাকে বলে বাট্টা দেওয়া (Rebate)।

কিস্তিবন্দীতে ক্রয় (Purchase by Instalment Payment):
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে উৎপাদক নিজেই খুচরা বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। কিস্তিবন্দীতে বিক্রয়েও অল্পরূপভাবে উৎপাদক খুচরা বিক্রয়ের পরিমাণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অধিক বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই হইলে বিক্রেতা একই সময়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। যেমন, পাইকার খুচরা বিক্রেতাকে ধার দিয়া দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য করে সেইরূপ উৎপাদক নিজে ভোগকারীকে ধীরে ধীরে মূল্য পরিশোধ করিবার সুযোগ দিয়া দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। তাই উৎপাদক ক্রেতাকে কিস্তিবন্দীতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে।

কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করার সুযোগ পাইয়া থাকে। এই প্রকারে যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে ধীরে ধীরে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিয়া থাকে, তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে

এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অস্থায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক কিস্তিবন্দীর দেয় অর্থ বিক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হয়।

ভাড়া ক্রয় (Hire Purchase) : কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ের অনুরূপ পদ্ধতিতে এককালে দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না করিয়া ধীরে ধীরে নিয়মিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার চুক্তিতে যে ক্রয়-বিক্রয় হয় উহাই ভাড়া ক্রয় (Hire Purchase)। ইহাতে যতদিন ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না করে ততদিন দ্রব্য ভাড়া লইয়াছে বলিয়াই গণ্য করে।

ভাড়া ক্রয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য : যদিও Hire Purchase এবং

ভাড়ার ক্রয়ের
বৈশিষ্ট্য :
মূল্য পরিশোধ
না হইলে ক্রেতা
মালিকানা স্বত্ব
পায় না

Instalment System-এ ক্রয় বিক্রয়ে মূল্য পরিশোধ একই নিয়মে হইয়া থাকে তথাপি দুইটি পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, ভাড়া ক্রয়ে (Hire Purchase-এ) ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব পায় না। মালিকানা স্বত্ব থাকে বিক্রেতারই। যে কোনও সময়ে চুক্তি অস্থায়ী কিস্তির অর্থ আদায় না হইলে বিক্রেতা দ্রব্য ফেরত লইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভাড়া ক্রয় চুক্তিতে মালিকানা স্বত্ব বিক্রেতার থাকিলেও দ্রব্য ভোগ করিয়া থাকে ক্রেতা। চুক্তি অস্থায়ী প্রথম কিস্তির মূল্য পরিশোধ করিলেই বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

মালিকানা স্বত্ব না
থাকিলেও দ্রব্য
ক্রেতার হেপাঙ্কতেই
থাকে

তৃতীয়ত, দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার থাকে না বলিয়া ক্রেতা দ্রব্যের মূল্য বাবদ দেয় শেষ কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না।

মূল্য চক্রবৃদ্ধি স্বদের
হারে স্থির হয়

চতুর্থত, যখন বিক্রয়মূল্য কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করার চুক্তি হইয়া থাকে, তখন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধরা হয়।

মালিকানা স্বত্ব না
পাইলে ক্রেতা দ্রব্য
বিক্রয় করিতে
পারে না

পঞ্চমত, যতদিন দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতা না পায় ততদিন ক্রেতা মনে করে যে দ্রব্যটি উৎপাদকের নিকট হইতে ভাড়া লওয়া হইয়াছে। তাই এই প্রকার ক্রয়কে ভাড়া ক্রয়

চুক্তি (Hire Purchase) বলা হয়।

ভাড়া ক্রয়ের সুবিধা-অসুবিধা : ভাড়া চুক্তি ক্রয়ে যে কতিপয় সুবিধা

সুবিধা : ধীরে
ধীরে মূল্য শোধ
করার সুবিধা

দেখা যায় তাহার মধ্যে যেটি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তাহা হইতেছে—ক্রেতা ধীরে ধীরে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে মূল্য পরিশোধ করিবার সুযোগ পায় বলিয়া স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও মূল্যবান দ্রব্য ভোগ

করিতে পারে। এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহা প্রায় সকলেরই প্রয়োজন হয় কিন্তু দ্রব্যের মূল্য অধিক বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা এককালে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে পারে না এবং সেই দ্রব্যের ভোগ হইতে বিরত থাকে।
 স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিও মূল্যবান দ্রব্য ভোগ করিতে পারে
 উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সেলাই-এর কল (Sewing Machine)। সেলাই-এর কল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রয়োজন কিন্তু মূল্য অধিক বলিয়া অনেক গৃহস্থই এককালে অর্থ ব্যয় করিয়া এই দ্রব্য ভোগ করিতে পারে না। তাই দেখা যায় 'উষা' কোম্পানী যে সেলাই-এর কল তৈয়ারি করে উহা ভাড়া চুক্তি নিয়মে ক্রয়ের স্বযোগ দিতেছে। সেইভাবেই রেডিও, গ্রামোফোন, খাটপালক ইত্যাদি ভাড়া চুক্তি নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

ভাড়া ক্রয়ের সুবিধা থাকিলেও এই প্রকার ব্যবসায়ের একটি অসুবিধা এই যে ক্রেতা সদা সর্বদাই অস্বস্তি বোধ করে যে দ্রব্যের মালিকান অসুবিধা : স্বত্ব তাহার নহে।

দ্বিতীয়ত, ধীরে ধীরে মূল্য পরিশোধ করিতে পারিলেও ক্রেতাকে মোটের মালিকানা স্বত্ব না উপর যে অর্থ দিতে হয় তাহা দ্রব্যের বাজার দর হইতে থাকায় ক্রেতা অস্বস্তি অনেক বেশী। যেমন, একটি সেলাই-এর কল নগদ অর্থ বোধ করে দিয়া ক্রয় করিলে ৩০০ টাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু যখন মূল্য বাজার দর ভাড়া ক্রয় নিয়মে ক্রয় করা হয়, তখন তাহার মূল্য পড়ে হইতে বেশী হয়ত ৪০০ টাকা। ক্রেতার পক্ষে যেমন অসুবিধা দেখা যায় বিক্রেতাকেও তেমনই দ্রব্যের মূল্য আদায় করার জন্ত কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয় এবং তাহার ব্যবস্থাপনার ব্যয় পড়ে বেশী। নিয়মিত চুক্তিমত মূল্য শোধ না করিলে মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজন হয় কিস্তিবন্দীর অর্থ শোধ না করিলে অনেক ক্ষেত্রে আবার বিক্রেতাকে মামলা-মোকদ্দমার সাহায্য নিতে হয়। তাহাতে ব্যবসায়ের খরচ ব্যতীতও সুনামের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

কিস্তিবন্দীতে (Instalment) ও ভাড়া (Hire) ক্রয়ের (Purchase) মধ্যে পার্থক্য : কিস্তিবন্দীতে ক্রয়েও ভাড়া ক্রয় নিয়মের মতই ক্রেতাকে ধীরে কিস্তিবন্দীতে ক্রয় ও ধীরে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিয়া থাকে। ভাড়ায় ভাড়ায় ক্রয়ের ক্রয় নিয়মের মত কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ও যতদিনের জন্ত ধাবে পার্থক্য বিক্রয় করা হয় ততদিনের জন্ত দ্রব্যের মূল্যের সহিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করা হয়। ভাড়ায় ক্রয় নিয়মের সহিত কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ের পার্থক্য এই যে কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ে প্রথম কিস্তির কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ে দেয় অর্থ পরিশোধ করিলেই দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার ক্রেতা প্রথম কিস্তির হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে ক্রেতা সেই দ্রব্য শেষ কিস্তির

মূল্য পরিশোধ অর্থ পরিশোধ হওয়ার পূর্বেও বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু করিলেই মালিকানা ক্রেতা চুক্তি অনুসারে নিয়মিত মূল্য শোধ না করিলে স্বত্ব পায় বিক্রেতা অবশ্য চুক্তি অনুযায়ী অর্থ আদায় করার জন্য আইন আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে।

যদিও বলা হইয়াছে যে ভাড়ায় ক্রয় ও কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-বিক্রয়ে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও মূল্যবান দ্রব্য ভোগ করার সুযোগ পাইয়া থাকে, তথাপি একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভাড়ায় ক্রয় ও কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ের সুযোগ সেই সমস্ত লোককেই দেওয়া হয় যাহাদের সমাজে খানিকটা প্রতিষ্ঠা বা সুনাম আছে। যাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা সন্দেহে বিক্রেতার মনে সন্দেহ থাকে তাহাদের ভাড়ায় ক্রয় অথবা কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ের সুযোগ বড় একটা দেওয়া হয় না।

ফড়িয়া (Factor) : ঘূণার অর্থেই ফড়িয়া কথাটি সাধারণত আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কারণ, তাহাদের কার্য সর্বদা ভোগকারীর স্বার্থের অন্তর্কূল হয় না। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহাদের কার্য ভোগকারীর স্বার্থের পরিপন্থী তাহাদের বুঝাইতেই এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। ফড়িয়াও এক সম্প্রদায়ের খুচরা ব্যবসায়ী। তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহার পািকারী হারে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে।

ফড়িয়া বাজারে দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া অহেতুক দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া থাকে বলিয়া এই প্রকার ব্যবসায় সমাজ কখনও সন্মুখিতে দেখে না। তাহার চেষ্টা করে উৎপাদকের নিকট হইতে মালের বা দ্রব্যের ফড়িয়া যোগান মালিকানা স্বত্ব অধিকার করিতে। কোনও দ্রব্যের সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ করিয়া অধিকাংশের মালিকানা আয়ত্তাধীনে আনিয়া উচ্চমূল্যে মূল্যায়ন করে বিক্রয় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সর্বদাই তাহার বাজারে অপ্রাকৃত অভাব সৃষ্টি করিয়া উচ্চমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে।

ফড়িয়াগণ সাধারণত জোট হিসাবে কাজ করে। প্রায় ক্ষেত্রেই এক একটি এলাকা কতিপয় ফড়িয়ার আয়ত্তাধীনে থাকে। এক অলিখিত চুক্তি অনুসারে আঞ্চলিক বিভাগ করিয়া এক একজন ফড়িয়া এক একটি এলাকার দ্রব্যের যোগানের সম্পূর্ণ দখল নেয়। পরে যখন তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন দ্রব্য বিক্রয় করে।

ফড়িয়াগণ আবার দস্তুরি (Commission) পরিবর্তেও কাজ করিয়া থাকে। ব্যবসায়ের প্রকৃত মালিকের সহিত এইরূপ চুক্তি থাকে যে ফড়িয়া নিজ নামেও ফড়িয়া নিজের নামেই ক্রয়-বিক্রয় করিবে। ধারে ক্রয় করিয়া, ক্রয়-বিক্রয় করে সে নিজেই নিজ নামে বিক্রয় করিয়া থাকে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে নিজের পাওনা অর্থ বাদ দিয়া প্রকৃত মালিককে ধারের অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকে।

দালাল (Broker) : দালালী ব্যবসায় একপ্রকার বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়। সকল ব্যবসায়ীই দালালী ব্যবসাতে সাফল্যলাভ করিতে পারে না। দালালী ব্যবসাতে দেখা যায় এক একজন দালাল এক একটি বিশেষ ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষীকরণ করে। যে-ব্যবসাতে বিশেষীকরণ করে সেই ব্যবসায় সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যাদি থাকে তাহার নথদর্পণে। দালালী ব্যবসায়ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়। ফড়িয়াদের মত দালালগণ সমাজের চক্ষে ঘৃণার পাত্র নহে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর যে প্রধান কর্ম—উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা—এই কার্যই দালাল করিয়া থাকে।

ফড়িয়াদের মত দালাল কখনও নিজের নামে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে না। দালাল কেবলমাত্র একটি বিশেষ ব্যবসায় লইয়া থাকে। দালাল দ্রব্যের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সম্ভাব্য ক্রেতার খোঁজ করিতে থাকে। যখন ক্রেতার সন্ধান পাওয়া গেল তখন দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতাকে যথাযথ তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করি সম্বন্ধে মনস্থির করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে পাকাপাকি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর দালাল বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের নিকট হইতেই দালালী বা দস্তুরি আদায় করিয়া থাকে। দালালের কর্তব্য শেষ হয় তখন, যখন ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যের অধিকার লাভ করে। একটি উদাহরণ দ্বারা দালালী ব্যবসায় কিভাবে চলে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। একজন জমির দালাল (Land Broker) জমি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করে। কোথায় কোন্ জমি বিক্রয়যোগ্য আছে, কোন্ জমির কি স্থবিধা-অস্থবিধা এই সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। তারপর দালাল খোঁজ করিতে থাকে সম্ভাব্য ক্রেতার। ক্রেতার সন্ধান পাইলে ক্রেতাকে জমি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে; যখন ক্রেতা কোন জমি ক্রয় করিতে স্থির নিশ্চয় হইল দালাল তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করাইয়া থাকে। ক্রেতা জমির অধিকার বা দখল লাভ করিলে দালালের কর্তব্য শেষ হয়। এখন দালাল ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতেই দালালী বা দস্তুরি আদায় করিয়া থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার পারিশ্রমিক হিসাবেই দালাল দালালী পাইয়া থাকে।

উপরের উদাহরণ হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে দালাল কখনও দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব নিজের বলিয়া দাবি বা গণ্য করে না। অতএব দ্রব্য অপর কোন

ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করাই তাহার কার্য। তাহার কোনরূপে দ্রব্যের যোগানের নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য বাড়াইয়া অতিরিক্ত দালালী আদায় করিতে চেষ্টা পায় না।

প্রতিনিধি (Agent) : যে-সকল ব্যবসায়ী প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করে তাহাদের কার্য অনেকটা দালালের মত হইলেও তাহার দালাল হইতে পৃথক। দালাল বিশেষ কোনও ব্যবসায় সম্পর্কে প্রতিনিধি নিজ নামে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া ব্যবসায় করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যবসায় করে না। যাহারা প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবসায় করে তাহার নিজের। ব্যবসায়ের ঝুঁকি নেয় না। প্রতিনিধি মূল বিক্রেতাই নিযুক্ত করে।

কোনও দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারে যাহাতে চাহিদা সৃষ্টি করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই উৎপাদক দস্তুরি বা কমিশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করে। প্রতিনিধি নিয়োগ প্রধানত দেখা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যে। অবশ্য আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে যে প্রতিনিধি নিয়োগ হয় না সে-কথা সত্য নহে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, এভারেডী ব্যাটারী তৈয়ারি হয় ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে যে উৎপাদক এভারেডী ব্যাটারী উৎপাদন করে তাহার পক্ষে ইউরোপে, সিংহলে অথবা অন্ত কোন রাজ্যে উহা বিক্রয় করার জন্ত ইউরোপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের কোনও ব্যবসায়ীর সাহায্য প্রয়োজন। এখন এভারেডী ব্যাটারী কোম্পানী সিংহলে ব্যাটারী বিক্রয় করার জন্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে এইরূপ চুক্তি থাকে যে এভারেডী ব্যাটারী কোম্পানী উহার প্রতিনিধির নিকট ব্যাটারী পাঠাইয়া দিবে। প্রতিনিধি তখন তথাকার বাজারে ব্যাটারী বিক্রয় করিবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ এভারেডী ব্যাটারী কোম্পানীকে বুঝাইয়া দিবে। প্রতিনিধি বিক্রয় মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা দস্তুরি পাইয়া থাকে। সিংহলে ব্যাটারী বিক্রয় করার জন্ত প্রতিনিধি যে-অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে উহা উৎপাদক নিজেই বহন করিবে। দস্তুরি এবং দ্রব্য বিক্রয় করার জন্ত প্রতিনিধি যে-অর্থ ব্যয় করে উহা বাদ দিয়া যাহা থাকে উহাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারী কোম্পানী পাইবে।

উদাহরণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে এই প্রকার ব্যবসায়ে প্রতিনিধি নিজে কোনও ঝুঁকি গ্রহণ করে না। প্রতিনিধি প্রতিনিধির যে-দ্রব্য উৎপাদকের নিকট হইতে পাইবে, উহা বিক্রয় করাই ব্যবসায়ের ঝুঁকি মাত্র তাহার কর্তব্য। বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার খুবই কষ্ট কোনও লোকসানই নাই। তবে কমিশন বা দস্তুরি হিসাবে যে-অর্থ আয় করিতে পারিত তাহা হইতে অবশ্য সে বঞ্চিত হইবে।

প্রতিনিধির দ্রব্যের দ্বিতীয়ত, উৎপাদক প্রতিনিধির নিকট যে-দ্রব্য পাঠাইয়া মালিকানা স্বত্ব থাকে উহার মালিকানা স্বত্বও উৎপাদকের। প্রতিনিধির থাকে না নিজস্ব কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না।

হৃতীয়ত, মালিকানা স্বত্ব বর্তায় না বলিয়া প্রতিনিধির নিকট যে-দ্রব্য পাঠানো হয় উহা উৎপাদক বিক্রয় হিসাবে গণ্য করে না, আর প্রতিনিধিও উহা ক্রয় বলিয়া মনে করে না। যদি কোন দ্রব্য অবিক্রীত দ্রব্যবিক্রয় না হইলে থাকে তবে সেই দ্রব্য উৎপাদক যে-কোনও সময়ে ফেরত প্রতিনিধির কোন দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। প্রতিনিধি যদি একটি দাখিল নাই দ্রব্যও বিক্রয় করিতে না পাবে তাহাতেও প্রতিনিধির কোনও দায়িত্ব থাকে না।

চতুর্থত, প্রতিনিধি উৎপাদকের পক্ষে বিক্রয় করে বটে, কিন্তু বিক্রয় করার জন্য যে-সমস্ত আনুসঙ্গিক ব্যয়—যেমন, বিজ্ঞাপনের ব্যয়, গুদামভাড়া, ইত্যাদি উৎপাদক বহন করিয়া থাকে। তবে দ্রব্যটি যদি এমন হয় যে উহার চাহিদা যথেষ্ট এবং বহু প্রতিনিধিই ঐ ব্যবসায় করিতে চাহে সে-ক্ষেত্রে হয়ত উৎপাদকের সহিত এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য যে-প্রতিনিধি বিক্রয় সমস্ত ব্যয় উহা প্রতিনিধিও এক নির্দিষ্ট হারে হারাহারি মতে প্রসারের জন্য ব্যয় বহন করিবে। যেমন, বার্মাশেল কোম্পানীর কেরোসিন, পেট্রল ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য যে-সমস্ত প্রতিনিধি আছে, তাহারা ব্যয়ের একাংশ বহন করিয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবসায়ের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে প্রতিনিধিকে মূলধন নিয়োগ করিতে হয় খুব কম। একরকম বিনা মূলধনেই এই ব্যবসায় চলিতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি গ্রহণ না করিয়াও ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি মূলধন নিয়োগ করিতে অপারগ হইলে এই প্রকার ব্যবসাতে প্রয়াসী হয়।

আশ্বাসদায়ী অথবা ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি (Delcredere Agent) :
প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবসায় করিলে ঝুঁকি নিতে হয় না, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিনিধি ইচ্ছা করলে উৎপাদকের পক্ষে ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি দ্রব্য বিক্রয় করিলেও ব্যবসায়ের আংশিক ঝুঁকি নিতে পারে। ঝুঁকি নেয় এই প্রকার প্রতিনিধিকে আশ্বাসদায়ী অথবা ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধি (Delcredere Agent) বলে।

আশ্বাসদায়ী অথবা ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধিও সাধারণ প্রতিনিধির মত উৎপাদকের পক্ষে দ্রব্য বিক্রয় করে এবং দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব দাবি করে না। কিন্তু আশ্বাসদায়ী প্রতিনিধির একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। উৎপাদকের পক্ষে বিক্রয় করিলেও বিক্রয়ের পরিমাণের উপর প্রতিনিধির নিজের দস্তুর বা কমিশন নির্ভর করে। তাই নিজের স্বার্থেই প্রতিনিধি অনেক ক্ষেত্রে ধারে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। উৎপাদক বাস্তব ক্ষেত্রে ক্রেতার সংস্পর্শে আসে না বলিয়া ক্রেতার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। উৎপাদক তখন প্রতিনিধির নিকট হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিতে পারে যে প্রতিনিধি

ধারে বিক্রয় করার ফলে উৎপাদকের কোন লোকসান হইবে না—অর্থাৎ, বিক্রয় মূল্যের যে-অংশ ধারে বিক্রয় হইয়াছে উহা সম্পূর্ণই আদায় হইবে—

আশ্বাসদায়ী
প্রতিনিধি ঝুঁকির
জন্ত অতিরিক্ত
দস্তুরি পায়

ঋণ অনাদায় থাকিবে না। উৎপাদকের পক্ষে এরূপ প্রতিশ্রুতি দাবী করা খুবই সমীচীন। কিন্তু প্রতিনিধির পক্ষেও বক্তব্য এই যে ধারে বিক্রয় করিয়া উৎপাদকের দ্রব্য বিক্রয় করার অর্থ, দ্রব্যের জনপ্রিয়তা তৈয়ার করা। ধারে বিক্রয় করিয়া বিক্রয় মূল্য সম্পূর্ণ আদায়ের যে-ঝুঁকি প্রতিনিধি নিতেছে এবং

উৎপাদককে ঋণের সম্পূর্ণই আদায় করার যে-আশ্বাস প্রতিনিধি দিতেছে সেজন্ত প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমিশন বা দস্তুরি পাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রতিনিধি ধারে বিক্রয় করিয়া নিজের প্রাপ্য কমিশনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে এবং উৎপাদকের দ্রব্যের জনপ্রিয়তা বাড়াইতে সাহায্য করে। যে-প্রতিনিধি ঋণ আদায় সম্পর্কে উৎপাদককে আশ্বাস দিয়া থাকে সে আশ্বাসদায়ী প্রতিনিধি (Del credere Agent)। আশ্বাস প্রদান করার জন্ত অথবা ঝুঁকি নেওয়ার জন্ত প্রতিনিধি সাধারণ কমিশন বা দস্তুরি বাদেও যে কমিশন বা দস্তুরি পায় তাহাকে আশ্বাসদায়ী কমিশন (Del credere Commission) বলে। সাধারণ কমিশন ও আশ্বাসদায়ী কমিশন উভয়ই বিক্রয় মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে পৃথক পৃথক হিসাব করা হয়। আশ্বাসদায়ী প্রতিনিধি ধারে বিক্রয় করার ফলে ধারের বা ঋণের কোন অংশ অনাদায় থাকিলে উহা আশ্বাসদায়ী প্রতিনিধিই বহন করিয়া থাকে—অর্থাৎ, উৎপাদককে প্রতিনিধি সেই অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া থাকে।

একটি উদাহরণ দ্বারা আশ্বাসদায়ী অথবা ঝুঁকিবাহক প্রতিনিধির কার্য বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। বোম্বাই সহরের আগরওয়ালা নূতন একপ্রকার রেডিও তৈয়ার করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় সহরে যাহাতে উহা বিক্রয় করা যায় তজ্জন্ত কতিপয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিল। কলিকাতা সহরে যে-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইল তাহার সহিত আগরওয়ালার এরূপ চুক্তি হইল যে সে ধারে বিক্রয় করিবে। প্রতিনিধি ধারে বিক্রয়ের সম্পূর্ণ 'অর্থ'ই আদায় করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ১০ টাকা কমিশন বা দস্তুরি দেওয়া হইবে কিন্তু ঋণের সম্পূর্ণ অংশ আদায় করার প্রতিশ্রুতির জন্ত এবং বিক্রয় মূল্যের কোন অংশ অনাদায় থাকিলে তাহা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্ত প্রতিনিধিকে অতিরিক্ত শতকরা ৫ টাকা হারে কমিশন বা দস্তুরি দেওয়া হইবে।

কলিকাতার প্রতিনিধি ১০,০০০ টাকায় কয়েকটি রেডিও বিক্রয় করিল। চুক্তি অনুসারে সে সাধারণ কমিশন শতকরা ১০ টাকা হিসাবে ১০০০ টাকা এবং আশ্বাসদায়ী কমিশন (Del credere Commission) শতকরা ৫ টাকা হারে ৫০০ টাকা পাইবে। তাহার দস্তুরি হইবে মোট ১৫০০ টাকা। কিন্তু যদি

বিক্রয় মূল্য ১০,০০০ টাকার মধ্যে কোন অংশ-ধরা যাউক ২০০ টাকা অনাদায় থাকে তবে সেই অনাদায় অর্থ উৎপাদককে (আগরওয়ালাকে) কলিকাতার প্রতিনিধি শোধ করিবে।

নিলামদার (Auctioneer) : নিলামদারের ব্যবসায় অত্যাশ্রয় ব্যবসায়ীর ব্যবসায় হইতে পৃথক। ছোট বড় সমস্ত ব্যবসায়ীই দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজে বিক্রয় মূল্য স্থির করিয়া বিক্রয় করে। যখন বিক্রয় করে নিলামদার অস্ত্রের কেবলমাত্র তাহার বিক্রয় মূল্যের কম না হয় সেদিকে দ্রব্য বিক্রয় করে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা সংগ্রহ করা যায় তাহার চেষ্টা করে। দ্রব্য দেখিয়া শুনিয়া বিক্রেতা যে-মূল্য দাবি করে তাহা তাহার ক্রয়-ক্ষমতার উপরে না হইলে ক্রেতা ক্রয় করিয়া থাকে। কোনও একটি দ্রব্যের ক্রেতাদের মধ্যে মূল্য বা দর হাঁকাহাঁকি হয় না—ইহাই সাধারণ ব্যবসায়ের নিয়ম।

নিলামদারের ব্যবসায়ের দ্বারা সাধারণ ব্যবসায়ের মত নহে। ইহাতে নিলামদার বিক্রেতা বটে কিন্তু কি মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহা নির্ভর করে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপর। যে-ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিতে রাজী হয় সে-ই দ্রব্যটি পায়। ক্রেতা যে-মূল্য দিতে রাজী হয় তাহা 'ডাক' (Bid) করিয়া স্থির করা হয়। নিলামদার দ্রব্যটি 'ডাকে' তুলিবার পূর্বে ঘোষণা করে সর্বনিম্ন দর, যাহার কম মূল্যে বিক্রয় হইবে না। তাবপর নিলাম ব্যবসায়েও আরম্ভ হয় ক্রেতাদের মধ্যে 'ডাকে'র প্রতিযোগিতা। ব্যবসায়ীর ঝুঁকি উদাহরণ—একটি সেলাই-কল নিলামদার নিলামে দ্বিক্রয় থাকে না করিবার ঘোষণা কবিল। ঘোষণা করার পর সর্বনিম্ন মূল্য স্থির করিল ২০০ টাকা। এখন দুইশত টাকায় সেলাই-কলটি কিনিতে বহু ক্রেতাই রাজী। কিন্তু যেহেতু নিলামে বিক্রয় হইবে সেজন্ত একটি দ্রব্য ত' আর সকল গ্রাহককে দেওয়া চলে না। তাই নিলামদারের পক্ষে এমন একজন ক্রেতা পাওয়া দরকার যে প্রতিযোগিতায় অস্ত্র সকল ক্রেতাদের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে রাজী। তাই আরম্ভ হয় 'ডাক' (Bid)। নিলামদার হাঁক দিল সর্বনিম্ন মূল্য ২০০ টাকা। দুইশত টাকা এক, দুইশত টাকা দুই; যদি দুইশত টাকার উপর মূল্যে কোন গ্রাহক নিতে রাজী থাকে তবে তাহাকে এইবার সে যে-মূল্যে কিনিতে রাজী তাহা ডাকিয়া বলিতে হইবে। মনে কর, অজয় ২৫০ টাকা দিতে রাজী; সে ডাকিবে ২৫০ টাকা। নিলামদার আবার ডাকিবে ২৫০ টাকা এক, ২৫০ টাকা দুই; এইবার হরেন ডাক দিল ৩৫০ টাকা। পূর্ব নিয়মে নিলামদার আবার ডাক দিল ৩৫০ টাকা এক, ৩৫০ টাকা দুই; এবার মনীন্দ্র ডাক দিল ৫০০ টাকা। নিলামদার ডাক দিল ৫০০ টাকা এক, ৫০০ টাকা দুই; এবার আর কেহ

ডাকিল না। এবারে নিলামদার ৫০০ টাকা তিন ডাকিবে—অর্থাৎ ‘ডাকের’ সর্বোচ্চ মূল্য ৫০০ টাকা। উহার ঊর্ধ্বে মূল্য দিতে কেহ রাজী নহে। সুতরাং মনীন্দ্রই দ্রব্যটি পাইয়া থাকিবে।

উপরের উদাহরণটি হইতে এই কথা স্বতই আমাদের মনে আসিতে পারে যে ক্রেতাদের মধ্যে অনেকটা রেবারেঘির ফলেই দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়। ইহা খুবই সত্য, যে-দ্রব্য হয়ত বাজারে ১০০ টাকায় ক্রয় করা যায়, নিলামে ক্রয় করার ফলে তাহার মূল্য দুই গুণ বা তিন গুণ হয়। ইহার কারণ এই যে, নিলামে যখন ‘ডাক’ হয় তখন প্রত্যেক ডাককারী অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রেতা অধিক মূল্য ক্রেতার মনে থানিকটা অহমিকা দেখা দেয়। আমার অপেক্ষা দিতে বাধ্য হয় অধিক মূল্যে কেহ ক্রয় করিবে ইহা সম্বন্ধ করা অসম্ভব; তাই অনেক সময় গ্রায্য মূল্যের অনেক অধিক মূল্যে ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে।

এই ত’ গেল, বিক্রয় কিভাবে হয় তাহার আলোচনা। এখন আলোচনা করা প্রয়োজন, নিলামদার যে দ্রব্য বিক্রয় করে উহা সে কিভাবে সংগ্রহ করে। প্রকৃত নিলামদারী ব্যবসায়ে নিলামদার দ্রব্য উৎপাদন করে না। আবার দ্রব্য ক্রয় করিয়াও বিক্রয় করে না। নিলামদার যে নিলামদারী ব্যবসায় করে, উহাই মাত্র সর্বসাধারণের গোচরে আনয়ন করে। এমন অনেক লোক আছে যাহার নিজের কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সে নিজে ব্যবসায়ী নহে। সুতরাং তাহার পক্ষে এমন একজন লোকের সাহায্য প্রয়োজন যে তাহার পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া দিবে। নিলামদার এই প্রকার একজন ব্যবসায়ী যে সেই ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ঐ দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া দিবে। যাহার দ্রব্য বিক্রয় হইবে সে কেবলমাত্র বলিয়া দিবে সর্বনিম্ন মূল্য। নিলামদার দেখিবে যে বিক্রেতা যে সর্বনিম্ন মূল্য বলিয়াছে উহার চেয়ে কম মূল্যে যেন দ্রব্যটি বিক্রয় না হয়। যদি কোন ডাককারী ঐ সর্বনিম্ন মূল্য না ‘ডাকে’, অর্থাৎ ঐ মূল্যে কোন ক্রেতা না পাওয়া যায় তাহা হইলে

-ব্যক্তি দ্রব্যটি বিক্রয় করার জন্ত গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহাকেই ফেরত দেওয়া হয়। নিলামদার অগ্রণী হইয়া কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। তাহাকে প্রধানত বিক্রেতার নির্দেশানুযায়ী কার্য করিতে হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা নিলামদারের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। সেক্ষেত্রে নিলামদারের উপর এই প্রকার নির্দেশ থাকে যে, যে সর্বোচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে তাহাতেই যেন বিক্রয় করা হয়। এখন সর্বোচ্চ গ্রায্য মূল্য কি হইতে পারে তাহা নিলামদার দ্রব্যের গুণাগুণ অনুযায়ী এবং দ্রব্যের চাহিদানুযায়ী স্থির করিয়া থাকে।

নিলামদার দ্রব্যের নিলামদার নিজেও দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিলামে বিক্রয় যোগান বুঝিয়া করিতে পারে। যদি দ্রব্য এমন হয় যাহার চাহিদা মাত্র একশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং দ্রব্যের যোগানও প্রচুর নহে, সেক্ষেত্রে নিলামদার চাহিদার প্রাবল্যের স্বযোগ

নিয়। বাহাতে আশাতিরিক্ত অধিক মূল্য পাইতে পারে তাহার..জ্ঞান নিলাম ডাকের ব্যবস্থা করিতে পারে।

নিলামদার অনেক সময়ে সরকারের অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে নিলামের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সরকার অথবা কোন নিলামদার সরকার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (যেমন কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান) অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি- উহার প্রাপ্য কর ইত্যাদি অনাদায় থাকিলে এক নির্দিষ্ট দিনের নিধি হিসাবে বিক্রয় পর করদাতার দ্রব্য ক্রোক করিয়া থাকে। ক্রোকী দ্রব্য তখন করিতে পারে নিলামে বিক্রয় করিয়া বকেয়া দেয় কর আদায় করিয়া থাকে। নিলামদার সরকার অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্য করার জন্য কমিশন বা দস্তুরি পাইয়া থাকে।

Exercises

1. What are the functions of a Wholesaler ?
পাইকারের কার্যাবলী কি ?
2. Who is a Middleman ? Enumerate the functions of a Middleman.
মধ্যগ কাহাকে বলা হয় ? মধ্যগের কার্য আলোচনা কর।
3. Distinguish a Departmental Store from a Multiple Shop.
বিভাগীয় বিপণি ও বহু-বিপণির পার্থক্য নির্দেশ কর।
4. What is a Chain Store ? Distinguish between a Chain Store and a Multiple Shop.
চেন ষ্টোর কি ? চেন ষ্টোর ও বহু-বিপণির মধ্যে পার্থক্য কি তাহা আলোচনা কর।
5. What are the functions of an agent ?
প্রতিনিধির কার্য কি ?
6. Give an idea of the business of an auctioneer ?
নিলাম বিক্রেতার ব্যবসায়ের একটি বিবরণ দাও।
7. How can a producer dispense with the services of middlemen ?
মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়া উৎপাদক কি উপায়ে ব্যবসায় চালাইতে পারে ?

চতুর্থ অধ্যায় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় (Buying and Selling of Goods)

পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় এই দ্বিবিধ কার্য লইয়াই ব্যবসায়। যে-মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করা হয় উহা হইতে অধিক মূল্যে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করাই ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্য। প্রসংগান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবসায়ের সাফল্য সর্বদা অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উপরই নির্ভর করে না; পরন্তু ব্যবসায়ী ক্রয়কুশলতার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে; ব্যবসায়ীর পক্ষে সর্বদা জানা প্রয়োজন যে, কোন দ্রব্য বা পণ্য কোন্ স্থানে ক্রয় করা সুবিধাজনক, এবং কখন ক্রয় করা সুবিধাজনক। ব্যবসায়ীর কার্য ভবিষ্যতের যোগান ও চাহিদার পূর্বাভাস স্থির করিয়া বর্তমানে দ্রব্য ক্রয় এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ করা। তাই বাজারে যোগান ও চাহিদার অবস্থা অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সাফল্যের সহিত ব্যবসায় করা কখনই সম্ভব নয়। সময়মত গ্রাহ্য মূল্যে ক্রয় করিয়া আবার সেই দ্রব্য মুনাফায় বিক্রয় করিতে পারিলেই ব্যবসায়ীর সাফল্য।

ক্ষেতর শ্রেণীবিভাগ : ক্ষেত। যে উদ্দেশ্যে দ্রব্য ক্রয় করে তদনুসারে ক্ষেতাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় :—

(১) **উৎপাদক ক্ষেতা (Manufacturer Purchaser) :** প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যই কাঁচামাল হইতে রূপান্তরিত হইয়া ভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়। যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামাল ভোগ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়।
উৎপাদক ক্ষেতা স্বতরাং যাহারা উৎপাদক তাহাদের প্রয়োজন কাঁচামাল, কাঁচামাল ও যন্ত্র- যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করার। এই প্রকার ক্ষেতাকে বলা হয় পণ্য ক্রয় করে উৎপাদক ক্ষেতা।

উৎপাদক ক্ষেতা কখনই অল্প পরিমাণে ক্রয় করে না। শিল্পে যন্ত্রপাতি যাহাতে কখনও কাঁচামালের অভাবে অকেজো (idle) বসিয়া না থাকে তাহার জগু সর্বদাই উৎপাদক ক্ষেতাকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয়। বহুদিনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল একই সময়ে ক্রয় করিয়া রাখাই উৎপাদক ক্ষেতার কর্তব্য।

উৎপাদক ক্ষেতা উৎপাদক ক্ষেতা যদি সম্ভায় কাঁচামাল ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে শিল্পজাত দ্রব্যও কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, পাইকারী হারে ক্রয় ফলে সমগোষ্ঠীয় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো করে তাহার পক্ষে সহজ হয়। স্বতরাং উৎপাদক ক্ষেতা সর্বদাই সচেষ্ট থাকে যাহাতে সম-ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় কম মূল্যে কাঁচামাল

ক্রয় করিতে পারে। অগ্রের তুলনায় কম মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিতে পারিলে উৎপাদক ক্রেতা প্রারম্ভিক সুবিধা পাইয়া থাকে।

উৎপাদক ক্রেতার পক্ষে তাই ক্রয়-ব্যবস্থা সূচকরূপে পরিচালনা করা একটি বড় দায়িত্ব। ক্রয়-ব্যবস্থা সূচকরূপে পরিচালনা করিবার জন্য ক্রয়-বিভাগ উৎপাদক প্রয়োজনবোধে যে-সমস্ত স্থানে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওলা ক্রেতার একটি বিশেষ যায় সেই সকল স্থানে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

উৎপাদক ক্রেতার দ্বিতীয় কর্তব্য হইল দ্রব্য মজুত করার ব্যবস্থা করা। প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া যাহাতে সেই কাঁচামালের কোনও প্রকার অপব্যবহার না হয় অথবা ব্যবস্থাপনার ক্রটির জন্ত নষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্ত আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করাও প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ও দৈবদুর্ঘটনার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্ত আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মজুত মাল বিভাগের (Stores) কর্মচারী খুব সতর্কতার সহিত নির্বাচন করা প্রয়োজন। কারণ মজুত মাল যাহার হস্তে গুপ্ত থাকিবে, সে ইচ্ছা করিলে অসাধু উপায়ে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে অথবা অগ্নাশ্রু উপায়ে উৎপাদকের ক্ষতিসাধন করিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসী ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও উপর মজুত বিভাগ ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য হইলেও উৎপাদকের প্রয়োজন মধ্যে মধ্যে মজুত বিভাগ পরিদর্শন করা। মজুত বিভাগের কর্মচারীর নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে বিবরণপত্র গ্রহণ করিয়া উহার সহিত প্রকৃত মজুত দ্রব্য মিলাইয়া দেখাও প্রয়োজন।

(২) পাইকারী ক্রেতা (Wholesale Purchaser) : পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে উৎপাদক ও সন্তোগকারীর মধ্যে আরও দুই সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী আছে যাহারা উৎপাদক ও সন্তোগকারীর মধ্যে যোগসাধন করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রথমে পাইকারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাইকারের কার্য সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে পাইকারের একটি কার্য 'ক্রয়' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। পাইকারও উৎপাদক ক্রেতার মত একই সময়ে বহুল পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। তবে পাইকার ও উৎপাদকের মধ্যে পার্থক্য এই যে উৎপাদক ক্রয় করে কাঁচামাল, যাহা শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্য দ্রব্যে পরিণত করা; আর পাইকার ক্রয় করে উৎপাদকের নিকট হইতে ভোগ্য সামগ্রী অথবা উৎপাদক যে কাঁচামাল ব্যবহার করে তাহা। উৎপাদক ক্রেতার মত পাইকারী ক্রেতারও জানা প্রয়োজন সর্বাধিক কম মূল্যে কোন্ স্থানে এবং কখন ব্যবসায়ের দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) **খুচরা ক্রেতা (Retail Purchaser) :** খুচরা ক্রেতার কার্য হইল নানা জায়গা হইতে নানা দ্রব্য খুচরা ক্রয় করিয়া সন্তোষকারীর নিকট খুচরা বিক্রয় করা। পাইকারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া খুচরা ব্যবসায়ী সন্তোষকারীর নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। খুচরা ক্রেতা কখনও খুচরা ক্রেতা কোনও একটি বিশেষ দ্রব্য একটিমাত্র দ্রব্য ক্রয় করে না, নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করাই তাহার কার্য। খুচরা ক্রেতার পক্ষে পাইকারের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খুচরা ক্রেতাকে পাইকার ধারে ক্রয় করার সুযোগ দিয়া থাকে। সেই সুযোগ না পাইলে অনেক সময়েই খুচরা ব্যবসায়ীর পক্ষে বিক্রয়োপযোগী সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। অবশু ধারে দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ পাইকার খুচরা ক্রেতাকে দিবে কি না তাহা নির্ভর করে খুচরা ক্রেতার স্হনাম ও আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে পাইকারের ধারণার উপর। পাইকার যদি মনে করে যে খুচরা ক্রেতার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে বাজারে যথেষ্ট স্হনাম আছে এবং প্রয়োজনমত খুচরা ক্রেতার পাইকারের নিকট হইতে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করার মত সংগতিও আছে তবে পাইকার খুচরা ক্রেতাকে ধারে ক্রয় করার সুযোগ দিয়া থাকে।

(৪) **ভোগকারী ক্রেতা (Consumer Purchaser) :** দ্রব্যের উৎপাদন হয় ভোগের উদ্দেশ্যেই। উৎপাদকের উদ্দেশ্য তখনই ফলবতী হয় যখন উৎপাদিত দ্রব্য সন্তোষকারী ক্রয় করে। সুতরাং উৎপাদন ভোগকারী যখন দ্রব্য ক্রয় করে তখনই উৎপাদন ফলবতী হয় ও বিলি ব্যবস্থার শেষ পর্যায় বা ধাপই হইল ভোগকারীর হাতে পৌছানো। ভোগকারী মাত্র সেই দ্রব্যই ক্রয় করে যে-দ্রব্যের অভাব আছে এবং যাহা অভাব পূরণ করিতে সমর্থ।

দ্বিতীয়ত, ভোগকারী প্রায়ই তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয় করে না। যখন যেমন অভাব বা প্রয়োজন তখন সেই পৰিমাণে ক্রয় করাই ভোগকারীর উদ্দেশ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে যে ভবিষ্যতের জন্ত এককালীন অর্থ ব্যয় করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করা হয় না তাহা নহে। বিশেষত রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় যদি ভোগকারী মনে করে ভবিষ্যতে দ্রব্যের যোগান সংকুচিত হইতে পারে সেক্ষেত্রে ভোগকারী প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ দ্রব্য এককালে ক্রয় করিতে পারে।

ভোগকারীও অনেক সময়ে ধারে ক্রয় করার সুযোগ পাইয়া থাকে। পাইকার যেমন খুচরা ক্রেতাকে তাহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ধারে ক্রয় করার সুযোগ দিয়া থাকে তেমনি খুচরা বিক্রেতাও ভোগকারীকে ভোগকারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ব্যাক্তগত স্হনাম, আর্থিক অবস্থানস্বারা ধারে ক্রয় করার সুযোগ দিয়া

থাকে। ভোগকারীর পক্ষে অবশ্য পাইকার অথবা খুচরা ক্রেতার মত কোন স্থানে কোন দ্রব্য কম মূল্যে পাওয়া যায় তাহার দিকেই কেবলমাত্র অনেক সময় খুচরা বিক্রেতা ভোগ-কারীকে ধারে দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ দিয়া থাকে।

কোন দ্রব্য কম মূল্যে পাওয়া যায় তাহার দিকেই কেবলমাত্র দৃষ্টি রাখা সম্ভব নহে। কারণ ভোগকারীর পক্ষে বহুদূর হইতে কম মূল্যে দ্রব্য পাওয়া গেলেও দ্রব্য বহন করা সর্বদা সম্ভব নহে। তাই ভোগকারী চায় যে—বাসস্থানের নিকটস্থ কোনও ব্যবসায়ী গ্রাহ্য মূল্যে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করে। এই কারণে খুচরা ব্যবসায়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় এবং খুচরা ব্যবসায়ী সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে।

ক্রয় ও বিক্রয় অংগাংগিভাবে জড়িত। একমাত্র ভোগকারী ব্যতীত অপর তিন প্রকার ক্রেতারই উদ্দেশ্য ক্রীত দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করা। ভোগকারী কখনও বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে না।

ক্রেতাকে যেমন শ্রেণীভাগ করা যায় বিক্রেতাকেও তেমনি কয়ভাগে ভাগ করা যায়। উৎপাদক ক্রেতা কাঁচামাল হইতে পরিণত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সেই দ্রব্য বিক্রয় করে। তাই উৎপাদক ক্রেতা উৎপাদক বিক্রেতাও বটে। একই নিয়মে পাইকারী ক্রেতাও পাইকারী বিক্রেতা; পাইকারী বিক্রেতা যে কখনও খুচরা বিক্রয় করে না তাহা নহে; তবে তাহা খুবই বিরল।

পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে খুচরা ক্রেতা ক্রয় করে। খুচরা ক্রেতা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকে।

ক্রয় ব্যাপারে যেমন ক্রেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় সবচেয়ে কম মূল্যে কোথায় পৰ্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য পাওয়া যায়, বিক্রয় ব্যাপারে তেমনি সবচেয়ে কম মূল্যে ক্রয় ও সবচেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় করা ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য।

বিক্রেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় কোথায় সবচেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র অধিক লাভের আশায় বাজার খুঁজিয়া বেড়াইলেই চলিবে না, বিক্রেতার আরও দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উহার একটি হইতেছে, ভোগকারীর পছন্দ-অপছন্দের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দ্রব্য বিক্রয় করার চেষ্টা। ভোগকারীর পছন্দমত দ্রব্যের যোগান দিতে অপারগ হইলে ব্যবসায়ীর ব্যবসায় কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আবার উচ্চমূল্য ও ভোগকারীর পছন্দ-অপছন্দ ব্যতীত বিক্রেতাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদানুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করা যায়। সুতরাং বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত বিক্রেতার পক্ষে—প্রথমত, বাজারের চাহিদা ও যোগানের অবস্থানুযায়ী নির্ভুল মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, চাহিদানুযায়ী দ্রব্য যোগান দেওয়ার জন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন এবং তৃতীয়ত, ভোগকারীর পছন্দমত দ্রব্য যোগান বা সরবরাহ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এই তিনটি অবস্থার উপরই বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ ও লাভ নির্ভর করে।

এখানে পুনরাবৃত্তি করিতেছি যে উৎপাদক ও পাইকারের পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয় বিভাগ বিশেষজ্ঞদের হাতে গ্রস্ত করাই অধিক লাভজনক।

ক্রয়-বিক্রয় বিভাগ
বিশেষজ্ঞদের হাতে
গ্রস্ত রাখা কর্তব্য

কারণ ক্রয় ও বিক্রয় বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া পাইকার ও উৎপাদকের ক্রয় ও বিক্রয় বিভাগ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

ক্রয়-বিক্রয়ের ৩টি

ধাপ : (১) ক্রয়,
(২) দ্রব্যের বিলি,
(৩) দ্রব্যের
মূল্য শোধ

ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত বিষয়সমূহের মধ্যে যে কয়েকটি বিষয়ে ছাত্রদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন—উহা হইতেছে (১) ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত পণ্য বা দ্রব্য; (২) দ্রব্যের খালাস দেওয়া (Delivery)—ইহাকে দ্রব্যের স্বত্ব হস্তান্তরও বলা যায়, এবং (৩) দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ হইলেই ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ

ধাপ পৌঁছানো হয়।

দ্রব্য বা পণ্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে কেবলমাত্র এই কথা বলা হইয়াছে যে, দ্রব্যের মূল্যের উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলে না, দ্রব্যের গুণাগুণ, দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও ব্যবসায়ীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ট্রেড মার্ক (Trade Mark) এবং পেটেন্ট অধিকার (Patent Right) :

ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে কোন কোন দ্রব্য বাজারে অতি সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহা জনপ্রিয়তা লাভ করিতেই পারে না। যে-সমস্ত দ্রব্য জনপ্রিয়তা লাভ করে উহার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তাই যাহাতে অল্প কোন ব্যবসায়ী

অনুরূপ দ্রব্য তৈয়ার করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে না পারে সেইজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায় চিহ্ন (Trade Mark) অনুরোধন করাইয়া

লয়। সরকারের (Government) নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাণ্ডল দিয়া এই ব্যবসায় চিহ্ন অনুরোধন করাইতে হয়। ব্যবসায় চিহ্ন অনুরোধন হইলে ঐ ব্যবসায় চিহ্ন হয় নিজস্ব। তখন অপর কোন ব্যবসায়ী উহা গ্রহণ করিতে বা ব্যবহার করিতে পারে না। ক্রেতা যখন দ্রব্য ক্রয় করে তখন এই ব্যবসায় চিহ্ন (Trade Mark) লক্ষ্য করিয়াই দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। দেখিতে অনুরূপ অথচ গুণের দিক হইতে যাহাতে নিকৃষ্ট না হয় সেইজন্যই ক্রেতা সর্বদা ব্যবসায় চিহ্নের উপর লক্ষ্য রাখে।

বিক্রেতা বা উৎপাদকের পক্ষেও ব্যবসায় চিহ্নের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। যে-দ্রব্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, অনুরূপ দ্রব্য যদি অল্প ব্যবসায়ী একই নামে তৈয়ার করে অথচ গুণের দিক হইতে একই রকম না হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্যের জনপ্রিয়তা নষ্ট হইয়া যায়। তাই যে-কোনও দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদক অনুরোধনিত ব্যবসায় চিহ্ন গ্রহণ করে।

কণ্ডাবানলের উৎপাদক একটি শব্দ দ্বারা কণ্ডাবানলের ব্যবসায় চিহ্ন গ্রহণ করিয়াছে। একই প্রকার দ্রব্য অন্ত কোন উৎপাদক “শব্দ মার্ক” লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিবে না। ইহা ব্যবসায় চিহ্নের একটি উদাহরণ।

আবার মনে কর, কোনও উৎপাদক অনেক অর্থব্যয়ে কোনও দ্রব্য সর্বপ্রথম উৎপাদন করিল। যাহাতে একই নামে অপর কেহ এইরূপ দ্রব্য উৎপাদন করিতে না পারে তাহার জ্ঞাও সরকারের নিকট হইতে অস্বমোদন লাভ করিতে পারে। ঐরূপ অধিকারকে বলা হয় ‘পেটেন্ট’ অধিকার। বহু গবেষণা ও অর্থব্যয়ে যখন কোনও দ্রব্য সর্বপ্রথম উৎপাদন করা হইল, উৎপাদক যাহাতে কতিপয় বৎসর উহার ফলভোগ করিতে পারে তাহার জ্ঞাই পেটেন্ট অধিকারের প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। তোমরা সকলেই **Cibazol Tablets**-এর নাম শুনিয়াছ। **Cibazol Tablet** সর্বপ্রথম উৎপাদন করে **Ciba Company**. যখন সর্বপ্রথম বহু ব্যয়ে ও গবেষণার পর এই ঔষধি তৈয়ার হইল তখন যাহাতে

অপর কেহ **Cibazol** নামে কোন ঔষধ তৈয়ার করিতে না পেটেন্ট অধিকার পারে তাহার জ্ঞাই প্রয়োজন পেটেন্ট অধিকার (**Patent Right**) গ্রহণ করা। ইহাতে ঐ নামে দ্রব্য উৎপাদনের একাধিকার থাকে পেটেন্ট অধিকারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর। পেটেন্ট অধিকার উৎপাদকের একটি সম্পদ। অন্যান্য সম্পদের মত পেটেন্ট অধিকার (**Patent Right**) বিক্রয় করা যায়। তবে এক নির্দিষ্ট সময়ের পর আর পেটেন্ট অধিকারের কোন মূল্য থাকে না। প্রথমত, যতই দিন যাইতে থাকে পেটেন্ট অধিকার প্রাপ্ত দ্রব্যের তুলনায় উৎকৃষ্টতর দ্রব্য বাজারে আসার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত, পেটেন্ট অধিকারপ্রাপ্ত কোন দ্রব্য বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া যখন সুনাম অর্জন করে, তখন আর পেটেন্টের গুরুত্ব থাকে না, দ্রব্যের সুনামই তখন জনপ্রিয়তা লাভে সাহায্য করে।

আবার একই দ্রব্য গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। উহাকে বলা হয় দ্রব্যের ব্র্যাণ্ড (**Brand**)। একই সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানী **State Express** নামে একাধিক সিগারেট তৈয়ার করে।

State Express 333, State Express 555, State Express 999. এখন যে-ব্যক্তি **State Express** সিগারেট পান করিবে তাহার জানা প্রয়োজন একই নামে তিনটি ব্র্যাণ্ডের কোনটির কি বিশেষ দোষগুণ। তখন সে **State Express** সিগারেট চাহিলেই চলিবে না, তিনটি ব্র্যাণ্ডের কোন ব্র্যাণ্ডটি তাহার প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। তিনটি ব্র্যাণ্ডের প্রত্যেকটির গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে ক্রেতার ঠিকবার সম্ভাবনাই অধিক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্রব্য ক্রয় করিতে বা বিক্রয় করিতে ক্রেতার এবং বিক্রেতার উভয়েরই দ্রব্যের ব্যবসায় চিহ্ন (Trade mark), পেটেন্ট (Patent), ব্র্যান্ড (Brand), উৎপাদকের নাম, কোথায় উৎপাদন হয়, এই সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

মাল খালাস (Delivery of Goods) : দ্রব্য সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়ার পর যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হইয়া দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে তখন উঠে মাল খালাস সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা। উভয় পক্ষ আলাপ-আলোচনা করিয়া স্থির করে মাল খালাসের পদ্ধতি।

সর্বদাই যে মাল খরিদ করার চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মাল বিলি দেওয়া হয় তাহা নহে। মাল খরিদ করার চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলি দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য খুচরা ক্রয়-বিক্রয়েই বলবৎ। খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণত ক্রয় মূল্য পরিশোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাল বিলি বা খালাস দিতে হয়। খুচরা ক্রয়-বিক্রয় তাই সমস্তা বড় একটি জটিল নহে। কিন্তু সমস্তা দেখা দেয় উৎপাদকের নিকট হইতে যখন পাইকার ক্রয় করে। সমস্তা এই কারণে যে পাইকার দ্রব্য ক্রয় করে দ্রব্যের চাহিদা হইবে বিলি-ব্যবস্থা

অনুমান করিয়া। কিন্তু উৎপাদকের ঘরে হ'য়ত' তখন সে পরিমাণ দ্রব্য নাও থাকিতে পারে। আবার এমন হইতে পারে যে পাইকার যে পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক সেই পরিমাণ দ্রব্য হ'য়ত' উৎপাদকের ঘরে তখন মজুতও নাই। এমত অবস্থায় পাইকার ক্রেতা ও উৎপাদক বিক্রেতার মধ্যে স্থির হওয়া প্রয়োজন, ভবিষ্যতে কোন্ তারিখের মধ্যে উৎপাদকে দ্রব্য পাইকারের ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ সমস্তা যে পাইকারের নিকট হইতে খুচরা ক্রেতার ক্রয়কালে উপস্থিত হয় না তাহা নহে। উৎপাদকের মত পাইকারের ঘরেও হ'য়ত' মজুত মাল না থাকিতে পারে, অথচ বাজারের অবস্থা অনুযায়ী খুচরা বিক্রেতা মাল কিনিতে প্রস্তুত। এরূপ ক্ষেত্রেও প্রয়োজন উভয়ের মধ্যে বুঝাপড়া হওয়া যে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে দ্রব্যের বিলি দিতে হইবে।

বিলি দুই প্রকারের হইতে পারে। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়া মাত্রই দ্রব্য বিক্রেতাকে দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে বিলি (Ready Delivery) বলে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট দিনে বিলি দেওয়ার চুক্তি হয় তবে তাহাকে বলে ভবিষ্যৎ বিলি (Future Delivery)। সঙ্গে সঙ্গে বিলি চুক্তিতে যে দ্রব্য বিক্রেতার হাতে নাই এমত দ্রব্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্ভব নহে। কিন্তু ভবিষ্যতে বিলি (Future Delivery) চুক্তিতে যদি বিক্রেতার হাতে দ্রব্য মজুত

নাও থাকে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দ্রব্য উৎপাদন করার অথবা অল্প কোনও ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ পাইয়া থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বিলির (Ready Delivery) চুক্তিতে ক্রেতা ও ভবিষ্যৎ বিলি (Future Delivery) চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তৎকালীন বাজার দর অনুসারে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে বলিয়া বাজার দরের পরিবর্তনজনিত লাভ বা লোকসানের ঝুঁকি কাহাকেও বহন করিতে হয় না।

কিন্তু ভবিষ্যতে বিলি (Future Delivery) চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাজার দরের পরিবর্তনজনিত লাভ বা লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। যদি ভবিষ্যতে বিলি নেওয়ার চুক্তিতে কোন ব্যবসায়ী ক্রয় করে তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে চুক্তিদিনের মূল্য অনুযায়ীই চুক্তি হইবে; উভয়েই জানে বাজার দর। সুতরাং দর কষাকষি করিয়া দ্রব্যের মূল্য স্থির হয়। কিন্তু যদি চুক্তিদিনের মূল্য একমাস পর বিলি দেওয়ার চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একজন এই একমাসের মধ্যে দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন হইলে লাভবান হইবে; অপরজন লোকসান স্বীকার করিবে।

ধরা যাউক অঙ্ককার বাজার দর অনুযায়ী চিত্তরঞ্জন ধূতির মূল্য প্রতিখানা ১৫ টাকা। যদি অঙ্কই বিলি দেওয়ার চুক্তিতে কেহ ৫০ জোড়া চিত্তরঞ্জন ধূতি ক্রয় করিয়া থাকে তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই নিঃসন্দেহ যে অঙ্ককার বাজার দর অনুসারেই ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে এবং কেহই লাভবান হইল না বা লোকসান স্বীকার করিল না। কিন্তু যদি এমন হয় যে অঙ্ককার দর প্রতিখানা ১৫ টাকা; এই দরে কোন ব্যক্তি এক মাস পরে বিলি দেওয়ার চুক্তিতে ৫০ জোড়া চিত্তরঞ্জন ধূতি ক্রয়ের চুক্তি করিল। এই এক মাসের মধ্যে যদি প্রতিখানা কাপড়ের মূল্য ১৫ টাকার স্থলে ১৪ টাকায় নামিয়া আসে তাহা হইলে ক্রেতা ১০ জোড়া কাপড়ে ১০০ টাকা লোকসান স্বীকার করিল। আর যদি প্রতিখানা কাপড়ের মূল্য ১৬ টাকায় উঠিয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতা ১০০ টাকা লোকসান স্বীকার করিল। এই প্রকার ঝুঁকি ভবিষ্যতে বিলি চুক্তিতে অবশ্যস্বাভাবিক। তবে ব্যবসায়ী এই প্রকার ঝুঁকি নেয় বলিয়াই মূল্যান্তর খুব দ্রুত উঠা-নামা করে না। কারণ ব্যবসায়ী ঝুঁকি নেওয়ার সময়েই বাজারের বর্তমান চাহিদা, যোগান, ভবিষ্যতে কি চাহিদা ও যোগান হইতে পারে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে। ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার সমন্বয় ঘটানোই ব্যবসায়ীর প্রধান কর্তব্য।

বিলি ব্যবস্থায় দ্বিতীয় সমস্ত্য পরিবহণের। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্থান পরিবর্তন করা প্রয়োজন কি উপায়ে বিলি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ, বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে কোনটির সাহায্যে দ্রব্য বিলি দেওয়া হইবে। ক্রেতার ইচ্ছা অনুসারেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিবহণ পদ্ধতি বাছিয়া নেওয়া হয়। ক্রেতা

যদি নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দেয় যে জাহাজে মাল পাঠাইতে হইবে তাহা হইলে বিক্রেতাকে জাহাজেই মাল পাঠাইতে হইবে। কিন্তু ক্রেতা যদি বিক্রেতার উপর পরিবহণ ব্যবস্থা বাছিয়া নেওয়ার দায়িত্ব ছাড়িয়া বিল ও পরিবহণ দেয় তাহা হইলে বিক্রেতাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে সে ব্যবস্থা নিজে যাদ ক্রেতা হইত তাহা হইলে কোন্ পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে দ্রব্য পাঠাইতে নির্দেশ দিত। নিজে ক্রেতা হিসাবে যে পরিবহণ ব্যবস্থা বাছিয়া নিত এরূপ ক্ষেত্রেও সেই পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই দ্রব্য পাঠানো কর্তব্য।

তবে বিলি ব্যবস্থায় দুইটি বিশেষ অবস্থার উপর বিক্রেতার লক্ষ্য রাখিতে হয়।

নির্দিষ্ট তারিখের প্রথমত, ক্রেতা যদি কোনও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দ্রব্য পাঠাইতে নির্দেশ দিয়া থাকে তাহা হইলে যে পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে বিলির সাহায্যে ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী দ্রব্য পৌছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, কি প্রকার দ্রব্য পাঠাইতেছে তাহার উপরও পরিবহণ ব্যবস্থা বাছিয়া লওয়া নির্ভর করে। দ্রব্যটি যদি খুব মূল্যবান হয় অথচ ওজন খুব হালকা, স্থানান্তর করিতে যদি যথেষ্ট অসুবিধা না হয় সে-ক্ষেত্রে যাহাতে অতি সস্তর ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পৌছে তাহার জ্ঞান সম্ভব হইলে বিমানপথে পাঠানো যায়—যেমন, মুক্তা। আফ্রিকা হইতে ভারতীয় কোন ব্যবসায়ী মুক্তা ক্রয় করিবার চুক্তি করিল। মুক্তা অতীব মূল্যবান ধাতু। সুতরাং যাহাতে ক্রীত দ্রব্য ক্রেতার

দ্রব্য অমুসারে নিকট অতি সস্তর পৌছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা পরিবহণ ব্যবস্থা আফ্রিকার ব্যবসায়ীর একান্ত প্রয়োজন। মুক্তা বিমানপথে স্থির হয় পাঠাইতেও বিশেষ অসুবিধা নাই কারণ মূল্যের অল্পপাতে ইহার স্থানের প্রয়োজন অতি অল্প। আবার যদি খুব ভারী দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে পাঠাইতে হয় তাহা হইলে হয় রেলপথে অথবা মালবাহী জাহাজে পাঠানোই সমীচীন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা আনিতে হইলে জাহাজে আনাই একমাত্র উপায়।

ইহার পর পরিবহণ ব্যয় সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চায় যাহাতে কম খরচে ক্রেতার ঘরে দ্রব্য পৌছিতে পারে। কারণ শেষ পর্যন্ত পরিবহণ ব্যয় ক্রয় মূল্যের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রয় মূল্য বাড়িয়া যায়। পরিবহণ ব্যয় স্থিরীকৃত হয় স্থানের দূরত্ব, দ্রব্যের মূল্য, দ্রব্য কি পরিমাণ স্থান দখল করিবে ইত্যাদির উপর। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বিবেচনা করিয়া যে পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্যে সস্তর, অল্প ব্যয়ে, অল্প ঝুঁকিতে মাল প্রেরণ করা যায় সেই পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করে। দ্রব্যের আকার, মূল্য ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পরিবহণ ব্যবস্থাও স্থির করা হয়।

আবার দ্রব্য যদি এমন হয় যে অতি সস্তরই পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে

তাহা হইলে পরিবহণ খরচের চেয়েও যাহাতে দ্রব্য অতি সম্বরই পৌঁছিতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

মূল্য পরিশোধ (Payment) : ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ ধাপ হইল মূল্য পরিশোধ। যতক্ষণ ক্রীত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না হয় ততক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় পূৰ্ণাঙ্গ পর্ধায়ে পৌঁছিয়াছে বলা যায় না। মূল্য পরিশোধের সঙ্গে দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের প্রশ্ন জড়িত। একথা তোমরা সকলেই জান যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে তোমাদিগকে দ্রব্যের মূল্য নগদ শোধ করিতে হয় ;

লেনদেনের
পরিসমাপ্তি মূল্য
পরিশোধে

অনুযায়ী তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতার উপর বিক্রেতার যথেষ্ট আস্থা থাকিলে, ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট দিনে শোধ করার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে দ্রব্য গ্রহণ করিতে পার। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় মূল্য পরিশোধের দিক হইতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—নগদান ও ঋণে। যখন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্যের মূল্য নগদই পরিশোধ করিতে হয় তখন সেই লেনদেনকে নগদান ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন বলে। খুচরা ব্যবসায় সাধারণত নগদান ক্রয়-বিক্রয়ই নিয়ম। তবে অনেক ক্ষেত্রে ধারে বা ঋণেও দ্রব্য বিনিময় হইতে পারে।

কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি ঋণের উপর ভিত্তি করিয়া হয় তাহা হইলে বিক্রেতা দ্রব্য হস্তান্তর করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যের মূল্য পায় না। ঋণে ক্রয়-বিক্রয় হইলে কোন সময়ে ক্রেতা ঋণ শোধ করিবে তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ঋণে ক্রয় করিলে উহার মূল্য পরিশোধ সঙ্গে সঙ্গেই হয় না বলিয়া ঐ প্রকার ক্রয়ের মূল্য পরিশোধকে 'বিলম্বে পরিশোধ' (Deferred Payment) বলা হয়।

ঋণভিত্তিক
লেনদেনে মূল্য
পরিশোধ বিলম্বে
হয়

বিলম্বে পরিশোধও (Deferred Payment) আবার পরিশোধের সময় অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, বিলম্বে পরিশোধে পরিশোধ নিয়মে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এমন চুক্তি হইতে পারে যে, যে-তারিখে দ্রব্য বিক্রয় করা হইল সেই দিন হইতে (ধরা যাউক) একমাস পর মূল্য পরিশোধ করিবে। বিলম্বে পরিশোধে (Deferred Payment) মূল্য পরিশোধ নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত স্থগিত থাকে। তবে যদি মূল্য পরিশোধের তারিখ লম্বা সময়ের জন্ত (মনে কর দুই বৎসর) স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে ক্রেতাকে এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি কিস্তিতে (Instalment) মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

(১) পরিশোধ
নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত
স্থগিত

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে কিস্তিবন্দীতে ক্রয়-বিক্রয় চলিতে

পারে। (Instalment Purchase দেখ।) এই নিয়মে ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি করার পর প্রথম কিস্তির দেয় অর্থ শোধ করিলেই (২) কিস্তিবন্দীতে দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব পাইয়া থাকে। কিস্তির দেয় অর্থ মূল্য শোধ পরিশোধ করার পর নির্দিষ্ট তারিখে পরবর্তী কিস্তিসমূহ পরিশোধ করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, ভাড়া ক্রয় নিয়মেও (Hire Purchase) কিস্তিবন্দীতে ক্রয়ের মত প্রথম কিস্তির দেয় অর্থ পরিশোধ করিয়াই ক্রেতা দ্রব্যের দখল লইতে পারে। যদিও দ্রব্য তাহারই অধিকারে ও ব্যবহারে থাকে তথাপি যতদিন চুক্তি অমুমায়ী শেষ কিস্তির অর্থ পরিশোধ না হয় ততদিন দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মনে করে যে দ্রব্যটি ভাড়ায় খাটানো হইতেছে। (Hire Purchase দেখ।)

চতুর্থত, আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে পাইকার অনেক ক্ষেত্রে খুচরা ব্যবসায়ীর (Retail Business) নিকট ঋণে বিক্রয় (Sale on Credit) করিতে বাধ্য হয়। পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীর মধ্যে সাধারণত এই নিয়ম প্রচলিত থাকে যে খুচরা বিক্রেতা তাহার প্রয়োজনমত ঋণে দ্রব্য ক্রয় করিবে, (৪) ঋণে বিক্রয় এবং সে যখন যেমন সাধ্য, তদমুদ্রপ ‘অর্থ’ শোধ করিবে। তবে এই সকল ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতা সর্বাধিক (maximum) কত মূল্যের দ্রব্য ঋণে ক্রয় করিতে পারিবে তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পূর্বে চুক্তির সাহায্যে স্থির হয়। এই প্রকার চুক্তিতে সাধারণত সপ্তাহসরিক হিসাব-নিকাশের পূর্বে ক্রেতা ঐ বৎসরের ঋণ শোধ করিয়া থাকে।

মূল্য পরিশোধের উপায় (Mode of Payment) : নগদান ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য পরিশোধের কোনও অসুবিধা দেখা যায় না কারণ দ্রব্য বিনিময় হয় নগদান অর্থের পরিবর্তে। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য নগদান দেয় হইলেও ইচ্ছা করিলে বিক্রেতা নগদ অর্থের (Cash Money) পরিবর্তে এমন কোন দ্রব্যের মাধ্যমে বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করিতে পারে যাহা অতি সহজেই নগদ অর্থে পরিবর্তন করা যায়। এই পর্দায় পড়ে চেক (Cheque), (মূল্য পরিশোধের উপায় পোষ্টাল অর্ডার (Postal Order), প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note), বিনিময় পত্র (Bill of Exchange)। নগদ অর্থও

আবার নানা উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতা (১) নগদান উভয়েই যখন উপস্থিত এবং দ্রব্য বিনিময় নগদান অর্থের (২) চেক মাধ্যমে হয় সে-ক্ষেত্রে নগদ অর্থ (Cash Money) দেওয়া ব্যতীত সাধারণত অন্য কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না। তবে ইচ্ছা করিলে

বিক্রেতা চেকও (Cheque) গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি ডাকবিভাগের মাধ্যমে হয় তাহা হইলে সাধারণত ড্রবোর মূল্যও ডাকযোগে পরিশোধ করা হয়। একস্থান হইতে (৩) পোষ্টাল অর্ডার অন্যস্থানে ডাকযোগে টাকা-পয়সা পাঠাইতে হইলে মনিঅর্ডার (৪) বিনিময় পত্র (Money Order) করিতে হয় তাহা তোমরা সকলেই জান। সুতরাং মনিঅর্ডারের মাধ্যমেও ড্রবোর মূল্য পরিশোধ করিতে পারা যায়। সাধারণ মনিঅর্ডার (Ordinary Money Order) যোগে (৫) মনিঅর্ডার মূল্য পরিশোধ করিলে অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতার অর্থ পাইতে বিলম্ব হয়। মনিঅর্ডার যোগে অর্থ প্রেরণ করিলে বিক্রেতা কত দিনের মধ্যে প্রেরিত অর্থ পাইতে পারে তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবসাস্থলের দূরত্ব ও ডাকবিভাগের (Postal Department) তৎপরতার উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চলতি নিয়মে যে কয়দিনের মধ্যে মনিঅর্ডার একস্থান হইতে অল্প একস্থানে পৌঁছিতে পারে, তাহার মনিঅর্ডার ও তারযোগে চেয়ে অনেকগুণ বেশী সময় লাগে। সুতরাং যাহাতে অর্থ প্রেরণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রেতা প্রেরিত অর্থ পাইতে পারে সেজন্য সাধারণ মনিঅর্ডার (Ordinary Money Order) যোগে টাকা-পয়সা না পাঠাইয়া 'তারযোগে মনিঅর্ডার' (Telegraphic Money Order, T. M. O.) করিয়া টাকা-পয়সা পাঠানো হয়। ইহাতে যদিও অর্থ প্রেরণের খরচ বা মাণ্ডল বেশী, তথাপি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একস্থান হইতে অল্প একস্থানে প্রেরিত অর্থ পৌঁছিয়া থাকে। আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে তারযোগে মনিঅর্ডার খুব বেশী হয় না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যে তারযোগে অর্থ প্রেরণ খুবই বেশী হয়। ইহাকে অবশ্য তারযোগে মনিঅর্ডার বলা হয় না। ইহাকে বলা হয় 'তারযোগে স্থানান্তর' (Telegraphic Transfer)। যখন তারযোগে এক দেশ হইতে অল্প দেশে অর্থ পাঠানো হয় তখন যে-সমস্ত ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে সেই রকম ব্যাংকের ঘরে উভয় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার জন্ম প্রয়োজনীয় নিজ দেশের মুদ্রা জমা দিতে হয়। যে-ব্যাংকের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা হয় সেই ব্যাংক তখন বিদেশস্থ প্রতিনিধির নিকট প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয়।

দ্বিতীয়ত, চেকের (Cheque) মাধ্যমেও ক্রয় মূল্য শোধ করা যায়। বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে বিক্রয় মূল্য নগদ না নিয়া চেকও নিতে পারে। চেকে মূল্য গ্রহণ ইচ্ছা করিলে বলা হইয়াছে এইজন্য যে ক্রেতা ক্রয় মূল্য চেকে বাধ্যতামূলক নহে পরিশোধ করিতে চাহিলেই বিক্রেতা চেক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। কারণ চেক গ্রহণ করা কি না করা তাহা চেকদাতার আর্থিক

অবস্থার উপর নির্ভর করে। এমনও ত' হইতে পারে যে ব্যাংকে যথেষ্ট অর্থ জমা নাই কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতাকে চেকের মাধ্যমে ক্রয় মূল্য শোধ করিল। বিক্রেতা যখন সেই চেক ব্যাংকের নিকট উপস্থাপিত করিল তখন দেখা গেল ব্যাংক চেক ফেরত দিল। এইরকম ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে পুনরায় সেই অর্থ আদায় করিতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই বহুদিন অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং ক্রেতা চেকে (Cheque) ক্রয় মূল্য পরিশোধ করিতে চাহিলেই যে বিক্রেতা সেই চেক গ্রহণ করিবে তাহা সত্য নহে। চেক যদিও নগদান অর্থেরই সামিল তথাপি চেক নগদান অর্থ নহে চেক অর্থের মত কাজ করে কিন্তু চেক নগদান অর্থের সামিল এই কারণে যে চেক হস্তান্তরযোগ্য (transferable)। যতক্ষণ পর্যন্ত হস্তান্তর গ্রহীতার হস্তান্তরকারীর উপর বিশ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চেক হস্তান্তর করিলে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি থাকে না। আবার এই কারণেও চেক অর্থের সমান যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত করিলেই চেকের পরিবর্তে নগদ অর্থ পাওয়া যায়।

ইহাও যেমন সত্য তেমনি চেক অর্থ নহে ইহাও সত্য। কারণ চেক সর্বজনগ্রাহ্য নহে। ব্যাংক হইতে চেকে লিখিত অর্থ আদায় করার নিয়ম পদ্ধতি যাহাদের জানা নাই তাহারা চেক গ্রহণ নাও করিতে পারে। চেক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা আইনত অপরাধ নহে। কারণ চেকের পরিবর্তে দেয় অর্থ যে বিনা ক্লেসে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা নাই।

দ্বিতীয়ত, বিক্রেতা চেকে বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করিতে রাজী হইতে পারে কিন্তু বিক্রেতা অপর কাহাকেও সেই চেক হস্তান্তর করিতে চাহিলে সে যে ঐ চেক গ্রহণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই। মনে কর তুমি ১০ (দশ) টাকা মূল্যে হরির নিকট একটি দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছ। হরি তোমাকে একখানা দশ টাকার নোট দিল। উহা যদি জাল (counterfeit) নোট না হয় চেক সর্বজনগ্রাহ্য তাহা হইলে তুমি কি বলিতে পার যে এই নোট তুমি নিবে না? তুমি যদি নোট নিতে অস্বীকার কর তাহা হইলে তুমি আইনত অপরাধী। কারণ ঐ নোটের পিছনে রহিয়াছে সরকারের সমর্থন। সরকার ঐ প্রকার নোটকে সর্বজনগ্রাহ্য বা বৈধমুদ্রা (Legal Tender) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আবার ঐ নোটখানা তুমি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অপর একজনকে তোমার ঋণ শোধ করার জন্ত হস্তান্তর করিতে পার। তুমিও যেমন নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পার নাই, যাহাকে তুমি সেই নোটখানা হস্তান্তর করিবে সে-ও তেমনি ঐ নোটখানা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি আমার নিকট হইতে একখানা চেক পাইয়াছ। উহা তুমি রমেশকে দিলে রমেশের পক্ষে সেই চেক গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে।

কারণ আমার আর্থিক সচ্ছলতার উপর তোমার আস্থা থাকিতে পারে কিন্তু রমেশের আস্থা নাও থাকিতে পারে।

তৃতীয়ত, তুমি বা আমি ব্যক্তি বিশেষে যেমন চেক আদান-প্রদান করিতে পারি ; সেই রকম ডাকবিভাগের নিকট হইতেও একপ্রকার চেক ক্রয় করিতে পারা যায়। উহাকে বলা হয় পোষ্টাল অর্ডার (Postal Order)। চেকের সহিত পোষ্টাল অর্ডারের পার্থক্য এই যে পোষ্টাল অর্ডার সাধারণত আদিত হয়। চেকের মত বাহককেই পোষ্টাল অর্ডারে লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হয় না। প্রাপক বলিয়া যে-ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা থাকে সেই যে পোষ্টাল অর্ডারে লিখিত অর্থ পাইতেছে সে-সম্বন্ধে ডাকবিভাগ নিঃসন্দেহ হইলেই অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারকে দেয় কোন অর্থ পরিশোধ করার জন্ত পোষ্টাল অর্ডার ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকিবে যে সরকারের কোন চাকুরীর প্রার্থী হইতে হইলে ৫/১০ টাকার পোষ্টাল অর্ডার আবেদন পত্রের সহিত পাঠাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে যে-কোন ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য অর্থ পোষ্টাল অর্ডারে (Postal Order) গ্রহণ করিতে পারে।

চতুর্থত, সরকারী তহবিলে কোন অর্থ জমা দিতে হইলে, যেমন—সরকারী টেক্সারী চালান খাজনা, অলুজা মাণ্ডল (License Fee) ইত্যাদি সরকারী চালানে (Treasury Challan) জমা দিতে হয়। টেক্সারী চালানের মাধ্যমে সরকারী পান্ডনা জমা দেওয়া হয় সরকারের নির্দিষ্ট অফিসে চালান পূরণ করিয়া দেয় অর্থ জমা দিলেই সরকারের ঘরে যেখানে পৌঁছানো প্রয়োজন সেখানে অর্থ জমা হইয়া থাকে। সরকারী তহবিলে জমা (Payment by Treasury Challan) একমাত্র সরকারের পান্ডনা পরিশোধ করিতেই ব্যবহার করা হয়।

উপরি-উক্ত কয়টি মাধ্যমই মোটামুটি নগদান অর্থ আদান-প্রদানের সমান। এখন দেখা যাইবে যে যে-সমস্ত লেনদেন ঋণের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়া থাকে তাহাদের দেনা কি উপায়ে পরিশোধ হয়।

প্রথমত, ছপ্তির কথা তোমরা অনেকই শুনিয়া থাকিবে। ছপ্তিকে আবার বিনিময় পত্রও (Bill of Exchange) বলা হয়। বিক্রেতা এক নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে ক্রেতাকে ঋণে দ্রব্য ক্রয় করিবার বিনিময় পত্র অধিকার দিতে পারে। মেয়াদ অন্তে ক্রেতা বিক্রেতাকে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবহারিক নিয়মে এমন একটি উপায়ের উদ্ভব হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলে বিক্রেতা মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেও বিক্রয় মূল্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। অবশ্য সেজন্য বিক্রেতাকে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। প্রথমে একটি উদাহরণ

দেওয়া যাউক। জি. বন্স এণ্ড কোং বোম্বাই-এর আগরওয়ালা এণ্ড কোংএর নিকট হইতে তিন মাসের ঋণের চুক্তিতে ১০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিল। স্ততরাং জি. বন্স এণ্ড কোং তিন মাস পর ক্রয় মূল্য ১০০০০ টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত। কিন্তু যাহাতে তিন মাসের মধ্যে যে কোনও সময়ে ইচ্ছা করিলে আগরওয়ালা এণ্ড কোং প্রয়োজনবোধে ১০০০০ টাকা পরিমাণ অর্থের সাহায্য পাইতে পারে সেজন্য জি. বন্স এণ্ড কোং-এর নিকট আগরওয়ালা এণ্ড কোং

একখানা বিনিময় পত্র পাঠাইয়া দিল। ভবিষ্যতে এক নির্দিষ্ট দিনে বিনিময় পত্রে লিখিত ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট অপর কাহাকেও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার আদেশ থাকে। ক্রেতা (এ-ক্ষেত্রে জি. বন্স এণ্ড কোং) বিনিময়

পত্রের উপর গৃহীত (accepted) লিখিয়া বিক্রেতা আগরওয়ালার নিকট ফেরত পাঠাইল। আগরওয়ালা এণ্ড কোং বিনিময় পত্রের বদলে তিন মাসের পূর্বেই ১০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য যাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে তাহাকে বিনিময় পত্র পরিশোধের দিন পর্যন্ত সুদ দিতে হইবে।

এই সুদকে বলা হয় বাট্টা (discount)। আগরওয়ালার বিনিময় পত্র বাট্টা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়। অত্র কোন উপায়ে ঋণ সংগ্রহ করিতে হইলেও তাহাকে সুদ দিতে হইত। এ-ক্ষেত্রে বরং একটি বিশেষ সুবিধা এই যে যাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইল সে আগরওয়ালা

এণ্ড কোং এবং জি. বন্স এণ্ড কোং দুইটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি পাইল। যদি আগরওয়ালা এণ্ড কোং অর্থের প্রয়োজন বোধ না করে তাহা হইলে এই বিনিময় পত্র বা ছড়ি ভাঙ্গাইয়া তিন মাস পরেই আদিষ্ট ব্যাংকের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবে। বিনিময় পত্র সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয়ত, বিনিময় পত্রের মতই অথচ প্রকৃতপক্ষে বিনিময় পত্র নহে এমন একপ্রকার প্রতিশ্রুতি পত্রের মাধ্যমেও ক্রয় মূল্য পরিশোধ করা যায়। এইপ্রকার প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note)। প্রত্যর্থ পত্রের বেলাতে ক্রেতা বা ঋণী, বিক্রেতা অথবা প্রাপককে ভবিষ্যতে কেবল এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। নির্দিষ্ট দিনে বিক্রেতা ঐ প্রত্যর্থ পত্র উপস্থাপিত করিলেই ক্রেতা প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তবে সাধারণত প্রত্যর্থ পত্রের উপরই প্রত্যর্থ পত্র দাতা কোন ব্যাংক হইতে অর্থ শোধ হইবে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে।

বিনিময় পত্র ও প্রত্যর্থ পত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা স্থগিত রাখা হইল। তবে ইহা উল্লেখ কর' প্রয়োজন যে বিনিময় পত্র লিখিয়া

থাকে বিক্রেতা এবং উহা ক্রেতার দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত (accepted) হয়।

ইহা মূল্য পরি- কিন্তু প্রত্যর্থ পত্রের বেলায় ক্রেতা নিজেই প্রত্যর্থ পত্র লিখিয়া
শোধের থাকে। সুতরাং উহা স্বীকৃত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

প্রতিক্রান্তি মাত্র শেষত, যে-সমস্ত উপায়ে মূল্য শোধ করা যায় তাহার
মধ্যে ব্যাংক ড্রাফ্ট (Bank Draft) বা ব্যাংকের হুতিও

একটি প্রধান উপায়। ইহাতে এক জায়গা হইতে অপর এক জায়গায় প্রচুর
পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করিতেও কোন অসুবিধা হয় না। যদি কেহ ব্যাংকের
হুতির মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করিতে চাহে, তাহা হইলে যে-পরিমাণ অর্থ

ব্যাংক ড্রাফ্ট বা অল্পত প্রেরণ করিতে হইবে সেই পরিমাণ অর্থ কোনও
ব্যাংকের হুতি ব্যাংকে জমা দিবে। সেই ব্যাংক তখন যাহার নামে অর্থ
প্রেরণ করিতে হইবে তাহার অল্পকূলে একখানা হুতি

লিখিয়া দিবে। অবশ্য এজন্ত ব্যাংককে দস্তুরি বা কমিশন দিতে হয়। কিন্তু
বিক্রেতাকে যে-স্থানে অর্থ দিতে হইবে সে-স্থানে যদি ব্যাংকের কোন শাখা
অফিস না থাকে তাহা হইলে যে-ব্যাংকের সে-স্থানে শাখা অফিস আছে
সেইরূপ ব্যাংকের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক ড্রাফ্ট
ব্যাংকের এক অফিস হইতে উহার অল্প কোন শাখা অফিসকে কোন নির্দিষ্ট
ব্যক্তি অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ
প্রদান করার আদেশ পত্র। মনে কর তুমি মাদ্রাজের পট্টভাইর নিকট
হইতে ৫০০ টাকা মূল্যের একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ। মাদ্রাজের ব্যবসায়ীকে
তুমি মণিঅর্ডার যোগে টাকা না পাঠাইয়া, ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া
(কলেজ স্ট্রীট শাখা) হইতে পট্টভাইর অল্পকূলে একখানা ড্রাফ্ট ক্রয় করিলে
(এ-ক্ষেত্রে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে মাদ্রাজে ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার
শাখা আছে। যদি ইহার কোনও শাখা অফিস মাদ্রাজে না থাকে তবে মাদ্রাজে
শাখা আছে এরূপ কোনও ব্যাংকের সন্ধান করা প্রয়োজন)। ড্রাফ্ট ক্রয় করিতে

তুমাকে ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া (কলেজ স্ট্রীট শাখা)
ব্যাংক ড্রাফ্ট পাঁচ শত টাকা জমা দিতে হইবে এবং তদতিরিক্ত পাঁচ শত
পিছনসহি করিয়া টাকার জন্ত নির্দিষ্ট কমিশন বা দস্তুরি—মনে কর ২ টাকা
ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে হইবে। এখন এই ড্রাফটখানা পট্টভাইকে পাঠাইয়া
আদায় করা হয় দিলে সে মাদ্রাজস্থ ইউনাইটেড্ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার অফিস
হইতে পাঁচ শত টাকা পাইয়া থাকিবে। ইহা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত
ড্রাফট্ আদিষ্ট বলিয়া পিছনসহি (Endorsement) করিয়া কোনও ব্যাংকের
মাধ্যমে আদায় করিতে হয়।

বাট্টা (Discount) : মূল্য পরিশোধের মাধ্যম সম্বন্ধে আলোচনা করা
হইল। মূল্য সর্বদাই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষি করিয়া স্থির হইয়া

থাকে। যখন দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে ব্যবসায় হয় তখন সাধারণত বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু কিছু সুযোগ দিয়া থাকে। ক্রেতার নিকট বাটা বা সুযোগ হইতে যাহাতে সত্তর ক্রয় মূল্য আদায় হয় তাহার জন্য

বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্রয় মূল্য হইতে একাংশ ছাড়িয়া দিতে পারে। উহাকে নগদান বাট্টা (Cash Discount) বলা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার সুবিধা এই যে ক্রেতা সত্তর ক্রয় মূল্য পরিশোধ করিলে ক্রয় মূল্যের কিঞ্চিৎ মকুফ পাইয়া

১। নগদান বাট্টা

২। ব্যবসায়িক
বাট্টা

থাকে, আর বিক্রেতাকেও বহুদিন ক্রয় মূল্য আদায় করার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে নগদান অর্থ পরিশোধ নিরপেক্ষও বিক্রেতা ক্রয় মূল্যের একাংশ ছাড়িয়া দিতে পারে। এই রীতি সাধারণত

বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসায়ের স্তন্য অর্জন করিবার উদ্দেশ্যেই দিয়া থাকে। ইহাতে বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য তালিকায় লিখিত মূল্য হইতে কিঞ্চিৎ ছাড়িয়া দেয়। উহাকে বলা হয় ব্যবসায়িক বাট্টা (Trade Discount)। ক্রেতা নগদান অথবা ঋণে যে-ভিত্তিতেই ক্রয় করুক না কেন ব্যবসায়িক বাট্টা পাইয়া থাকে। ক্রেতা ব্যবসায়িক ও নগদান বাট্টা উভয়ই পাইতে পারে। টি. বসু এণ্ড কোং আর. পি. মিত্র এণ্ড কোং-এর নিকট হইতে ২০০ টাকা

নগদান বাট্টা সত্তর
মূল্য আদায় করার
জন্য দেওয়া হয়

মূল্যের কোন দ্রব্য ক্রয় করিল। যাহাতে সত্তর বিক্রয় মূল্য আদায় হয়, সেজন্য আর. পি. মিত্র, টি. বসু এণ্ড কোংকে এই সুযোগ দিল যে যদি বিক্রয় মূল্য ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে শতকরা ২ টাকা বাট্টা দেওয়া হইবে।

ক্রেতার পক্ষেও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে পারিলে ২ টাকা লাভ হয়; আর বিক্রেতাও সত্তর বিক্রয় মূল্য আদায় করিতে পারে।

ব্যবসায়িক বাট্টা
বিক্রয়ের পরিমাণ
বাড়াইবার উদ্দেশ্যে
দেওয়া হয়

ইহাই নগদান বাট্টার উদাহরণ। কিন্তু আর. পি. মিত্র এণ্ড কোং কতদিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে সে-বিষয়ে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়া সমস্ত ক্রেতাকেই মূল্য তালিকায় লিখিত মূল্য হইতে শতকরা ১ টাকা বাট্টা

দেওয়ার নিয়ম করিল। এ-ক্ষেত্রে যে নগদ ক্রয় করিবে সে নগদান বাট্টা শতকরা ২ টাকা। ব্যতীতও শতকরা ১ টাকা ব্যবসায়িক বাট্টা পাইয়া থাকে। যে ঋণে ক্রয় করিবে সে মাত্র ব্যবসায়িক বাট্টা পাইবে। যখন নগদান বাট্টা ও ব্যবসায়িক বাট্টা উভয়ই দেওয়া হয় তখন তালিকায় লিখিত মূল্য হইতে প্রথমে ব্যবসায়িক বাট্টা বাদ দিয়া যাহা পাওনা হয় তাহার উপরই নগদান বাট্টা হিসাব করা হয়।

টেণ্ডার (Tender): ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার ও বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষি অথবা কথাবার্তার পর চুক্তি দ্বারা স্থির হয়, এ-অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু অনেক সময়ে ক্রেতা বাজার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্রব্যের মূল্য

যাচাই করিয়া সর্বনিম্ন কম মূল্যে ক্রয় করার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না ; বিশেষত ব্যবসায় যখন খুবই বড় এবং ক্রয়ের পরিমাণও হয় খুব বেশী। আবার যখন দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী নিজে দ্রব্য ক্রয় করিবার ঝুঁকি লয় না। এই সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যখন একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয়

অধিক ক্রয় অথবা
পারদর্শী কার্য
সম্পাদনের জন্ত
বিক্রেতার নিকট
মূল্য জানিতে
চাহিয়া প্রস্তাব বা
টেণ্ডার আহ্বান
করা হয়

করিয়া থাকে তখন বাজারে বিক্রেতাদের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করে। টেণ্ডার কথাটির পারিভাষিক অর্থ 'সরবরাহের প্রস্তাব'। পত্রিকা মারফতে বিক্রেতা অথবা সরবরাহকারীদের নিকট হইতে কোনও একটি দ্রব্য কি মূল্যে সরবরাহ করিতে পারে তাহার প্রস্তাব বা টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। কেবলমাত্র দ্রব্য বিক্রয় করিবার প্রস্তাব গ্রহণের জন্তই টেণ্ডার আহ্বান করা হয় না। বৃহদাকারে কোন কার্য সম্পাদন করিবার জন্তও টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতে পারে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সংবাদপত্র পাঠ

কর তাহারা দেখিয়া থাকিবে প্রায় প্রত্যেক দিন কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠান হইতে কোন দ্রব্য সরবরাহ করার জন্ত অথবা কোনও কার্য সম্পাদন করার জন্ত টেণ্ডার বা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। যখন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তখন যে-দ্রব্য প্রয়োজন তাহার বিশদ বিবরণ, কি পরিমাণ দ্রব্য প্রয়োজন, কতদিনের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে, ইত্যাদি সংবাদ দেওয়া হয়। যাহারা ঐ দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাহারা তখন প্রস্তাব বা টেণ্ডার দাখিল করিবে। একটি উদাহরণ ধরা যাউক। বাংলা সরকারের হরিণঘাটার দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্ত ১,০০,০০০ ছোট-বড় বোতল বা শিশির প্রয়োজন। বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ১,০০,০০০ শিশি ক্রয় করা অস্ববিধাজনক ত' বটেই, আবার যে-প্রকার বোতল প্রয়োজন হয়ত ঠিক সেই প্রকার বোতল সংগ্রহ হইল না। সুতরাং বাংলা সরকার বোতল তৈয়ারি-কারক অথবা যাহারা শিশি-বোতলের পাইকারী ব্যবসায় করে সেই প্রকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এক লক্ষ বোতল সরবরাহ করার জন্ত প্রস্তাব আহ্বান করিতে পারে।

যে-সকল প্রতিষ্ঠান এক লক্ষ বোতল সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাহারা প্রস্তাব আহ্বায়কের (এ-ক্ষেত্রে বাংলা সরকার) নিকট নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দর উল্লেখ (Quotation) করিয়া প্রস্তাব দাখিল করিবে। এইভাবে যখন প্রস্তাবসমূহ বাংলা সরকারের হাতে পৌছিল, তখন সরকার প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া যে-প্রস্তাবটি সরকারের বিশেষ অমুত্থানে হইবে সেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিবে।

সরকারের অমুত্থানে অবশ্য সেই প্রস্তাবটিই হইবে যাহাতে সবচেয়ে কম মূল্যে দ্রব্য সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সর্বদাই যে সর্বনিম্ন দর

উল্লেখকারীর সহিতই দ্রব্য সরবরাহ করার চুক্তি হইবে তাহা নহে। কারণ, দর উল্লেখ ব্যতীতও ক্রেতার কতকগুলি বিষয়ে নজর দিতে হয়—যেমন সরবরাহ করার সময়, সরবরাহ করার উপায় ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে বিক্রেতা অধিক বিক্রয়ের আশায় খুব কম দর উল্লেখ করে এবং তাহার সহিত দ্রব্য সরবরাহ করার জ্ঞাত চুক্তি করা হয়—অর্থাৎ, সরবরাহকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরবরাহকারী প্রস্তাবিত মূল্যের দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে না।

প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়ে প্রস্তাব আস্থায়ক প্রস্তাবকারীর ব্যবসায়ের খ্যাতি, ব্যবসায়ের আকার, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করিয়া থাকে। যাহার বাজারে কোনও নাম বা খ্যাতি নাই অথবা যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সমাজাত এমন লোকের ধা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণ করা বিপজ্জনক। প্রস্তাব আস্থানকারী অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীর নিকট হইতে তাহার আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করার বিশ্বাসজ্ঞাপক হিসাবে প্রস্তাবিত মূল্যের একাংশ জামানত হিসাবে দাবি করে। যদি প্রস্তাবকারী চুক্তি অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করিতে না পারে অথবা যে-দ্রব্য সরবরাহ করা হয় উহা গুণের দিক হইতে প্রস্তাবিত দ্রব্যের তুলনায় হীন হয়, তাহা হইলে প্রস্তাব আস্থায়কের জামানত বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকে।

দর উল্লেখ (Quotation) : টেণ্ডার ও দর উল্লেখ দুইটি একই বিষয়ের দুইটি ভাগ। প্রস্তাব আস্থায়ক ক্রেতাকে হিসাবে দ্রব্য ক্রয় করিতে চায়, আর প্রস্তাব দাখিলকারক বিক্রেতা হিসাবে দ্রব্য সরবরাহ করিতে বা যোগান দিতে চায়; সুতরাং যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক প্রথমে তাহাকে যে-দরে দ্রব্য সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাহা উল্লেখ করিতে হয়। ইহাকে বলে 'দর উল্লেখ' (Quotation)। প্রস্তাবক যে-দর উল্লেখ করে উহাই প্রাথমিক উল্লেখ। প্রাথমিক উল্লেখ করিয়াই পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আপাতদৃষ্টিতে সর্বনিম্ন দর উল্লেখকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করাই সর্বদা লাভজনক কিন্তু হয়ত সে-প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত অধিক ব্যয়বহুল হয়; কারণ প্রস্তাবগ্রহীতা যদি সময় অনুসূচী (Time Schedule) মানিয়া দ্রব্যের যোগান দিতে না পারে অথবা দ্রব্য সমগুণবিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে প্রস্তাব আস্থায়কের ক্ষতি হয়। দর উল্লেখ করার সময়ে প্রস্তাবগ্রহীতার জানা প্রয়োজন প্রকৃত বাজার দর কি? প্রস্তাব গ্রহণের লোভে বাজার দরের কম মূল্যে সরবরাহ করার প্রস্তাব করিয়া হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে যে সেই মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন অথবা সংগ্রহ করা যায় না। ইহাতে সরবরাহকারীর লোকসান ব্যতীত লাভ হয় না। কারণ, তাহার সহিত যে-চুক্তি হইয়াছে সেই চুক্তি আর বলবৎ থাকে না। আবার চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে না পারার জ্ঞাত বাজারে সুনামেরও ক্ষতি হয়।

চুক্তি (Contract) : নগদান ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণত কোনও চুক্তির প্রয়োজন হয় না। ক্রেতার দ্রব্য পছন্দ হইলে এবং মূল্য আশায়রূপ হইলেই নগদান ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু ঋণে বা ধারে ক্রয়-বিক্রয় হইলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়। ক্রেতা প্রস্তাবকের উল্লিখিত দর গ্রহণ করিলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়। দ্রব্য, কত দিনের জন্ত ঋণে ক্রয়-বিক্রয় হইল, ঋণ শোধের উপায় ও সময় ইত্যাদি বিশদভাবে প্রত্যেক চুক্তিতে লিখিত থাকে। চুক্তি লিখিত বা মৌখিক যে-কোনও একপ্রকার হইতে পারে। তবে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চুক্তি বলিতে লিখিত চুক্তিকেই বুঝায়। কারণ, অলিখিত বা মৌখিক চুক্তিকে ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তির মর্যাদা দিতে পারে সত্য; কিন্তু কোন পক্ষ যদি মৌখিক চুক্তি অনুসারে কার্য না করে তাহা হইলে তাহার প্রতিকারের জন্ত কোনরূপ আইন-আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা যায় না।

টেণ্ডার বা প্রস্তাব আহ্বান করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্রব্য সরবরাহের প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ যখন সমাপ্ত হয় তখন প্রয়োজন উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি। চুক্তিতে কি সর্তে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহা লিপিবদ্ধ থাকে। কোনও পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিলে প্রয়োজন হইলে আইন ও আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

চুক্তিতে লিখিত বিষয়বস্তু : (১) চুক্তিতে সম্পর্কিত পক্ষের নাম (ক্রেতার এবং বিক্রেতার নাম), ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি। (২) চুক্তির বিষয়বস্তু অর্থাৎ যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয় তাহার বিশদ বিবরণ। (৩) যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হইল তাহার পরিমাণ। (৪) বিলি দেওয়ার নিয়ম—কোন চুক্তির বিষয়বস্তু সময়ে কিভাবে বিলি দিতে হইবে তাহা; কোন পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রব্য বিলি দেওয়া হইবে চুক্তিতে তাহার উল্লেখ থাকে। (৫) দ্রব্যের মূল্য কি উপায়ে পরিশোধ করিতে হইবে—কিস্তিবন্দীতে কিংবা দ্রব্য বিলি অনুপাতে সঙ্গে সঙ্গে মূল্য দেয় কি না। (৬) চুক্তির কোনও সর্ত ভঙ্গ করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতার কি প্রতিকার। উপরি-উক্ত সর্তাবলী যোজনা করিয়া চুক্তি লিখিত হইলে উভয়পক্ষ চুক্তিতে সহি করিয়া থাকে। চুক্তি দুই প্রস্ত হওয়া প্রয়োজন। এক প্রস্ত ক্রেতা রাখিয়া দেয় এবং দ্বিতীয় প্রস্ত বিক্রেতার নিকট থাকে। চুক্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহে এইরূপ দুই ব্যক্তির সাক্ষী হিসাবে সহি প্রয়োজন।

চুক্তি কার্যকরী হইতে হইলে চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের নিম্নলিখিত গুণ থাকা কাহারো চুক্তি করিতে প্রয়োজন : (১) চুক্তিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক না হন, বিভিন্ন পক্ষে : দেশের আইন দ্বারা এই বিষয়টি স্থির হয়। ভারতবর্ষে কোন (১) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে চুক্তি করার অধিকার

- (২) যে দেউলিয়া পায় না। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের কম বয়স্ক কোনও ব্যক্তি
বলিয়া ঘোষিত চুক্তির পক্ষভুক্ত হইলে সে-চুক্তি আইনত কার্যকরী নহে।
নহে (২) কোনও ব্যক্তি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত
(৩) অস্থ মস্তিষ্ক হইলে তাহার চুক্তি করার অধিকার থাকে না। (৩) বিকৃত
(৪) নাগরিক মস্তিষ্ক লোকের চুক্তি করার অধিকার থাকে না। (৪) কাহারও
অধিকারসম্পন্ন নাগরিক অধিকার হরণ করা হইলে তাহার চুক্তি করার
ব্যক্তি অধিকার থাকে না।

Exercises

1. Describe the different stages of buying and selling of goods.
Give example.

ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা কর ও একটি উদাহরণ দাও।

2. Write notes on : Payment of Price ; Tender ; Quotation ;
Delivery ; Contract ; Discount.

আলোচনা কর : মূল্য পরিশোধ ; টেন্ডার ; দর উল্লেখ ; বিলি ; চুক্তি ; বাট্টা।

3. Who can enter into a contract ?

কে চুক্তি পক্ষভুক্ত হইতে পারে ?

— — —

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম

(Illustration of Business Activities)

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে যোগ-সাধন ঘটায় ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন সম্পর্কিত যে কয়টি স্তর আছে উহা মোটামুটি নিম্নরূপ : (১) উৎপাদক উৎপাদন করে। (২) পাইকার উৎপাদকের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করে ; পাইকার আবশ্যকীয় প্রচারকার্য করিয়া দ্রব্যের অস্তিত্ব খুচরা ব্যবসায়ী ও সম্ভোগকারীর গোচরে আনয়ন করে। (৩) খুচরা ব্যবসায়ী প্রচারকার্যের ফলে পাইকারের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে এবং সেই দ্রব্য ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। (৪) পাইকারের প্রচারকার্যের ফলে অনেক সময়ে ভোগকারী ও খুচরা ক্রেতা সরাসরি দ্রব্য সম্বন্ধে অল্পসন্ধান করিয়া থাকে ; খুচরা ব্যবসায়ী অথবা ভোগকারীর ক্রয়-বিক্রয়ের অল্পসন্ধানের পর পাইকার অথবা উৎপাদক অল্পসন্ধানের উত্তর দিয়া থাকে। অল্পসন্ধানের উত্তরের পর আসে দ্রব্যের অর্ডার অর্থাৎ সরবরাহ করিবার নির্দেশ পত্র। সরবরাহ করিবার নির্দেশ পত্র পাওয়ার পর পাইকার নির্দেশ অনুযায়ী দ্রব্য প্রেরণ করিয়া থাকে। কিভাবে দ্রব্য প্রেরণ করা হইবে তাহাও ক্রেতার নির্দেশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। দ্রব্য সরবরাহের পর মূল্য পরিশোধ। মূল্য পরিশোধ কিভাবে হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া থাকে বিক্রেতা। বিক্রেতার নির্দেশমত মূল্য পরিশোধ হইলে পর বিক্রেতা মূল্যের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকে। প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যম রসিদ। স্মরণ্যঃ দ্রব্যের অল্পসন্ধানের আরম্ভ হয় লেনদেনের সূচনা ; আর লেনদেনের সমাপ্তি হয় রসিদ প্রাপ্তির পর।

যে-স্তর কিংবা পর্ষায়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল প্রত্যেকটি পর্ষায়েই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি যখন খুবই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এক একটি অঞ্চল যতদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল ততদিন চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের আবশ্যকতা তত বেশী অনুভূত হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি এমন বিস্তৃত হইয়াছে এবং

ব্যবসায়-বাণিজ্য এমন জটিল হইয়াছে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ১। অল্পসন্ধান বর্তমানে চিঠিপত্রের বা নথিপত্রের প্রয়োজন খুবই অধিক। যতদিন ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পরিচিত ছিল ততদিন ব্যবসায়ের লেনদেনের জ্ঞান কোন লিখিত চুক্তি বা নথিপত্রাদির প্রয়োজন হইত না। মৌখিক প্রতিশ্রুতির পরিবর্তেই ব্যবসায়ের লেনদেন চলিত। কিন্তু বর্তমানে লেনদেনে নানাপ্রকার

জটিলতা দেখা দিয়াছে। মৌখিক-সর্বের উপর নির্ভর করিয়া আর কোন লেনদেন চলে না। তাই প্রয়োজন হয় নানাবিধ নথিপত্রের।

অনুসন্ধান পত্র (Letter of Enquiry) : একটি উদাহরণের সাহায্যে উপরের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মনে কর, কোনও ব্যক্তি সংবাদপত্রে কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে উৎসুক হইল। এখন প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি দ্রব্য ভোগ করিবে কি না তাহা দ্রব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, মূল্য, কবে পর্যন্ত দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত স্থির করা কঠিন। সুতরাং সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রথমেই বিজ্ঞাপনদাতার নিকট পত্র লিখিয়া দ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। সে যে-পত্র লিখিবে উহাকে অনুসন্ধান পত্র (Letter of Enquiry) বলে।

অনুসন্ধান পত্রের নমুনা

Specimen of a Letter of Enquiry)

মনে করা যাউক যে কলিকাতার একজন পশম দ্রব্য ব্যবসায়ী কাশ্মীরের একজন পশম দ্রব্য ব্যবসায়ীর নিকট পশম দ্রব্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন।

ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্

বিখ্যাত পশম দ্রব্য বিক্রেতা

স্থাপিত ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

টেলিগ্রাম : এবলুন, কলিকাতা

টেলিফোন : ২৩-৫২৭০

১৫নং সূর্য সেন ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

তাৰিখ ১৯/১০/৬০

(পত্রের উত্তরে সূচকসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।)

সূচকসংখ্যা এন/৩১০/কে/৬০

কাশ্মীর উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

দিল্লী গেট, কাশ্মীর, ভারতবর্ষ

বিষয় : পশম দ্রব্য সম্পর্কে অনুসন্ধান

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীতের প্রারম্ভে আমরা নানারকম পশম দ্রব্য মজুত করিতে চাই।
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমরা জানিতে পারিলাম, আপনারা
নানাপ্রকার পশম দ্রব্য মজুত করিয়াছেন।

যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্ভব আমাদের অবহিত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব :

- (১) বিবিধ পশম দ্রব্যের একখানি মূল্য তালিকা পাঠাইবেন।
- (২) সম্ভব হইলে উৎকৃষ্ট, মাঝারি ও সাধারণ পশম বস্ত্রের কিছু নমুনা পাঠাইবেন।
- (৩) মালের অর্ডার দেওয়ার পর কতদিনের মধ্যে মাল সরবরাহ করা সম্ভব।
- (৪) মাল রেল যোগে পাঠাইবেন কি না।
- (৫) মালের মূল্য কিভাবে পরিশোধ করিতে হইবে। ইত্য—

নিবেদক

রজনীকান্ত তরফদার

অংশীদার

ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস

দ্বিতীয় স্তর

অনুসন্ধান পত্রের উত্তর (Reply to the Letter of Enquiry) :

অনুসন্ধান পত্র প্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবসায়ীকে উত্তর দিতে হইবে। যে-সমুদয় বিষয়ে অনুসন্ধানকারী অবহিত হইতে চাহিয়াছেন, তদতিরিক্তও কোন তথ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিলে উত্তরদাতা সেই তথ্য ২। অনুসন্ধান উত্তর উল্লেখ করিবেন। অনুসন্ধান পত্রের উত্তর এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে অনুসন্ধানকারী কোনরূপ অসন্তুষ্ট না হন। ব্যবসায়ের সাফল্য মুখ্যত ভোগকারীর সন্তুষ্টিবিধানের উপরই নির্ভর করে। ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরসের অনুসন্ধান পত্রের উত্তরের নমুনা দেওয়া হইল।

কাশ্মীর উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পাইকারী পশম দ্রব্য ব্যবসায়ী

গ্রাম : উল, কাশ্মীর

ফোন : কাশ্মীর ১৫৭

সূচকসংখ্যা : এন/আর/১০৭৮/৬০

ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্

১৫নং স্বর্ধ সেন ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

দিল্লী গেট

কাশ্মীর

ভারতবর্ষ

তারিখ ২৫/১০/৬০

সূচকসংখ্যা—আপনাদের অনুসন্ধান

পত্র নং এন/৩১০/কে/৬০

তারিখ ১৯/১০/৬০

বিষয়—পশম দ্রব্য সম্পর্কে তথ্যাদি জ্ঞাপন

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের উপরে লিখিত অনুসন্ধান পত্রের উত্তরে আনন্দের সহিত জানাইতেছি—

(১) আমাদের ব্যবসায়ের রীতি অনুযায়ী আমরা একমাত্র পাইকারী বিক্রয় করিয়া থাকি। পাইকারী বিক্রয় দরের তালিকা এই সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলাম।

(২) মালের অর্ডার পাওয়ার পর ১০ দিনের মধ্যে আমরা মাল চালান করিয়া থাকি।

(৩) ক্রেতার বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকিলেও ভিতরে কাগজ ও উপরে চটের মোড়ক করিয়া রেল যোগেই মাল পাঠানো হয়।

(৬) মালের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ অগ্রিম দেয়, বাকী অংশ ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধনীয়; তবে সম্পূর্ণ মূল্য নগদ পরিশোধ করিলে শতকরা ৫ টাকা নগদান বাট্টা দেওয়া হয়। মূল্য সব সময় রেখাঙ্কিত চেকে (Crossed Cheque) দেয়।

(৫) আমাদের নিজেদের মিলে প্রস্তুত সর্বোৎকৃষ্ট সার্জ 'কাপড়ের এবং অত্যন্ত মাঝারি ও সাধারণ পশম দ্রব্যের ছাঁট নমুনা পৃথক মোড়কে পাঠানো হইল।

আপনাদের নিকট হইতে সত্তর মালের অর্ডার পাইলে বিশেষ বাধিত হই। ইতি—

নিবেদক

আর, পি, বেগ

ম্যানেজার

কাশ্মীর উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

যুক্ত—১ প্রস্তু মূল্য তালিকা।

মালের অর্ডার : ভূমীয় স্তর

এবারে অনুসন্ধানকারী (ইষ্ট বেঙ্গল উলেন-স্টোরস্) মূল্য তালিকা ও পশম বস্ত্রের নমুনা দেখিয়া যে-যে দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক সেই সেই দ্রব্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পুনরায় পত্র দিবে। উহাই মালের অর্ডার (সরবরাহের নির্দেশ পত্র)।

ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্

বিখ্যাত পশম দ্রব্য বিক্রেতা

(স্থাপিত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। অর্ডার

টেলিগ্রাম : এবলুন, কলিকাতা

১৫ নং সূর্য সেন ষ্ট্রীট

টেলিফোন : ২২-৫২৭০

কলিকাতা-১২

সূচকসংখ্যা : আর/৭/কে/৬০

(পত্রের উত্তরে সূচকসংখ্যা উল্লেখ করিবেন ।)

কাম্মীর, উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

দিল্লী গেট

বিষয় : পশম দ্রব্যের অর্ডার

কাম্মীর, ভারতবর্ষ

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২৫।১০।৬০ তারিখে প্রেরিত পশম বস্ত্রের নমুনা ও মূল্য তালিকা পাইয়া প্রীত হইলাম।

নিম্নলিখিত পশম দ্রব্য অতি সহর রেলযোগে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। যাহাতে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে মাল হাওড়া রেল গুদামে পৌছায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাল চালান করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আপনাদের ২৫।১০।৬০ তারিখের এন/আর/১০৭৮/৬০ নং চিঠির ৪নং সর্তাহুযায়ী মালের মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ছই হাজার টাকা মূল্যের ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, ষ্ট্রীট রোড অফিসে দেয় ^{OB}ST 300751 নং রেখাক্রিত

চেক (Crossed Cheque) এই সঙ্গে পাঠাইলাম। চেকের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

অনুগ্রহপূর্বক মাল কাঠের পেটিতে প্যাকিং করিয়া পাঠাইবেন।

মালের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য	মোট
১নং কাম্মীর শাল ৬ হাত	সাদা ১০ জোড়া প্রতিখানা	১০০৮	২০০০৮
	বাদামী ১৫ „ „	৭৫৮	২২৫০৮
	থয়ের ১০ „ „	৭৫৮	১৫০০৮
লেডিস স্কার্ফ	সাদা ৫ „ „	৫০৮	৫০০৮
	কালো ৫ „ „	৬০৮	৬০০৮
	লাল ৫ „ „	৬০৮	৬০০৮
সোয়েটার গলাবন্ধ	সাদা ১০টি প্রতিটি	২০৮	২০০৮
	আকাশী ১০টি „	১৪৮	১৪০৮
	বাদামী ১৫টি „	১৪৮	২১০৮
			৮০০০৮

মাল প্রাপ্তির পর মোট মূল্য বাবদ বাকী দেয় টাকা। ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, ষ্টাণ্ড রোড শাখার উপর রেখাক্রিত চেকে পরিশোধ করা হইবে। ইতি—

নিবেদক

রজনীকান্ত তরফদার

অংশীদার

ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্

মাল পাঠাইবার অর্ডার দেওয়া হইলে লেনদেনের চুক্তি সম্পাদিত হইল। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই চুক্তির সর্তামুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য। কোনও পক্ষ চুক্তির সর্তামুযায়ী কার্য না করিলে অপর পক্ষের চুক্তি পরিহার করার অধিকার থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ে নগদান অর্থের পরিবর্তে লেনদেন হইলে এইরূপ অর্ডারের প্রয়োজন হয় না।

অর্ডার পূরণ : মালের অর্ডার প্রাপ্তির পর ব্যবসায়ীর কর্তব্য যথাসম্ভব সমস্ত অর্ডারের সর্তামুযায়ী মাল সরবরাহ করা। মাল পাঠাইবার পূর্বে ব্যবসায়ীর খুব ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, যে-মাল পাঠানো হইতেছে উহাতে কোনও ত্রুটি আছে কি না। মালে কোনরূপ ত্রুটি থাকিলে সেইরূপ মাল না পাঠানোই সংগত। কারণ তাহাতে ব্যবসায়ীর সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়।

৪। **অর্ডার পূরণ** যদি কোনও কারণে ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্ডার অমুযায়ী মাল পাঠানো সম্ভব না হয় তাহা হইলে পত্র লিখিয়া তৎক্ষণাৎ অর্ডার দাতাকে জানান প্রয়োজন এবং যদি অর্ডারের মালের বিকল্প কোন দ্রব্য থাকে তবে তাহাতে অর্ডার দাতার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি না তাহা জানিতে চাওয়া প্রয়োজন।

মাল পাঠাইবার পূর্বে পুনরায় অর্ডার পত্রে কোন বিশেষ সর্তের উল্লেখ আছে কি না তাহাও ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত। উপরের উদাহরণে ক্রেতা ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্ কাঠের পেটিতে মাল পাঠাইতে নির্দেশ দিয়াছিল। সুতরাং যদিও বিক্রেতা অশু সকল ক্ষেত্রে কাগজ ও চটের মোড়কে মাল পাঠাইয়া থাকে, তথাপি এক্ষেত্রে কাগজ ও চটের থলির পরিবর্তে কাগজে মোড়ক করিয়া কাঠের পেটিতেই পাঠাইতে বাধ্য। কারণ উহাই ক্রেতার অভিপ্রায়। কাঠের পেটিতে মাল পূরণ করিয়া খুব সুন্দররূপে কাঠের পেটিটি আটকাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে পেটির ভিতরের মালের কোন ক্ষতি না হয় এবং কেহ সহজে পেটি ভাঙিয়া মাল অপহরণ করিতে না পারে। ইহার পর একখানা বড় কাগজে খুব পরিষ্কারভাবে একদিকে প্রাপকের নাম ঠিকানা এবং অশুদ্ধিকে প্রেরকের নাম ঠিকানা লিখিয়া সেই কাগজখানা পেটির উপর আঁটিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কাগজখানা এমনভাবে আঁটি প্রয়োজন যে কোনরূপে উহা উঠিয়া না যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই কাগজ

ব্যতীতও পেটির অপর দিকে 'কালি' দিয়া মোট হরফে প্রাপকের ও প্রেরকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সতর্কতা, অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ কাগজখানা কোনও কারণে ছিঁড়িয়া গেলেও কাঠের পেটির গায়ে কালিতে প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখিত থাকায় মাল সরবরাহ দিতে অসুবিধা হয় না।

মাল পাঠাইবার সময়ে যে মাল পাঠান হয় তাহার একটি বিশদ বিবরণ ক্রেতাকে পাঠাইতে হয়। ইহাতে মালের নিজস্ব পরিচয়, নম্বর, মালের পরিমাণ, মূল্য, কোনও প্রকার ব্যবসায়িক বাট্টা ইত্যাদি থাকিলে তাহার অর্ডার পুরণে উল্লেখ থাকে। এই বিবরণ পত্রকে বলা হয় **চালান পত্র (Invoice)**। ক্রেতা চালান পত্র পাইলে চালানে লিখিত মালের সহিত প্রেরিত মাল মিলাইয়া লইতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতা যে-মাল সরবরাহ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য থাকে চালান পত্রে (Invoice)।

মাল পাঠাইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে পত্র দিয়া জানাইয়া দেয় যে অর্ডার অনুযায়ী মাল পাঠান হইলো। ঐ পত্রকে অর্ডার পূরণ বা সম্পাদন পত্র বলা যায়। অর্ডার পূরণ বা সম্পাদন পত্রের সহিত চালান যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

কাশ্মীর উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পাইকারী পশম দ্রব্য ব্যবসায়ী

গ্রাম : উল, কাশ্মীর

দিল্লী

ফোন : কাশ্মীর ১৫৭

কাশ্মীর, ভারতবর্ষ

সূচকসংখ্যা : আর/১০৭/ক/৬০ তারিখ ১০।১১।৩০

বিষয় : পশম দ্রব্য সরবরাহ

সূচকসংখ্যা :

আপনাদের পত্র নং আর/৭/কে/৬০

তারিখ ৩০।১০।৬০

সাবিনয় নিবেদন,

আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী অল্প তারিখে সংশ্লিষ্ট চালানে লিখিত পশম দ্রব্য রেলযোগে পাঠানো হইল। এই সঙ্গে রেলওয়ে রসিদ নং KR573591-ও পাঠানো হইল। ইতি—

যুক্ত : (১) চালান নং ১৫০ তারিখ ১০।১১।৬০

নিবেদক

আর. পি. বেগ

(২) রেলওয়ে রসিদ নং KR 573591

ম্যানেজার

কাশ্মীর উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

চালান পত্র

কাশ্মীর উলেন গুডস্ সিণ্ডিকেট

উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ পাইকারী পশম দ্রব্য ব্যবসায়ী

চালান নং ১৫০

দিল্লী গেট

কাশ্মীর, ভারতবর্ষ

তারিখ ১০/১১/৬০

ক্রেতা—ইষ্ট বেঙ্গল উলেন ষ্টোরস্

১৫নং সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(শতকরা ৩ টাকা ১ মাস)

ক্র.সং.	দ্রব্যের বিবরণ	পরিমাণ সংখ্যা	দর প্রতি সংখ্যা	মোট মূল্য
১	১নং কাশ্মীর শাল ৬ হাত সাদা	১০ জোড়	১০০৮	২০০০৮
২	” ” ” ” বাদামী	১৫ ”	৭৫৮	২২৫০৮
৩	” ” ” ” থয়ের	১০ ”	৭৫৮	১৫০০৮
৪	লেডিস স্কার্ফ ” ” সাদা	৫ ”	৫০৮	৫০০৮
৫	” ” ” ” কালো	৫ ”	৬০৮	৬০০৮
৬	” ” ” ” লাল	৫ ”	৬০৮	৬০০৮
৭	সোয়েটার গলাবন্ধ সাদা	১০ টি	২০৮	২০০৮
৮	” ” ” ” আকাশী	১০ টি	১৪৮	১৪০৮
৯	” ” ” ” বাদামী	১৫ টি	১৪৮	২১০৮
				৮০০০৮

রেলযোগে প্রেরিত

বাদ : ব্যবসায়িক বাট্টা ২৫% ২০০৮

৭৮০০৮

ভুলচুক বাদে (E. & O. E.)

আর. পি. বেগ

ম্যানেজার

ক্রেতা উপরি লিখিত পত্র ও চালান পাইলে মাল খালাস করিবার ব্যবস্থা করিবে। মাল খালাস করিবার জন্য বিক্রেতা রেলযোগে মাল পাঠাইলে রেল কোম্পানী হইতে যে-রসিদ পাইয়া থাকে উহা ক্রেতাকে পাঠাইয়া দেয়। ঐ রসিদ রেল কোম্পানীর অফিসে দেখাইলে ক্রেতা মাল খালাস করিতে পারে।

মাল খালাস করিয়া ক্রেতা চালানে লিখিত দ্রব্যের সহিত প্রেরিত দ্রব্য মিলাইয়া লইবে। যদি কোনরূপ ভুলচুক ধরা পড়ে তাহা হইলে ক্রেতার কর্তব্য তৎক্ষণাৎ চালান পত্রের বিক্রেতাকে ভুলচুক সম্বন্ধে অবহিত করা। চালানে লিখিত কয়েকটি বিশেষ কথা তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাহায্যে মাল চালানের নীচে ভুলচুক বাদ (E. & O. E. অর্থাৎ, Errors and Omissions excepted) কথাটির অর্থ এই যে যদি ভবিষ্যতে খালাস করা হয় কোনও সময়ে এই বিশেষ লেনদেনটি সম্পর্কে কোনও ভুল বা ছুট ধরা পড়ে তাহা হইলে বিক্রেতার উহা সংশোধন করার অধিকার থাকে। চালানের নীচে ২৫% ব্যবসায়িক বাট্টা লেখা আছে এবং মূল্য নিরূপণে মোট মূল্য হইতে শতকরা ২৫ ভাগ বাদ দেওয়া হইয়াছে। আবার চালানের উপরিভাগে লিখিত আছে শতকরা ৩ টাকা ১ মাস। এই কথাটির তাৎপর্য এই যে যদি মালের মূল্য বারদ পাওনা ৭৮০০ টাকা সম্পূর্ণ এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে ব্যবসায়িক বাট্টা ব্যতীতও শতকরা ৩ টাকা হাবে নগদান বাট্টা দেওয়া হইবে। ইহাতে ক্রেতা সত্তর মূল্য পরিশোধি করার প্রেরণা পাইয়া থাকে।

লেনদেনে ভুলত্রুটি সংশোধন (Correction of Errors in Transactions) : হিসাব রক্ষণে ও হিসাব লিখিতে ভুলচুক সর্বদাই হইতে পারে। কিন্তু যখনই কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই উহার সংশোধন প্রয়োজন। ভুলত্রুটি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা না হইলে ভবিষ্যতে ক্রেতা-বিক্রেতার লেনদেনে ভুলচুক ছাড়া কোনও বিশেষ দিনে ভুলক্রমে ক্রেতার নামে গণে কর ৫০ টাকা পাওনা অধিক দেখানো হইল স্ততরাং সেই তারিখে বৎসরের উদ্ভূত পত্র হইতে ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থা বুঝা যায় না। কারণ পাওনাদারদের নিকট ৫০ টাকা পাওনা অধিক দেখানোর ফল ব্যবসায়ের ৫০ টাকা সম্পদ বেশী দেখানো।

চালানের শেষে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে বিক্রেতা ভুলচুক বাদে (Errors and Omissions excepted) এই কথাটি লিখিয়া রাখে। ইহা লেখা থাকার ফলে যে-কোনও সময় চালানে লিখিত লেনদেন সম্বন্ধে কোন ভুলত্রুটি বাহিব হইলে বিক্রেতার সে-ভুল সংশোধন করার অধিকার থাকে ইহাই প্রকাশ পায়। যে-যে কারণে হিসাব সংশোধনের প্রয়োজন হয় তাহা নিয়ে আলোচনা করা হইল। মোটামুটি ভুলত্রুটির উদ্ভব দুই স্থানে হইতে পারে। প্রথমত—মূল্য বিষয়ক ; দ্বিতীয়ত—দ্রব্য বিষয়ক।

মূল্য বিষয়ক ভুল—চালানে প্রকৃত মূল্য হইতে ভুলক্রমে অধিক বা কম মূল্য লিখিত হইলে ভুল সংশোধনের প্রয়োজন হয়। মালের মূল্য লিখিতে অথবা একাধিক দ্রব্য বিক্রয় হইলে দ্রব্যসমূহের মূল্যের যোগফলেও ভুল হইতে পারে।

দ্রব্য বিষয়ক ভুল—ক্রেতা যে-পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের নির্দেশ দেয় তাহা হইতে অধিক অথবা কম সরবরাহ করা হইলে যে-পরিমাণ দ্রব্য কম বা বেশী সরবরাহ করা হয় তাহার মূল্য সংশোধন করা প্রয়োজন। অনেক সময় ক্রেতার নির্দেশমত সঠিক পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হইল কিন্তু দেখা গেল উহার মধ্যে কিছু দ্রব্যও গলদ রহিয়াছে। ক্রেতা যখন সেই দ্রব্য ফেরত পাঠাইয়া দেয় তখনও প্রয়োজন হয় হিসাব সংশোধনের।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে চালানে লিখিত মূল্য নিতুলভাবে লেখা না হইলে, ক্রেতার নির্দেশমত সঠিক পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ না হইলে অথবা গলদপূর্ণ দ্রব্য সরবরাহ করা হইলে হিসাব সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

হিসাবে ভুলচুক সংশোধনের উপায় (Method of Correcting Accounts) : কোনও লেনদেনের ভুল সংশোধন করিতে হইলে সেই লেনদেনে সংশ্লিষ্ট পক্ষের হিসাবে সংশোধন করিতে হয়। লেনদেনের ফল দুইটি। লেনদেনের ফলে কোনও হিসাব দেনাদার সাব্যস্ত হইতে পারে ; কোনও হিসাব পাওনাদার সাব্যস্ত হইতে পারে। প্রত্যেক লেনদেনেরই এই দুইটি ভাগ লেনদেনের ভুলচুক দেনা ও পাওনা। মনে কর, শ্রামাচরণের নিকট ঋণে ৫০০ টাকা সংশোধনের উপায় মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করা হইল। এই লেনদেনে শ্রামাচরণ

আর যে-ব্যবসায়ী বিক্রয় করিয়াছে সেই ব্যবসায়ী ‘বিক্রয় বাবদে’ পাওনাদার। ধরা যাউক, এই লেনদেনটিই যখন চূড়ান্ত পর্যায় আসিয়াছে, অর্থাৎ চালান যোগে দ্রব্য শ্রামাচরণের নিকট পাঠানো হয় তখন চালানে ৫০০ টাকার স্থলে ৫৫০ টাকা লেখা হইয়াছে। ফলে চালান দৃষ্টে বিক্রেতা শ্রামাচরণকে ৫৫০ টাকা দেনা ও বিক্রয় বাবদে ৫৫০ টাকা পাওনা লিখিয়াছে। যখন চালানে লিখিত ৫০ টাকা অধিক (৫০০ টাকার স্থলে ৫৫০ টাকা) বিক্রয় অথবা শ্রামাচরণের অধিক দেনা ধরা পড়িল তখনই শ্রামাচরণের দেনা কমাইয়া ৫৫০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা লেখা এবং বিক্রয় খাতেও ৫৫০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা লেখা প্রয়োজন। তাহা হইলে এই ভুলটি সংশোধন করার জন্য শ্রামাচরণের হিসাবে বিক্রেতা যদি ৫০ টাকা পাওনা দেখাইয়া দেয় আর বিক্রয় খাতে যদি ৫০ টাকা দেনা দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে উভয় হিসাবই প্রকৃত মূল্যের লেনদেনে নেওয়া হয়। এখানে ধরা হইয়াছে যে বিক্রেতাই ভুল ধরিতে পারিয়াছে এবং ভুল সংশোধন করিয়াছে।

এক্ষেত্রে ভুল সংশোধনকালে বিক্রেতা ক্রেতাকে (শ্রামাচরণকে) জানাইয়া দিবে যে তাহার হিসাবে ভুলক্রমে যে ৫০ টাকা অধিক দেনা লেখা হইয়াছিল তাহা সংশোধন করিবার জন্য হিসাবে ৫০ টাকা পাওনা লেখা হইল (৫৫০ টাকা দেনা হইতে ৫০ টাকা পাওনা বাদ দিলে ৫০০ টাকা প্রকৃত দেনা)। কিন্তু এই ভুলটি

যদি ক্রেতা (শ্রামাচরণ) ধরিয়া থাকে তাহা হইলে শ্রামাচরণ বিক্রেতার হিসাবে ৫০ টাকা দেনা লিখিবে। কারণ লেনদেনের দুইটি অংশ—দেনা ও পাওনা। এই লেনদেনটির জ্ঞান যখন ক্রেতার (শ্রামাচরণ) হিসাবে দেনা, তখন বিক্রেতার হিসাবে পাওনা। একই উপায়ে যদি গলদপূর্ণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয় অথবা নির্দেশপত্রে লিখিত দ্রব্যের পরিমাণের অধিক অথবা কম দ্রব্য সরবরাহ করা হয় তাহা হইলেও ক্রেতা-বিক্রেতার হিসাব সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সংশোধনের ফলে একটি হিসাব দেনা হয় অপর কোনও হিসাব পাওনা হয়। সুতরাং যখন ভুল সংশোধন করা হয় তখন একপক্ষ অপরপক্ষকে কিভাবে ভুল সংশোধন করা হইল তাহা লিখিয়া জানাইয়া থাকে।

উপরি-লিখিত উদাহরণটির সাহায্যে ভুল সংশোধন বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। (শ্রামাচরণ ক্রেতা, হরিচরণ বিক্রেতা। একটি লেনদেনে শ্রামাচরণ হরিচরণের নিকট হইতে ৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করিল। কিন্তু হরিচরণ ভুলক্রমে চালানে ৫০০ টাকার স্থলে ৫৫০ টাকা লিখিয়া চালান পত্র শ্রামাচরণের নিকট পাঠাইয়া দিল। চালান পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে হরিচরণ, শ্রামাচরণকে ৫৫০ টাকা দেনা লিখিয়া, বিক্রয় খাতে ৫৫০ টাকা পাওনা লিখিল। কিন্তু পরে, হরিচরণের নিকট এই ভুলটি ধরা পড়িল। যখন ভুলটি ধরা পড়িল তখন সঙ্গে সঙ্গেই শ্রামাচরণের হিসাবে ৫০ টাকা পাওনা এবং বিক্রয় খাতে ৫০ টাকা দেনা লিখিয়া ভুলটি সংশোধন করিয়াই শ্রামাচরণকে ভুল সংশোধন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিবে। এক্ষেত্রে যে-পত্রের মাধ্যমে ভুল সংশোধন হইয়াছে বলিয়া জানানো হয় উহাকে **পাওনা লিপি (Credit Note)** অথবা **পাওনা চিঠা** বলা হয়। পাওনা লিপি অথবা পাওনা চিঠার একখানি প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্স

প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী

৪৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা-১

শ্রামাচরণ এণ্ড সন্স লিঃ

তারিখ ১০/১১/৬০

১৫নং নাকতলা লেন

পাওনা লিপি

নং ৫০

কলিকাতা-৪০

(Credit Note)

বরাবর

১১/১১/৬০ তারিখের ১৫নং চালান দ্রষ্টব্য। উহাতে ভুলক্রমে যে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা অধিক পাওনা দেখানো হইয়াছে তাহা অতঃপর 'বিক্রয় বাবদে

ভুল' লিখিয়া আপনাদের হিসাবে ৫০ টাকা পাওনা দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করা হইল।

হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্স

পক্ষে

হরিচরণ কুণ্ডু (অংশীদার)

ঠিক এই উপায়ে যদি চালানে মূল্য কম লেখা হয় তাহা হইলেও উহা সংশোধন করা হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে যে-পত্রের মাধ্যমে ভুল সংশোধন করা হইবে উহাকে **দেনালিপি** অথবা **দেনা চিঠা (Debit Note)** বলা হইবে। মনে কর, ৫০০ টাকার স্থলে চালানে ৪৫০ টাকা লেখা হইয়াছিল। এক্ষেত্রে যখন সেই ভুলটি ধরা পড়িল তখন শ্রামাচরণের হিসাবে ৫০ টাকা দেনা এবং বিক্রয় খাতে ৫০ টাকা পাওনা লিখিয়া হিসাব সংশোধন করা হইবে। এক্ষেত্রে যে **দেনা লিপি** অথবা **দেনা চিঠা** দেওয়া হইবে তাহা নিম্নরূপ :

হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্স

প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী

৪৩নং নেতাজী স্তম্ভ রোড

কলিকাতা-১

তারিখ ১০।১১।৭

শ্রামাচরণ এণ্ড সন্স লিঃ

১৫নং নাকতলা লেন

কলিকাতা-৪০

নং ২৫

বরাবর—

দেনা লিপি

(Debit Note)

১।১১।৬০ তারিখের ১৫নং চালানে বিক্রয় বাবদে ভুলক্রমে আপনাদের হিসাবে ৫০০ টাকার স্থলে ৪৫০ টাকা পাওনা দেখানো হইয়াছে। অতঃ ৫০ টাকা দেনা দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করা হইল।

হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্স

পক্ষে

হরিচরণ কুণ্ডু (অংশীদার)

কিন্তু এই ভুল যখন ক্রেতার নিকট প্রথম ধরা পড়ে তখন ক্রেতা বিক্রেতার হিসাবে অনুরূপভাবে দেনা অথবা পাওনা দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করিয়া থাকে।

শ্রামাচরণ এণ্ড সন্স লিঃ যখন দেখিল যে চালানে ৫০০ টাকা স্থলে ৫৫০ টাকা লেখা হইয়াছে, তখন প্রথমে ক্রয় বাবদে ৫৫০ টাকা দেনা ও হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্স হিসাবে ৫৫০ টাকা পাওনা লিখিবে; পরমুহূর্তেই হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্সের হিসাবে ৫০ টাকা দেনা দেখাইয়া ক্রয় বাবদে ৫০ টাকা পাওনা দেখাইয়া হিসাব সংশোধন করিবে। অর্থাৎ, শ্রামাচরণ এণ্ড সন্স লিঃ হরিচরণ এণ্ড ব্রাদার্সকে ৫০ টাকার জন্ত একখানি দেনা চিঠি অথবা দেনা লিপি পাঠাইবে। কিন্তু যদি ৫০০ টাকা স্থলে চালানে ৪৫০ টাকা লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে ৫০ টাকার জন্ত একখানা পাওনা লিপি অথবা পাওনা চিঠি পাঠাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে-ভুলের জন্ত বিক্রেতা ক্রেতাকে দেনা লিপি পাঠায় সেই ভুলের জন্ত ক্রেতা বিক্রেতাকে পাওনা লিপি পাঠায়। ইহার বিপরীত অবস্থা হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে পাওনা লিপি পাঠায়। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে দেনা লিপি পাঠাইয়া থাকে।

চালানে লিখিত দ্রব্যের পরিমাণ হইতে প্রকৃতপক্ষে কম বা বেশী সরবরাহ করা হইলেও অনুরূপভাবে পাওনা লিপি অথবা দেনা লিপির মাধ্যমে ভুল সংশোধন করা হয়।

আবার ক্রেতার নির্দেশমত পণ্য সরবরাহ হইলেও পণ্যের কোন অংশ খারাপ অথবা গলদপূর্ণ হইলে এই উপায়ে হিসাব সংশোধন করা হয়।

দেনা লিপির (Debit Note) ও পাওনা লিপির (Credit Note)

ব্যবহারঃ দেনা লিপি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই ব্যবহার করিতে পারে।

বিক্রেতা সাধারণত ক্রেতার নিকট প্রাপ্য অর্থ দাবি করিয়া দেনা বাড়াইতে

যে-হিসাব দাখিল করে তাহাতে প্রকৃত পাওনা হইতে কম

দেনালিপি পাওনা দেখাইলে ক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইয়া

থাকে। যেমন বিক্রেতা যে-মাল সরবরাহ করিয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য ৫৫০

টাকা। কিন্তু চালানে ভুলক্রমে ৫৫০ টাকা স্থলে ৫০০ টাকা লেখা হইয়াছে। যখন

বিক্রেতার নিকট এই ভুলটি ধরা পড়িবে তখন বিক্রেতা ক্রেতার হিসাবে ৫০ টাকা

দেনাভুক্তি করিয়া ক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে।

আবার ইহার বিপরীত অবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইয়া

থাকে। যেনে কর, চালানে দ্রব্যের মূল্য ৫০০ টাকা স্থলে ভুলক্রমে ৫৫০ টাকা

লেখা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ভুল

পাওনা কমানিতে সংশোধনের জন্ত ৫০ টাকা মূল্যের দেনা লিপি পাঠাইবে।

দেনা লিপি ইহা ছাড়াও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে—

যদি চালানে লিখিত মালের মধ্যে কোন অংশ গলদপূর্ণ হয় এবং সেই গলদপূর্ণ

মাল ফেরত দেওয়া হয়। উহার মূল্য ক্রেতার হিসাবে দেনাভুক্তি করিয়া দেনা লিপি পাঠাইবে।

স্বতবাং দেখা যাইতেছে যে বিক্রেতা মালের প্রকৃত মূল্য হইতে কম মূল্য দাবি করিয়া থাকিলে যে-পরিমাণ কম মূল্য দাবি করা হইয়াছে সেই মূল্যের জন্ত ক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইয়া থাকে। আর ক্রেতা বিক্রেতাকে দেনা লিপি পাঠাইয়া থাকে যদি বিক্রেতা প্রকৃত মূল্য হইতে অধিক মূল্য দাবি করিয়া থাকে, অথবা যখন ক্রেতা কোনও দ্রব্য বিক্রেতাব নিকট ফেরত পাঠাইয়া দেয়।

পাওনা লিপিও দেনা লিপির মত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। দেনা ও পাওনা লেনদেনের দুইটি ভাগ। যাহা বিক্রেতার পাওনা উহাই ক্রেতার দেনা, আর যাহা ক্রেতার পাওনা উহাই বিক্রেতার দেনা। তাহা হইলে ক্রেতা যখন বিক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে তখন বিক্রেতা ক্রেতাব নিকট পাওনা লিপি পাঠাইবে। স্বতরাং চালানে প্রকৃত মূল্য হইতে ভুলক্রমে অতিরিক্ত মূল্য দেখানো হইলে উহা সংশোধনের জন্ত বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পাওনা লিপি পাঠাইবে। আর ক্রেতা যখন কোনও গলদপূর্ণ মাল ফেরত পাঠাইবার জন্ত বিক্রেতার নিকট দেনা লিপি পাঠাইবে তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে পাঠাইবে পাওনা লিপি।

হিসাব বিবরণী (Statement of Accounts) : লেনদেন নগদান (cash) ও ঋণ (credit) উভয়ের উপরই ভিত্তি করিয়া হইয়া থাকে। লেনদেন যখন নগদ অর্থের পরিবর্তে হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও অপর পক্ষের হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লেনদেন যখন ধারে হয় তখন ক্রেতার প্রয়োজন বিক্রেতার হিসাব রাখা আর বিক্রেতার প্রয়োজন ক্রেতার হিসাব রাখা।

ক্রেতা বিক্রেতার হিসাব না রাখিলে বিক্রেতা তাহার নিকট কত হিসাব বিবরণী টাকা পাইবে তাহা বুঝিতে পারিবে না, তেমনি বিক্রেতা ক্রেতার হিসাব না রাখিলে ক্রেতার নিকট কত টাকা পাইবে তাহা বুঝিতে পারিবে না। হিসাব কিভাবে রাখা হয় তাহা তোমরা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু জান। তুমি যদি মুদি দোকান হইতে তোমার সংসারের আবশ্যকীয় চাউল ডাইল ধারে ক্রয় কর, তাহা হইলে বিক্রেতা

প্রতিমাসে কোন্ তারিখে কি দ্রব্য, কত মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করা হইল এবং মাসের মধ্যে কোন্ তারিখে তুমি কত টাকা পরিশোধ করিয়াছ তাহা দেখাইয়া প্রতিমাসের শেষে তোমার নিকট কত পাওনা তাহার হিসাব তোমার নিকট পাঠাইবে।

তোমার নামে হিসাব না রাখিলে বিক্রেতা তোমার নিকট কত পাইবে তাহা সে কখনই মনে রাখিতে পারিবে না। তুমিও অল্পরূপভাবে বিক্রেতার

১। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হিসাব রাখিলে বিক্রেতা তোমার নিকট মাসের শেষে কত টাকা পাইবে তাহা
 ২। পাওনার বৃদ্ধিতে পারিবে। মাসের শেষে উভয়ের হিসাব উভয়ে
 তালিকা মিলাইয়া দেখিলেই বৃদ্ধিতে পারিবে কোন ভুলত্রুটি আছে কি

না। তাহা হইলে বৃদ্ধিতে পারিতেছ যে নগদান ক্রয়-বিক্রয়ে
 ক্রেতার ও বিক্রেতার কাহারও ব্যক্তিগত হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু
 ক্রয়-বিক্রয় যদি ধারে হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত হিসাব না রাখিলে চলে না।

উপরের আলোচনা হইতে বৃদ্ধিতে পারিতেছ যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট
 নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণে লেনদেনের এবং ঐ লেনদেনের মধ্যে কত অর্থ
 পরিশোধ করা হয় তাহার একখানি হিসাব ক্রেতার নিকট দাখিল করে। উহাকেই
 বলা হয় হিসাব বিবরণী (Statement of Accounts)।

হিসাব বিবরণীর একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল। মনে কর রাজেন ক্রেতা
 ও ব্রজেন বিক্রেতা। রাজেন মধ্যে মধ্যেই ব্রজেনের নিকট হইতে ধারে দ্রব্য ক্রয়
 করিয়া থাকে। প্রতিমাসের শেষে ব্রজেন রাজেনের নিকট একখানি করিয়া
 হিসাব বিবরণী দাখিল করিয়া থাকে। ব্রজেন রাজেনের নিকট যে হিসাব বিবরণী
 দাখিল করিবে তাহার নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল :

হিসাব বিবরণীর সহিত ক্রেতা বিক্রেতার যে-হিসাব রাখিয়া থাকে
 উহা মিলাইয়া দেখিবে যে বিক্রেতা দেনাপাওনার যে-হিসাব দিয়াছে উহা নির্ভুল
 আছে কি না। যদি কোনও ভুলত্রুটি থাকে তাহা হইলে যাহাতে
 হিসাব বিবরণী সত্ত্বর উহার সংশোধন হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। আন্ত
 পরীক্ষার প্রয়োজন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই হিসাব বিবরণী পাইলেই ক্রেতা
 বৃদ্ধিবে যে বিক্রেতা তাহার পাওনা যাহাতে সত্ত্বর পরিশোধ হয় তাহার জন্তই
 এই হিসাব বিবরণী পাঠাইয়াছে। সুতরাং হিসাব বিবরণী পাওনা অর্থ আদায়ে
 তাগিদ দেওয়ার জন্তও ব্যবহার করা হয়।

বিক্রেতা যেমন দেনাপাওনার জন্ত হিসাব বিবরণী দিয়া থাকে, ব্যাংকসমূহও
 উহাদের মঞ্চলের নিকট এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত হিসাব বিবরণী
 দিয়া থাকে। কি সময়ের ব্যবধানে ব্যাংক উহার মঞ্চলের

ব্যাংকের হিসাব নিকট হিসাব বিবরণী দাখিল করিবে তাহা মঞ্চলের সহিত
 বিবরণী দেওয়ার লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মঞ্চলের সহিত
 পদ্ধতি লেনদেন যদি খুবই প্রচুর হয় তাহা হইলে সপ্তাহ শেষে

হিসাবে বিবরণী পাঠাইয়া থাকে। কারণ, লেনদেন লিপিবদ্ধ করিতে কোন ভুল
 হইয়া থাকিলে যাহাতে মঞ্চল সত্ত্বর উহা সংশোধনের সুযোগ পায় তাহার জন্তই
 সপ্তাহ শেষে হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে হয়। কিন্তু লেনদেনের পরিমাণ
 যদি খুব প্রচুর না হয় তাহা হইলে প্রতিমাসের হিসাব বিবরণী পরবর্তী মাসের মধ্যে
 দাখিল করিয়া থাকে। আবার যদি মঞ্চলের সহিত লেনদেন বৎসরের মধ্যে

তুই একবার মাত্রই হয় তাহা হইলে বাৎসরিক হিসাব বিবরণী পরবর্তী বৎসরের প্রথমে পাঠাইয়া থাকে।

ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ তামাক ব্যবসায়ী

৪২নং নেতাজী সুভাষ রোড, টেলিফোন : ৪৩-৫৪২১

কলিকাতা-১

তারিখ ২/২/৬০

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসের হিসাব বিবরণী (Statement of Accounts for the Month of January, 1960) :

ব্রজেন্দ্রনাথ নিয়োগী ঋণী (Dr.)

বিবরণ (Particulars)	দেনা (Debit)	পাওনা বা শোধ (Credit)	বাকী (Balance)
১৩৬০ জানুয়ারী ১, ১৯৫৯ সালের			
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত	৫০০৮		
,, ,, ৫, ৫ কিলোগ্রাম			
ভার্জিনিয়া তামাক বাবদ	১,০০০৮		
,, ,, ১০, ২ কিলোগ্রাম			
গোল্ডেন লীফ তামাক বাবদ	১০,০০০৮		
,, ,, ২০, ১ কিলোগ্রাম			
নেপানী তামাক বাবদ	১০০৮		
	১১,৬০০৮		
বাদ শতকরা ৫% ব্যবসায়িক বাট্টা	৫৮০৮		
	১১,০২০৮		
বাদ জানুয়ারী ৭, নগদ শোধ		২০০৮	
,, ,, ১৫, ষ্টেট ব্যাংকের উপর চেক			
	১১১৭৫ নং	৮০০০৮	
,, ,, ২৫, ষ্টেট ব্যাংকের উপর চেক			
	১১২৩০ নং	২০০০৮	
		১০,২০০৮	৮২০৮
৩১ শে জানুয়ারী তারিখে দেনা			

মূল্য পরিশোধ (Payments) : হিসাব বিবরণী পাওয়ার পর যত সত্ত্বর সম্ভব ক্রেতার কর্তব্য দেনা পরিশোধ করা। কারণ দেনা সত্ত্বর পরিশোধ করা হইলে ক্রেতার স্বনাম বাড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সত্ত্বর দেনা পরিশোধ করিলে ক্রেতা নগদান বাট্টার সুযোগ পাইয়া থাকে উহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে হিসাব বিবরণী অমুযায়ী হিসাব চূড়ান্ত হয় না। হিসাবেই লেনদেন চলিতে থাকে। যখন যেমন লেনদেন হয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

মূল্য পরিশোধের বিভিন্ন উপায় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে যে নগদান, চেক, হুণ্ডি, পোষ্টাল অর্ডার, মণিঅর্ডার ইহার মধ্যে যে-কোন উপায়েই মূল্য পরিশোধ করা যায়। তবে ব্যবসায় যখন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তখন (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে) মূল্য পরিশোধ বেকার ভাগ ক্ষেত্রেই চেকের মাধ্যমে হইয়া থাকে। ইহা একটি সুবিধা যে চেকের মাধ্যমে দেনা পরিশোধ ব্যাংকের বহিতে লিখিত থাকে। প্রয়োজনমত ব্যাংকের লিখন (Records in Bank Accounts) সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে দাখল করা যায়।

মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে ক্রেতার কর্তব্য হিসাব বিবরণীতে লিখিত সকল দেনা পাওনা নিতুল কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। যদি কোনও ভুল থাকে উহা সংশোধন করাইয়া বিক্রেতার পাওনা শোধ করা হয়। ভুল সংশোধনের জন্ত দেনা লিপি অথবা পাওনা লিপি ব্যবহার করা যায়। উহা পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্বীকার (Acknowledgement) : যখনই কোন অর্থের লেনদেন হয় তখনই প্রাপকের কর্তব্য অর্থপ্রাপ্তি স্বীকার করা। প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ক্রেতার নিকট একখানি বিশেষ মূল্যবান দলিল (Document)। মূল্য প্রাপ্তিস্বীকার কোনও সময়ে অর্থ পরিশোধ হয় নাই বলিয়া বিক্রেতা দাবি করিলে প্রাপ্তিস্বীকার পত্রই ক্রেতার সাহায্যে আসিবে। প্রাপ্তিস্বীকার পত্রকে রসিদ বলে। রসিদ সাধারণত দুই প্রকারের হইতে পারে। বিক্রেতা যখন ক্রেতার বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হইয়া মূল্য আদায় করে তখন বিক্রেতা যে-বিল দাখিল করে সেই বিলের পিছনেই অর্থপ্রাপ্তির স্বীকৃতি (acknowledgement of receipt) গ্রহণ করে। কিন্তু যখন ক্রেতা চেকের মাধ্যমে, প্রাপ্তিস্বীকারই মণিঅর্ডার যোগে, হুণ্ডির মাধ্যমে, পোষ্টাল অর্ডার যোগে মূল্য লেনদেনের চূড়ান্ত পরিশোধ করে তখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট রসিদ পাঠাইয়া দেয়। বেকার ভাগ ক্ষেত্রেই চেক, হুণ্ডিতে অথবা পোষ্টাল অর্ডারে মূল্য পরিশোধ হইলে, প্রথমে একখানি কাঁচা রসিদ দেওয়া হয়। কারণ চেক, হুণ্ডি অথবা পোষ্টাল অর্ডার ভাঙ্গানো হইলেই বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে মূল্য

পাইয়া থাকে। যখন চেক, হুণ্ডি অথবা পোস্টাল অর্ডার ভাঙানো হয় তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে পাকা রসিদ দিয়া থাকে। পাকা রসিদ দেওয়া হইলে কাঁচা রসিদ নাকচ (cancel) বলিয়া গণ্য করা হয়। যখন রসিদ আদান-প্রদান হয় তখনই কোনও লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রসিদ পাওয়ার পর ক্রেতার দেখা প্রয়োজন যে রসিদ ব্যবসায়ের আইনসম্মত প্রাধিকার কর্তৃক সহি হইয়াছে কি না। যেমন কোনও অংশীদারী ব্যবসায়ে একজন অংশীদারের উপর অর্থের প্রাপ্তিস্বীকারের ভার থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে রসিদ যদি সেই অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয় তাহা হইলে রসিদে দায়িত্বপূর্ণ সেই রসিদ আইনত গ্রহণীয় নহে। সুতরাং যে-কর্মচারীর কর্মচারীর স্বাক্ষর উপর প্রাপ্তিস্বীকারের ভার থাকে তাহার স্বাক্ষর ব্যতীত রসিদ কার্যকরী হয় না। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কর্মচারী সহযুক্ত হইলেই যে সর্বদা রসিদ আইনত গ্রহণীয় হয় তাহা নহে। ব্যবসায়ের নিজস্ব সীল (Seal) থাকিলে সেই সীলও সহির নিম্নে অঙ্কিত থাকা প্রয়োজন। বিশেষত যৌথ কোম্পানীর বেলাতে ম্যানেজার অথবা হিসাবরক্ষক (Accountant) অর্থের প্রাপ্তিস্বীকার করিলেও তাহাদের সহিত কোম্পানীর সীল অঙ্কিত না হইলে উহা গ্রহণীয় হয় না।

অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে রসিদের উপর আটাল (Revenue Stamp) দেওয়া থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আটাল যুক্ত থাকে না। অর্থ-প্রাপ্তির পরিমাণ যদি ২০ টাকা অথবা ২০ টাকার উর্ধ্বে হয় রসিদে আটাল তাহা হইলে রসিদ আটালযুক্ত না হইলে আইনত গ্রহণীয় নহে। ২০ টাকার কম হইলে রসিদ আটালযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না।

উপরের আলোচনা হইতে বোধ হয় তোমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে যে একটি লেনদেনের উৎপত্তি হয় অর্ডার (order) অর্থাৎ মাল-সরবরাহের নির্দেশপত্রে আর উহার পরিসমাপ্তি হয় রসিদ প্রাপ্তিতে।

বিল (Bill) : যখন ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রেতা দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে এবং ক্রেতা দ্রব্যের প্রাপ্তি স্বীকার করে তখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে মালের বাবদ প্রাপ্য অর্থের একখানি হিসাব দাখিল করে। উহাকেই বিল (Bill) বলে। অবশ্য ক্রয় যদি নগদান অর্থের পরিবর্তে হইয়া থাকে তাহা হইলে বিলের প্রয়োজন হয় না। কারণ, সেক্ষেত্রে ক্রেতা নগদান অর্থ পরিশোধ করলেই বিক্রেতা তাহাকে একখানি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র দিয়া থাকে। উহাকে বলে 'ক্যাশমেমো' (Cash Memo)। কিন্তু লেনদেন যদি ঋণের উপর হয় তাহা হইলে ক্রেতার নিকট মাল পৌছাইবার পর বিক্রেতা মালের বাবদ বিল ও ক্যাশমেমো দেয় মূল্য দাবি করিয়া থাকে। সুতরাং মাল প্রাপ্তিস্বীকারের পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট প্রাপ্য মূল্য দাবি করিয়া যে-হিসাব দিবে উহাই বিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাল পাঠাইবার চালান ও বিল একসঙ্গেই

পাঠান হয়। চালান দৃষ্টে মাল বিলি দেওয়া হইলে বিলও সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার নিকট দাখিল করা হয়।

চালান ও বিলের পার্থক্য (Difference between a Challan and a Bill) : চালানের সাহায্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল পাঠাইয়া থাকে। চালানে থাকে মালের বিশদ বিবরণ; মালের রকম ও পরিমাণ। চালানের সাহায্যে ক্রেতা মাল মিলাইয়া লয়। চালান সাধাবণত তিন প্রস্ত লেখা হয়। দুই প্রস্ত ক্রেতার নিকট পাঠান হয়। ক্রেতা এক প্রস্ত নিজে রাখিয়া দেয় এবং দ্বিতীয় প্রস্তে ক্রেতা মালের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বিক্রেতার নিকট ফেরত দেয়, তৃতীয় প্রস্ত বিক্রেতার চালান বহিতে থাকে। কিন্তু বিলে মালের বিশদ বিবরণ ত' থাকেই অধিকন্তু মালের মূল্য, মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশ, বাট্টার হার, বিক্রয় কর ইত্যাদিও লিখিত থাকে। অর্থাৎ, বিলে বিশেষ লেনদেন বাবদে বিক্রেতা কত পাইবে তাহা প্রদর্শিত হয় এবং বিলের মাধ্যমে মালের মূল্য দাবি করা হয়। একখানি বিলের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল :

বিল নং ৪০৭ 'ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা এণ্ড কোং টেলিফোন : ৪৩-৫৪২১

প্রসিদ্ধ তামাক ব্যবসায়ী

৪২ নং নেতাজী স্মরণ রোড

কলিকাতা-১

তারিখ ৬/১৮/৬০

ব্রজেন্দ্রনাথ নিয়োগী.....দেনা

(অমুগ্রহপূর্বক চেকে মূল্য পরিশোধ করিবেন।)

তারিখ	মালের বিবরণ (Particulars of goods supplied)	মূল্যের পরিমাণ	নীট
১৯৬০	৫ কুইন্টেল ভার্জিনিয়া তামাক		
জানুয়ারী	২০০ টাকা কুইন্টেল দরে	১০০০/-	
৫	বাদ ব্যবসায়িক বাট্টা ৫%	৫০/-	২৫০/-
	যোগ ৫.২% কেন্দ্রীয় শুল্ক		৪২'৪০
		মোট—	২২২'৪০

নয়শত নিরানব্বই টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা মাত্র
স্বাক্ষর ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা

বিল ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য (Difference between a Bill and a Statement of Accounts) : বিল ও হিসাব বিবরণী দেখিতে প্রায় একরকম হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক। বিল হিসাব বিবরণী ও প্রতিটি লেনদেনের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে তৈয়ারি করিতে হয়। বিলের পাথক্য আর হিসাব বিবরণীতে থাকে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত লেনদেন হয় উহার সংক্ষিপ্তসার।

বিলের মারফতে বিশেষ লেনদেনের জন্য পাওনা দাবি করা হয় আর হিসাব বিবরণীর মধ্যে সমস্ত লেনদেন বাবদ দেনাপাওনা দেখাইয়া হিসাব বিবরণীর তারিখে মোট কত পাওনা তাহা দেখান হয়।

চালান ও হিসাব বিবরণীর পার্থক্য (Difference between Challan and a Statement of Accounts) : বিলের মতই চালান দেখিতে অনেকটা হিসাব বিবরণীর মত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। চালানের মাধ্যমে মাল বিল দেওয়া হয় আর হিসাব বিবরণীর মাধ্যমে কতিপয় লেনদেন বাবদ প্রাপ্য মূল্য পরিশোধের তালিকা দেওয়া হয়।

Exercises

1. What is a Letter of Enquiry ? Draft a Letter of Enquiry to a Cigarette dealer enquiring about prices, methods of delivery.

অনুসন্ধান পত্র কাহাকে বলে ? একজন সিগারেট ব্যবসায়ীর নিকট সিগারেটের মূল্য ও বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া একখানি পত্র লিখ।

2. Enumerate the different stages in a business transaction that a buyer or a seller is to pass through ?

ব্যবসায়ের লেনদেনে ক্রেতাকে অথবা বিক্রেতাকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করিতে হয় আলোচনা কর।

3. Distinguish between an Invoice and a Bill ?

চালান ও বিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

4. Explain the following : Debit Note ; Credit Note ; Errors and Omissions Excepted (E. & O. E.) ; Receipt ; 5% one month.

নিয়মিতভঙ্গিলির বিশদ আলোচনা কর : দেনা লিপি ; পাওনা লিপি ; ভুলচুক বাদ ; রসিদ ; শতকরা ৫ টাকা একমাস।

5. Explain Cash Discount and Trade Discount and find out the difference between the two.

নগদান বাটী ও ব্যবসায়িক বাটী কি ? উভয়ের পার্থক্য সন্নিবেশে আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূলধন, আবর্তন ও মুনাফা Capital, Turnover and Profit)

মূলধন (Capital) : যে-কয়টি উপাদান লইয়া ব্যবসায় সংগঠিত হয় তন্মধ্যে মূলধন অগ্র্যতম। মূলধন ব্যতিরেকে কোনও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যে চলিতে পারে না তাহার পুনরুৎপাদন নিশ্চয়োজন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন ও সংগঠন এই চারিটি উপাদান লইয়া ব্যবসায় গঠিত হয়।

মূলধনের সংজ্ঞা সম্বন্ধে অনেকেরই একটি অস্পষ্ট ধারণা আছে। মূলধন বলিতে অনেকের মনে করিয়া থাকে ‘অর্থ’ (Money)। কিন্তু ‘অর্থ’ এবং মূলধন একই জিনিষ নয়। যদি অর্থই মূলধন হয় তাহা হইলে কল্পসমূহ নিজেই ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া যে ‘অর্থ’ সঞ্চয় করে তাহাও মূলধন। সাধারণক্ষেত্রে যে ভাবে বিচার করা হউক, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মূলধনের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থবিজ্ঞান একটি অংশ। সুতরাং অর্থবিজ্ঞানবিশারদগণ মূলধনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ব্যবসায়গণও তাহা মানিয়া লইয়াছেন। অর্থনীতিতে মূলধনের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

যে উৎপাদিত দ্রব্য-সম্পদ উৎপাদনে পুনরায় ব্যবহৃত হয়
মূলধনের সংজ্ঞা তাহাই মূলধন (Capital is the produced means of production)। এই সংজ্ঞায় সঞ্চিত অর্থকে মূলধন বলা যায় না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায় নিয়োগ করিয়া পুনরায় সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য না করে ততক্ষণ ‘অর্থ’ নিছক সঞ্চয়ই (Saving) রহিয়া যায়। কিন্তু কোনও ব্যবসায়ী যদি সেই সঞ্চয় ব্যবসায় ব্যবহার করে তাহা হইলেই উহাকে মূলধন বলা যায়। শতাব্দীর নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। উহা সে সিঁদুকে আটকাইয়া রাখিল। সে-টাকা দ্বারা কোনও সম্পদ উৎপাদন হইল না। কিন্তু শতাব্দী যদি ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া একটি ব্যবসায় গঠন করে তাহা হইলে ঐ টাকা দ্বারা সে যে আয় করিবে তাহা দ্বারা সে অন্যান্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবে। সুতরাং যতক্ষণ ‘অর্থ’ নিয়োজিত হইয়া সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য না করে ততক্ষণ ‘অর্থ’কে মূলধন বলা যায় না।

মূলধনের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Capital) :
অধ্যাপক ট্রিফেনসনের মতে ব্যবহার অনুযায়ী মূলধনকে যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, উহা হইল—উৎপাদন মূলধন (Production Capital) ;
মূলধনের ভাগ রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন (Revenue Capital) ; সহায়ক মূলধন (Auxiliary Capital) ; মজুরি মূলধন (Remuneratory Capital) ;

স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) ; চলতি মূলধন (Circulating Capital) ; সামাজিক মূলধন (Social Capital) ।

(১) উৎপাদন মূলধন (Production Capital) (উৎপাদন মূলধন বলিতে সেই সমস্ত সামগ্রীকে বুঝায়, যাহা মানুষকে দ্রব্য বা সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করে) যাহা মানুষের পূর্ব পরিশ্রমের ফল হিসাবে সঞ্চিত হয় এবং যাহা প্রাকৃতিক দান নহে। যে-কোনও দ্রব্য উৎপাদনে দেখা যায় যে মানুষের কার্যিক পরিশ্রম ব্যতিরেকেও কিছু আনুসঙ্গিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় যাহাতে উৎপাদনে সফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্য শ্রমিককে সাহায্য করে বলিয়াই উৎপাদন সম্ভব হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত শ্রমিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না উহার

উৎপাদন মূলধনের প্রধানত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি। আদিম যুগ হইতে অর্থনীতি ও বাণিজ্যের বিবর্তন দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে যেমন কাঁচামাল, সমাজের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে ক্ষুদ্র সম্পদ উৎপাদন। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মনে কর, কোনও কৃষক কাঁচা পাট উৎপাদন করিতে প্রয়াসী, সাহায্যে নূতন দ্রব্য তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ অথবা দ্রব্যসমূহ জমি, বীজ, উৎপাদন করা হয় লাঙ্গল ইত্যাদি। জমি ত প্রকৃতির দান হিসাবেই পাওয়া যায়।

এখন জমি চাষ করিতে প্রয়োজন লাঙ্গল। লাঙ্গল তৈয়ারি করিতে প্রয়োজন কাষ্ঠ, লৌহ ফলাকা। কাষ্ঠ প্রাকৃতিক দান, কিন্তু কাষ্ঠ হইতে লাঙ্গল তৈয়ারি করিতে প্রয়োজন যন্ত্রপাতি, আবার লৌহ ফলাকার জন্ত প্রয়োজন কাঁচা লৌহ, ডলোমাইট ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক সামগ্রী হইতে পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয়ে যে লাঙ্গল তৈয়ারি করা হইল ইহার সাহায্যেই এখন জমি চাষ সম্ভব হইল। এই লাঙ্গলই হইল মানুষের বিগত সঞ্চিত শ্রম। অর্থাৎ লাঙ্গল হইল একটি উৎপাদিত দ্রব্য যাহার সাহায্যে এখন পুনরায় সম্পদ উৎপাদন সম্ভব হইতেছে।

উৎপাদন মূলধনের রূপ (Forms of Production Capital) : উৎপাদনের উদ্দেশ্য ভাগ। উৎপাদনের প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ-কর্তার নিকট দ্রব্য পৌঁছিতে ও তাহাকে সন্তুষ্টি দিতেও কয়েকটি স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরেই উৎপাদককে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। যে-অর্থ প্রতি স্তরে ব্যয়িত হয় উহা তাহার মোট মূলধন হইতেই যায়। সুতরাং স্তরবিভাগ অনুসারে উৎপাদন মূলধনেরও ভাগ বা রূপ স্থির করা যায়।

ধরা যাউক, তুলা হইতে কাপড় বুনা হইবে। ইহাতে প্রথমে আসে কাঁচা তুলা। দ্বিতীয়ত, তুলা হইতে সূতা কাটিয়া সূতায় রং করার জন্ত প্রয়োজন রং। সূতা ধোলাই করার জন্ত প্রয়োজন ক্ষার। উৎপাদন মূলধনের কয়েকটি উদাহরণ উহাদের বলা হয় আনুসঙ্গিক সহায়ক দ্রব্য (Auxiliary materials)। তৃতীয়ত, সূতা দ্বারা কাঁপড় বুনিতে প্রয়োজন যন্ত্রপাতি (tools and machinery)। চতুর্থত, উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজন

একটি কারখানা (Factory or Workshop)। পঞ্চমত, প্রয়োজন গুদামঘর—যেখানে উৎপাদিত দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করা যায়। শেষত, উৎপাদিত দ্রব্য সহজে ও অল্পব্যয়ে বিলি-ব্যবস্থা করার জন্ত প্রয়োজন পরিবহণ-ব্যবস্থা (Transportation)। পরিবহণ-ব্যবস্থার জন্ত প্রায়শই ব্যবসায়ী নিজের লরি বা যান্ত্রিক গাড়ী থাকে। স্তত্রাং যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া উৎপাদন মূলধন গঠিত হয় তাহারা (১) কাঁচামাল, (২) আত্মসম্মিক সহায়ক দ্রব্য, (৩) যন্ত্রপাতি, (৪) কারখানা, (৫) গুদামঘর, (৬) পরিবহণ-ব্যবস্থা।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, উৎপাদকমণ্ডলীর হাতে উৎপাদন মূলধনের পরিমাণ যত অধিক পরিমাণ সঞ্চিত থাকিবে অদূর ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনও ততই বাড়িবে। সামাজিক আর্থিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্ত উৎপাদন মূলধন যতই বাড়িতে থাকিবে ততই মঙ্গল। যদি উৎপাদন মূলধনের পরিমাণ কমিতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অর্থনৈতিক কার্য নিম্নগামী হইতেছে। অর্থাৎ, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কম পরিমাণ সম্পদ তৈয়ারি হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় সমাজের আয়ও কমিয়া যায় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্রমশঃ গরীব হইতে থাকে। স্তত্রাং ব্যবসায়িগণ কখনও ইহা চাহে না যে সমাজের উৎপাদন মূলধন কমিয়া যায়।

(২) রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন (Revenue Capital) : রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন বালিতে সেই মূলধনকেই বুঝায় যাহার বিনিময়ে মূলধন রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন অধিকারীর আয় হয়। ব্যবসায়ীর হাতে মজুত মাল বা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ী আয় করে। উহা তাহার নিকট রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন। আবার যে ব্যবসায়ীর ব্যবসায় হইতেছে ‘অর্থ’ লব্ধী করা, তাহার নিকট যে ‘অর্থ’ লব্ধী করার জন্ত রাখে বা যাহা লব্ধী করে উহাই রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন।

রাজস্ব প্রদায়ী মূলধনের বৈশিষ্ট্য এই যে রাজস্ব প্রদায়ী মূলধনে অধিকারীর নিজস্ব স্বত্ব (Ownership) প্রমাণিত হয়। ব্যক্তিগত দিক হইতে দেখিলে নিজস্ব স্বত্ব না থাকিলে ব্যবসায়ী কখনও রাজস্ব আদায় করিতে প্রয়াসী হইত না। রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন অধিকারীর নিকট আয় প্রদায়ী এবং উহার আয় হইতে সে তাহার নিজের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয়।

উৎপাদন মূলধন বাড়িলে ভবিষ্যতে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে এবং অধিকতর আর্থিক দ্রব্য উৎপাদন হইতে পারে একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন বাড়িলে যে সামাজিক উন্নতির সূচনা করে তাহা

নহে। কারণ রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন ব্যবসায়ীর বা কোনও ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ কোনও ঝুঁকিদার ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়িবে অনুমান করিয়া বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি ক্রয় করিয়া রাখিল, উহা তাহার নিকট রাজস্ব প্রদায়ী মূলধন সন্দেহ নাই। সেই ঝুঁকিদারই কিন্তু জমির মূল্য বাড়িলে জমি বিক্রয় করিয়া দিবে। ইহাতে তাহার লাভ হইল বটে কিন্তু সামাজিক দিক হইতে কোনই লাভ হইল না। বরঞ্চ ঝুঁকিদার যদি প্রচুর পরিমাণে জমি ক্রয় করিয়া জমির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার স্বযোগ না পাইত, তাহা হইলে জমির মূল্য তত বাড়িত না।

আবার এ-কথাও বিবেচনার যোগ্য যে ব্যবসায়ে যে সম্পদ বা দ্রব্য শেষত ভোগকর্তার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য উৎপাদন হয় উহা উৎপাদক হইতে পাইকার, রাজস্ব প্রদায়ী পাইকার হইতে খুচরা বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতা হইতে মূলধনের অন্তিমের ভোগকর্তার হাতে পৌঁছে। প্রতি স্তরে একই দ্রব্য রাজস্ব ফলে ভোগকারীর প্রদায়ী মূলধন। কিন্তু মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ প্রত্যেকেই লাভ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ক্রয় করে। সুতরাং প্রত্যেক মধ্যবর্তী হয় ব্যবসায়ী লাভ করে বলিয়া ভোগকর্তার নিকট উহার মূল্য অনেক অধিক হয়। সুতরাং সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে রাজস্ব প্রদায়ী মূলধনের অবিকারীদের কাধের ফলে সমাজকে সম্পদের মূল্য দিতে হয় অনেক বেশী।

(৩) **সহায়ক মূলধন (Auxiliary Capital)** : উৎপাদন মূলধনের মধ্যে যন্ত্রপাতিতে একপ্রকার উৎপাদন মূলধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যন্ত্রপাতিতে আবার সহায়ক মূলধন হিসাবেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সহায়ক মূলধন সেই সমস্ত দ্রব্য যাহার সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রমিকের দ্রব্য বা সম্পদ উৎপাদন সম্ভব নহে। এই দিক দিয়া সহায়ক মূলধন ও উৎপাদন মূলধনের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

(৪) **মজুরি মূলধন (Remuneratory Capital)** : মজুরি মূলধন বলিতে সেই অর্থকেই বুঝায় যাহা ব্যবসায়ী শ্রমিকের মজুরি দিতে ব্যয় করে। এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবসায়ী শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা মজুরি যদি নগদ অর্থে প্রদান করে তবে তাহাকে মজুরি মূলধন বলা হয় না। মজুরি মূলধন একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ হয়। উহা হইতেছে ব্যবসায়ী নগদ অর্থে মজুরি দেওয়ার পরও যদি শ্রমিকের খাণ্ড, বাসস্থান, পরিধেয় ইত্যাদি দেয় তবে তাহাকেই মজুরি মূলধন বলা হয়। অবশ্য নগদ

অর্থে মজুরি প্রদান ও দ্রব্যে মজুরি প্রদান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই ক্মীণ। কারণ শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে নগদ অর্থ পায় উহাই সে তাহার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে ব্যয় করে সন্দেহ নাই। তথাপি উভয়ের পারস্পরিক গুরুত্ব মূল্যান্তরের হ্রাসবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ-বিষয় এখানে বিশদ আলোচনা অবাস্তব। তথাপি একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বাজারে দেখা যাইতেছে সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই বাড়িয়া যাইতেছে। কোনও দ্রব্যের

নাম মজুরি
(nominal
wage)

মূল্য এক বৎসর পূর্বে যাহা ছিল বর্তমানে তাহার চারিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্যের গড় মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকের মজুরি দ্বিগুণ বাড়ে নাই। শ্রমিক বলিতে পারে যে নাম মজুরির (Nominal or Remuneratory Wage) বদলে প্রকৃত মজুরি (Real Wage) দেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত মজুরি হইতেছে সেই মজুরি যাহা নাম মজুরির পরিবর্তে

প্রকৃত মজুরি
(real wage)

ক্রয় করা যায়। শ্রমিক নাম মজুরি গ্রহণ না করিয়া প্রকৃত মজুরি অর্থাৎ তাহার প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য গ্রহণ করিল। এই ক্ষেত্রে তাহার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য যোগান দিতে

ব্যবসায়ীকে যে দ্রব্য ও সেবা দিতে হইবে উহাই তাহার পক্ষে মজুরি মূলধন (Remuneratory Capital)।

(৫) স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) : ব্যবসায়ে অনেক দ্রব্য রহিয়াছে যাহার স্থায়িত্ব খুবই বেশী। আবার এমনতর দ্রব্যও রহিয়াছে যাহার স্থায়িত্ব নাই, একবার মাত্র ব্যবহার করিলেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। স্থায়ী মূলধন এবং দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না। যে দ্রব্য স্থায়ী এবং

পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা যায়; একবার মাত্র ব্যবহারে যাহার প্রয়োজন শেষ হয় না উহাই স্থায়ী মূলধন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ব্যবসায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, নিজস্ব দালান, জমি ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষ হয় না। তবে ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে

যে দ্রব্য পুনঃ পুনঃ
ব্যবহার করা যায়
উহাই স্থায়ী মূলধন

ইহার প্রয়োগ বা ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, ইহার সাহায্যে উৎপাদন-ব্যয়ও তত বাড়িতে থাকে। একটি সহজ উদাহরণ দ্বারা এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। যে-যন্ত্রটি নূতন

ক্রয় করা হইল উহার পিছনে আশু আর কোনও ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি যন্ত্রটি বহুদিন কার্যকরী থাকিবে তথাপি যন্ত্রটি যতই পুরাতন হইতে থাকিবে ততই উহার উৎপাদন-ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে ব্যয়ও বাড়িবে—যেমন, মেরামত খরচ; যে সমস্ত অংশ অকেজো হইতে পারে উহার পুনর্গঠন ব্যয়

ইত্যাদি। সুতরাং স্থায়ী সম্পদ যত অধিক ব্যবহার হইবে যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের

উৎপাদন-ব্যয়ও ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে। কারণ, যন্ত্রপাতি উৎপাদনক্রম রাখিতে যাহা কিছু ব্যয় সমস্তই উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাবে ধরা হইয়া থাকে।

(৬) সামাজিক মূলধন বা জাতীয় মূলধন (Social Capital) : পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট হইয়াছে যে, ব্যবসায়ী যে ‘অর্থ’ বিনিয়োগ করে উহাই ব্যবসায়ের মূলধন। নিয়োজিত মূলধন আবার ব্যবহার জাতীয় বা সামাজিক মূলধন অল্পসারে কতিপয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত মূলধন ব্যবসায়ীর নিজস্ব অথবা ব্যক্তিগত বিস্তৃত এমন মূলধনও আছে

জাতীয় বা
সামাজিক মূলধন

যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে। সম্পদ অধিকার করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় উহাই মূলধন। কাজেই যে সম্পদ কোনও ব্যক্তিবিশেষ অধিকার করে না এবং যাহার ফলভোগ কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে তাহাই সামাজিক বা জাতীয় সম্পদ। এবং সেই প্রকার সম্পদ অধিকার করিতে যে অর্থ বিনিয়োগ বা ব্যয় করা হয় তাহাই জাতীয় বা সামাজিক মূলধন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে দেশের রাস্তাঘাট, রেলপথ ইত্যাদি দেশের জনসাধারণের সম্পদ; কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে। সুতরাং রাস্তাঘাট, রেলপথ তৈয়ারি করিতে যে অর্থ

রাস্তাঘাট, রেলপথ
ইত্যাদি তৈয়ারি
করিতে যে অর্থব্যয়
হয় উহাই জাতীয়
বা সামাজিক মূলধন

ব্যয় হইয়াছে উহা সমস্তই জাতীয় মূলধন; অনেক সময়ে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে সামাজিক ও জাতীয় মূলধন একই অর্থে প্রয়োগ হয় না। সামাজিক মূলধনকে তখন অনেকটা সঙ্কুচিত অর্থে ব্যবহার করা হয়। যখন সামাজিক মূলধন সঙ্কুচিত অর্থে প্রয়োগ হয় এবং জাতীয় মূলধনের সমার্থবোধক হিসাবে প্রয়োগ

হয় না তখন সামাজিক মূলধন কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পদ অধিকার করিতে যে ‘অর্থ’ ব্যয় হয় তাহাকে বুঝায়। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যয়

সামাজিক বা
জাতীয় মূলধন
কাহারও নিজস্ব
নহে

করিয়া (অর্থাৎ মূলধন নিয়োগ করিয়া) যে সম্পদ অধিকার করে, উহার ফলভাগী হয় সেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এলাকার মধ্যে সকল নাগরিক। যেমন—কলিকাতা কর্পোরেশন, ইহাকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। কলিকাতা কর্পোরেশন উহার এলাকাধীন বসবাসকারী সকলকে পানীয়

জল সরবরাহ করিয়া থাকে। পানীয় জল সরবরাহ করিতে যে সমুদয় যন্ত্রপাতি, জল বহনের গাড়ী ব্যবহার করিতেছে উহা সমস্তই সামাজিক সম্পদ এবং ঐ সম্পদ-

জাতীয় বা
সামাজিক মূলধনের
ফলভাগী দেশের
সকল নাগরিক

নিচয় অধিকার করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, উহা সকলই সামাজিক মূলধন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মূলত, সামাজিক ও জাতীয় মূলধনের মধ্যে পার্থক্য খুবই ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম। তবে উভয়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে দেশের সকল লোকই ঐ সম্পদের ফলভাগী। মূলধনকে অর্থ-

নীতিবিশারদ ও বাণিজ্য গবেষকগণ উপরি-উক্ত কয় ভাগে ভাগ করিলেও ব্যবসায়ের

দিক হইতে দেখিলে ব্যবসায়িগণ মূলধনকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া থাকে। তাহাদের মতে মূলধনের তিনটি রূপ—স্থায়ী মূলধন (fixed capital); চলতি মূলধন বা পরিচল মূলধন (circulating capital); কার্যকরী মূলধন (working capital)।

(৭) **পরিচল মূলধন (Circulating Capital)** : মনে কর, একজন ব্যবসায়ী তাহার নিজস্ব সঞ্চিত 'অর্থ' নিয়োগ করিয়া একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিল। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫০০০ টাকা। এখন ব্যবসায়ী ঐ ৫০০০ টাকা কিভাবে প্রয়োগ করিলে তাহার লাভ হইবে তাহা তাহাকে বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যবসায় করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন ব্যবসায়ের জন্ত একখানা ঘর।

ব্যবসায়ী ছইভাবে ঘর অধিকার করিতে পারে। প্রথমত, ব্যবসায়ের ঘর ভাড়া লইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সে নিজেই জমি ক্রয় করিয়া ঘর তৈয়ারি করিতে পারে। মনে কর, প্রতি বৎসর অপরকে ঘরের জন্ত ভাড়া না দিয়া সে নিজেই একখণ্ড জমির উপর একখানা ঘর তৈয়ারি করিল। জমি কিনিতে এবং ঘর তৈয়ারি করিতে তাহার ২০০০ টাকা ব্যয় হইল। কেবল ঘর হইলেই হইবে না, ব্যবসায় চালাইতে তাহার প্রয়োজন কিছু

আসবাবপত্রের। সুতরাং সে আরও ৫০০ টাকা ব্যয় করিল। ১। স্থায়ী মূলধন আসবাবপত্র তৈয়ারি করিতে বা কিনিতে। তাহা হইলে তাহার হাতে রহিল ২৫০০ টাকা। তাহা হইলে ব্যবসায়ীর ৫০০০ টাকার মধ্যে ২৫০০ টাকা জমি ঘর ও আসবাবপত্র ক্রয় করিতে প্রয়োগ করিল। জমি ঘর ও আসবাবপত্র তাহার নিকট স্থায়ী সম্পদ এবং ঐ স্থায়ী সম্পদ অধিকার করিতে নিয়োজিত মূলধনের যে অংশ ব্যয় হইল উহাই স্থায়ী মূলধন।

ব্যবসায়ী ৫০০০ টাকা হইতে ২৫০০ টাকা নগদ হাতে রাখিয়া দিয়াছে। ঐ ২৫০০ টাকা হইতে আবার কিছু অংশ নগদ হাতে রাখিল—মনে কর, ৫০০ টাকা—অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করিবে পণ্য বা মাল কিনিতে। ঐ ২০০০ টাকা মূল্যের পণ্য বিক্রয় করিয়াই ব্যবসায়ী লাভ করিবে। মনে কর, ২০০০ টাকার পণ্য ৩০০০ টাকায় বিক্রয় করা হইল। ফলে ব্যবসায়ী ১০০০ টাকা মুনাফা করিল। ঐ মুনাফা হইতে ব্যবসায় পরিচালনার সমস্ত ব্যয় বাদ দিয়া যাহা থাকিবে উহা ব্যবসায়ী নিজে পাইবে। ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় যদি ৫০০ টাকা হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ী নিজে ৫০০ টাকা পাইবে। ঐ ৫০০ টাকা আবার ব্যবসায়ে

খাটানো হইবে অবশ্য যদি ৫০০ টাকা হইতে ব্যবসায়ী নিজে ২। পরিচল বা কিছু ব্যয় না করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসায়ের চলতি মূলধন মোট মূলধনের একাংশ স্থায়ী সম্পদে আটক থাকে এবং একাংশ ব্যবসায়ের পণ্য ক্রয় করিতে ব্যবহার হয়। যে অংশ ব্যবসায়ে পণ্যাদি ক্রয়ে ব্যবহার করা হয় উহাই বারবার আবর্তন হইতে থাকে এবং উহার ফলেই

ব্যবসায়ের আয় হয়। মূলধনের এই অংশকেই বলা হয় পরিচল অথবা চলতি মূলধন (Circulating Capital)।

(৮) **কার্যকরী মূলধন (Working Capital)** : ব্যবসায়ী আবার মূলধনের আর একটি ভাগ করিয়া থাকে যাহাকে বলা হয় কার্যকরী মূলধন (Working Capital)। কার্যকরী মূলধন বলিতে ব্যবসায়ে সেই মূলধনকে বুঝায় যাহা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। একথা বোধ হয় আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই যে ব্যবসায়ে কোনও সময়ে যে সম্পদ থাকে উহা সম্পূর্ণই কার্যকরী নহে। কারণ, দালান, কোঠা, জমি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সম্পদ বটে কিন্তু উহা আবর্তন হয় না। কিন্তু অত্যাগ্র সম্পদ যাহা জমি, দালান ইত্যাদির মত স্থায়ী নয় তাহা পুনঃপুনঃ আবর্তন হয় এবং ফলে ব্যবসায়ের লাভ বা লোকসান হয়। কোনও একটি ব্যবসায়ের দায় ও সম্পদের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া কার্যকরী মূলধন কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬০, উদ্ভূত পত্র (Balance Sheet

<u>মূলধন ও দায়</u>		<u>সম্পত্তি ও সম্পদ</u>	
(<u>Capital & Liabilities</u>)	টাকা	(<u>Properties & Assets</u>)	টাকা
পাওনাদার—	০০	দালান ও জমি—	২০০০
(Creditors)		আসবাবপত্র—	১০০
ডিসেম্বর মাসের		দেনাদার—	১২০০
শ্রমিকের মজুরি		(Debtors)	
বাবদ দেনা—	২০০	স্বীকৃত ছাড়	
মূলধন—	৫০০০	বা	
		প্রাপ্য বিল —	১০০০
		(Bills Receivable)	
		মজুত মাল—	১৫০০
		(Stock in Trade)	
		নগদান ও ব্যাংকে জমা	৬০০
	<u>৬৭০০</u>		<u>৬৭০০</u>

উপরের উদ্ভূতপত্র হইতে দেখিবে যে ব্যবসায়ের মোট সম্পদ মোট দায়ের

সমান অর্থাৎ ব্যবসায়ের যে দায় তাহা উহার সম্পদ হইতে পরিশোধ করা যায়।

ব্যবসায়ীর নিজস্ব মূলধন বাবদ দায়ের মধ্যে ব্যবসায়ীর নিজস্ব মূলধনও ধরা হইয়াছে। কারণ ব্যবসায়ী ব্যবসা স্থাপন করিলে ব্যবসায়ের একটি পৃথক সত্তা হয়। ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় তখন আব একই নয়। ব্যবসায়ের দিক হইতে

ব্যবসায়ী যে মূলধন নিয়োগ করে তাহা ঋণ হিসাবে ধরিলেই ভাল হয়। ব্যবসায়ী নিজে ব্যবসায়কে মূলধন পরিমাণ ‘অর্থ’ ঋণ দিয়াছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্যবসায়ী যে অর্থ নিয়োগ করিয়াছে উহা যতদিন ব্যবসায় চলিতে থাকিবে ততদিনই ব্যবসায় খাটিতে থাকিবে। সুতরাং ব্যবসায়ীর নিজস্ব মূলধন স্থায়ী দায় (Fixed Liabilities) কিন্তু অল্প দুইটি দায় রহিয়াছে—পাওনাদার ১৫০০ এবং ঋমিকদের পাওনা মজুরি ২০০ যে কোনও সময়ই তাহার দাবি করিতে পারে এবং যে কোন মুহূর্তেই উহা পরিশোধ করিতে হইতে পারে। ইহাতে ব্যবসায়ীর চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ ব্যবসায়ে ঐ তারিখে যে সম্পদ আছে তাহার মধ্যে স্থায়ী সম্পদ ২৪০০ টাকা বাকী ৪৩০০ টাকা মূল্যের সম্পদ যে কোনও মুহূর্তে নগদান অর্থে পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং ঐ ৪৩০০ টাকা হইতে

চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের ব্যবধান ঋমিকদের পাওনা মজুরি ২০০ টাকা হইতে থাকিবে। ঐ ২৬০০ টাকা দ্বারাই আবার পণ্য ক্রয় ও ব্যবসায়ের অগ্রাগ্র ব্যয় চলিতে থাকিবে। তাহা হইলে কার্ধত ২৬০০ টাকা ব্যবসায়ীর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কার্ধকরী মূলধন (Working Capital)। কার্ধকরী মূলধন (Working

Capital) বলিতে তাহা হইলে সেই মূলধনকে বুঝায় যাহা ব্যবসায়ের অস্থায়ী বা চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের ব্যবধান। চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের ব্যবধান বাড়িতে থাকিলে বুদ্ধিতে হইবে যে ব্যবসায়ের অবস্থা সচ্ছল (solvent) ত বটেই পরন্তু চলতি সম্পদ দ্বারা চলতি দায় মিটাইয়াও যথেষ্ট উদ্ধৃত আছে যাহা ব্যবসায়ের প্রসারকল্পে ব্যবহার করা যায়।

অনেক সময়ে দেখা যায় ব্যবসায়ের চলতি সম্পদ হইতে চলতি দায় মিটানো সম্ভব নয়। মনে কর, উপরি-লিখিত উদ্ধৃত পত্রে চলতি সম্পদ ৪৩০০ টাকা কিন্তু যদি পাওনাদার ও ঋমিকদের মজুরি বাবদ দায় ৫০০০ টাকা হয় তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে যে ব্যবসায়ীকে যদি ঐ তারিখে ব্যবসায় অবসান করিতে বা গুটাইতে হয় তাহা হইলে পাওনাদারের পাওনা শোধ করিতে চলতি সম্পদ ব্যতীত কিছু স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যবসায়ী স্থায়ী সম্পদ কখনও বিক্রয় করিতে

চাহে না। : অথচ যদি পাওনাদারদের পাওনা শোধ করিতে না পারে তাহা হইলে বাজারে তাহার স্নানাম ক্ষুণ্ণ হইবে এবং প্রতিদ্বন্দী ব্যবসায়ী উহার স্বযোগ লইবে।

সুতরাং ব্যবসায়ীকে একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয় যে কখনও এমতভাবে ঋণে ক্রয় করিবে না যাহাতে পাওনাদারদের পাওনা চলতি সম্পদ হইতে মিটাইতে অক্ষম হয়। এরূপ অবস্থা হইতে ব্যবসায়ীর পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ঋণে ক্রয়ের পরিমাণ কমান অথবা কম মুনাফায় সম্ভব পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। ব্যবসায় আবশ্যকীয় মূলধন প্রয়োগ করিতে না পারিলে যেমন ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন নিয়োগও অম্লরূপ ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন নিয়োগকে বলা হয় অতিমূলধনকরণ (over-capitalisation)। যে উদাহরণটি দেওয়া হইল তাহাতে পরিচল বা চলতি মূলধন এত অধিক হইয়াছে যে ব্যবসায়ের সম্পদ হইতে চলতি দায় মিটানো সম্ভব হইতেছে না। উহাই অতিমূলধনকরণ।

একথা অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উদ্ভূত পক্ষে ব্যবসায়ের যে অবস্থা দেখা যায় উহা কোনও একটি বিশেষ দিনের। ঐ অবস্থা যে চলতি সম্পদ যাহাতে চলতি দায় হইতে অধিক হয় সেদিকে ব্যবসায়ীর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

যায় উহা কোনও একটি বিশেষ দিনের। ঐ অবস্থা যে দীর্ঘস্থায়ী হইবে তাহা নহে। পরবর্তী দিবসেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। অবিজ্ঞীত পণ্য অধিকমূল্যে বিক্রয় হইতে পারে এবং পাওনাদারের পাওনা সমস্ত পরিশোধ হইয়াও হাতে কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কিন্তু যদি চলতি সম্পদ হইতে চলতি দায় মিটানো সম্ভব নয় এমত অবস্থা চিরস্থায়ী আকার ধারণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইতেছে এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায় গুটাইবার প্রয়োজন হইবে।

ছাত্রদের মনে অনেক সময় এমত ধারণা হয় যে ব্যবসায়ীর মূলধন (Capital Owned) ও প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত মূলধন (Capital Used) সমান। ব্যবসায়ীর মূলধনই সর্বদা ব্যবহৃত মূলধন নহে। ১০৬ পৃষ্ঠায় যে উদ্ভূত পক্ষ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ীর নিজস্ব মূলধন (Capital Owned) ৫০০০ টাকা কিন্তু এখন যদি ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করিবার জন্ত ২০০০ টাকা ধার করে তাহা হইলে তাহার সম্পদ খাতে যেমন ২০০০ টাকা বাড়িল তেমনি দায় খাতেও ২০০০ টাকা বাড়িল। কিন্তু তাহার নিজস্ব মূলধন সমানই রহিল। অথচ ঐ ২০০০ টাকা মূলধন হিসাবে ব্যবসাতে খাটিল। ঋণ গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়ী যদি ধারে ২০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে তাহা হইলেও ব্যবসায়ের অবস্থা একই রূপ রহিল। অর্থাৎ তাহার নিজস্ব মূলধন ৫০০০ টাকাই রহিল কিন্তু ব্যবসাতে ২০০০ টাকা অতিরিক্ত খাটাইবার সুযোগ পাইল। ব্যবসায়ী নিজে যেমন ধারে ক্রয় করিয়া প্রকৃত মূলধন বাড়াইবার সুযোগ পাইল তেমনি ব্যবসায়ী যাহাদের ধারে বিক্রয় করিল তাহারাও তাহার নিকট হইতে অম্লরূপ সুযোগ পাইল। স্তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্যবসাতে ব্যবহৃত মূলধন (Used Capital) মোট দায় হইতে

ব্যবসায়ীর মূলধন,
ব্যবহৃত মূলধন ও
কার্যকরী মূলধন
এক কথা নহে

ব্যবসায়ের দেনাদারকে ঋণের সুযোগ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা। অর্থাৎ উপরের উদাহরণে মোট দায় ৬৭০০ টাকা। উহা হইতে দেনাদারদের নিকট হইতে পাওনা ১২০০ টাকা ও প্রাপ্য বিল (Bill Receivable) ১০০০ টাকা বাদ দিলে রহিল ৪৫০০ টাকা। এই ৪৫০০ টাকাই হইল ব্যবহৃত মূলধন। কিন্তু কার্যকরী মূলধন ২৬০০ টাকা। ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্পদ পুনর্গঠনের উপায় (Ways of replacing Assets) : সম্পদের মূল্য ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। আসবাবপত্র যাহা ধরা যাউক, ৫০০ টাকায় ক্রয় করা হইল উহার মূল্য এক বৎসর পর আর ৫০০ টাকা থাকিবে না। বাজারে ব্যবহৃত আসবাবপত্র বলিয়া হয়ত ৪৫০ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। তাহা হইলে এক বৎসর ব্যবহার করার পর আসবাবপত্র বাবদে লোকসান ৫০ টাকা। এইরূপভাবে হয়ত দশ বৎসর ব্যবহার করার পর আসবাবপত্র আত্ম ব্যবহার করা যাইবে না এবং ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বাতিল করা হইবে। যদি বাতিল আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া ৫০ টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে ১০ বৎসরে মোট লোকসান হইল ৫৫০ টাকা। উহাকেই ব্যবসাতে অবচয় বা মূল্য হ্রাস (Depreciation) বলে। এখন দশ বৎসর পরে পুনরায় ঐ আসবাবপত্র পুনর্গঠন বা পুনর্পূরণ করার সময়ে আবশ্যকীয় অর্থ কোথা হইতে সম্পদ পুনর্গঠনের আসিবে। অবচয় যখন ব্যবহারজনিত লোকসান তখন প্রতিবৎসর লাভ হইতে যদি ঐ পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা যায় তাহা হইলে দশ বৎসর পর আবশ্যকীয় অর্থ ব্যবসায়ী সহজেই পাইতে পারে। কারণ লাভ হইতে অপচয় বাবদ লোকসান বা ক্ষতি বাদ দিয়া প্রীতি-বৎসরে অবচয় পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফা ব্যবসায়ী তুলিয়া লইতে পারে। মনে কর, ১২৫০ সালে মুনাফা ১০০০ টাকা হইয়াছে কিন্তু উহাতে অবচয় বাবদ লোকসান ধরা হয় নাই। ব্যবসায়ী তাহার ইচ্ছামত ১০০০ টাকা সম্পূর্ণই তুলিয়া লইতে পারে; কারণ মুনাফা তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু যদি ১০০০ টাকা হইতে আসবাবপত্রের অপচয় বাবদ ৫০ টাকা বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে মুনাফা দাঁড়ায় ৯৫০ টাকা এবং ব্যবসায়ী ৯৫০ টাকাই তুলিতে পারে। এইভাবে প্রতিবৎসর যদি ব্যবসায়ী ৫০ টাকা করিয়া লাভ কম লয় তাহা হইলে দশ বৎসরে ৫০০ টাকা পরিমাণ সম্পদ তাহার ব্যবসাতে রহিল যাহা দ্বারা দশ বৎসর পরে পুনরায় আসবাবপত্র তৈয়ারি করিতে বা ক্রয় করিতে পারে। এই কারণেই অবচয় বাবদ ব্যয় বা ক্ষতি লাভ-ক্ষতি-হিসাবে ক্ষতি স্বীকার করা হয়।

মূলধন বাড়াইবার উপায় (Ways of increasing Capital) : ব্যবসায়

সাফল্য লাভ করিতে থাকিলে প্রায়ই দেখা যায় যে ব্যবসায় প্রসারিত করার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায় ক্ষীণ করিতে হইলে ব্যবসায়ের অনেক সময়েই স্থায়ী সম্পদ বাড়াইতে হয়।

মূলধন
বাড়াইবার উপায়

একথা তোমরা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতেও পড়িয়াছ যে—যে পরিমাণে সম্পদ বাড়ে সেই পরিমাণ দায়ও বাড়ে। যে পরিমাণে দায় বাড়িল সেই পরিমাণ মূলধন বাড়িল—বিশেষত ব্যবহৃত মূলধন (Used Capital)।

এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর যদি ব্যবসায়ের প্রসারকল্পে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহাই মূলধন বাড়ানোর উপায়। নিম্নলিখিত উপায়ে মূলধন বাড়ানো সম্ভব।

প্রথমত, যদি ব্যবসায়ীর নিজস্ব সঞ্চয় থাকে তবে তাহা ব্যবসায়ে নিয়োগ

করিতে পারে। যদি ব্যবসায়ীর নিজের কিছু সঞ্চয় না থাকে তাহা হইলে ব্যবসায়ীকে বাহির হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যে ব্যবসায়ে ঋণ দিতে পারে এমন লোকের সন্ধান করিতে থাকিবে। অনেক লোক আছে যাহাদের সঞ্চয় আছে কিন্তু

ব্যবসায় পরিচালনার বুদ্ধি নাই তাহারাই ব্যবসায়ে ঋণ দিতে পারে। মনে কর, কএর ৫০০০ টাকা ব্যবসায় সম্প্রসারণের

জন্ত প্রয়োজন এবং তাহার নিজের ৫০০০ টাকা সঞ্চয় নাই। খএর ৫০০০ টাকা সঞ্চয় আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার বুদ্ধি নাই। কাজেই খএর পক্ষে সঞ্চিত অর্থ একেজো ফেলিয়া না রাখিয়া এমনভাবে প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত যাহাতে ৫০০০ টাকার বিনিময়ে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। ক সেই সম্ভাবনার পথ দেখাইয়া দিল। কাজেই ধরা যাউক খ তাহার সঞ্চিত ৫০০০ টাকা কএর ব্যবসায়ে ধার দিতে রাজী হইল। এখন ক এবং খ উভয়ের পক্ষে বিশেষ চিন্তার বিষয়—কএর ভাবিবার বিষয় যে খএর নিকট হইতে তাহাকে ধার করিতে যে সুদ দিতে হইবে, ধারের অর্থ খাটাইয়া তাহার চেয়ে অধিক আয় হওয়া প্রয়োজন। যদি শতকরা ৫ টাকা সুদ হয় তাহা হইলে এক বৎসরে খ কে সুদ বাবদে ২৫০ টাকা দিতে হইবে। কিন্তু যদি ঐ ৫০০০ টাকা খাটাইয়া ২৫০ টাকার অতিরিক্ত আয় করা না যায় তাহা হইলে তাহার নিজস্ব কিছুই রহিল না, অথবা যদি ২৫০ টাকার কম আয় হয় তাহা হইলে তাহার লোকসান হইল এবং ঐ ৫০০০ টাকা অতিরিক্ত খাটানোর জন্ত যে লোকসান উহা তাহার লাভ হইতে দিতে হইবে। কাজেই ক তখনই ব্যবসায় প্রসার করিতে ঋণ করিবে যখন ঋণের উপর যে সুদ দিতে হইবে তাহা হইতে তাহার ঋণকৃত মূলধন হইতে আয়ের পরিমাণ বেশী হইবে।

খএর পক্ষে ভাবিবার বিষয় এই যে কএর ব্যবসায়ে তাহার সঞ্চয় ধার দিলে ভবিষ্যতে আদায় হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তাহা হইলে খ কে ঋণ দিয়া ঝুঁকি (Risk) গ্রহণ করিতে হইতেছে। সুতরাং ঝুঁকির মূল্য বাবদ সে সুদ দাবি করিবে। কিন্তু কএর ব্যবসায়ে ঋণ দিলে খ কে যে পরিমাণ ঝুঁকি লইতে হইবে সরকারী ঋণপত্রে (Treasury Bond) বিনিয়োগ করিলে তাহার ঝুঁকি অনেক কম হইবে। সুতরাং সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিতেই খ প্রয়াসী হইবে। এ-

ক্ষেত্রে তাহা হইলে ঋ অতিরিক্ত ঋঁকির জন্ম কএর নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্রে যে হারে স্ৰদ পাওয়া যাইবে তাহার অতিরিক্ত হারে স্ৰদ দাবি করিবে। যদি সরকারী ঋণপত্রে শতকরা ৩ টাকা স্ৰদ পাওয়া যায় আর কএর ব্যবসায়ে ঋণ দিলে শতকরা ৫ টাকা স্ৰদ পাওয়া যায় তাহা হইলে ঋ হয়ত ঋণ দিয়া শতকরা ২ টাকা বেশী আয় করিতে চেষ্টা করিবে।

তৃতীয়ত, ঋণ গ্রহণ না করিয়া ক থএর সহিত এমত চুক্তি করিতে পারে ঋ যে-পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিবে ব্যবসায়ের লাভে সে সেই অল্পপাতে অংশ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ ঋ কে ব্যবসায়ের একজন অংশীদার হিসাবে ৩। অংশীদার গ্রহণ গ্রহণ করা হইবে। এক্ষেত্রেও থএর বিবেচ্য বিষয় হইল যে ব্যবসায়ের অংশীদার হইলে সে মূলধনের উপর কি হারে লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতির মত এক্ষেত্রেও ঋ বিবেচনা করিবে যে ঋঁকি গ্রহণ নু করিয়া সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিয়া তাহার আয় বেশী হইবে কিংবা ঋঁকি লইয়া ক এর ব্যবসায়ে অংশীদার হইবে। অবশ্য এ-বিবেচনা ক কেও করিতে হইয়াছে যখন প্রথম সে তাহার সঞ্চিত অর্থ লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে।

চতুর্থত, ব্যবসায়ী যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে তাহার ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমীচীন হইবে তাহার প্রাপ্য মূনাফা হইতে কিছু অংশ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা। ইহাকেই ৪। স্বয়ংক্রিয় বলা যায়, স্বয়ংক্রিয় উপায় মূলধনকরণ (Self-financing of Capital or Autofinancing)। ইহাকে মূনাফা মূলধন করণও (Capitalisation of profit) বলে। মূনাফার সম্পূর্ণই ব্যবসায়ী তুলিয়া না লইয়া প্রতিবৎসর কিয়দংশ ব্যবসায়ে রাখিয়া দিলে বেশ কিছুদিন পর প্রয়োজন পরিমাণ মূলধন সঞ্চয় হইতে পারে। এই পদ্ধতির প্রয়োজন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে বিশেষত যোথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে (Joint Stock Company)। কারণ, যোথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিতে পারিবে তাহা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা বিশেষে সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। আবার যোথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হইবার পর প্রারম্ভিক মূলধনের পর মূলধন বাড়াইতে হইলেও সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে মূলধন বাড়াইবার অনুমোদন পাওয়া যায় না বলিয়া বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে অথবা মূনাফা মূলধনকরণ দ্বারা মূলধনের প্রয়োজন মিটানো হয়।

পঞ্চমত, ইহার কোন উপায়েই যদি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে

৫। ভাড়া ক্রয় বা ব্যবসায়ী অনুসন্ধান করে যে মূলধন দ্বারা যে সমুদয় সম্পদ কিস্তীবন্দী ক্রয়ে সংগ্রহ করা আবশ্যিক তাহা ভাড়া পাওয়া যায় কিনা। ভাড়া দিয়া সংগ্রহ করিতে পারে অথবা ভাড়া ক্রয় নিয়মে অথবা কিস্তীবন্দী ক্রয় নিয়মেও আবশ্যিকীয় সম্পদ ক্রয় করিতে পারে।

অধুনা ভাড়া ক্রয় নিয়মে এবং কিস্তীবন্দী ক্রয় নিয়মে ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছে। ভাড়া ক্রয় ও কিস্তীবন্দী ক্রয়বিজয়ের স্ববিধা-অস্ববিধা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

মূলধন গঠন (Formation of Capital) : একথা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে যে সঞ্চিত অর্থ যখন ব্যবসায়ে সম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তখন তাহাকে মূলধন বলে। তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সমাজে সঞ্চয় যত বাড়িবে, সেই সঞ্চয় কাজে খাটাইয়া সম্পদ সঞ্চয় যত বাড়ে উৎপাদনের পথও তত সহজ হইবে। সঞ্চয়ই দেখা যাইতেছে মূলধনও তত বেশী মূলধনের মাপকাঠি। উন্নত দেশসমূহে, যেখানে মাথাপিছু আয় হয় খুব বেশী, সঞ্চয়ও বেশী হয়। আর অল্পন্নত দেশসমূহে, যেখানে সাধারণের মাথাপিছু আয় কম, দেখা যায় মূলধনের অপ্রাচুর্য। ভারতের শিল্প-ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাইবে যে শিল্পে অল্পন্নত অবস্থার অল্পতম কারণ মূলধন সংগ্রহের অস্ববিধা। তাই নিজের দেশের মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর বলিয়াই বিদেশী মূলধন নিয়োগের প্রদ্বাণ এত গুরুত্বপূর্ণ। একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে ভারতের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমান পর্যায়ে পৌছিতে বিদেশী মূলধন, বিশেষত ব্রিটিশ মূলধন যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বল্পকাল পর স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঐ পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করিবার জন্ত ভারতবর্ষের নিজস্ব মূলধন ছিল অপ্রচুর, তাই প্রদ্বাণ উঠিয়াছিল বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের। একথা তোমরা বোধ হয় জান যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রেট ব্রিটেনের আর পূর্বের সেই বাণিজ্যিক একাধিপত্য ছিল না কারণ গ্রেট ব্রিটেনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমস্যা দেখা দিল শিল্প পুনর্গঠনের (Rehabilitation of Industries)। তাই গ্রেট ব্রিটেনের স্থান অধিকার করিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা (Marshall Aid Plan) ; আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (World Bank or International Bank for Reconstruction and Development) ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক দিক হইতে অল্পন্নত দেশগুলিকে শিল্পসম্ভার ও নগদান অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। যদি ঐ সাহায্য না পাওয়া যাইত তাহা হইলে ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কতটা ফলপ্রসূ হইত তাহা বলা কঠিন।

তাহা হইলে একথা বুঝা যাইতেছে যে দেশে যদি প্রচুর সঞ্চয় থাকিত তাহা হইলে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ করার প্রদ্বাণ উঠিত না। সুতরাং প্রদ্বাণ হইতেছে মূলধন কি করিয়া গঠন হইতে পারে? সহজ উত্তর হইতেছে সঞ্চয় হইলেই মূলধন গঠন হইতে পারে। সঞ্চয় কি উপায়ে হইতে পারে? অর্থাৎ কি কি অবস্থার উপর সঞ্চয় নির্ভর করে? একথা পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয় অস্ত্রায় হইবে না যে

কেবল সঞ্চয় হইলেই মূলধন গঠন হয় না, সেই সঞ্চয় যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয় তখনই তাহা মূলধনে পরিণত হয়।

যে সকল কারণে সঞ্চয় হয় (Factors responsible for Saving) :

প্রথমত, লোকে আয়ের সম্পূর্ণ অংশই যদি ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় না করে তাহা হইলে যে অংশ সত্তা সত্তা ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় হয় না উহাই সঞ্চয় হয়।

সঞ্চয় গঠন

কিন্তু লোকের আয় যদি এত কম হয় যে আয় সম্পূর্ণই জীবন-ধারণে প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে ব্যয় হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। দুই ব্যক্তির আয় তুলনা করিলেই একথাটি পরিষ্কার হইতে পারে। ক'এর মাসিক আয় ১০০০ টাকা আর খ'এর মাসিক আয় ২০০ টাকা। ক'এর ১০০০ টাকা হইতে তাহার ও তাহার পরিজনবর্গের জীবনধারণের জন্ত মনে কর ৫০০ টাকা ব্যয় হইল। তাহার সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে বাকী ৫০০ টাকা হইতে ক' আরও ২০০ টাকা ব্যয় করিল।

১। সঞ্চয়ের ক্ষমতা তাহা হইলে ক'এর পক্ষে ৩০০ টাকা সঞ্চয় হইল। কিন্তু খ' যাহার আয় ২০০ টাকা, তাহার পক্ষে সঞ্চয় ত দূরের কথা, তাহার আয় সম্পূর্ণই নিজের ও পরিজনবর্গের জীবনধারণে ব্যায়ত হইবে। খ'এর পক্ষে সঞ্চয় সম্ভব নহে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি এমত হয় যে সাধারণের আয় হইতে জীবন-ধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া আয় কিছুই উদ্ধৃত থাকে না, তাহা হইলে সেই দেশে সঞ্চয় হওয়া এবং ফলস্বরূপ মূলধন গঠন খুবই কষ্টকর। দেখা যাইতেছে যে, সকল লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা সমান নহে। যাহার আয় বেশী, তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ। যাহার আয় সামান্য তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোকের মাথাপিছু গড় আয় বাৎসরিক ১০০ টাকার কম সেখানে সঞ্চয় হওয়া যে কত কষ্টকর তাহার বিশ্লেষণ নিম্নপ্রয়োজন। সঞ্চয় আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মূলধন গঠন সঞ্চয় ক্ষমতার (Power to save) উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের ইচ্ছার (Willingness to save) উপর। সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেই সঞ্চয় হয় না। কারণ, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিবে সে বর্তমানে ভোগ করিয়া বেশী সন্তুষ্টি পাইবে কিংবা বর্তমানে ভোগবিরতি (Abstinence) পস্থা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে

ব্যয় করিলে সন্তুষ্টি বেশী পাইবে তাহার উপর সঞ্চয়ের ইচ্ছা

২। সঞ্চয়ের স্পৃহা

নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ যাহার সন্তান-সন্তাত আছে তাহার পক্ষে সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষা, কন্যার বিবাহ, ইত্যাদির জন্ত ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন অধিক বলিয়া সঞ্চয়ের ইচ্ছা বা স্পৃহা খুবই প্রবল। কিন্তু যাহার সন্তান-সন্ততি নাই, অথবা নিজে দার পরিগ্রহ করে নাই তাহার পক্ষে সঞ্চয়ের স্পৃহা প্রবল নহে। অল্পরূপভাবে, অনেকের মনে বৃদ্ধ বয়সে জীবনধারণের জন্ত সঞ্চয়ের স্পৃহা থাকে। আবার এমনও দেখা যায় যে অনেকে নিজেকে ভোগ হইতে

বঞ্চিত করিয়া সম্ভান-সম্ভতির জন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখে। ধনবান লোক বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছায়ও অনেকে সঞ্চয় করে। মোট কথা তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেই হয় না, সঞ্চয়ের স্পৃহাও থাকা চাই। আবার একথাও সত্য যে সঞ্চয়ের স্পৃহা থাকিলেই হইবে না সঞ্চয়ের ক্ষমতাও থাকা চাই। উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, সঞ্চয় বিনিয়োগের সুবিধার (Opportunity to invest) উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় হইল অথচ সে সঞ্চয় যদি ফলপ্রসূ উপায়ে বিনিয়োগ করা না যায় তাহা হইলে সঞ্চয় করিতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। বিনিয়োগের সুযোগ বলিতে দেশের আর্থিক, বাণিজ্যিক অবস্থার কথা বুঝায় কারণ যে দেশের আর্থিক ও

বাণিজ্যিক অবস্থা খুব নিম্নস্তরে সে দেশে সঞ্চয় হইলেও বিনিয়োগের সুযোগ কম। কাজে কাজেই সেই দেশের লোকদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয় হইবে না। আর্থিক ও বাণিজ্যিক অবস্থার উন্নতির জন্ত সঞ্চয় একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। যাহাদের মাধ্যমে সঞ্চয় বিনিয়োগ হয় সেই সকল প্রতিষ্ঠান যদি যথেষ্ট উন্নত না হয় তাহা হইলে সঞ্চয়কারী বিনিয়োগের সুযোগ পায় না। ব্যাঙ্ক, বীমা, বিনিয়োগ গ্রাস (Investment Trust), সমবায়-সমিতি, ইত্যাদি বিনিয়োগের মাধ্যম। সুতরাং যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছে সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ সঞ্চয় বিনিয়োগের সুযোগ খুব সহজেই পায়। সুতরাং তাহাদের সঞ্চয়ের স্পৃহাও বাড়ে।

চতুর্থত, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপরও সঞ্চয়ের স্পৃহা নির্ভর করে। রাজনৈতিক অবস্থা যদি এমনতরো গোলমালপূর্ণ হয় যে জনসাধারণ সর্বদাই নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত থাকে তাহা হইলে সঞ্চয় করার স্পৃহা আদৌ থাকে না।

আবর্তন (Turnover) : আবর্তন বলিতে ব্যবসায়ে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার গড়পড়তা সত্তার (stock of goods) পূরণ করার প্রয়োজন হয় তাহাকেই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে হইতে সত্তার আবর্তনই (stock turnover) বুঝায়। অনেকের মতে সত্তার আবর্তন না বলিয়া মূলধন আবর্তন (capital turnover) বলাই সঙ্গত। যেভাবেই প্রকাশ করা

হউক আবর্তনের স্থূল অর্থ—ব্যবসায়ে যে দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই দ্রব্য কতবার পূরণ করা হয়। এমন দ্রব্য আছে যাহা দৈনিকই পূরণ করার আবশ্যক হয় আবার এমন দ্রব্য আছে যাহা মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক পূরণ করিতে হয়। একজন পানওয়ালাকে দৈনিকই প্রায় পানের সত্তার পূরণ করিতে হয়। কিন্তু একজন মুদীদোকানওয়ালার হস্তে সত্তাহে একবার দ্রব্য

পূরণ করিবে। আবার মোটরগাড়ী বিক্রিতে হয়ত বৎসরে একবার মোটরগাড়ীর সম্ভার পূরণ করিবে। স্বত্বে বাবসায়ীকে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য পূরণ করিতে হয় উহাই আবর্তন বা সম্ভার আবর্তন। উপরের উদাহরণ হইতে ইহা স্বত্বেই প্রতীয়মান হয় যে ব্যবসায়ের প্রকৃতির উপর আবর্তন নির্ভর করে।

আবর্তনের গুরুত্ব (Importance of turnover) : ব্যবসায় ছোট, মাঝারি কিংবা বড় যে আকারেরই হউক না কেন, সম্ভার আবর্তনের গুরুত্ব সকলের নিকটেই সমান। দ্রুত ও শীঘ্র গতিতে সম্ভার আবর্তন করিবার প্রয়োজন

হইলে উহাই ব্যবসায়ের সুনাম সূচনা করে। কারণ ব্যবসায়ের মূলধন আবর্তন যত বেশী হয় ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থাও তত বেশী উজ্জ্বল হয়। মজ্জেল (client) অধিক বলিয়াই সম্ভার পুনঃপুনঃ পূরণ করার প্রয়োজন হয়। একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবসায়ের প্রকৃতির উপরও সম্ভার আবর্তন নির্ভর করে। একজন মন্তব্য ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায় প্রত্যহই সম্ভার আবর্তনের প্রয়োজন হয় (বর্তমান সময়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ অবস্থায় অবশ্য ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়াছে)। কিন্তু একজন আসবাবপত্র বিক্রেতার পক্ষে তত দ্রুত সম্ভার আবর্তন না হইলেও ক্ষতির সম্ভাবনা কম। কারণ আসবাবপত্র ত আর একদিনেই নষ্ট হইয়া যাইবে না।

দ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী কি ক্ষণস্থায়ী যাহাই হউক না কেন যে দ্রব্য সে বিক্রয় করিবার জন্ত ক্রয় করে উহা যাহাতে অতি সহজ বিক্রয় করা যায় সেদিকে সকল ব্যবসায়ী বিশেষ লক্ষ্য রাখে। ব্যবসায়ী কখনও চাহে না যে তাহার মূলধন আটক থাকুক, দীর্ঘদিন পরে একবারে অধিক মুনাফায় সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে। কারণ দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিয়া অধিক মুনাফায় বিক্রয় করার বিপদও আছে। যতদিন অপেক্ষা করিতে থাকিবে সেই সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ের অধিকতর প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে ; যে দ্রব্য সে ব্যবসায় করে সেই দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন পরিবর্তিত দ্রব্য বাহির হইতে পারে ; সমাজে লোকের রুচির পরিবর্তন হইতে পারে। এই সমস্ত কারণেই ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়-নীতি এমনভাবে স্থির করে যাহাতে দ্রুত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় হয়।

কোন ব্যবসায়ী ১০০০ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া বসিয়া রহিল ভবিষ্যতে যে-সময় দ্রব্যের মূল্য বেশ বাড়িবে তখন সে বিক্রয় করিবে। মনে কর, এক বৎসর সময় সে যদি অপেক্ষা করিতে থাকে তাহা হইলে ঐ এক বৎসর তাহাকে দ্রব্য গুদামজাত করিতে হইবে। গুদামের ভাড়া, ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় ইত্যাদি সমুদয়ই তাহাকে বহন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত ব্যয় বাবদ যদি তাহাকে ঐ সময়ের মধ্যে ১০০ টাকা ব্যয় করিতে হয় এবং সে যদি ক্রয়মূল্যের উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে লাভও করে তাহা হইলেও তাহার নিজের কিছুই

রহিল না। কিন্তু উহার চেয়ে ব্যবসায়ী যদি শতকরা ২ টাকা হারে লাভ লইয়া বিক্রয় করিত তাহা হইলে হয়ত ২ মাসের মধ্যেই বিক্রয় হইত। ফলে প্রতি ২ মাস অন্তর তাহাকে পুনরায় ১০০০ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিতে হইত এবং বৎসরে ৬ বার দ্রব্যসত্তার পূরণ করার আবশ্যক হইত, এবং প্রতিবারে শতকরা ২ টাকা হারে ২০ টাকা আয় করিলে ৬ বারে ১২০ টাকা আয় করিতে পারিত। ব্যবসায়ীর পক্ষে দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই কাম্য কারণ ইহাতে মূলধন অধিক দিন আটক থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরন্তু, মূলধন আবর্তনের ফলে তাহার লাভও হয় বেশী।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যবসায়ী যত সম্ভায় সম্ভব দ্রব্য ক্রয় করিয়া অধিক মুনাফায় বিক্রয় করিতে প্রয়াসী হয়। মনে কর, ক প্রতি কুইন্টেল চাউল ১০ টাকা মূল্যে ১০ কুইন্টেল চাউল ক্রয় করে এবং প্রতি কুইন্টেল ১২ টাকা দরে বিক্রয় করে। এইভাবে প্রতি মাসেই একবার ক্রয় করে এবং মাসের মধ্যেই ১০ কুইন্টেল চাউল সম্পূর্ণ বিক্রয় করে। তাহা হইলে তাহার সম্ভারের আবর্তন ১২ বার এবং বৎসরে তাহার মুনাফা $২ \times ১০ \times ১২$ টাকা = ২৪০ টাকা।

খ প্রতি কুইন্টেল চাউল ১০ টাকা মূল্যে ১০ কুইন্টেল চাউল প্রতি ১৫ দিনে ক্রয় করে এবং সম্পূর্ণই ১১'২৫ টাকা দরে প্রতি ১৫ দিনে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলে খ এর ব্যবসায় দ্রব্য আবর্তন হয় ২৬ বার এবং তাহার মুনাফা হয় $২৬ \times ১০ \times ১১'২৫$ টাকা = ৩২৫ টাকা। গ প্রতি কুইন্টেল চাউল ১০'২৫ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রতি সপ্তাহে ১০ কুইন্টেল চাউল ১১ টাকা দরে বিক্রয় করিতে পারে। গ এর ব্যবসায় সম্ভার আবর্তন হয় ৫২ বার। সুতরাং তাহার মুনাফা হয় $৫২ \times ১০ \times ১১$ টাকা = ৩২০ টাকা।

ক, খ ও গ তিনজন ব্যবসায়ীরই উদ্দেশ্য একই। তিন জনেই চাহে যে প্রতিযোগিতায় অপর দুই জনকে হটাইয়া দিবে এবং সর্বাধিক মুনাফা আয় করিবে। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তিন জনে তিন প্রকার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ক এর নীতি সবচেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করিয়া সবচেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় করা। ফলে তাহার সম্ভার আবর্তন হইল সবচেয়ে কম এবং মুনাফাও কম। খ এর নীতি হইল যে কুইন্টেল প্রতি মুনাফা কম হইলেও

আবর্তন বাড়াইয়া মুনাফার পরিমাণ বাড়ান। গ-ও অধিক আবর্তনের ফলে মুনাফার পরিমাণ বাড়ান এই নীতিতে বিশ্বাস করে এবং সেই উদ্দেশ্যে সে সর্বাধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া কুইন্টেল প্রতি কম মুনাফায় বিক্রয় করিতে নারাজ নহে।

একদিকে গ বিক্রয়মূল্যের দিক হইতে তাহার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের হটাইয়া অধিক বিক্রয় করিতে পারে, অন্তরিক্তে তেমনি সে ক্রয় ব্যাপারেও তাহার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অধিকতর সুযোগ পাইতেছে। কারণ ক ও

এর তুলনায় গ যখন অধিক মূল্য দিতে রাজী তখন বিক্রেতাও তাহার নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিতে অধিক প্রয়াসী।

সম্ভার আবর্তন বাহির করার নিয়ম (Method of determining turnover) : উপরের উদাহরণে এমত ধারণা হইতে পারে যে ব্যবসায়ী যতক্ষণ তাহার ক্রীত সম্পূর্ণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে না পারে ততক্ষণ পুনরায় দ্রব্য ক্রয় করে না। কিন্তু একথা সত্য নহে। ব্যবসায়ীকে সর্বদাই চাহিদা অনুমান করিয়া সম্ভার রাখিতে হয়। বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই আবার তাহাকে দ্রব্য পূরণ করিতে হয়। কাজে কাজেই ব্যবসায়ীর পক্ষে খুব নিভুলভাবে সম্ভার আবর্তন বাহির করা সম্ভব নাও হইতে পারে। এই কারণে গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভার আবর্তন বাহির করা হয়।

$$\text{আবর্তন} = \frac{\text{একক ক্রয়মূল্যে বিক্রয়ের পরিমাণ}}{\text{গড় সম্ভার}}$$

উপরের সমীকরণের সাহায্যে সম্ভার আবর্তন বাহির করিতে হইলে গড় সম্ভার ও বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য বহির করিয়া লইতে হয়।

ব্যবসায়ী যখন বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সম্পূর্ণ বিক্রয় হওয়ার পূর্বেই পুনরায় দ্রব্য ক্রয় করে, তখন বৎসরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তাহার সম্ভারের হিসাব গ্রহণ করিতে হয়। মনে করা যাউক বৎসরে প্রতি তিন মাস অন্তর চারিবার সম্ভারের হিসাব লওয়া হয়। কোন ব্যবসায়ে দেখা গেল ১লা জানুয়ারী সম্ভারের মূল্য ১৫০০

টাকা, ১লা এপ্রিল ১৮০০ টাকা, ১লা জুলাই ১২০০ টাকা, ১লা অক্টোবর ১১০০ টাকা। সুতরাং সম্ভারের গড় $(১৫০০ + ১৮০০ + ১২০০ + ১১০০) \div ৪ = ১৪০০$ । ব্যবসায়ে বৎসরের গড় সম্ভার ১৪০০ টাকা।

বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য বাহির করিতে হইলে মোট বিক্রয়মূল্য হইতে মুনাফা বাদ দিতে হয়। পুনরায় মনে করা যাউক ব্যবসায়ী প্রতিটি দ্রব্য শতকরা ২৫ টাকা লাভে বিক্রয় করে। তাহা হইলে ক্রয়মূল্য যখন ১০০ টাকা তখন বিক্রয়মূল্য ১২৫ টাকা। ব্যবসায়টিতে বৎসরে বিক্রয় ৮৭৫০ টাকা। ৮৭৫০ টাকা বিক্রয়মূল্যের মধ্যে ক্রয়মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ মুনাফা। সুতরাং মোট বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ লাভ। যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ৮৭৫০ টাকা পাওয়া গেল উহার ক্রয়মূল্য $৮৭৫০ - ১৭৫০ = ৭০০০$ । ক্রয়মূল্য নিম্ন উপায়েও বাহির করা যায়—

$$\begin{array}{rcl} \text{বিক্রয়মূল্য } ১২৫ \text{ ক্রয়মূল্য } & ১০০ & \\ \text{,, } ৮৭৫০ \text{ ,, } & \frac{১০০}{১২৫} \times ৮৭৫০ = ৭০০০। & \end{array}$$

তাহা হইলে যে সমীকরণটি উপরে দেওয়া হইল সেইটি প্রয়োগ করিলে সম্ভার আবর্তন হয় ৫ বার।

সস্তার আবর্তন = $\frac{\text{বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য}}{\text{গড় সস্তার}}$

$$= \frac{১০০০}{১৪০০} = ৫। \text{ অর্থাৎ, এই ব্যবসায়টিতে বৎসরে ৫ বার দ্রব্য}$$

পূরণ করিবার প্রয়োজন হয়।

সস্তার আবর্তন এবং বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য দেওয়া থাকিলে গড় সস্তার বাহির করিতে হইলে বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্যকে আবর্তন দ্বারা ভাগ করিতে হয়। বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ÷ আবর্তন।
 $১০০০ ÷ ৫ = ১৪০০$ গড় সস্তার।
 ক্রয়মূল্যকে আবর্তন দ্বারা ভাগ করিলে দ্রব্য সস্তার পাওয়া যায়।
 গড় সস্তারকে আবর্তন দ্বারা গুণ করিলে ক্রয়মূল্যও বাহির করা সহজ। বিক্রীত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য = গড় সস্তার × আবর্তন অর্থাৎ $১৪০০ \times ৫ = ১০০০$ । সস্তার আবর্তনকে মূলধন আবর্তনও বলে (Turnover of stock is also called turnover of Capital)।
 মূলধন আবর্তন বলিতে এখানে কার্যকরী মূলধন আবর্তনকেই বুঝায়।

যে মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্রব্য সস্তার ক্রয় করা হয় উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকরী মূলধন। তাহা হইলে মূলধন আবর্তন দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করা হইতে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্য আদায় করাকে বুঝায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যবসায়ী ধারে দ্রব্য ক্রয় এবং বিক্রয় করে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে আবর্তন বাহিব করা একটু কষ্টকর। যখন নগদান ক্রয়-বিক্রয় হয় তখন ক্রয়মূল্য শোধ ও বিক্রয়মূল্য আদায় হইলেই আবর্তন শেষ হয় কিন্তু ধারে ক্রয়বিক্রয়ে কয়েকটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

ধারে ক্রয়ে ১ম স্তর দ্রব্যের বিলি গ্রহণ—২য় স্তর ধারের মেয়াদ অস্তে মূল্য শোধ। ধারে বিক্রয়ে—১ম দ্রব্যের বিলি দান—২য় বিক্রয়মূল্য আদায়।

ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের সস্তার আবর্তনও পরিবর্তন হয়। নগদান ক্রয়বিক্রয় হইলে ক্রয়মূল্য প্রদান ও বিক্রয়মূল্য আদায় এই দুইটি সময়ের মধ্যেই একবার আবর্তন হয়।

কিন্তু যেখানে ধারে ক্রয়বিক্রয় হয় সেখানে আবর্তনের কয়টি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ধারে ক্রয়ে যেদিন দ্রব্যের বিলি গ্রহণ করা হইল সেইদিন ব্যবসায়ীর নিজস্ব কোনও মূলধন প্রয়োগ করা হইল না বটে কিন্তু সে তাহার উত্তমর্গের (Creditors) মূলধন প্রয়োগ করিল। ফলে উহা তাহার ব্যবসায়ের কার্যকরী মূলধন। তাহার ব্যবসায়টির মোট মূলধন আবর্তন তখনই সমাপ্ত হইবে যখন ধারে ক্রীত দ্রব্য ধারে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়মূল্য আদায় হইবে।

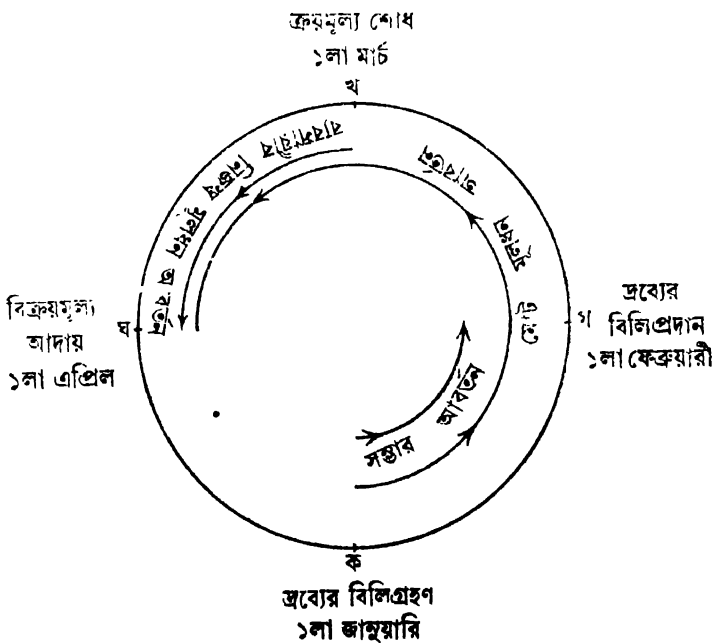
কিন্তু যদি ব্যবসায়ী তাহার নিজস্ব মূলধনের আবর্তন বাহির করিতে চাহে

তাহা হইলে যে সময় সে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য শোধ করিল সেই সময় হইতে ধারে বিক্রয় করিয়া যখন ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিবে সেই সময় তাহার নিজস্ব মূলধন আবর্তন শেষ হয়।

দ্রব্য ক্রয় হইতে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে সম্ভার আবর্তন বলিতে আরম্ভ করিয়া দ্রব্য (অবশ্য যখন ধারে ক্রয়বিক্রয় হয়) দ্রব্যের বিলি গ্রহণ করিয়া বিক্রয় ও মূল্য দ্রব্যের বিলি প্রদান করিলেই সম্ভার আবর্তন হয়।

আদায় শেষ হইলে একটি চিত্রের সাহায্যে মূলধন ও সম্ভার আবর্তন দেখান আবর্তন শেষ হয় যাউক।

ক্রয় বিক্রয়
দ্রব্যের বিলি গ্রহণ দ্রব্যের মূল্য শোধ দ্রব্যের বিলি প্রদান দ্রব্যের মূল্য আদায়
ক —→ থ —→ গ —→ ঘ
ব্যবসায়ের মোট মূলধন আবর্তন ক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘএ শেষ। ব্যবসায়ের নিজস্ব মূলধন থ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘএ আবর্তন শেষ। দ্রব্যের আবর্তন ক হইতে আরম্ভ করিয়া গএ শেষ।



মুনাফা (Profit): প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য মুনাফা আয় করা—
একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রয়মূল্য হইতে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়াই

ব্যবসায়ী মুনাফা পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিক্রয়মূল্য হইতে ক্রয়মূল্য বাদ দিলে যাহা বাকী (অবশিষ্ট) থাকে তাহাই মুনাফা।

একটি বিশদভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ব্যবসায়ী যে মুনাফা আয় করে উহার মধ্যে কতিপয় উপাদান থাকে যাহা অনেক ক্ষেত্রে আমরা পৃথকভাবে বিবেচনা করি না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত হয়। কাঁচামাল (Land), শ্রমিক (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন মুনাফা (Organisation)।

অর্থনীতিতে কাঁচামাল বাবদে যে মূল্য দেওয়া হয় উহাকে বলে খাজনা (Rent); শ্রমিকের মজুরিকে বলে মজুরি (Wage); মূলধন প্রয়োগের জন্য যে মাস্তুল দিতে হয় উহাকে বলে সুদ (Interest) এবং সংগঠন (Organisation) বাবদ যে মূল্য দেওয়া হয় উহাই মুনাফা (Profit)।

এক্ষেত্রে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন যে সংগঠনের ও ব্যবস্থাপনার ভার যদি মালিকের নিজের হাতেই থাকে তাহা হইলে মুনাফা কি নিয়মে বাহির করা হইবে। এক-মালিকানা ও অংশীদারী ব্যবসায়ে মালিক অথবা মালিকবৃন্দ নিজেরাই ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই ব্যবসায় পরিচালনা করে। এরূপক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সুদ ও ব্যবস্থাপনার মজুরি দুইই পাইতে পারে এবং পাইয়া থাকে।

মুনাফার উপাদান

১। সুদ

তাহা হইলে ব্যবসায়ী যে মুনাফা পাইয়া থাকে উহাতে দুইটি উপাদান পাওয়া গেল। প্রথমত সুদ, দ্বিতীয়ত

ব্যবস্থাপনার মজুরি।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় উপাদান রহিয়াছে যাহা মুনাফায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, মূলধন নিয়োগ করিয়া সুদ গ্রহণ করিলেও ব্যবসায়ীকে কিছু ঝুঁকি লইতে হয়। একথা উদাহরণের সাহায্যে পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে সরকারী ঋণপত্রে (Treasury Bond) নিয়োগ করিয়া শতকরা ৩ টাকা সুদ পাইতে পারে কিন্তু সেই একশত টাকাই যদি সে ব্যবসায়ে নিয়োগ

২। ঝুঁকির মূল্য করে তবে নিশ্চয়ই শতকরা ৩ টাকার অধিক আয় করিতে চায়, নচেৎ ব্যবসায়ে সে অর্থ নিয়োগ করিত না। এখন যদি বৎসরান্তে দেখা যায় যে সুদ বাবদ প্রাপ্য ৩ টাকা না লইয়া তাহার পাওনা হয় ৫ টাকা, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মূলধন নিয়োগ করিয়া যে ঝুঁকি লইয়াছে সেই ঝুঁকির মূল্য ২ টাকা অর্থাৎ, ৫ টাকা হইতে সুদ বাবদ ৩ টাকা বাদ দিলে ২ টাকা রহিল, উহাই ঝুঁকির মূল্য।

আবার অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে একই প্রকারের দুইটি ব্যবসায় একই স্থবিধা-অস্থবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে। কিন্তু একটি ব্যবসায়ে অপরটির তুলনায় অধিক লাভ হইতেছে। এই ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবসায়টি যে তুলনায় অধিক

মুনাফা বা লাভ করিতেছে উহার হেতু কি? আপাতদৃষ্টিতে দুইটি ব্যবসায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তাহা হইলে ব্যবসায়ের নিজস্ব ৩। ব্যবস্থা ও কোন গুণ আছে যাহার জন্তই সেই অতিরিক্ত লাভ পরিচালনার কৌশল হইতেছে। উহাকেই ব্যবসায়ীর নিজস্ব কৌশল বলা হয়। ইহা হইল চতুর্থ উপাদান।

আবার অনেক সময়ে দেখিতে পাঁইবে যে ব্যবসায়ী যে বিক্রয়মূল্য স্থির করে, যাহাকে নিরূপিত মূল্য (Marked Price) বলে, উহা হইতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। মনে কর, সাধারণ সময়ে বাজারে চিনি প্রতি কিলোগ্রাম ১

৪। স্বাভাবিক টাকা দরে বিক্রয় হয়। এই এক টাকার মধ্যে ব্যবসায়ী তাহার স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) ধরিয়া লইয়াছে, কিন্তু পূজার বাজারে হঠাৎ চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় ফলে প্রতি কিলোগ্রাম ১ টাকা ২৫ নঃ পঃ দরে বিক্রয় করিতেছে। তাহা হইলে প্রতি কিলোগ্রামে ২৫ নঃ পঃ করিয়া ব্যবসায়ীর আকস্মিক লাভ হইল।

৫। আকস্মিক লাভ এই আকস্মিক লাভ সে প্রত্যাশা করে নাই বা তাহার নিরূপিত মূল্যে এই আকস্মিক লাভ ধরা হয় নাই। তাহা হইলে আকস্মিক লাভ (Windfall Profit) হইল পঞ্চম উপাদান।

অর্থনীতিবিশারদগণ গবেষণা করিয়া ইহাও স্থির করিয়াছেন যে ব্যবসায়ী

অনেক সময়ে বিশেষ সুবিধার জন্ত স্বাভাবিক আয় হইতেও ৬। ব্যবসায়ের অধিক আয় করিতে পারে। যেমন, মনে কর কলিকাতা একচেটিয়া অধিকার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে বিজলী (Electricity) সরবরাহের একাধিকার বা একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু কোন প্রতিযোগী বিজলী সরবরাহ প্রতিষ্ঠান নাই—সেজন্ত কলিকাতা ও সহরতলীতে বিজলী সরবরাহের জন্ত কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যে মূল্য দাবি করিবে, ভোগকর্তাগণ তাহাই দিতে প্রস্তুত থাকিবে। সুতরাং যদি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে হয়ত মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাকা মুনাফা করিত। প্রতিযোগী ব্যবসায়ী না থাকার দরুন সেই ব্যবসায় মূলধনের উপর শতকরা ৭ টাকা হারে মুনাফা আয় করে। সুতরাং শতকরা দুই টাকা হিসাবে মুনাফাকে একচেটিয়া মুনাফা বলা যায়।

সুতরাং ব্যবসায়ের মুনাফা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া গঠিত—

ব্যবসায়ীর নিয়োজিত মূলধনের উপর স্বদ; (২) ব্যবস্থাপনার মজুরি; (৩) মূলধনের উপর ঝুঁকির মূল্য; (৪) উন্নততর ব্যবস্থাপনার মজুরি; (৫) আকস্মিক লাভ; (৬) একচেটিয়া কারবারের অধিকার।

ব্যবসাবাণিজ্য অবশ্য মুনকার এতগুলি ভাগ করে না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে মোট

বিক্রয়মূল্য হইতে ক্রয়মূল্য ও আত্মসজ্জিক পরিচালনার ব্যয় বাদ দিয়া যাঁহা মোট মুনাফা ও থাকে উহাই মুনাফা। তবে ব্যবসায়িগণ প্রতি ক্ষেত্রেই মুনাফার দুইটি ভাগ করিয়া থাকে—(১) মোট মুনাফা (Gross Profit); (২) নীট মুনাফা (Net Profit)।

হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার বিশ্লেষণ করা যায়। মনে কর, ক একটি ব্যবসায় স্থাপন করিল। উহাতে এক বৎসরে মোট ক্রয় ৫০০০ টাকা; এখন ৫০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ৬০০০ টাকায় বিক্রয় হইল। তাহা হইলে ব্যবসায়ীর মোট লাভ ১০০০ টাকা। ঐ ১০০০ টাকা হইতে ব্যবসায়ের পরিচালনার জন্ত (management) যেমন—বাড়ীভাড়া, বিজলী আলো, ম্যানেজারের মজুরি, ইত্যাদি বাবদ ৭০০ টাকা ব্যয় হইল, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর নিজস্ব পাওনা ৩০০ টাকা। উহাই তাহার নীট পাওনা ও ব্যবসায়ের নীট মুনাফা। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসায়ে যে-মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করা হয় সম্পূর্ণই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হয় না। অবিক্রীত মাল পরবর্তী হিসাব সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয়। আবার সেই সময়ে কিছু মাল অবিক্রীত থাকে। এই নিয়মেই ব্যবসায় চলিতে থাকে। ব্যবসায়িগণ এইরূপ ক্ষেত্রে যখন মোট মুনাফা বাহির করিবে তখন প্রারম্ভিক সস্তার (opening stock) + নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রয় (purchases) হইতে নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনে অবিক্রীত দ্রব্য বাদ দিলে যাঁহা থাকে তাহাই মোট বিক্রয়। এবারে বিক্রয়মূল্য হইতে মোট ক্রয়মূল্য বাদ দিলে যাঁহা থাকে তাহাই মোট মুনাফা। নিম্নের চকটির সাহায্যে মোট মুনাফা বাহির করার নিয়ম দেখান যাইতেছে :

প্রারম্ভিক সস্তার = ১০০০ টাকা	ক	
	খ	
বৎসরের মধ্যে ক্রয় = ১০০০০ টাকা	গ	
বৎসরের শেষ দিনে অবিক্রীত সস্তার = ২০০০ টাকা	ঘ	

বিক্রয় মূল্য ১২০০০ টাকা
 = বিক্রীত দ্রব্যের
 ক্রয়মূল্য ৯০০০ টাকা
 + মোট মুনাফা ৩০০০ টাকা

ক-খ অংশ প্রারম্ভিক সত্তার (opening stock) ১০০০ টাকা; খ-গ অংশ বৎসরের মধ্যে ক্রয় ১০০০০ টাকা। সুতরাং মোট বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যের ক্রয়মূল্য ১১০০০ টাকা। উহা হইতে বৎসরের শেষ দিনে অবিক্রীত সত্তারের মূল্য ২০০০ টাকা গ-ঘ অংশ বাদ দিলে ৯০০০ টাকার মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করা হইয়াছে। তাহা হইলে ৩০০০ টাকা মোট মুনাফ। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হিসাবরক্ষণে অবিক্রীত মালের মূল্য ক্রয়মূল্য হইতে বাদ না দিয়া বিক্রয় মূল্যের সহিত যোগ দেওয়া হয়, উহাতে মোট ফলের (Results) কোনও তারতম্য হয় না। যেমন—(বিক্রয়মূল্য ১২০০০ + অবিক্রীত মালের মূল্য ২০০০) — (প্রারম্ভিক সত্তার ১০০০ টাকা + ক্রয় ১০০০০) = ৩০০০ টাকা মোট মুনাফ।

প্রত্যেক ব্যবসায়েরই ব্যবসায় পরিচালনায় ব্যয় রহিয়াছে। উহাকে বলা হয় পড়তা ব্যয় (overhead expenses)। ব্যবসায়ের মোট মুনাফ হইতে পড়তা ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট মুনাফ। মোট মুনাফ হইতে পড়তা ব্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ—যেমন, ম্যানেজারের বেতন, ডাকমাণ্ডুল, কমিশন, ইত্যাদি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণও সমান হইলে পড়তা ব্যয় পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ, বিক্রয় যদি ১০০০০ স্থলে ২০০০০ টাকা হয় তাহা হইলে যে দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে উহার পরিমাণও দ্বিগুণ হইবে; যদি বিক্রয়মূল্য (Marked up price) ও ক্রয় মূল্য উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে।

কিন্তু বিক্রয় যে অল্পপাতে পরিবর্তন হয়, পড়তা ব্যয় সেই অল্পপাতে পরিবর্তন হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিক্রয় যদি তিনগুণ হয় তাহা হইলে বিল দিবার ব্যয়—তিনগুণ হয় না হয়ত দ্বিগুণ হইবে। এই কারণেই পড়তা ব্যয় ও বিক্রয়ের হ্রাস হারে বিক্রয় যত বাড়ে মুনাফও তত বাড়ে। কিন্তু বিক্রয় যে হারে কমে পড়তা ব্যয় তুলনায় হয়ত মোটেই কমে না বা কমিলেও সমান হইতে পারে। কোনও কারণে বিক্রয় কমিল বলিয়া স্থির ব্যয় যেমন খাজনা, বেতন ইত্যাদি কমে না। এই উদাহরণ হইতে আরেকটি সিদ্ধান্ত আসা যায় যে পড়তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যয় আছে যাহা পরিবর্তনীয়—যেমন কমিশন। আবার কিছু ব্যয় আছে যাহা স্থির—যেমন খাজনা, বেতন ইত্যাদি।

ব্যবসায়ে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবে যে মোট মুনাফ ও নীট মুনাফ সমান হারে বাড়ে না বা কমে না। অনেক ক্ষেত্রে মোট মুনাফ যে হারে বাড়ে তাহার চেয়ে নীট মুনাফ অধিক হারে বাড়ে। ইহার বিপরীতও সত্য।

বৎসর	মোট বিক্রয় (Turnover)	মোট মুনাফা (Gross Profit)	পড়তা ব্যয় (Overhead Expenses)	নীট মুনাফা (Net Profit)	বিক্রয়মূল্যের তুলনায় নীট মুনাফা শতকরা হারে
১৯৫৮	১০০০০	৭০০	২০০	৫০০	৫
১৯৫৯	১৪০০০	৯৮০	২৩০	৭৫০	৫.৪

উপরের সূচী হইতে দেখিতে পাইবে যে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে বিক্রয়ের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু মোট মুনাফা শতকরা মোটেই বাড়েনি। ১৯৫৮ সালে শতকরা ৭ ; ১৯৫৯ সালেও তাই। কিন্তু নীট মুনাফার হার ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে মাত্র শতকরা .৪ ভাগ বাড়িয়াছে। কারণ, মোট মুনাফা যদিও শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়াছে পড়তা ব্যয় অনুপাতে কম হওয়াতে ১৯৫৯ সালে নীট মুনাফা ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা .৪ ভাগ বাড়িয়াছে।

উপরের আলোচনা ও সূচী হইতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

বিক্রয়মূল্য (Sales অথবা Turnover) = ক্রয়মূল্য (Purchases)
কয়েকটি সিদ্ধান্ত
+ মোট মুনাফা (Gross Profit)।

ক্রয়মূল্য (Purchases) = বিক্রয়মূল্য (Sales) - মোট মুনাফা (Gross Profit)।

মোট মুনাফা = বিক্রয়মূল্য (Sales) - ক্রয়মূল্য (Purchases) ; অথবা নীট মুনাফা (Net Profit) + পড়তা ব্যয় (Overhead Expenses)।

নীট মুনাফা (Net Profit) = মোট মুনাফা (Gross Profit) - পড়তা ব্যয় (Overhead Expenses)।

পড়তা ব্যয় (Overhead Expenses) = মোট মুনাফা (Gross profit) - নীট মুনাফা (Net Profit)।

ব্যবসায়ীর পক্ষে উপরি-লিখিত সকল সংবাদই প্রয়োজন। কারণ, ব্যবসায় পরিচালনা কালে তাহার জানা প্রয়োজন যে ব্যবসায়ে যে লাভ হইতেছে উহা আয় করিতে কি অনুপাতে ব্যয় হইতেছে ; অথবা যে হারে লাভ বাড়িতেছে সেই অনুপাতেই অগ্রান্ত ব্যয় বাড়িতেছে কিংবা কমিতেছে। অবশ্য একথা পুনরুল্লেখ করিতেছি যে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত থাকিলেই এই তুলনা বিশেষ কাঙ্ক্ষনীয় হয়।

এই তুলনা যেমন নিজের পক্ষে আবশ্যক হয় তেমনি যদি কোনও ব্যবসায়ী ব্যবসায় ক্রয় করিতে চলতি ব্যবসায় ক্রয় করিতে চাহে তাহার পক্ষেও প্রয়োজন হয়।
মোট মুনাফা ও ব্যবসায়ী নিজে পূর্ববর্তী বৎসরের সহিত মুনাফার হার তুলনা
নীট মুনাফা পড়তা করিয়া আবশ্যকবোধে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

ব্যয় ইত্যাদির আবার নতুন যে ব্যবসায়ী চলতি ব্যবসায় ক্রয় করিতে চাহে তুলনা প্রয়োজন তাহার পক্ষে একাধিক ব্যবসায়ের সহিত মুনাফার হার তুলনা করিয়া ব্যবসায় ক্রয়োপযোগী কিনা তাহাও বুঝিতে পারে। ব্যবসায়ী তাই বিক্রয়ের সহিত মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার তুলনা করিয়া থাকে।

ব্যবসায়	মোট বিক্রয় বা কূলবিক্রয় (Turnover)	মোট মুনাফা (Gross Profit)	নীট মুনাফা (Net Profit)	বিক্রয়ের অনুপাতে মোট মুনাফার শতকরা হার (% of G. P. in terms of Sales)	বিক্রয়ের অনুপাতে নীট মুনাফার শতকরা হারে (% of N. P. in terms of Sales) *
ক	৫৪০০	১৩৫০	৮১০	২৫	১৫
খ	৬০০০	১৮০০	৯০০	৩০	১৫

* উপরের সূচী হইতে দুইটি ব্যবসায়ের মুনাফা আয়ের ক্ষমতা তুলনা করিলে দেখা যায় যে ক ব্যবসায়ে যদিও মোট মুনাফা শতকরা কম কিন্তু নীট মুনাফা তুলনায় সমান। অর্থাৎ, ক ব্যবসায়ের পরিচালনা অনেক বেশী দক্ষ। এখানে অবশ্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ক ও খ একই মূল্যে ক্রয় করে এবং উভয়ের বিক্রয়মূল্যও (Marked Price) সমান।

কোনও ব্যবসায়ী চলতি ব্যবসায় ক্রয় করিতে মাত্র দুই বৎসরের মুনাফা আয়ের ক্ষমতারই তুলনা করে না পরন্তু কতিপয় বৎসরের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া থাকে। কতিপয় বৎসরের মুনাফার তুলনা করার প্রয়োজন এইজন্য যে ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের ধারা বা গতি (Trend) বুঝিতে পারা যায়। যদি মুনাফার ধারায় ইহা প্রমাণিত হয় যে মুনাফা ধীর গতিতে বাড়িতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু মুনাফার গতি উৎসাহময়ী না হইয়া যদি আধোগামী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল নহে।

কেবলমাত্র মুনাফার তুলনা করিয়াই ব্যবসায়ী ক্রয়মূল্য স্থির করে না

অত্যন্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর ধারে বিক্রয়ের রীতি থাকিলে কেতাকে নজর দিতে হয় যে ব্যবসায়ে রীতি অনুসারে ঊহার সংবাদ গ্রহণও কেতোর আবশ্যক যতই বাড়িবে ব্যবসায়ীর খুঁকি এবং অনাদায়ী ধারের পরিমাণও তত বেশী হইবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবসায়ী অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবসায় বলিয়া মূলধনের উপর হ্রদ ও ব্যবস্থাপনার ব্যয় ধরে না। কিন্তু ব্যবসায়ীর 'নীট মুনাফা' বাহির করিতে হইলে মুনাফা হইতে অন্তান্ত ব্যয়ের মত মূলধনের উপর হ্রদ ও ব্যবস্থাপনা বাবদ প্রাপ্য নিজের মজুরিও ধরিতে হয়। মনে কর, নীট মুনাফা পাওয়া গেল ৭০০ টাকা। উহার মধ্যে হ্রদ ও নিজের মজুরি ধরা হয় নাই। মনে কর, ব্যবসায়ে যে মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে উহা যদি অন্তত ধার দেওয়া হইত অথবা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইত তাহা হইলে ৪০০ টাকা হ্রদ বাবদ পাওনা হইত। আবার ব্যবসায় নিজে না চালাইয়া কোনও তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা চালাইতে হইলে তাহাকে ৪০০ টাকা মজুরি দিতে হইত। তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটি খাতের ব্যয় ধরা হয় নাই বলিয়া তাহার মুনাফা ৭০০ টাকা, কিন্তু যদি ঐ দুইটি খাতে ব্যয় ধরা হয় তাহা হইলে মুনাফা মোটেই থাকে না।

Exercises

১. Define (a) Fixed capital ; (b) Circulating capital ; (c) Used capital

সংজ্ঞা লিখ : (ক) স্থায়ী মূলধন ; (খ) পরিচল মূলধন ; (গ) ব্যবহৃত মূলধন।

২. What is the difference between Production Capital and Revenue Capital ?

উৎপাদন মূলধন ও রাজস্ব-প্রদায়ী মূলধনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩. How are rates of Turnover calculated ? Discuss the relationship between the rapidity of Turnover and Profit.

আবর্তনের হার কিভাবে হিসাব করা যায় ? আবর্তনের দ্রুততা ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কি আলোচনা কর।

৪. What are the conditions of the formation of Capital ?

মূলধন গঠন কি কি অবস্থায় উপর নির্ভর করে ?

৫. What is Profit ? Distinguish between Gross Profit and Net Profit.

মুনাফা কি ? মোট মুনাফার ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

6. From the following Trading Account find the rate of Turnover.

Trading A/c

	Rs.		Rs.
Opening stock	1,500	Sales	12,000
Purchases	9,000	Closing stock	2,500
Gross Profit	4,000		14,500
	14,500		

What is the rate percent of Gross Profit upon Sales ?

নিম্নোক্ত ক্রয়বিক্রয় হিসাব হইতে আবর্তন হার বাহির কর এবং বিক্রয়মূল্যের শতকরা কত মুনাফা হইয়াছে তাহা বাহির কর :

ক্রয়বিক্রয় হিসাব

	টাকা		টাকা
প্রারম্ভিক সঞ্চার	১,৫০০	বিক্রয়	১২,০০০
ক্রয়	৯,০০০	সমাপ্তি সঞ্চার	২,৫০০
মোট মুনাফা	৪,০০০		১৪,৫০০
	১৪,৫০০ =		

সম্ভ্রম অধ্যায়

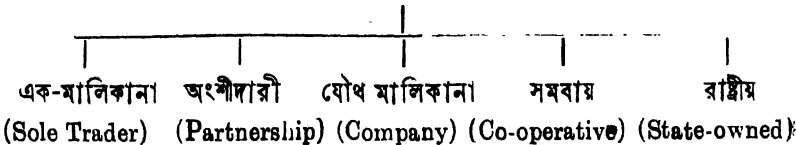
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Business Unit)

যে কোনও দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রূপ সেই দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশে যে সমস্ত আর্থিক সম্পদ পাওয়া যায় প্রধানত তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কার্য-কলাপ চলিতে থাকে। সেইজন্যই দেখা যায় কোনও দেশ শিল্পে উন্নত, কোনও দেশ কৃষিজ উৎপাদনে অগ্রণী। একথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে দেশের শিল্প ও অগ্রগত অর্থনৈতিক কার্যাবলী আবার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত।

বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় বিভিন্ন উপায়ে পরিচালিত হয়। সুতরাং যে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয় সেইভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু দুইটি বিশেষ বিষয়ের উপর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি করিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাগ করা হইয়াছে—
প্রথমত, মালিকানা স্বত্ব; দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপনার ভার।
মোটামুটি উপরিলিখিত দুইটির ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিত কয়ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১। এক-মালিকী ব্যবসায় (Sole Trader or Single Proprietorship Business)
- ২। অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership Business)
- ৩। যৌথ মালিকানা ব্যবসায় (Company form of Business)
- ৪। সমবায় ব্যবসায় (Co-operative Business)
- ৫। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (State-owned Business)

ব্যবসায় (Business)



এক-মালিকানা ব্যবসায় (Sole proprietorship Business) :

এক-মালিকানা
বৈশিষ্ট্য

একজন মাত্র ব্যক্তি কোনও ব্যবসায়ের অধিকারী অথবা মালিক হইলে সেই ব্যবসায়কে এক-মালিকানা ব্যবসায় বলে। এক-মালিকানা ব্যবসায়ের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য :

১। একক প্রচেষ্টা

(১) মালিক একাই ব্যবসায়ের মূলধন যোগায়। হয় তাহার নিজস্ব পুঁজি হইতে নতুবা ঋণ করিয়া আবশ্যকীয় মূলধন সংস্থান করে।

২। একক দায়িত্ব

(২) মালিক একক বলিদ্ধা ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্বও

৩। অবস্থা বুঝিয়া
ব্যবস্থা গ্রহণ

তাহার নিজের। ব্যবস্থাপনার ভার কাহারও সহিত ভাগ বা বন্টন করিয়া লওয়ার উপায় নাই। তাহাকে তাহার ব্যবসায়ের

৪। লাভের অংশ-
ভাগী নাই

একচ্ছত্র অধিপতি বলা যাইতে পারে।

৫। অসীম দায়

(৩) কাহারও নিকট তাহার কার্যের জ্ঞাত জবাবদিহি করিতে হয় না। সে যেমন ব্যবসায়ের মঙ্গল বুঝিবে ঠিক তেমনিভাবেই ব্যবসায় পারিচালনা করিতে পারে।

৬। ক্ষুদ্রাকার

(৪) ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের কোন অংশভাগী থাকে না। ব্যবসায়ের লাভও যেমন সম্পূর্ণই তাহার প্রাপ্য, ব্যবসায়ের লোকসানও তেমনি তাহাকেই সম্পূর্ণ বহন করিতে হয়।

(৫) এক-মালিকানা ব্যবসায়ীর দায় অসীম। ব্যবসায়ের সমস্ত ঋণের ও দায়ের জ্ঞাত ব্যবসায়ী একাই মাত্র দায়ী। অসীম দায় বলিয়া ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জ্ঞাত তাহার নিজস্ব সম্পদও পাওনাদারগণ ক্রোক দিতে পারে। একক মালিকানা ব্যবসায়ের অগ্রাঙ্ক অন্তবিধার মধ্যে ইহাও একটি।

(৬) এক-মালিকানা ব্যবসায় প্রায়শই ক্ষুদ্রাকার হয়।

এক-মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা (Advantages of a Sole Trader's Business) :

সুবিধা :

উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। ফলে যে কল্পপ্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখিতে

১। ভেদবিশেষের
সম্ভাবনা নাই

পাওয়া যায় তন্মধ্যে (১) এক-মালিকানা ব্যবসায় গঠন করা সবচেয়ে সহজ। অংশীদারী ব্যবসায়ের মত ব্যবসায় গঠনের পূর্বে অংশীদারদের মধ্যে নিজেদের দায় ও অধিকারের পরিধি

স্থির করার প্রসঙ্গও নাই, আবার যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংগঠনকালীন আইনের যে কঠোরতা উপলব্ধি করে তাহাও এক-মালিকানা ব্যবসায় প্রযোজ্য নহে। ফলে এক-মালিকানা ব্যবসায় মালিক মনস্থির করিয়া ব্যবসায় চালাইবার মত নিম্নতম মূলধনের সংস্থান করিতে পারিলেই ব্যবসায় স্থাপন করিতে পারে।

(২) এক-মালিকানা ব্যবসায় এক ব্যক্তির আয়ত্তে থাকে বলিয়া ব্যবসায়ী

২। শৃঙ্খলতার

সহিত পরিচালনা

সর্বদাই যাহাতে শৃঙ্খলার সহিত ব্যবসায় পরিচালিত হয় তৎপ্রতি সচেতন থাকে। বস্তুত এক-মালিকানা ব্যবসায় যখন দায়িত্ব বণ্টনের প্রশ্ন নাই তখন মালিক যখনই যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করে তখনই সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

(৩) যদি ব্যবসায় কোনরূপ জটিলতা (Crisis) দেখা দেয় তখন এক-মালিকানা ব্যবসায় যত তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে অতীত কোনপ্রকার ব্যবসায়ই তত তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না।

৩। তৎপরতার

সহিত সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া

এক-মালিকানা ব্যবসায় মালিক নিজেই একমাত্র কমান্ডার (Commander)। অংশীদারী ব্যবসায়ের 'নানা মূর্খির নানা মত' দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া কোনও জটিল অবস্থা সমাধানের পথে আসিতে সময়সাপেক্ষ। হয়ত বা দেখা যাইবে যে অংশীদারগণ এমন সময়ে একটি সমাধানে উপনীত হইল যখন জটিল অবস্থা সমাধানের আর প্রশ্নই উঠেই না।

(৪) একজন মাত্র মালিক বলিয়া এক-মালিকানা ব্যবসায়ের অপচয়ের সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, মালিক সর্বদাই সকল বিষয়ের উপর তাহার সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে।

(৫) মালিকের সহিত কর্মচারীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে বলিয়া কর্মচারীবৃন্দও সর্বদা মনে করে যে ব্যবসায়ের সাফল্য তাহাদেরও অংশ আছে। ইহা ব্যবসায়ের সুনাম (Goodwill) অর্জন করিতে সাহায্য করে।

এক-মালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধা (Disadvantages of a Sole Trader's Business) : যথেষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য নহে যে

অসুবিধা :

১। এক নির্দিষ্ট

পরিধির মধ্যেই

সীমাবদ্ধ

এক-মালিকানা ব্যবসায় কোনরূপ জটিলতা নাই। এক-মালিকানা ব্যবসায় যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রথমত, যখন ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতে থাকে (Expansion) তখন প্রায়ই দেখা যায় যে ব্যবসায় পরিচালনার পক্ষে একজন মাত্রই যথেষ্ট নহে। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় হয়ত ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায়ই সাফল্য লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যবসায় প্রসার লাভ করার সহিত ব্যবস্থাপনাও জটিল আকার ধারণ করিতে পারে। কাজেই তখন হয়ত অপর কাহারও পরামর্শ, বুদ্ধি ও পরিশ্রম ব্যবসায় সাফল্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। যেহেতু মালিক একজন, সেজন্য হয়ত ব্যবসায়টি প্রসারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রসারলাভ করিতে পারিল না। এরকম উদাহরণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিরল নহে।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায় প্রসারের জন্ত যখন অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন

২। প্রয়োজনকালে
মূলধন সংগ্রহের
অনুবিধা

তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যবসায়ীর নিজস্ব পুঁজি হয়ত প্রসারিত ব্যবসায়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অথচ তাহার নিজস্ব সম্পদও বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং এক-মালিকানা ব্যবসায় এক বিশেষ পরিধির

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয়ত, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এক-মালিকানা ব্যবসায়

৩। অসীম দায়
বলিয়া প্রসারের
বাধা

মালিকের দায় অসীম। অসীম দায়ের জন্ত মালিক ব্যবসায় প্রসারের চেষ্টা হইতে অনেক সময়ে বিরত থাকে।

চতুর্থত, এক-মালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা দেখা যায়। মনে কর ক একজন ব্যবসায়ী,

কিন্তু কএর অবর্তমানে কএর পুত্র খ-ও যে সমান খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী হিসাবে প্রমাণিত হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কারণ ইহা খুবই বিরল যে ব্যবসায়ীর পুত্রও ব্যবসায়ী হইবে। কারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিজস্ব, উহা তৈয়ার করা যায় না। সুতরাং হয়ত কএর অবর্তমানে ব্যবসায়ের আর কোনও অস্তিত্বই থাকিবে না।

৪। স্থায়িত্বের
অনিশ্চয়তা

এ অনুবিধা থাকা সত্ত্বেও এবং আধুনিক যুগে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের দিকে

এক-মালিকানা
ব্যবসায় অনুবিধা
সত্ত্বেও টিকিয়া থাকে

ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে এক-মালিকানা ব্যবসায়ের হার নিত্যন্ত কম নহে। ইহার কারণ এই যে এক-মালিকানা ব্যবসায় প্রায় ক্ষেত্রেই খুচরা বিক্রেতা হিসাবে কার্য করে। অসংখ্য ভোগকর্তা বিরাট এলাকায় ছড়াইয়া থাকে বলিয়া আজও এক-

মালিকানা ব্যবসায় লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এক-মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রের ব্যক্তিগত ক্রটির দিকে নজর রাখিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়। কারণ ভোগকর্তাদের যত অধিক সম্বল রাখিতে পারিবে, এক-মালিকানা ব্যবসায়ের সাফল্যও ততই সহজ হয় এবং স্থান্য গঠনে সহায়ক হয়।

যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায় (Joint Hindu family Business) : ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহার মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা (Undivided/Joint family) অন্ততম। এই সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই যে বিশেষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে উহাকেই যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায় (Joint Hindu family business) বলে। এই প্রকার ব্যবসায় হিন্দু সমাজেই প্রচলিত।

পারিবারিক ব্যবসায় বলিয়া ব্যবসায় অনেকাংশে এবং মুখ্যত উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। উত্তরাধিকার আইনের দুইটি ধারা আছে

—‘দায়ভাগ’ ও ‘মিতাক্ষরা’। দায়ভাগ উত্তরাধিকার প্রথা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা বর্তমান। মিতাক্ষরা প্রথা বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমান। দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে বর্তমান মালিকের যৌথ হিন্দু পরিবার সম্পত্তি ও সম্পদে একাধিকার (absolute right)। ব্যবসায় উত্তরাধিকার অর্থাৎ, যতক্ষণ মালিক জীবিত ততক্ষণ তাহারই সম্পত্তিতে আইনে পরিচালিত একাধিকার। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকার-গণের মধ্যে যাহারা পুরুষ তাহাদের মধ্যেই সম্পত্তি সমভাগে বন্টন করা হয়, যদি সম্পত্তির অধিকারী তাহার জীবদ্দশায় কোনরূপ ইচ্ছাপত্র (will) ইত্যাদি তৈয়ার না করে। কিন্তু মিতাক্ষরা নিয়মে যৌথ কারবারের সকল পুরুষ সম্পত্তিতে ভোগাধিকার পায়। একজনের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি অগ্ন্যগ্ন্য সকল পুরুষের মধ্যে ভাগ করা হয়।

যৌথ হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য (Special features of a Joint Hindu family Business) : যৌথ হিন্দু ব্যবসায় বৈশিষ্ট্য :

প্রতিষ্ঠান উত্তরাধিকার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইরূপ ব্যবসায় পরিচালনার ভার গুরুত্ব থাকে পরিবারের কর্তার (Headman) উপর। কর্তার জীবদ্দশায় অগ্ন্যগ্ন্য সকলে ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে কর্তার উপর।

১। কর্তাই সর্বসর্বা দ্বিতীয়ত, কর্তা ব্যবসায়ের মুনাফা উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী যে হারে সম্পত্তিতে অংশাধিকারী সেই হারেই বন্টন করিয়া দিয়া থাকে।

২। উত্তরাধিকার আইন মুনাফার অংশ স্থির করে তৃতীয়ত, যৌথ হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণও অংশীদার হইতে পারে।

৩। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিও মালিক চতুর্থত, হিন্দু যৌথ ব্যবসায়ের অংশীদারগণের নিকট কর্তা হইতে পারে।

৪। বিগত সময়ের লাভ-লোকসানের জ্ঞান জবাবদিহি করিতে বিগত সময়ের হিসাব বাধ্য।

৫। কাহারও পঞ্চমত, এইরূপ ব্যবসায়ে একজন অংশীদারের মৃত্যুতে ব্যবসায় ভাঙিয়া যায় না। সুতরাং এইপ্রকার ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অনেক বেশী। কর্তার কার্যাবলীর সমালোচনা করা যায় না।

অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership Business) : অংশীদারী ব্যবসায়ও মালিকানা ব্যবসায়, কিন্তু ইহাতে মালিক একাধিক হইতে পারে। ভারতবর্ষের অংশীদারী আইনে (Partnership Act) অংশীদারী ব্যবসায়ের নিয়মসমূহ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে

“The Partnership is the relation which subsists between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them on behalf of all of them”—Act IX 1932.

এই সংজ্ঞাটি আলোচনা করিলে এই দাঁড়ায় যে—(১) অংশী-

১। মুনাফার দারী ব্যবসায়ে কতিপয় লোকের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।
উদ্দেশ্যে ব্যবসায়

(২) ব্যবসায়টি যে মুনাফা আয় করিবে উহাতে সকল

২। মুনাফা বণ্টন অংশীদারই অংশ গ্রহণ করিবে। আইনে একথার উল্লেখ আছে যে
ইচ্ছা করিলে কোনও একজন মাত্র অংশীদার লোকসান বহন
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু সে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারে না।

(৩) ব্যবসায় পরিচালনায় সকল অংশীদার অংশ গ্রহণ

৩। সকল করিতে পারে অথবা কোনও একজন মাত্র অংশীদারের উপর
অংশীদারই পরিচালনার ভার গ্ৰস্ত থাকিতে পারে। সকল অংশীদারদের
পরিচালনায় অংশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যবস্থাপক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা করিয়া
গ্রহণ করিতে পারে থাকে। এতদ্ব্যতীতও অংশীদারী ব্যবসায়ের যে সকল বৈশিষ্ট্য

দেখা যায় তাহা—

(৪) অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারগণের দায় অসীম (Unlimited)। অংশী-

দারী ব্যবসায়ের দেনা বা দায়ের জন্ত সকল অংশীদারই একক
৪। অসীম দায়িত্ব (severally) এবং যৌথভাবে (jointly) দায়ী। অর্থাৎ,

মনে কর একটি অংশীদারী ব্যবসায়ে ক, খ ও গ তিন জন অংশীদার আছে। ঐ
ব্যবসায়ের সমস্ত দেনার জন্ত ক, খ ও গ পৃথকভাবে দায়ী। তাহাদের প্রত্যেকের
ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ব্যবসায়ের দায়ের জন্ত দায়ী। আবার ক, খ ও গ একত্রিত
(যৌথ) ভাবেও ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জন্ত দায়ী।

(৫) অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি চরম বিশ্বাস (Uberrimae Fidei)। যতক্ষণ

অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে একজন নিজেকে গণ্য
৫। চরম বিশ্বাস করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে স্বরণ রাখিতে হইবে যে সে
এমত কোন কার্য করিবে না যাহাতে অন্যান্য অংশীদারদের মনে কোনও প্রকার
সন্দেহের উদ্ভেদ হইতে পারে। অংশীদারগণ প্রত্যেকেই অন্ত সকল অংশীদারের
উপর বিশ্বাস গ্ৰস্ত করিয়া আছে।

অংশীদারী ব্যবসায় গঠন (Formation of a Partnership Business): অংশীদারী ব্যবসায়, কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় গঠিত হয়।

পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা পরিষ্কৃত হইবে। অংশীদারী
অংশীদারী ব্যবসায় আইনে এইরূপ সর্ব রহিয়াছে যে সাধারণ অংশীদারী
গঠন

ব্যবসায়ে (General Partnership Business) উদ্ভূতম ২০

জন অংশীদার থাকিতে পারে আর অংশীদারী ব্যবসায় যদি ব্যক্তিং ব্যবসায়

করে তবে উদ্দেশ্য ১০ জন অংশীদার থাকিতে পারে। একথা উল্লেখ করা নিম্নপ্রয়োজন যে উদ্দেশ্যতম সংখ্যা স্থির থাকিলেও নিম্নতম সংখ্যা স্থির করার অংশীদারের নিম্ন কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ অংশীদারী ব্যবসায় যখন ও উদ্দেশ্যতম সংখ্যা একাধিক ব্যক্তির মালিকানা-স্বত্বে তখন নিম্নতম ২ জন লোক প্রয়োজন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিকসংখ্যা ২ হইতে ২০ যে কোন জায়গায়ই হইতে পারে আর ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় অংশীদার কর্তৃক পরিচালিত হইলে ২ হইতে ১০ জনের মধ্যে যে কোনও জায়গায় মালিকসংখ্যা থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যখন অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিকের সংখ্যা স্থির হইল, তখন প্রথম উঠে মূলধন সরবরাহ করার। মূলধন সরবরাহ করার কোন মূলধন সরবরাহ বিধিনির্দেশ নাই। যদি কেহ মূলধন নাও যোগায় তাহা হইলেও তাহাকে অংশীদারী ব্যবসায়ের সমস্ত সুযোগ দিয়া অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কোনও অংশীদারের পক্ষে অংশীদারী ব্যবসায়ের মূলধন যোগান বাধ্যতামূলক নহে। মূলধন না যোগাইয়াও ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া মূলধন না যোগাইয়াও সে অন্তর্গত অংশীদারের সহিত ব্যবসায়ের দেনার জ্ঞাত একক এবং যৌথভাবে দায়ী।

তৃতীয়ত, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অংশীদারী ব্যবসায়ের একজন মাত্র অংশীদারকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া যাইতে ব্যবস্থাপনার ভার পারে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একের হাতে থাকিলেও অন্তর্গত অংশীদারগণ ব্যবসায়ের হিসাবপত্রাদি বা পুস্তকাদি পরিদর্শন করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না।

চতুর্থত, অংশীদারী ব্যবসায় গঠিত হইলে ব্যবসায়টিকে কারবারী সংস্থা বলা হয় (Firm) এবং ব্যবসায়টি তখন কারবারী সংস্থা নামে পরিচিত হয়। সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় যে অংশীদারী ব্যবসায়ের নাম ব্যক্তিগত (Personal) না হইয়া নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হয়। অংশীদারী ব্যবসায়ের যেমন ক, খ ও গ মিলিত হইয়া কোন অংশীদারী ব্যবসায় মান স্থাপন করিলে উহার নাম ক এণ্ড কোং না দিয়া হয়ত 'ফ্রেণ্ডস্ টোস' দিবে। কারণ ক এণ্ড কোং নামে ব্যবসায় চালিত হইলে কএর প্রাধান্য মনে হয় বেশী যাহা খ ও গ পছন্দ নাও করিতে পারে এবং অংশীদারদের বলা হয় অংশীদার (Partner)।

অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি চুক্তি (The basis of a Partnership Business is contract) : অংশীদারী ব্যবসায়ের সংজ্ঞায় একথা বলা হইয়াছে যে অংশীদারগণের মধ্যে একটি স্থির সম্বন্ধ থাকে। যে সুবন্ধ অংশীদারী ব্যবসায়কে সুসংবদ্ধ রাখে তাহা বাহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপে ভঙ্গ না হয় সেইজ্ঞাই

অংশীদারগণ কি কি সৰ্ত্তে যুক্ত হইল তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া লয়। দ্বিতীয়ত, অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি 'চুক্তি' ইহার তাৎপৰ্য এই যে কোনও অংশীদারের মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারগণ স্বতই অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিক বলিয়া

গণ্য হয় না। ইহার কারণ এই যে, যে অংশীদারের মৃত্যু অংশীদারী ব্যবসায় হইল সে তাহার জীবিতাবস্থায় অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তি ভিত্তিক সম্পূর্ণ দেনার দায় স্বীকার করিয়া অংশীদার হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার মৃত্যুতে তাহার বিধবা পত্নী অথবা তাহার পুত্রও যে স্বতই ব্যবসায়ের দেনা স্বীকার করিয়া অংশীদার হইল তাহা নহে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশীদারগণকে মৃত অংশীদারের বিধবা পত্নী অথবা তাহার পুত্রের সহিত পুনরায় সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে যে তাহারা অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার থাকিতে রাজী কিনা। উদাহরণস্বরূপ মনে কর কএম মৃত্যু হইল, তাহার পুত্র গ উত্তরাধিকার সূত্রে কএর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইবে বলিয়া একথা ধরিয়া লওয়া যায় না যে গ ব্যবসায়ের সমস্ত দেনা স্বীকার করিবে। গ অসীম দায় ভিত্তিতে অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার হইবে কিনা তাহা তাহার সহিত পুনরায় চুক্তি করিয়া স্থির করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে

আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনও ব্যক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার হইতে পারে অংশীদারী ব্যবসায় না। তাহার কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ অংশীদার হইতে হওয়ার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে কোনও চুক্তিতে পারে না আবদ্ধ হইতে হইলে যে বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োগ করিতে

হয় অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধিবিবেচনা তত পরিপক্ব নয় যে চুক্তির দোষ ত্রুটি অনুধাবন করিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। আইনে একথা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (minor) ব্যবসায়ের লাভের অংশ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে অংশীদার বলিয়া গণ্য করা যায় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি মুনাকার অংশও দেওয়া হয়, তথাপি অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্কক্রমে উত্তীর্ণ হইলেই তাহাকে জানাইয়া দিতে হয়, সে অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার থাকিতে রাজী কিনা। যদি প্রাপ্তবয়স্কক্রমে উপস্থিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তি তাহার অনিচ্ছা প্রকাশ না করে তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে সে ব্যবসায়ের অংশীদার থাকিতে রাজী এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়েয় জন্ত অংশীদারের সহিত সেও একক ও যৌথভাবে দায়ী।

অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (Types of Partnership Business) : অংশীদারী ব্যবসায় দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership at will) ; (২) বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায় (Particular Partnership)। ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership

at will) বলিতে সেই প্রকার অংশীদারী ব্যবসায়কেই বুঝায় যে ব্যবসায় কত দিনের জন্ত স্থাপিত হইল তাহা নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা অংশীদারী ব্যবসায়ের রকম থাকে না। যতদিন ব্যবসায়টি ভাঙ্গিয়া না যাইবে ততদিনই অংশীদারী নিয়মে চলিতে থাকিবে। আর বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায়ের বেলান্ন মাত্র এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ব্যবসায় গঠন করা হয় অথবা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলে স্বতই অংশীদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যায়। মনে কর, ক ও খ মিলিত হইয়া পুজার বাজারে

১। ঐচ্ছিক কাপড়-চোপড় বিক্রয় কবিবার জন্ত একটি দোকান স্থাপন করিল। এই অংশীদারী ব্যবসায়টি পুজার বাজার শেষ হওয়ার পরই ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইহা একটি বিশেষ অংশীদারী ব্যবসায়। কিন্তু কোনও দিন স্থির না করিয়া যদি ক ও খ অংশীদারী ব্যবসায় স্থাপন করে তবে উহা হইবে ঐচ্ছিক অংশীদারী ব্যবসায়।

২। বিশেষ (Kinds of Partners) : অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিকদের সহিত ব্যবসায়ের সম্পর্ক অনুযায়ী কয়েকভাবে ভাগ করা যায়—(১) সক্রিয় অংশীদার (Working Partner); (২) নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping or Dormant Partner)।

(১) সক্রিয় অংশীদার সেই অংশীদার যে ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে কেবলমাত্র লাভের অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না।

(২) যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন মাত্র যোগায় এবং লাভের অংশ গ্রহণ করে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না তাহাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলা হয়। যদিও এই দুই ভাগে মোটামুটি অংশীদারদের ভাগ করা হয় তথাপি অংশীদারী ব্যবসায় পরিচালনার ব্যাপারে ধীরে ধীরে অগ্রগত প্রকার অংশীদারের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সংজ্ঞা অবশ্য আইন দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। যেমন—

(৩) আচরণ অনুমিত অংশীদার (Partner by Holding out) : কোনও ব্যক্তি অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার না হইয়াও যদি এমন আচরণ করে যে সে কোন অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার তবে তাহাকে আচরণ অনুমিত বা জোটে থাকা অংশীদার (Partner by Holding out) বলে। যেমন য ক ও খ এর ব্যবসায়ের অংশীদার নয়। কিন্তু য লোক সমক্ষে এমন প্রচার করিতে পারে যে সে ক ও খ এর ব্যবসায়ের অংশীদার। এক্ষেত্রে য এর বর্ণনার ফলে য সংযুক্ত আছে মনে করিয়া গ ঐ অংশীদারী ব্যবসায়ে ‘অর্থ’ ঋণ দিল। এক্ষেত্রে ক ও খ এর মত য এর দায় অসীম (Unlimited)। এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জন্ত য-ও দায়ী।

৩। জোটে থাকা আচরণ অনুমিত বা জোটে থাকা অংশীদার (Partner by Holding out) বলে। যেমন য ক ও খ এর ব্যবসায়ের অংশীদার নয়। কিন্তু য লোক সমক্ষে এমন প্রচার করিতে পারে যে সে ক ও খ এর ব্যবসায়ের অংশীদার। এক্ষেত্রে য এর বর্ণনার ফলে য সংযুক্ত আছে মনে করিয়া গ ঐ অংশীদারী ব্যবসায়ে ‘অর্থ’ ঋণ দিল। এক্ষেত্রে ক ও খ এর মত য এর দায় অসীম (Unlimited)। এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জন্ত য-ও দায়ী।

৩। জোটে থাকা আচরণ অনুমিত বা জোটে থাকা অংশীদার (Partner by Holding out) বলে। যেমন য ক ও খ এর ব্যবসায়ের অংশীদার নয়। কিন্তু য লোক সমক্ষে এমন প্রচার করিতে পারে যে সে ক ও খ এর ব্যবসায়ের অংশীদার। এক্ষেত্রে য এর বর্ণনার ফলে য সংযুক্ত আছে মনে করিয়া গ ঐ অংশীদারী ব্যবসায়ে ‘অর্থ’ ঋণ দিল। এক্ষেত্রে ক ও খ এর মত য এর দায় অসীম (Unlimited)। এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জন্ত য-ও দায়ী।

(৪) প্রতিবন্ধ অংশীদার (Partner by Estoppel) অনেকটা আচরণ অস্বীকার অংশীদারের (Partner by Holding out) মত হইলেও ইহার সহিত প্রতিবন্ধ অংশীদারের (Partner by Estoppel) কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। আচরণ অস্বীকার অংশীদারের (Partner by Holding out) বেলাতে তাহার কোন কার্যের ফলে

অন্তের মনে অংশীদারী ব্যবসায়ে তাহার অংশ আছে এই ধারণা হয় কিন্তু প্রতিবন্ধ অংশীদারের বেলাতে অংশীদারের মোনতাও তাহাব দায় স্থির করিতে পারে। গ জানে যে ক ও খ অংশীদারী ব্যবসায়ে সে একজন অংশীদার প্রচার করিয়া বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতেছে কিন্তু কখনও সে উহার প্রতিবাদ করে নাই অথবা একথা ঘোষণা করে নাই যে সে ঐ অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার নহে। একরূপ ক্ষেত্রে ঐ ব্যবসায়ের সমস্ত দায়ের জন্ত গ ক ও খ এর মত একক ও যৌথভাবে দায়ী।

দায় সীমাবদ্ধ বা সসীমদায় অংশীদার ও অসীমদায় অংশীদার (Limited Partner and General Partner) : অংশীদারী ব্যবসায়ের একটি বৈশিষ্ট্য, যাহা বিশদভাবে আলোচনা বব। হইয়াছে যে অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায়

অসীম (Unlimited)। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনও সসীমদায় অংশীদারী ব্যক্তির নিয়োগ করার মত অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যবসায়

সমস্ত দায় গ্রহণ করার মত সাহস বা ইচ্ছা নাই। অথচ অংশীদারী ব্যবসায় যদি কোনও সর্ব মূলধন যোগাইবার মত অংশীদার পায় তাহা হইলে উপকৃত হয়। এইরূপ অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ রাখিয়া এবং ব্যবসায়ের সমস্ত দেনার দায় হইতে মুক্ত রাখিয়া যাহাতে অংশীদার সংগ্রহ করা যায় সেজন্য গ্রেট-ব্রিটেনে সসীমদায় অংশীদারী আইন (Limited Partnership Act) পাঁচ করা হইয়াছে। সসীমদায় অথবা দায় সীমাবদ্ধ অংশীদারদের দায়

প্রাপ্ত মূলধন যে পরিমাণ মূলধন যোগাইতে রাজী সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। পর্যন্ত দায় সীমাবদ্ধ মনে কর একটি অংশীদারী ব্যবসায়ে মূলধনের প্রয়োজন। রবিনহুড মূলধন যোগাইতে রাজী কিন্তু ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায় গ্রহণ করিয়া অংশীদার হইতে রাজী নহে। দায় সীমাবদ্ধ অংশীদারী আইনের অম্বলে রবিনহুড ১০০০ পাউণ্ড দিতে রাজী হইল কিন্তু কোনও দায় তাহাতে বর্তাইবে না। সে যে মুহূর্তে ১০০০ পাউণ্ড পরিশোধ করিবে সেই মুহূর্তেই তাহার দায় শেষ হইবে। কোনও নির্দিষ্ট তারিখে তাহার প্রতিশ্রুত অর্থের যে অংশ মাত্র পরিশোধ করা বাকী সেই পর্যন্তই তাহার দায় সীমাবদ্ধ।

দায়-সীমাবদ্ধ অংশীদারের এই স্ববিধা থাকিলেও তাহার একটি সসীমদায় অংশীদার বিশেষ অস্ববিধা। এই যে সে ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ পারে না। যদি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তবে সে-ও সাধারণ বা করিতে পারে না অসীমদায় অংশীদারের মত ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দেনার জন্ত দায়ী।

আরেকটি বিশেষ অঙ্গবিধা এই যে সসীমদায় অংশীদার কখনও মূলধন তুলিয়া নিতে পারে না। যখনই মূলধন তুলিয়া নিল, তখনই সেই মূলধন তুলিয়া পরিমিত দায় তাহার ঘাড়ে চাপিল। অর্থাৎ, পুনরায় সেই পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে না দিলে সেই পরিমাণ দায় নিজে পুনরায় পূরণ করিতে হয় রহিয়া গেল।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন ভারতবর্ষে দায় সীমাবদ্ধ ভারতবর্ষে দায় সীমাবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসায় বা অংশীদারের অস্তিত্ব আইনত গ্রাহ্য নহে।

১.২ অংশীদারী চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of a Partnership deed) : (অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি যদিচ সৌহার্দ্য (Friendship), সদ্ভিচ্ছা (Goodwill) এবং চরম বিশ্বাস (Uberrimae fidei or Utmost goodfaith) তাহা হইলেও অংশীদারদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া একটি চুক্তি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ যদি একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সমস্ত অংশীদার নিজেদের কার্যের পরিধি স্থির করিয়া নেয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে অংশীদারী ব্যবসায় কোনরূপ গোলযোগ অথবা বিরোধ (Dispute) উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষভাবে কমিয়া যায়। অল্প অংশীদারদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সদ্ভিচ্ছা থাকিতে পারে বলিয়া ভবিষ্যতে যে উহা ভঙ্গ হইবে না তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই।) তাই যে সকল বিষয় লইয়া ভবিষ্যতে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে উহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে অংশীদারী ব্যবসায়ের একটি চুক্তিপত্রের প্রয়োজন কত বড়। উল্লেখ করা প্রয়োজন চুক্তিপত্র লিখিত অথবা মৌখিক উভয়ই হইতে পারে।

(যে সমস্ত ব্যাপারে ভবিষ্যতে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে তাহার কয়েকটিঃ)

(১) মনে কর, একটি অংশীদারী ব্যবসায় ক ও খ-কে লইয়া অংশীদারী ব্যবসায়ের গঠিত হইল। যখন ব্যবসায়টি স্থাপিত হইল তখন ক চুক্তিপত্রের ৫০০ টাকা ও খ ৩০০ টাকা মূলধন দিয়াছিল। বৎসরান্তে প্রয়োজনীয়তা যখন লাভ-লোকসান খতিয়ান করা হইল তখন ক মূলধনের অল্পপাতে ৫/৮ অংশ লাভ দাবি করিল। এ-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মুনাকা বন্টনের কোনও প্রকার চুক্তি ছিল না। কএর দাবির যৌক্তিকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খএর ব্যক্তব্যও কম যুক্তিপূর্ণ নহে। খ দাবী করিল যেহেতু মুনাকা বন্টন করার হার স্থিরীকৃত ছিল না সেহেতু অংশীদারী আইন অনুসারে লাভ সমান অংশে ভাগ করিতে হইবে। ফলে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মন কষাকষি দেখা দিল। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য ক-কে মুনাকার অর্ধেক খ-কে দিতে হইবে, কারণ আইনই সেই প্রকার নির্দেশ দিয়াছে।

(২) ধরা যাউক যে ব্যবসায়ের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং সে সর্বক্ষণ ব্যবসায়ের পরিশ্রম ব্যয় করিতেছে। ক মূলধন যোগাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যবসায়ের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। বৎসরান্তে হিসাবনিকাশ কালে খ দাবি করিল যে সে যদি ব্যবসায়ের সর্বশক্তি নিয়োগ না করিত তাহা হইলে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করিতে হইত। সুতরাং খ পারিশ্রমিক হিসাবে একজন ম্যানেজারের বেতন দাবি করিল। ক বলিল যে এরূপ কোন চুক্তি ছিল না যে ব্যবসায়ের আয় হইতে খ কে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য পারিশ্রমিক দিতে হইবে। এক্ষেত্রে খ হারিয়া গেল কারণ অংশীদারী আইনে এরূপ কোন ধারা নাই যে চুক্তিতে অংশীদারকে পারিশ্রমিক দেওয়ার সর্ত না থাকিলেও সে পারিশ্রমিক পাইবে। সুতরাং খএর অসন্তুষ্টি ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক স্থাপিত করিতে পারে।

(৩) আবার এমন হইতে পারে যে যেহেতু অধিক মূলধন দিয়াও ক খএর সহিত সমান অংশে লাভ পাইতেছে নেহেতু ক মূলধনের উপর সুদ দাবি করিল। কারণ সমান অংশে লাভ বণ্টন করার ফলে তাহার যে ক্ষতি হইল তাহা কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ হইতে পারে যদি মূলধনের উপর সুদ দেওয়া হয়। (সুদ দেওয়া হইলে মনে কর' শতকরা ৫ টাকা হারে ক পাইবে ২৫০ টাকা, খ পাইবে ২০০ টাকা)। তাহা হইবে খ হইতে ক মোটের উপর ৫০ টাকা বেশী পাইতে পারে। এক্ষেত্রেও আইন কএর প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করিবে। কারণ আইনে এমন কোনও ধারা সন্নিবেশিত হয় নাই যে চুক্তির অবর্তমানে কেহ মূলধনের উপর সুদ দাবি করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে কএর মন হইতে খএর উপর বিরূপ ভাব দূরীভূত হইল না।)

(এই প্রকার নানা কারণেই অংশীদারী ব্যবসায়ের ভবিষ্যতে বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং ফলে খুব সফল অংশীদারী ব্যবসায়ও ভাঙিয়া যাইতে পারে। এই কারণেই অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়।)

অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু (Contents of a Partnership Deed) : অংশীদারী চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীয়তা কয়েকটি উদাহরণ সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইল। একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে চুক্তি মৌখিক হইতে পারে আবার লিখিতও হইতে পারে। মৌখিক চুক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ করা কষ্টকর বলিয়া লিখিত চুক্তিই কার্যকরী। তবে আরম্ভকালে লিখিত চুক্তি না হইলেও অংশীদারী ব্যবসায় গঠন সম্ভব। কিন্তু ব্যবসায় স্থাপিত হওয়ার পর যত অংশীদারী ব্যবসায়ের সম্ভব চুক্তিপত্র তৈয়ার করা প্রয়োজন এবং উহা অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ব্যবসায় নিবন্ধকের (Registrar of Firms) অফিসে পঞ্জীভূত (Registered) হওয়া আবশ্যিক। অংশীদারী ব্যবসায় পঞ্জীভূত (রেজিস্ট্রীকৃত) হওয়ার সুবিধা পরে আলোচনা করা যাইবে।

অংশীদারী চুক্তিপত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হয়—

(১) ব্যবসায়ের নাম: ব্যবসায় কি নামে পরিচিত হইবে
১। ব্যবসায়ের নাম উহা ব্যবসায় স্থাপনের পূর্বেই স্থির করা প্রয়োজন।
নাম ব্যবসায়ের নাম এমন হওয়া উচিত যাহাতে তৃতীয় পক্ষ
অথবা অংশীদারদের মনে এমন ধারণা না হয় যে ব্যবসায়টি কোনও ব্যক্তি
বিশেষের।

(২) কি প্রকারের ব্যবসা হইবে: কি দ্রব্য লইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকিবে—
অর্থাৎ, ব্যবসায়ের কর্মপদ্ধতি কি হইবে উহাও চুক্তি
২। ব্যবসায় পত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(৩) মিয়াদ: অংশীদারী ঐচ্ছিক কিংবা বিশেষ। অর্থাৎ অংশীদারী ব্যবসায়
কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিংবা যতদিন ব্যবসায় আইনত
৩। মিয়াদ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বা তুলিয়া দেওয়ার অবস্থায় না আইসে
ততদিন থাকিবে উহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(৪) মূলধন যোগান: অংশীদারের মধ্যে কোন অংশীদার
৪। মূলধন যোগান কত মূলধন যোগাইবে উহার উল্লেখ থাকা অপরিহার্য।

(৫) পরিচালন ব্যবস্থা: ব্যবসায় কি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে—অর্থাৎ,
সকল অংশীদারই অংশ গ্রহণ করিবে কিংবা সকল অংশীদারের
৫। পরিচালন ব্যবস্থা পক্ষে একজন মাত্র পরিচালনার ভার লইবে উহার বিশদ
আলোচনা থাকা।

(৬) লাভ-লোকসান বন্টন: যখন অংশীদারগণ লাভলোকসান মূলধনের
সমাহুপাতে ভাগ করিয়া লয় তখন গোলযোগের কোনও
৬। মুনাফা বন্টন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অসমান (Unequal) মূলধন
যোগান হইলে চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকিলে লাভ সমান অংশে ভাগ করা হয়
বলিয়া তুলনায় অধিক মূলধন যোগানকারীর লোকসান হয়। সুতরাং কি অহুপাতে
মুনাফা বন্টন করা হইবে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

(৭) অর্থ উত্তোলন: অংশীদারী ব্যবসায়ে মুনাফা হইবে অহুমান করিয়া
সাময়িকভাবে অংশীদারগণ ব্যবসায় হইতে অর্থ উত্তোলন করিতে পারে। কিন্তু যে
পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করিয়া লইবে সেই পরিমাণে কার্যকরী
৭। ব্যবসায় হইতে মূলধন (Working Capital) কম পড়িবে এবং মূলধনের
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আবর্তনও কম হইবে; ফলে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যাইতে
অর্থ তুলিয়া নেওয়া পারে। অংশীদারগণ যদি সমহারে অর্থ তুলিয়া না লয়—কেহ
বেশী, কেহ কম, তাহা হইলে যে অংশীদার তুলনায় কম অর্থ তুলিয়া নেয় তাহার
মনে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। সুতরাং অংশীদারগণ কে কত পরিমাণ অ
তুলিয়া নিতে পারিবে তাহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

(৮) মূলধন তুলিয়া নেওয়া অর্থের উপর সুদ : একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে তুলনায় যে অংশীদার অধিক মূলধন যোগায় কিন্তু অল্প অংশীদারদের সহিত সমান হারে মুনাফা লয় তাহার পক্ষে মূলধনের উপর সুদ দেওয়া হইলে মুনাফার পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়িবে। কারণ তুলিয়া নেওয়া অর্থের উপর যে সুদ পাওয়া যাইবে তাহা ব্যবসায়ের আয় বলিয়াই হিসাব করা হইবে এবং সে-ও উহার অংশভাক্ হইবে। সুতরাং এ-বিষয়টিও চুক্তিপত্র তৈয়ারিকালে স্থির করা প্রয়োজন।

(৯) হিসাবনিকাশ : কি উপায়ে কোন্ তারিখে হিসাবনিকাশ করা হইবে তাহাব উল্লেখ।

(১০) ব্যাঙ্কের চেক ও অগ্রাগ্রহ দলিল সম্পাদন করার পদ্ধতি : অংশীদারদের সকলক্ষেই হয়ত সর্বদা পাওয়া সহজ নয়। এরূপক্ষেত্রে অংশীদারদের পক্ষে কে বা কাহারও চেক সহি করিবে, হাণ্ডি সাকরুণ করিবে, কিংবা দলিলাদি সম্পাদন করিবে তাহা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই স্থির করা প্রয়োজন। অগ্রাগ্রহ যে যখন যেমন খুসী তেমন কাধ করিতে পারে।

(১১) অংশীদারী ব্যবসায়ের মালিকানা পরিবর্তন হইলে কি উপায় অবলম্বন করা হইবে : যেমন, কোনও একজন অংশীদার মারা গেলে ব্যবসায় কিভাবে পরিচালিত হইবে অথবা অবস্থা বিশেষে নূতন অংশীদার গ্রহণ করিতে হইলে কি পন্থা অবলম্বন করা হইবে তাহার নির্দেশ চুক্তিপত্রে থাকা প্রয়োজন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সকল অংশীদার রাজী না হইলে নূতন অংশীদার গ্রহণ করা যায় না।

(১২) বিবাদ নিষ্পত্তির উপায় : অংশীদারদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে কি উপায়ে উহার নিষ্পত্তি হইবে। অথবা তৃতীয় পক্ষের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে ব্যবসায়ের পক্ষে কে কর্মভার গ্রহণ করিবে উহাও চুক্তিপত্রে লিখিত থাকা প্রয়োজন।

(১৩) অংশীদার বহিকার করার উপায় : কি অপরাধে এবং কি সর্তে অংশীদারকে বহিকার করা যায় তাহার বিশদ আলোচনা থাকা আবশ্যক।

(১৪) ব্যবসায় বন্ধ করিবার প্রণালী : কি উপায়ে এবং কি অবস্থায় উপনীত হইলে ব্যবসায় গুটান হইবে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। চুক্তিপত্র অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে রদবদল করা যায়।

✓ **অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and obligations of a Partner) :** অংশীদারের অধিকার ও দায়িত্বের মোটামুটি রূপ উপরের আলোচনা হইতে পরিষ্কার হইবে। তথাপি অংশীদারী আইনে কতিপয় বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে যাহা নীচে আলোচনা করা হইল।

অংশীদারদের অধিকার (Rights) : (১) ব্যবসায় পরিচালনায় অধিকার: ১। ব্যবসায় অংশগ্রহণে সকল অংশীদারেরই অধিকার রহিয়াছে

পরিচালনায় পক্ষে উল্লেখ না থাকিলে পরিচালনার জন্ত কোনও অংশীদার অংশগ্রহণ পারিভ্রমিক দাবি করিতে পারে না।

২। চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকিলে সেই হারে মুনাফা ভাগ করিয়া লইতে হয়। চুক্তিপত্র মুনাফার সমান না থাকিলে সকল অংশীদারই সমান হারে মুনাফার অংশগ্রহণ অধিকারী।

(৩) অংশীদার ব্যবসায়ে ঋণ দিলে সেই ঋণের উপর শতকরা ৩। ঋণের উপর হ্রদ বার্ষিক ৬ টাকা হারে হ্রদ পাইয়া থাকে। চুক্তিতে লিখিত মূলধনের অতিরিক্ত মূলধন যোগাইলে উহাকেও ঋণ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং ঋণের মতই উহার উপর হ্রদ দিতে হইবে।

(৪) সদিচ্ছা প্রণোদিত, সত্বদ্বৈশ্রে এবং ব্যবসায়ের মঙ্গলের কলাপে লোকসান জন্ত কোন অংশীদার কোনও কার্য করার ফলে তাহার লোকসান হইলে সমস্ত অংশীদারকে লাভ-লোকসানের হারাহারি মতে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়।

(৫) প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসায় গুটাইবার আবেদন জানাইবার অধিকার আছে।

(৬) প্রত্যেক অংশীদারই যেমন ব্যবসায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তেমনি হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা করিতে পারে।

(৭) সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও অংশীদারকে বহিষ্কার করা যায় না।

কর্তব্য ব্যতীত অধিকার অর্জন করা যায় না (Rights and duties are correlative)। সুতরাং অংশীদার যাহাতে তাহার অধিকার

অংশীদারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে তজ্জন্ত তাহাকে কতিপয় কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। যেমন, (১) প্রত্যেক অংশীদারের দায় অসীম। দায়

১। অসীম দায় অসীম থাকার দরুন ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দেনার জন্তই অংশীদারের নিজস্ব সম্পদও ক্রোক দেওয়া যায়।

২। বিশ্বাস রক্ষা (২) প্রত্যেক অংশীদার অগ্নাগ্র অংশীদারের সহিত সর্বদা বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিবে।

- ৩। সততা (৩) কখনও সততা পরিহার করিবে না।
- ৪। ব্যবসায় হইতে (৪) ব্যবসায় হইতে কোনও অংশীদার কোনও প্রকার দস্তুরি গ্রহণ করিবে না। ব্যবসায়ের পক্ষে ক্রয়বিক্রয়ে কোন অংশীদার স্বযোগ গ্রহণ করিবে না।
- ৫। নূতন অংশীদার (৫) অপর সকল অংশীদারের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া কোনও অংশীদার নূতন অংশীদার গ্রহণ করিবে না।

অংশীদারী ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকরণ বা পঞ্জীভূত হওয়া (Registration of a partnership Business) : অংশীদারী ব্যবসায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের (Joint Stock Company) মত রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক নহে। তবে অংশীদারী ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকৃত হইলে কতিপয় স্বযোগ পায় বলিয়া অংশীদারী ব্যবসায়ও দিন দিন অধিক পরিমাণে রেজিস্ট্রিকৃত হইতেছে। প্রত্যেক রাজ্য সরকার অংশীদারী ব্যবসায় নিবন্ধকে নিয়োগ করে এবং তাহার অফিসেই অংশীদারী ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়।

রেজিস্ট্রিকরণের সুবিধা (Advantages of registration of a Partnership Business) : (১) অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী ব্যবসায় ১০০ টাকার উর্ধ্বের দেনার জন্ম তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারে না বলিয়া অংশীদারী ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়।

(২) অ-রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারগণ পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য স্থিরীকরণের জন্ম আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে না। তাই যাহাতে চুক্তিপত্রে লিখিত সর্ব আদালতের সাহায্যে পরস্পরের উপর কাঙ্ক্ষিত করা যায় তদ্বৎশেই অংশীদারী ব্যবসায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়।

অংশীদারী ব্যবসায় গুটাইবার বা অবসায়নের উপায় (Methods of Winding up a Partnership Business) : অংশীদারী ব্যবসায় গুটাইবার দুইটি উপায় আছে—একটি ঐচ্ছিক ; অপরটি বাধ্যতামূলক।

ঐচ্ছিক অবসায়ন বা গুটান (Voluntary winding up) : (১) অংশীদারী ব্যবসায় যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম স্থাপিত হয় তাহা হইলে সেই সময় উত্তীর্ণ হইলেই ব্যবসায় গুটান চলে।

(২) অংশীদারী ব্যবসায় যদি বিশেষ কোন কর্তব্য সম্পাদন করার জন্ম গঠিত হয় তবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ব্যবসায় গুটান সম্ভব।

৩। কোনও অংশীদার আবেদন করিলে (৩) অংশীদারী ব্যবসায়ের কোনও অংশীদার অবসর গ্রহণ (Retire) করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবেদন জানাইলে অংশীদারী ব্যবসায় গুটান সম্ভব।

৪। অংশীদার দেউলিয়া হইলে (৪) অংশীদারী ব্যবসায়ের কোনও অংশীদারের মূলধন দ্বারা ব্যবসায় তাহার ব্যক্তিগত দেনা শোধ করার প্রয়োজন হইলেও ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়।

৫। অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে (৫) কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে অংশীদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত আইন নির্ধারিত উপায়ে অংশীদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে উহাকে বাধ্যতামূলক ভাঙ্গিয়া যাওয়া বলে। যেমন—

(১) কোন অংশীদারী ব্যবসায় যদি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ের অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ব্যবসায় আইনভুক্ত হইতে হইবে। যেমন কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া চোরাকারবারী ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে একটি অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিল। চোরাকারবারী ব্যবসায় বে-আইনী। তাহা হইলে যে চুক্তি বে-আইনী কার্য করার জন্য সংঘটিত হইল সে চুক্তিও অকার্যকর।

(২) ব্যবসায়ের অংশীদারদের মধ্যে কেহ উন্মাদ বলিয়া প্রমাণিত হইলে অংশীদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যায়। কারণ উন্মাদের আর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে না।

৩। অংশীদার কর্তব্য পালনে অপারগ হইলে (৩) কোনও অংশীদার যদি তাহার কর্তব্য পালনে অপারগ হয় তাহা হইলেও অংশীদারী ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যায়।

(৪) অংশীদারী ব্যবসায়ের কোন অংশীদার চুক্তি ভঙ্গ করিলে ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

৪। চুক্তি ভঙ্গ করিলে (৫) আদালত যদি মনে করে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অকল্যাণকর অথবা কোনও কারণে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন দেখা দেয় তাহা হইলেও আদালতের নির্দেশে অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া যায়।

৫। আদালতের ইচ্ছা অংশীদারী ব্যবসায় গুটান হইলে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে তাহাও মোটামুটি আইন দ্বারা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে আদায়ীকৃত অর্থ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রয়োগ করা হয়।

১। সরকারী পাওনা (১) প্রথমত, সরকারী অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের

- দেনা শোধ করিতে হয়; (২) যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে প্রথমে ২। শ্রমিক ও শ্রমিকের মজুরি দিতে হইবে। তবে মজুরি বা বেতন কর্মচারীর বেতন বাবদ দেনা ৫০০ টাকার উপরে না হয়; (৩) যাহা থাকিবে তাহা দ্বারা অন্ত্যন্ত পাওনাদারদের ঋণ শোধ করিতে হয়; (৪) তাহার পরও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে প্রথমে অংশীদারের নিকট হইতে ব্যবসায় ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে সেই ঋণ শোধ করিতে হয়; (৫) ৫। মূলধন ফেরত সর্বশেষ যাহা বাকী রহিল উহা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হয়।

যৌথ কারবার (Company): ব্যবসায় ক্ষেত্রে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিবর্তনের ফল হিসাবে জন্মলাভ করে যৌথ কারবার। একক-মালিকানা হইতে অংশীদারী কারবার এক ধাপ এবং অংশীদারী কারবার হইতে যৌথ কারবার আরেক ধাপ।

যৌথ কারবারের জন্মের ইতিহাস বিচিত্র। উহার আলোচনা এখানে নিরর্থক। তথাপি ছাত্রদের এইটুকু জানান আবশ্যক মনে করি যে বর্তমান সময়ে যৌথ কারবারের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু যৌথ কারবারের বয়স মাত্র একশতাব্দীর কিঞ্চিৎ উপরে।

বর্তমান কালের যৌথ কারবারের ধারায়ই সর্বপ্রথম যৌথ কারবার গঠিত হইয়াছিল ১৭১১ খৃঃ দক্ষিণ সমুদ্র কোম্পানী (South Sea Company)। এই কোম্পানীটি দক্ষিণ আমেরিকায় একচেটিয়া কারবারের যৌথ কারবারীর স্বত্ব অধিকার লাভ করিয়াছিল বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে। কিন্তু কোম্পানীটি বুদবুদের (Bubble) মত ফীত হইয়া ১৭২০ খৃঃ নষ্ট হইয়া যায়। ফলে যে সমস্ত লোক এই যৌথ কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছিল তাহাদের অর্থ নষ্ট হইয়া গেল। বৃটিশ সরকার এই প্রকার যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭২০ খৃঃ বুদবুদ আইন (Bubble Act) পাস করিয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে প্রথম আইন পাস করে ১৮৪৪ খৃঃ গ্রেটব্রিটেন। ভারতবর্ষে প্রথম কোম্পানী আইন গঠিত হয় ১৮৫০ খৃঃ। কিন্তু সসীম দায় (Limited Liability) নীতি সর্বপ্রথম ১৮৫৬ খৃঃ যৌথ কারবারী আইনে সন্নিবেশিত হয়।

যৌথ কারবারের বৈশিষ্ট্য (Special characteristics of a Company)
যৌথ কারবারে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তাহা নিয়ে আলোচনা করা হইল।

(১) যৌথ কারবার একটি অপ্রকৃত (artificial) ও অবাস্তব (Intangible)

বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিস্বত্ব লাভ করে। অর্থাৎ ব্যক্তির মতই যৌথ কারবার

১। অবাস্তব

নিজের নামে কারবার চালাইতে পারে। আইনের চক্ষে

ইহার স্বাধীন ব্যক্তিস্বত্ব দ্বারা ইহাও বুঝায় যে যৌথ কারবার

নিজের নামে মামলা দায়ের করিতে পারে এবং তৃতীয় ব্যক্তি যৌথ কারবারকে প্রতিবাদী করিয়া মামলা দায়ের করিতে পারে।

(২) যৌথ কারবারের অস্তিত্ব স্থায়ী (Perpetual succession): যৌথ

কারবারের মালিকানা পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু তদ্বারা

২। স্থায়িত্ব

যৌথ কারবারের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ক এর অংশপত্র (shares)

থ এর নিকট বিক্রয় করিলে মালিকানা পরিবর্তন হইল বটে কিন্তু কারবার চলিতে

কোন প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইল না।

৩। অংশপত্র বিক্রয়

(৩) যৌথ কারবারের মূলধন বহু লোকের মধ্যে শেয়ার

করিয়া মূলধন সংগ্রহ বা অংশপত্র (shares) বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয়।

৪। অংশপত্র

(৪) যৌথ কারবারের অংশপত্র হস্তান্তর যোগ্য

হস্তান্তর যোগ্য

(Transferable)।

(৫) যৌথ কারবারের অংশপত্র ক্রেতাগণ দেখিয়াই

৫। ঐচ্ছিক মিলন

কারবারে সংশ্লিষ্ট হয়।

(৬) যৌথ কারবারের একটি 'সীল' (Seal) থাকে। সকল দলিলে সীলাঙ্কণ

বাহ্যাত্মক। সীলই যৌথ কারবারের স্বাধীনত্বের জ্ঞাপন

৬। সীল

করে।

যৌথ কারবারের প্রকারভেদ (Different types of Company) :

যৌথ কারবারের অংশীদারের (Shareholder) দায়ের প্রকার হিসাবে উহাকে

দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (১) অসীমদায় যৌথ কারবার

যৌথ কারবারের

(Unlimited Liability Company); (২) দায়সীমাবদ্ধ

ভাগ

অথবা সসীম দায় যৌথ কারবার (Limited Liability

Company)।

অসীমদায় যৌথ কারবার (Unlimited Liability Company):

অসীমদায় যৌথ কারবারের অংশপত্র অধিকারীর দায়িত্বের স্থির পরিমাণ নাই।

অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদারদের মতই তাহাকে কারবারের

১। অসীমদায়

সম্পূর্ণ দায় পরিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয় এবং প্রয়োজন-

বোধে তাহার নিজস্ব সম্পদ যৌথ কারবারের দায় মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। সসীমদায়

বা দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে অসীমদায় যৌথ

কারবার ও দায় সীমাবদ্ধ বা সসীমদায় কারবারের অংশীদারের দায়ের পার্থক্য

বুঝা যাইবে। অসীমদায় যৌথ কারবারের অংশীদারের দায়িত্বের কোনও শেষ

নাই বলিয়া অথবা অসীমদায় যৌথ কারবার দেখা যায় না বলিলেও অত্যাুক্তি হইবে না।

সসীমদায় বা দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবার (Limited Liability Company) : সসীমদায় যৌথ কারবারের অংশপত্র অধিকারীর দায় শেষার বা অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্যের (Face value) অনাদায়ী ২। সসীমদায় বা দায় সীমাবদ্ধ অংশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

উদাহরণ—ক পাইন কোম্পানীর দশখানা শেষার কিনিল। প্রতিখানা শেষারের আঙ্কিক মূল্য ১০০ টাকা। তাহা হইলে ক এর দায়িত্ব ১০০০ টাকা। উহা হইতে মনে করা যাউক ৮০০ টাকা শোধ করা হইয়াছে। তাহা হইলে ক এর দায়িত্ব রহিল ২০০ টাকা। দায় সীমাবদ্ধ থাকার জন্ত কোনও সময়েই ক এর ২০০ টাকার অতিরিক্ত দায় থাকিবে না। যে মুহূর্তে ২০০ টাকা পরিশোধ করা হইবে সেই মুহূর্তেই ক এর দায় শেষ হইবে। ক এর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য যতই হউক না কেন, যৌথ কারবারের দায়ের জন্ত তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক দেওয়া যায় না। কিন্তু অসীমদায় যৌথ কারবারের অংশীদার আবার মনে কর, ক পাইন কোম্পানীর (অসীমদায়) দশখানা শেষার প্রতিখানা ১০০ টাকা মূল্যের ক্রয় করিল। সে ১০০০ টাকা সম্পূর্ণই পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেষার বা অংশপত্রের মূল্য সম্পূর্ণ শোধ করা হইলেও প্রয়োজন হইলে ক এর ব্যক্তিগত সম্পত্তিও যৌথ কারবারের দায়ের জন্ত ক্রোক দেওয়া চলে। হুতরাং বৃত্তিতে পারিতেছে যে দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারের অংশ অধিকারীদের দায় সীমাবদ্ধ থাকার সুবিধার জন্তই সসীমদায় যৌথ কারবারের এত জনপ্রিয়তা।

সসীমদায় যৌথ কারবারের প্রকারভেদ (Types of Limited Liability Company) : দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) অংশপত্র বা শেষারের মূল্য পরিমিত দায় সীমাবদ্ধ যৌথ কারবার (Company Limited by Shares); (২) দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার (Company Limited by Guarantee)।

অংশপত্র বা শেষারের মূল্য পরিমিত দায় সীমাবদ্ধ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে অংশপত্রের মালিকের দায় শেষারের আঙ্কিক মূল্যের সমান। **সসীমদায়ের অর্থ** যেমন উপরের উদাহরণটিতে দেখান হইয়াছে যে ক এর দায় যে কয়খানা শেষার ক্রয় করিয়াছে সেই শেষারের আঙ্কিক মূল্যের সমান। আঙ্কিক মূল্য পরিশোধ হইলেই সে দায়মুক্ত।

দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার : এমন অনেক যৌথ কারবারও আছে যেখানে কারবারের অংশপত্র অধিকারিগণ শেষার বা অংশপত্র ক্রয়কালে এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে যে কারবার গুটাইবার সময়ে কারবারের দায়ের

একাংশ মিটাইতে প্রস্তুত থাকিবে। তাহার দায় যে পরিমাণ দায় মিটাইবার অঙ্গীকার দিয়াছে, সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত কারবারে প্রারম্ভিক মূলধন শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত শেয়ার অধিকারিগণ ব্যক্তিগতভাবে কারবার গুটাইবার কালে দায়ের কত অংশ মিটাইতে রাজী তাহার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। মনে কর, স্নাকসন এণ্ড কোং নামে এই প্রকার একটি কারবার গঠিত হইল। রাজেন উহার একজন অংশপত্রের মালিক। প্রতিথানা শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। শেয়ারের মূল্য অতিরিক্ত; সে এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে যদি ব্যবসায় গুটাইবার অবস্থায় আসে তখন সে দায়ের ৫ শতাংশ পরিশোধ করিবে। এই প্রকারে সকল অংশপত্র অধিকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ের কত অংশের জগ্গ দায়ী থাকিবে তাহার উল্লেখ থাকে। তাই এই প্রকার যৌথ কারবারকে বলে দায়িত্বের অঙ্গীকারযুক্ত যৌথ কারবার। যে সকল প্রতিষ্ঠান মূনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানই এই ধারায় গঠিত হয়—যেমন বণিকসংঘ (Chamber of Commerce)। এই সকল প্রতিষ্ঠান যৌথ কারবার হইলেও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে ২৫ ধারা মতে এণ্ড কোং লিঃ (& Co. Ltd) কথাটি ব্যবহার করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত।

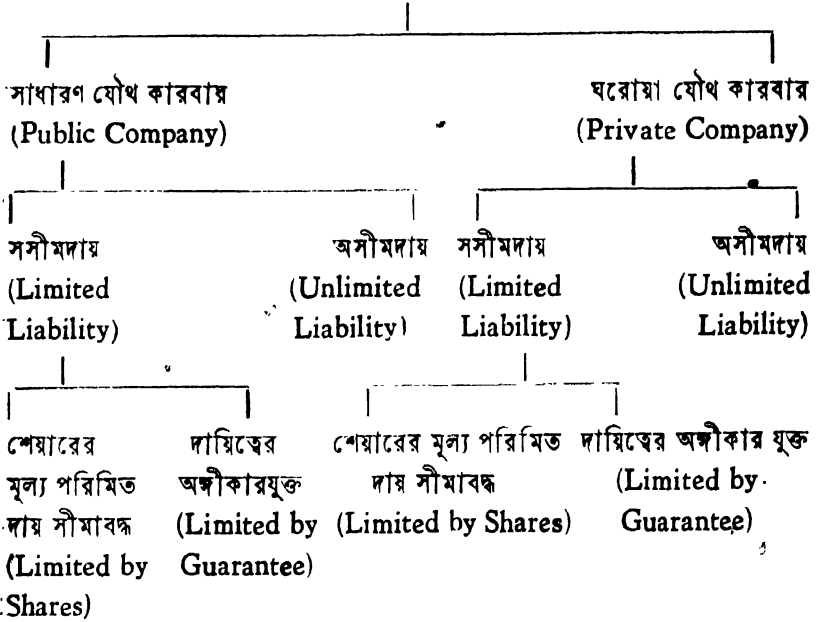
(১) ঘরোয়া যৌথ কারবার ও সাধারণ যৌথ কারবার বা জনসংঘ
(Private Company and Public Company): অংশীদারী কারবারের (ব্যবসায়) মত গোপনীয়তা (secrecy) বজায় রাখিয়া এবং স্বল্প পরিমিত অংশীদার লইয়া ব্যবসায় করার সুবিধা এবং যৌথ কারবারেরও কিছু ঘরোয়া যৌথ কারবার সুযোগ সুবিধা যাহাতে পাওয়া যায় তদুদ্দেশ্যে একপ্রকার যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাকে বলা হয় ঘরোয়া যৌথ কারবার। ঘরোয়া বলার কারণ এই যে সাধারণ যৌথ কারবারের মত এই প্রকার যৌথ কারবারের মূলধন জনসাধারণের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয় না। সংস্থাপকদের (promoters) আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই এই প্রকার যৌথ কারবারের অংশপত্র (shares) বিক্রয় সীমাবদ্ধ থাকে। আইনও এই প্রকার যৌথ কারবারকে মানিয়া লইয়াছে। ঘরোয়া যৌথ কারবারকে প্রসারিত অংশীদারী ব্যবসায় (Extended partnership business) বলা যায়। কারণ অংশীদারী কারবারের মতই ইহার মালিকানা কতিপয় পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যবসায় যৌথ কারবারের সুযোগ লাভ করার জন্ত, বিশেষত সীমদায়ের (Limited Liability), ঘরোয়া যৌথ কারবার গঠন করে। আইনের চক্ষে উহা বেআইনী নহে।

(২) সাধারণ যৌথ কারবার বা জনসংঘ (Public Company): সাধারণ যৌথ কারবার ঘরোয়া যৌথ কারবারের মত ইহার কার্যাবলী কতিপয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ

স্বাধিতে পারে না। সাধারণ যৌথ কারবারের মূলধন সাধারণের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়।

উপরের আলোচনা হইতে যৌথ কারবারের নানা ভাগ নিয়ে চিত্র সাহায্যে দেখান যায়।

যৌথ কারবার (Company)



সরকারী যৌথ কারবার (Government Company) : ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন (১৯৫৬) অনুসারে এক নতুন শ্রেণীর যৌথ কারবার গঠন করা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহাকে বলা হয় সরকারী যৌথ কারবার। ১৯৫৬ সালে যৌথ কারবারী আইন (Company Act) পাস হওয়ার পূর্ব সরকারী যৌথ কারবার পৰ্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় কারবারী প্রতিষ্ঠানের কোনও প্রয়াস দেখা যায় নাই। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে উহাতে সকল প্রকার শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিলে পরিকল্পিত ফল পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই সরকারী যৌথ কারবারের অস্তিত্বকে আইনত স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অংশপত্রের সংখ্যা গরিষ্ঠতা (majority) সরকারের হাতে রাখিয়া সরকারী যৌথ কারবারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। সরকারী যৌথ কারবারে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা উভয়ে সম্মিলিতভাবে মূলধনের শতকরা

অন্য ৫১ ভাগ অধিকার করে। এই প্রকার প্রতিষ্ঠান গঠনের ভার থাকে সরকারের হাতে। সরকার নিজে শতকরা ৫১ ভাগ অংশপত্র রাখিয়া বাকী অংশপত্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতে পারে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য থাকে বলিয়া ইহাকে সরকারী যৌথ কারবার বলা হয়। হিন্দুস্তান শিপ ইয়ার্ড (Hindusthan Ship Yard) কোম্পানী নামে যে যৌথ কারবারটি গঠন করা হইয়াছে উহা সরকারী কারবারের একটি উদাহরণ।

সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার (Statutory Company): বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত এবং বিশেষ কার্য সম্পাদন করার অধিকার দিয়া আইন সভায় আইন পাস করিয়া কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন কর সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার হইলে সেই প্রকার যৌথ কারবারকে সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার বলে। সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এক নির্দিষ্ট এলাকায় সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারের এক বিশেষ ব্যবসায়িক কার্য করার একাধিকার বা একচেটিয়া অধিকার (monopoly right) থাকে। সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (Reserve Bank of India); ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সান্পাই কর্পোরেশন (Calcutta Electric Supply Corporation); রেল কোম্পানীসমূহ ইত্যাদি। ইহা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (East India Company) একটি সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ছিল।

ব্যক্তিগত যৌথ কারবার বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (One-man Company): ব্যক্তিগত এবং যৌথ কারবার দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাব এক প্রকার কারবারী প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা হইয়াছে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান কখনও ব্যক্তিগত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে সসীমদায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের স্বযোগ নেওয়ার জন্ত ঘরোয়া সসীমদায় যৌথ কারবার হইতে পারে। সেই প্রকার ঘরোয়া ব্যক্তিগত যৌথ কারবার সাধারণ যৌথ কারবার হিসাবে কার্য চালাইতে পারে কিন্তু কারবারের অংশপত্র এমতভাবে বিলি করা হয় যাহাতে সংস্থাপক নিজেই অংশপত্রের সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিজের হাতে রাখিয়া দেয়, যাহাতে ভোটাধিকারের সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাহার নিজের হাতেই থাকে। বস্তুত, সংস্থাপক নিজেই সর্বস্বা। যৌথ কারবারী আইনের ধারা অনুসারে ইহার ব্যবসায় পরিচালনা হয় বলিয়া ইহাকে বেআইনী বলা যায় না। এই প্রকার যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান যে সাধারণ যৌথ কারবারের স্বযোগ স্ববিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না তাহা একটি মামলায় স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং পৃথিবীব্যাপী গ্রাহ্য হইতেছে। উহা হইতেছে সলোমন বনাম সলোমন (Solomon Vs Solomon) মামলা। ইহাতে এই রায় (Judgement) দেওয়া হইয়াছে যে আইনানুগ সর্বনিম্ন সংখ্যক সদস্য লইয়া যৌথ

কারবারী আইনের নির্দেশ মানিয়া কোন পারিবারিক ব্যবসায় চালিত হইলেও সেই ব্যবসায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (State Enterprise) : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উৎপাদন ব্যবস্থাকে বুঝায়। যখন কোনও বিশেষ শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে তখন তাহাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বলা হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন ব্যবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে।

শিল্পবিপ্লবের সূর্যোদয়ে অর্থনীতিতে ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ছিল ঘরোয়া (Private)। ঘরোয়া উদ্যোগ বলিতে বুঝা যায় ব্যবসায় অনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন উৎপাদন। এই প্রথাকে বলা হয়

ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ (Capitalism)। ইহাতে ব্যবসায়, বাণিজ্য, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ইহাকে বলা হয় অবাধ ব্যবসায় (Let alone ;

ফরাসী ভাষায় বলে Laissez faire)। কিন্তু দেখা গেল যে ব্যবসায়ী সর্বদা নিজের মুনাফা বাড়াইতেই ব্যগ্র। ফলে তাহার কার্যকলাপ সর্বদা সমাজের কল্যাণের সহায়ক হয় না। বিশেষতঃ এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই ঘরোয়া উদ্যোগ ব্যবস্থার প্রবর্তক গ্রেট ব্রিটেনেও কতিপয় শিল্প ও ব্যবসায় রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিচালিত হইতেছে। যেমন—রেলপথ, ডাক তার বিভাগ, প্রচার বিভাগ (Broadcasting)। শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া (Nationalise) অথবা রাষ্ট্রের একক মূলধনে নতুন উদ্যোগ গঠন করিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিচালিত হয়। পূর্বে যে সরকারী যৌথ প্রতিষ্ঠানের (Government Company) উল্লেখ করা হইয়াছে উহাকে সরকারী উদ্যোগ বলা যায়। আবার সংবিধিবদ্ধ যৌথ কারবার যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও ব্যবস্থাপনায় থাকে তাহাকেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বলা যায়। যেমন জীবন বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া একটি সরকারী সংস্থা লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (Life Insurance Corporation of India) অথবা বিমান চলাচল ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া এয়ার লাইনস কর্পোরেশন (Airlines Corporation) গঠন করা হইয়াছে উহাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

সরকারী উদ্যোগে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় উহার আবশ্যকীয় মূলধন রাষ্ট্রই যোগায়। অবশ্য আবশ্যিকবোধে সাধারণের নিকট হইতেও মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

কেবলমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গঠিত হয় না। পরিকল্পিত উপায়ে যাহাতে দেশের সম্পদ ব্যবহার করিয়া নাগরিকদের সামগ্রিক উন্নতি করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

বেসরকারী কারবারে কারবারের মালিকদের অর্থাৎ কারবারের অংশগ্ৰহণ অধিকারীদের ব্যতীত কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। কিন্তু সরকারী

উদ্যোগে কারবারের কার্যাবলীর জন্য দেশের নাগরিকদের নিকট সরকারকে জবাবদিহি করিতে হয়। অবশ্য জবাবদিহি হয় বিধান সভায়না লোকসভার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে অধুনা অর্থনীতি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করা হইয়াছে। উহাকে বলা হয় **মিশ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ (Mixed Economic Enterprise)**।

মিশ্র উদ্যোগে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মিশ্র অর্থনীতি পাশাপাশি কার্য করে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতের লৌহশিল্প। বেসরকারী প্রচেষ্টায় বা উদ্যোগেই ভারতের লৌহশিল্প গড়িয়া উঠে। কিন্তু লৌহশিল্পের গুরুত্ব এত অধিক, বিশেষত ভারতের পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করিতে উহার অবদান এতই গুরুত্বপূর্ণ, যে বেসরকারী লৌহ প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি কয়েকটি সরকারী লৌহ ইম্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—ভূর্গাপুর লৌহ ইম্পাত শিল্প, রাউরকেলার লৌহ ইম্পাত শিল্প, ভিলাইর লৌহ ইম্পাত শিল্প। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া সহযোগিতা করিয়া দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির চেষ্টা করে।

যৌথ কারবার গঠনের পদ্ধতি (Procedure of formation of a Company) :

যৌথ কারবার গঠন পদ্ধতি যৌথ কারবার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যে অবস্থায় আসিলে কারবার গঠন হইতে পারে তাহার পূর্বের অবস্থাও বিচার করা প্রয়োজন। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে মাহুঘের প্রচেষ্টা আবশ্যিক। যাহারা সেই প্রচেষ্টা করে এবং যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাহাদের বলা হয় সংস্থাপক (Promoter)।

সংস্থাপকের (Promoter) অভাবে অনেক ক্ষেত্রে স্বযোগ থাকা সত্ত্বেও বৃহদায়তন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হয় না। সংস্থাপকের প্রধান কর্তব্যই হইল বিনিয়োগ উপযোগী অর্থ (Investment fund) এবং বিনিয়োগের স্বযোগ (Investment opportunities) উভয়ের মধ্যে সংযোগ সংস্থাপকের কর্তব্য বিধান করা। উভয়ের মধ্যে বিনা আয়াসে সংযোগবিধান ঘটনা চক্রেই (fortuitous) ঘটে, স্বতরাং ইহা বিরল। Mead এর কথা উদ্ধৃত করিলে বলিতে হয়—“Unassisted coincidence of Investment fund and Investment opportunities is fortuitous”. এই সংযোগ সাধন করিতে সংস্থাপকের প্রথমেই কোন ব্যবসায়ে উন্নতির সম্ভাবনা অধিক, কোন ব্যবসায় অনগ্রসর, ইত্যাদি অবস্থা বিশদভাবে পর্যালোচনা করিতে হয়।

ব্যবসায়ের স্বযোগ সন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। স্বযোগ কার্যে

রূপায়িত করিবার জন্য দেশের আর্থিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ পরিকল্পনা কার্যকারী করিতে তাহার প্রয়োজন হইবে নানা প্রকার সম্পদ। সম্পদের মধ্যে জনসম্পদ (Human resources); আর্থিক সম্পদ (Economic resources)—যেমন কাঁচা মাল (Raw materials) যন্ত্রপাতি ইত্যাদি; নগদ অর্থ (money)। এই সব কয়টির সুসমঞ্জস প্রয়োগ (co-ordinated use) হইলেই ব্যবসায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নচেৎ নহে।

সবদিক বিবেচনা করিয়া যখন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন মনস্থ করা হয় তখন আসে আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ (Legal Procedure)। আইনানুগ পদ্ধতিকে কয়েকটি পর্বায়ে ভাগ করা যায়—

- (১) নিবন্ধন (Registration বা Incorporation); (২) আহ্বান Invitation to the public for subscription); (৩) অংশপত্র, বিলি (Allotment of shares); (৪) ব্যবসায় আরম্ভ (Commencement)।

যৌথ কারবার নিবন্ধনের পদ্ধতি (Procedure of Registration or Incorporation of Company) : যৌথ কারবার গঠন স্থির করিলে সংস্থাপক

(Promoter) কারবার নিবন্ধন করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সকল প্রকার যৌথ কারবারের পক্ষে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক রাজ্যে (State) একজন করিয়া যৌথ কারবার নিবন্ধক (Registrar of Joint Stock Companies) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। উক্ত অফিসে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের তালিকায় তালিকাভুক্ত বা পঞ্জীভূত হওয়াকেই নিবন্ধন বলে।

যৌথ কারবারের মোটামুটি দুইটি রকম আছে লক্ষ্য করিয়াছ—ঘরোয়া যৌথ কারবার (Private Company) আর সাধারণ যৌথ কারবার বা জনসংঘ (Public Company)। ঘরোয়া যৌথ কারবার নিবন্ধন কালে কারবারে অন্তত ২ জন সদস্য থাকিবে। দুই জনের আবেদনেই ঘরোয়া যৌথ কারবার নিবন্ধন হইতে পারে কিন্তু জনসংঘে বা সাধারণ যৌথ কারবার ন্যূনতম ৭ জন আবেদনকারী থাকা প্রয়োজন। ইহাদেরই বলা হয় সংস্থাপক।

সংস্থাপকবৃন্দ একত্রিত হইয়া কয়েকটি দলিল সম্পাদন করিলে যৌথ কারবার নিবন্ধন হইতে পারে। প্রথমত, যৌথ কারবারের পক্ষে স্মারকলিপি (Memorandum of Association) তৈয়ার করা বাধ্যতামূলক। স্মারকলিপির বিষয়বস্তু স্থানান্তরে আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয়ত, যৌথ কারবার পরিচালনার পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) গঠন করা প্রয়োজন। পরিমেল নিয়মাবলীতে কারবারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কিভাবে হইবে তাহার নির্দেশ থাকে। পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ার করা যৌথ কারবারের পক্ষে বাধ্যতামূলক

নহে। যৌথ কারবারী আইনে (Company Act) পরিমেল নিয়মাবলীর একখানা নমুনা দেওয়া আছে। ঐ নমুনার সকল দফা মানিয়া নিলে এবং সেই মর্মে ঘোষণাপত্রে সহি করিলে পৃথকভাবে পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ার না করিলেও চলে। তবে প্রত্যেক কারবারের ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য বা সমস্তা থাকিতে পারে যেজন্য পৃথকভাবে পরিমেল নিয়মাবলী তৈয়ারের আবশ্যক হইতে পারে।

তৃতীয়ত, যৌথ কারবারের প্রস্তাবিত ঠিকানা দাখিল করিতে হয়। প্রস্তাবিত ঠিকানা নিবন্ধনকালে দাখিল না করিলে নিবন্ধন হওয়ার পর কারবারের ঠিকানা ২৮ দিনের মধ্যে যৌথ কারবারের নিবন্ধকের অফিসে উহা দাখিল করিতে হয়।

চতুর্থত, যৌথ কারবারের আইনে লিপিত সম্পূর্ণ নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়াই যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে এই মর্মে কোনও ঘোষণাপত্র উকিল, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, এডভোকেট, বা অনুরূপ মর্যাদা-সম্পন্ন কোনও ব্যক্তির ঘোষণা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, যদি কারবার পরিচালনার ভার কোনও ম্যানেজিং এজেন্ট (Managing Agent) অথবা সেক্রেটারী ও ট্রেজারার (Secretaries & Treasurers) হাতে অর্পণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন হইয়াছে উহার একখানি প্রতিলিপি (copy) দাখিল করিতে হয়।

এই পাঁচ দফা করণীয় ঘরোয়া এবং সাধারণ উভয় প্রকার যৌথ কারবারের বেলাতেই প্রযোজ্য। সাধারণ যৌথ কারবারের বেলাতে পরিচালকের নামের তালিকা (Director) এতদ্ব্যতীত আরও করণীয়: (১) যাহারা যৌথ কারবারের পরিচালক (Director) হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নামের তালিকা; (২) যাহারা পরিচালক হিসাবে (Director) কাজ করিতে ইচ্ছুক সেই মর্মে তাহাদের নিজেদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি (Statement); (৩) স্মারকলিপিতে (Memorandum of Association) যদি দেখা যায় যে পরিচালকবৃন্দ পূর্ণাঙ্গ পরিমাণে অংশপত্র ক্রয় করিতে স্বীকৃত হয় নাই, তাহা হইলে পরিচালকগণের মধ্যে কার্য করার অধিকার লাভের জন্য যে পরিমাণ অংশপত্রের উল্লেখ পরিমেল নিয়মাবলীতে থাকিবে তাহা ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি।

উপরিলিখিত দলিল সমুদয় যৌথ কারবার নিবন্ধকের (Registrar of Joint Stock Companies) অফিসে দাখিল করিতে হয় এবং নিবন্ধন মাণ্ডল তৎসঙ্গে নিবন্ধনের মাণ্ডল (Registration fees) ও দাখিল মাণ্ডল (Filing fees) জমা দিতে হয়।

নিবন্ধন মাণ্ডল যৌথ কারবারের মূলধনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। নিবন্ধন মাণ্ডল ন্যূনতম ১০০ টাকা। মূলধন ২০০০০ টাকা উর্ধ্বে হইলে ক্রমবর্ধমান হারে (Graduated rate) বাড়িতে থাকে। দাখিল মাণ্ডল (filing fee) ন্যূনতম ৫ টাকা। উহাও মূলধনের পরিমাণ অথবা অংশীদারের (Shareholders) সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে স্থির হয়।

যৌথ কারবার নিবন্ধনের অফিস হইতে তখন স্মারকলিপি (Memorandum of Association) ও পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়া যদি আপত্তিজনক কিছু না থাকে তবে নিবন্ধন বা পঞ্জীভূত (Registration) করিবে এবং কারবারকে নিবন্ধন প্রমাণপত্র (Certificate of Registration) দিয়া থাকে। ইহাকে Certificate of Incorporation বলে। নিবন্ধন বা পঞ্জীভূত প্রমাণপত্র পাটলে যৌথ কারবার আইনত জন্মলাভ করে।

১-স্মারকলিপির গুরুত্ব (Importance of Memorandum of Association) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনকালে (Registration) যে সমুদয় দলিল নিবন্ধকের (Registrar) কাৰ্যালয়ে দাখিল করিতে হয় তাহার মধ্যে স্মারকলিপি অগ্ন্যতম। স্মারকলিপির গুরুত্ব খুবই অধিক। স্মারকলিপিকে যৌথ কারবারের জন্মপত্রিকা বলা যাইতে পারে। স্মারকলিপি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বনাম তৃতীয় পক্ষের মধ্যে একখানি চুক্তিপত্র। স্মারকলিপি অগ্ন্য একটা কারণেও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। উহা হইতেছে যে স্মারকলিপির উদ্দেশ্য সর্ত (object clause) যাহা নাই এরূপ কোনও কার্য যৌথ কারবার করিতে পারে না এবং করিলে তাহা আইনত সিদ্ধ হয় না। স্মারকলিপি এমনভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন যে স্মারকলিপি পরিবর্তনের প্রয়োজন না হয়, কারণ স্মারকলিপির কোনও ধারা বা সর্ত (Clause) কারবারের পরিচালকবর্গের সুরিধামত পরিবর্তন করা যায় না। স্মারকলিপি পরিবর্তন অনেক সময়সাপেক্ষ কারণ যৌথ কারবারী আইনে লিখিত উপায় ব্যতীত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদালতের মত ব্যতীত, স্মারকলিপি পরিবর্তন করা যায় না। স্মারকলিপি নিবন্ধনের জন্ত দাখিল করার পূর্বে উহাতে সংস্থাপকদের (Promoter) সহি থাকা প্রয়োজন। ঘরোয়া যৌথ কারবারীতে সর্বনিম্ন দুইজন ও জনসংঘ বা সাধারণ যৌথ কারবারে সর্বনিম্ন সাতজন সংস্থাপকের সহি প্রয়োজন।

স্মারকলিপিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়—এবং স্মারকলিপির ধারা তদনুসারেই স্মারকলিপির বিষয়বস্তু লেখা হয়। স্মারক-

লিপির প্রত্যেকটি ধারা বা সর্ভ ভিন্ন ভিন্ন দফায় লিখিত হয়, প্রত্যেকটি ধারায় ক্রমিক নম্বর (১, ২, ইত্যাদি) দিতে হয় এবং স্মারকলিপি সর্বদাই ছাপান অথবা টাইপ করা হয়।

স্মারকলিপির বিষয়বস্তু (Contents of a Memorandum of Association) : স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করিতে হয়।

১। নামধারা (Name clause) : যৌথ কারবারের নাম। যেমন—ফাউল
প্রে কোং লিঃ। যৌথ কারবার যদি দায় সীমাবদ্ধ বা
১। নামধারা সসীমদায় হয় তাহা হইলে নামের পর 'লিঃ অথবা 'লিমিটেড'
এই কথা লিখিতে হয়। কিন্তু কারবার যদি ঘরোয়া সসীমদায় যৌথ কারবার
হয় তাহা হইলে ' (পি) লিঃ ' অথবা ' (প্রাইভেট) লিমিটেড ' লিখিতে হয়।

একুথা পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন যে যৌথ কারবারের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা লাভ হয়
নিবন্ধনের পরে। সুতরাং ব্যক্তিরও যেমন নির্দিষ্ট নাম থাকে, কারবারেরও তেমন
নির্দিষ্ট নাম থাকে যে নামে উহা সর্বসমক্ষে পরিচিত হয়।

২। ঠিকানা ধারা (Address অথবা Situation clause) : এখানে যৌথ
কারবার কোন্ রাজ্যে (State) স্থিত মাত্র উহা লিখিলেই যথেষ্ট হয়। তবে
অনেক ক্ষেত্রেই কারবারের প্রধান কার্যালয়ের (Head Office)

২। ঠিকানা ধারা ঠিকানা দেওয়া হয়। অন্ত্যায় কারবার নিবন্ধনের ২৮ দিনের
মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা নিবন্ধনের অফিসে দাখিল করিতে হয়।

৩। উদ্দেশ্য ধারা (Object clause) : স্মারকলিপিতে যে সর্ভ বা ধারা
সন্নিবেশিত হয় তাহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ধারা। কারবারের
উদ্দেশ্যাবলী এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাহাতে কোনও
৩। উদ্দেশ্য ধারা কারণে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ না করিলে অল্প কার্য
গ্রহণ করিতে পারে। অনেক সময়ে স্মারকলিপিতে মূল উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট-
হীন উদ্দেশ্যও যোজনা করা হয় ; যাহাতে ভবিষ্যতে কারবারের কোনও কার্য
বেআইনী (ultra Vires) বলিয়া ঘোষিত না হয়।

৪। দায় ধারা (Liability clause) : দায় ধারাতে
৪। দায় ধারা কারবারের সদস্যদের দায় সসীম (Limited) কিংবা অসীম
(Unlimited) উহার উল্লেখ করিতে হয়।

৫। মূলধন ধারা (Capital clause) : অঙ্গীকারাবদ্ধ দায় সীমাবদ্ধ যৌথ
কারবারে (Company Limited by Guarantee) সদস্যগণ যে কত মূল্যের দায়
গ্রহণ করিতে রাজী উহার উল্লেখ প্রয়োজন। কিন্তু কারবার

৫। মূলধন ধারা যদি অংশপত্র দায় সীমাবদ্ধ (Company Limited by
Shares) হয় তাহা হইলে মোট মূলধনের মূল্য এবং কয়খানি অংশপত্রে ঐ মূলধন
বিভক্ত তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

- ৬। **সংস্থাপন ধারা (Association clause)** : এই ধারায় সংস্থাপক বৃন্দের নাম, ঠিকানা, কয়খানি অংশপত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক
 ৬। সংস্থাপন ধারা সেই তথ্যসমূহ দিতে হয় এবং প্রত্যেক সংস্থাপককে কোনও সাক্ষীর সম্মুখে সহি করিতে হয়।

পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) : নিবন্ধনকালে যে অপর দলিলটি দাখিল করিতে হয় উহাই পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association)। পরিমেল নিয়মাবলীকে কারবারের উপবিধিও (Bye-laws) বলা হয়। পরিমেল নিয়মাবলীতে কারবারের পরিচালনার নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে। ইহাতে কারবারের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সকল প্রকার ধারা লেখা থাকে। পরিচালকমণ্ডলী কি উপায়ে গঠিত হইবে, পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য, দায়িত্ব, ম্যানেজারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, হিসাব পরীক্ষকের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে।

পরিমেল নিয়মাবলী পৃথকভাবে তৈয়ার না করিয়াও পারা যায় একথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে যৌথ কারবারী মূল আইনে সন্নিবেশিত ‘সূচী এ’ (Table A) গ্রহণ করিলেই চলে। কিন্তু অসীম দায় যৌথ পরিমেল নিয়মাবলীর কারবার, ঘরোয়া যৌথ কারবার অথবা অঙ্গীকারাবদ্ধ দায় পরিবর্তে Table A সীমাবদ্ধ যৌথ কারবারের বেলায় পরিমেল নিয়মাবলী পৃথকভাবে গঠন করা বাধ্যতামূলক।

পরিমেল নিয়মাবলীও স্মারকলিপির মত পৃথক পৃথক অল্পক্ষেত্রে তৈয়ার করিতে হয়। উহা ছাপান বা টাইপ করিতে হয়।

পরিমেল নিয়মাবলীও খুব সতর্কতার সহিত তৈয়ার করা প্রয়োজন, কারণ যৌথ কারবারের ব্যবস্থাপনা পরোক্ষ উপায়ে (Indirect way) হয় বলিয়া পরিমেল নিয়মাবলীতে যে সমুদয় ক্ষমতা সদন্তগণ গঠনে সতর্কতা পরিষ্কারভাবে পরিচালকবর্গের হাতে স্তম্ভ করে উহাই মাত্র সম্পাদন করিতে পারে। স্তত্রাং পরিচালনকার্যে যাহাতে কোন প্রতিবন্ধ বা ব্যাঘাত না ঘটে সেই জন্তই পরিমেল নিয়মাবলী কোনও প্রকার দ্ব্যর্থবোধক হওয়া সঙ্গত নহে। আবার পরিমেল নিয়মাবলী বহির্ভূত কোনও কার্য করিয়া যাহাতে পরিচালকবর্গ কারবারের সদস্যদের কোনও অতিরিক্ত দায়াবদ্ধ না করে সেজন্যও পরিমেল নিয়মাবলীতে আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

স্মারকলিপির মতই পরিমেল নিয়মাবলী পরিবর্তন সময় ও বিশেষ বিধি সাপেক্ষ।
পরিমেল নিয়মাবলীর বিষয়বস্তু (Contents of Articles of Association) : পরিমেল নিয়মাবলীকে কারবারের সদস্যবৃন্দের সহিত

কারবারের চুক্তি বলা যাইতে পারে। পরিমেল নিয়মাবলীতে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে বলিয়া স্বতই উহা পরিমেল নিয়মাবলীর বিষয় বস্তু বৃহদাকার হয়। সুতরাং উহার বিষয় বস্তু এখানে আলোচনা করা অসম্ভব। তবে বিষয় বস্তুসমূহকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয় ভাগে ভাগ করিয়া দেখান হয়। অথবা পরিমেল নিয়মাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১। অংশপত্র সম্বন্ধীয় : (ক) শেয়ার বা অংশপত্রের বিভিন্ন ভাগ, যেমন—পূর্বাধিকার অংশপত্রে, সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র; সাধারণ বা ক্রায়াভুগ অংশপত্র ইত্যাদি। লক্ষ্য করিতে হইবে বিভিন্ন প্রকার অংশপত্র ক্রেতাদের বিভিন্ন প্রকার অধিকার থাকে বলিয়া পরিমেল নিয়মাবলীতে সকল প্রকার অংশপত্রেরই কোন অংশপত্রের কি প্রকার অধিকার এবং দায়িত্ব তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

(খ) অংশপত্র হস্তান্তর কি উপায়ে হইতে পারে, আবার উত্তরাধিকার সূত্রে অংশপত্রের অধিকারী হইলে কি উপায়ে সে হস্তান্তর সিদ্ধ হয় ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে।

(গ) অংশপত্রের উপর তলবীয় মূল্য অর্থাৎ শেয়ারের মূল্যের অংশ সময় মত পরিশোধ না হইলে কারবারের পরিচালকবর্গ সেই অংশপত্র (share) বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। কি কি সর্তে অর্থাৎ কত দিনের মধ্যে তলবীয় মূল্য শোধ না হইলে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এই সকল বিষয় বাজেয়াপ্তকরণের অধিকারের মধ্যে আলোচনা করা থাকে।

(ঘ) অংশপত্রের মূল্য শোধের তলব কখন কি ভাবে দিতে হইবে তাহাও লেখা থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে।

(ঙ) অনেক সময়ে দেখা যায় কারবারে অতি মূলধন করণ (Over-capitalisation) হইয়াছে। যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করিলে মূলধনের সৃষ্টি ব্যবহার হইতে পারে তদতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইলে যে মুনাফা অধিক হইবে তাহা নহে। সুতরাং পরিচালকবর্গের সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হয় যে কারবারে যে মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে উহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবার প্রয়োজনের তুলনায় কম না হয়। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইয়া থাকে তাহা হইলে শেষ পন্থায় অংশীদারগণ মুনাফা পায় কম। সুতরাং প্রশ্ন উঠে মূলধনের যে অংশ প্রয়োজনতিরিক্ত তাহা কমাইয়া দেওয়া। ইহাকে বলা হয় মূলধন ন্যূনীকরণ

(Reduction of Capital)। শেয়ারের মূল্য ন্যূনীকরণের পছাও পরিমেল নিয়মাবলীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়।

২। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক : এই অমুচ্ছেদে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ থাকে :

(ক) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন প্রথা বা নিয়োগ প্রথা।

(খ) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অধিকার ও

৬। পরিচালক কর্তব্যের পরিধি।

নির্বাচন, পারিশ্রমিক, (গ) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পারিশ্রমিক, অধিকার ও কর্তব্য পারিতোষিক ইত্যাদি।

(ঘ) ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণকারীর বহিষ্কারের উপায়।

৩। সদস্য সন্মতীয় : বিভিন্ন প্রকার অংশপত্রের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার থাকে।

কোন অংশপত্র অধিকারী কি ভাবে ভোটদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, কি ভাবে

ভোটদান হইবে, স্তূপীকৃত (cumulative) কিংবা একক (single)

৭। ভোটদানের ইত্যাদির উল্লেখ থাকে পরিমেল নিয়মাবলীতে। পরিচালক পদ্ধতি

সংসদের (Board of Directors) মিটিংএর পদ্ধতি এই

অমুচ্ছেদে আয়োচিত হয়। আরেকটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ থাকে এই অমুচ্ছেদে।

উঃ কারবারের নিজস্ব সীলরক্ষণের নিয়ম। কাহার নিকট সীলমোহর থাকিবে তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

৪। হিসাব সন্মতীয় : কারবারের হিসাবপত্রাদি বিষয় খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় এই অমুচ্ছেদে আলোচিত হয়। হিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, তাহার

পারিশ্রমিক, লাভাংশ বিতরণের পদ্ধতি, কারবারের পক্ষে

৮। হিসাবনিকাশ পরিচালকসমূহীর ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদির বিষয় পরিমেল

নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়।

অমুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র (Prospectus) : যৌথ কারবার নিবন্ধন

হইলেই প্রায় উঠে কারবার পরিচালনার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।

যৌথ কারবারের মূলধন কোনও ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি যোগায় না ; মূলধন

সংগ্রহ করিতে হয় শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া। সুতরাং অংশপত্র ক্রেতাদের

আকৃষ্ট করার প্রয়োজন হয়। অংশপত্র ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার

অমুষ্ঠানপত্রের সংজ্ঞা উদ্দেশ্যেই অমুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র প্রচার করিতে হয়।

অমুষ্ঠানপত্রকে যৌথ কারবারী আইনে এই ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—“any

prospectus, circular, advertisement, or other document inviting

offers from the public for the subscription of any shares in or

debentures of a body corporate.” তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে কোনও

প্রকার প্রচারকার্য দ্বারা কারবারের অংশপত্র অথবা ঋণপত্র (Debenture)

ক্রয়ের আস্থান পাওয়া যাইতে পারে তাহাই অস্থানপত্র বা বিবরণপত্র (Prospectus)।

অস্থানপত্রকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায় (১) সংবাদ প্রদান ; (২) শেয়ার ক্রয়ের আস্থান ; (৩) আইনানুগকর্তব্য। অস্থানপত্রের বিষয় বস্তুকে মোটামুটি বলা যাইতে পারে—স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মা-
অস্থানপত্রের
অংশভাগ
বলীর সারাংশ প্রদান। অস্থানপত্র বা বিবরণপত্র প্রচার
করিতে হয় স্থানীয় কোনও পত্রিকায়। ইহার উদ্দেশ্য যাহাতে
অস্থানপত্রে লিপিত সকল বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।
অস্থানপত্র প্রচার করা বাধ্যতামূলক নহে। অস্থানপত্র
অস্থানপত্রের
পরিবর্তে বিবৃতি
প্রচার না করিয়া নিবন্ধকেব কার্যালয়ে 'অস্থানপত্রের পরিবর্তে
বিবৃতি' (Statement in lieu of prospectus) দাখিল
করিলেও চলে। কিন্তু যেখানে অস্থানপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করা হয়।
সে-ক্ষেত্রেও সাধারণত বিবৃতি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

অস্থানপত্র প্রকাশ করার পূর্বে উহার এক প্রতিলিপি নিবন্ধকের অফিসে জমা
দিতে হয়। নিবন্ধকের অফিস হইতে যদি অস্থানপত্র পরিবর্তন করার বা সংশোধন
করার কোনও নির্দেশ পাওয়া না যায় তাহা হইলেই অস্থান-
অস্থানপত্র
নিবন্ধকের কার্যা-
লয়ে নথিকরণ
পত্র প্রচার করিতে পারা যায়। অস্থানপত্রের প্রতিলিপি
নিবন্ধকের কার্যালয়ে জমা দেওয়ার ২০ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার
পূর্বেই অস্থানপত্র প্রচার করিতে হয়। এই সর্ত পূরণ করা
হইয়াছে তাহা প্রমাণ করার জন্তই অস্থানপত্রে লিখিতে হয় কোন্ তারিখে
অস্থানপত্রের প্রতিলিপি নিবন্ধকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হইল।

অস্থানপত্র প্রচার করা বাধ্যতামূলক নহে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান
সাধারণের নিকট হইতে শেয়ার ক্রয়ের আস্থানের অপেক্ষা না করিয়াও শেয়ার বা
অংশপত্র বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে। এরূপ কোন চুক্তির মাধ্যমে শেয়ার
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে সেইরূপ ক্ষেত্রেই অস্থানপত্রের বদলে বিবৃতি
(Statement in lieu of prospectus) দাখিল করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও
দেখা যায় যে অস্থানপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি অস্থানপত্রের মতই প্রচার করা হয়।
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে সংবাদপত্রে যখন অস্থানপত্র প্রচার করা হয় তখন
শিরোনামায় লেখা থাকে 'Prospectus'। শিরোনামায় যদি লেখা হয় (This is
an announcement and not a prospectus) তাহা হইলে বুঝিবে
যে কারবারী অল্প উপায়ে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সাধারণের নিকট
অংশপত্র বিক্রয়ের আস্থান করে না। অল্প উপায়ে কিভাবে মূলধন
সংগ্রহ করা হয় তাহা অবলেনন বা ঝুঁকি গ্রহণ (Underwriting) পর্যায়ে
আলোচনা করা হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করার পূর্বেই মূলধন নিয়ন্ত্রণ প্রাধিকারের (Controller of Capital Issue) অনুমতি সংগ্রহ প্রয়োজন। অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত মূলধন সংগ্রহের অনুমতি যে মূলধন নিয়ন্ত্রণ প্রাধিকার দিয়াছেন অনুষ্ঠানপত্রে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানপত্র দ্বারা সাধারণকে কারবারে অংশ গ্রহণ করিতে এবং ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সুতরাং অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হয় তখনই যখন অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের ফলে সাধারণে অংশপত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় সেজন্য কারবারের ভবিষ্যৎ এমতভাবে অঙ্কন করা হয় যাহাতে কারবারের ভবিষ্যৎ অবস্থা খুবই উজ্জ্বল মনে হয় এবং কাহারও মনে কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অসং পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ট কুশলতার সহিত অনুষ্ঠানপত্র তৈয়ারি করিয়া থাকে। যাহাতে কারবারের সদস্যদের চক্ষে ধূলি দিয়া অংশপত্র বিক্রয় করা না হয় সেই উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর উপর আইনত দায় বর্তান হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতে ইহা কোনও প্রকারে প্রমাণিত হয় যে অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অথবা সত্য গোপন করিয়া অথবা যাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল তাহা উল্লেখ না করিয়া পরিচালকমণ্ডলী অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিয়াছে তাহা হইলে পরিচালকমণ্ডলী দেওয়ানী ও ফৌজদারী, দ্বিবিধ আইনেই দণ্ডনীয়। যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে অনুষ্ঠানপত্রের লিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া অংশীদারগণ ঠকিয়াছে তাহা হইলে দেওয়ানী আইনের নিয়মে অংশীদারগণ ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। আবার সেই একই কারণে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হইতে পারে তাহা জরিমানা, কারাদণ্ড বা উভয়ই হইতে পারে।

অনুষ্ঠানপত্রের বিষয়বস্তু (Contents of a Prospectus) : অনুষ্ঠানপত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ অপরিহার্য তাহা নিয়ে আলোচনা করা হইল।

- | | |
|---------------------------|--|
| অনুষ্ঠানপত্রের বিষয়বস্তু | ১। কারবারের স্মারকলিপিতে যে সমুদয় ধারা উল্লেখ করা হইয়াছে সে সমস্ত ধারার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। |
| ১। স্মারকলিপির সারমর্ম | ২। কারবার সংস্থাপকদের নাম, ঠিকানা, তাহাদের পেশা, প্রত্যেকে কয়খানি করিয়া শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা। |
| ২। সংস্থাপকের স্বীকৃতি | ৩। কারবারের পরিচালকমণ্ডলীর নাম, ঠিকানা, |
| ৩। পরিচালকমণ্ডলী | পেশা ইত্যাদি ব্যতীতও প্রত্যেক পরিচালক কয়খানি করিয়া অংশপত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার উল্লেখ থাকে। যদি পরিচালক |

হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবার ক্ষমতা ন্যূনতম মূল্যের অংশপত্র ক্রয়ের বিধি থাকে তাহা হইলে পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে সেই ন্যূনতম মূল্যের, অংশপত্র ক্রয় করিয়াছে কিনা তাহা উল্লেখ করিতে হয়।

৪। শেয়ার বা অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য কিভাবে আদায় করা হইবে অর্থাৎ আবেদনপত্রের সহিত আঙ্কিক মূল্যের কত অংশ, বিলিকালে কত অংশ এবং তারপর তলব কিভাবে করা হইবে এবং তলব হইলে বিলির

৪। অংশপত্রের মূল্য পর প্রথম তলব, প্রথম তলব হইতে কতদিন পর দ্বিতীয় তলব আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদি অস্থগঠনপত্রে লিখিত থাকে। মোট অংশপত্রের মূল্য কয় কিস্তিতে এবং কখন কি ভাবে আদায় হইবে তাহাই এই ধারায় লিখিত থাকে মনে কর, প্রতিখানি শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য ১০০ টাকা। উহা আদায় করা হইবে আবেদনকালে (On application) শতকরা ২০ ভাগ; বিলিকালে (On allotment) শতকরা ৩০ ভাগ; প্রথম তলবে (First call) শতকরা ২০ ভাগ; দ্বিতীয় তলবে (Second call) শতকরা ২০ ভাগ এবং চূড়ান্ত তলবে (Final call) শতকরা ১০ ভাগ।

৫। বিভিন্ন প্রকার অংশপত্রের বিবরণ অস্থগঠনপত্রে দিতে হয়। কয় প্রকারের অংশপত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইতেছে—যেমন পূর্বাধিকার অংশপত্র (Preference shares); সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র (Cumulative Preference Shares); শ্রাম্যভূগ (Equity) বা সাধারণ অংশপত্র ইত্যাদি।

৬। ন্যূনতম আবেদনের পরিমাণ কি হইবার উল্লেখ। অর্থাৎ ন্যূনতম কয়খানি অথবা কতমূল্যের অংশপত্র ক্রয়ের আবেদন করিলে অংশপত্র বিলি করা হইবে তাহার উল্লেখ। প্রসঙ্গত আবেদনপত্র আলোচনা করা প্রয়োজন যে কোন যৌথ কারবারই ন্যূনতম টাকা (Minimum subscription) আদায় না হইলে অংশপত্র বণ্টন আরম্ভ করিতে পারে না। ন্যূনতম টাকা কি তাহা পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৭। কারবার প্রতিষ্ঠাকালে প্রারম্ভিক ব্যয় (Preliminary Expenses) বা সংগঠন ব্যয় (Formation Expenses)। এখানে কেবল মোট সংগঠন ব্যয় বা প্রারম্ভিক ব্যয় কত হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করিতে হয়।

৮। কারবার যদি কোনও প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহার বা যাহাদের নিকট হইতে কোনও দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছে তাহাদের নাম এবং চুক্তির সারাংশ দিতে হয়।

৯। কারবার যদি ব্যবস্থাপনার ভার কোনও ম্যানেজিং এজেন্ট (Managing Agents), সেক্রেটারী এবং ট্রেজারার্স (Secretaries & Treasurers) অথবা কোনও ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের হাতে অর্পণ করিয়া থাকে তাহা হইলে উহাদের সহিত কার্য পরিচালনা ব্যাপারে চুক্তির সর্ব, পারিশ্রমিক ইত্যাদির উল্লেখ করিতে হয়।

১০। পরিচালকমণ্ডলীর সহিত কারবারের কোনও প্রকার চুক্তি হইয়া থাকিলে বিশেষত তাহাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং পারিশ্রমিক অস্থগতপক্ষে উহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১০। পরিচালক-বর্গের সহিত চুক্তি ১১। কারবারের হিসাব নিরীক্ষকের নাম, ঠিকানা।
১১। হিসাবনিরীক্ষা ১২। অত্র কোন কারবারের সহিত কোনও চুক্তি

১২। অত্র কারবারের সম্পাদিত হইয়া থাকিলে তাহার সারাংশ।
সহিত চুক্তি ১৩। সদস্যের ভোট প্রথা ও ব্যবসায়ের লাভে অংশ গ্রহণ।

১৩। ভোটদান পদ্ধতি ১৪। অংশপত্রের উপর কোনও অধিমূল্য (Premium) পাওয়া গিয়াছে কিনা, পাওয়া গিয়া থাকিলে কত, অথবা অংশপত্র উনমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকিলে, কত উনমূল্যে বিক্রয় হইল তাহার উল্লেখ।

১৫। কারবার যদি পরিশোধ্য পূর্বাধিকার অংশপত্র (Redeemable Preference Shares) বিক্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে কিভাবে অংশপত্রের মূল্য পরিশোধ করা হইবে তাহার উল্লেখ।

১৬। লাভক্ষতি হিসাব ও উদ্ধৃতপত্র ১৬। কারবারের লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্ধৃতপত্র কোথায় এবং কখন দেখা যাইতে পারে তাহার উল্লেখ।

অস্থগতপক্ষে যে সকল ধারা উল্লেখ না করিলে আলোচনা অপর্যাপ্ত থাকিবে তাহারই এখানে উল্লেখ করা হইল।

অংশপত্র বণ্টন (Allotment of shares) : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠনে তৃতীয় ধাপ হইতেছে অংশপত্র বণ্টন। নিবন্ধন ও অস্থগতপক্ষে প্রচারের পরই অংশপত্র বিলি প্রদ্র। কিন্তু অংশপত্র বণ্টন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে কারবারী প্রতিষ্ঠানকে কতিপয় সর্ব পূরণ করিতে হয়, নচেৎ অংশপত্র বিলি করিতে পারে না।

অংশপত্র বণ্টন নূনতম টাকা আদায় ও অংশপত্র বণ্টন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে আবেদন করে না ততক্ষণ অংশপত্র বণ্টন আরম্ভ করিতে পারে না।

বিভীত, অংশপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে যে অর্থ পাওয়া

গিয়াছে উহা কোনও তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে (Scheduled Bank) গচ্ছিত রহিয়াছে সেই মর্মে বিবৃতি প্রদান।

তৃতীয়ত, যদি কারবার কোনও অস্থানপত্র প্রকাশ করিয়া না থাকে তাহা হইলে অংশপত্র বন্টনের অন্তত তিন দিন পূর্বে নিবন্ধকের অফিসে একথানা অস্থানপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করিবে।

অংশপত্র বন্টনের পূর্বে অস্থানপত্র দাখিল
অস্থানপত্র প্রকাশ, চতুর্থত, যদি অস্থানপত্র প্রকাশের ১২০ দিনের মধ্যেও ন্যূনতম চাঁদা আদায় না হইয়া থাকে তাহা হইলেও অংশপত্র আদায় ও অংশপত্র বিলি করা চলে না।

বন্টন পঞ্চমত, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান অস্থানপত্র প্রকাশের পর অন্তত পাঁচদিন অতিবাহিত না হইলে অংশপত্র বন্টন আরম্ভ করিতে পারে না। অবশ্য এই সময়কে পরিচালকমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে বাড়াইয়াও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে কবে করিয়া অংশপত্রবন্টন অংশপত্র বন্টন আরম্ভ হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

ব্যবসায়ের কার্য আরম্ভ (Commencement of business) : একক মালিকানা (Proprietary), অংশীদারী (Partnership) অর্থবা ঘরোয়া যৌথ (Private Company) ব্যবসায়ের মত সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (Public Company) ব্যবসায় গঠন হইলেই ব্যবসায়ের কার্য আরম্ভ করিতে পারে না। ব্যবসায়ের কার্য আরম্ভ করিতে হইলে সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানকে যৌথ কারবারের নিবন্ধক (Registrar of Joint Stock Companies) নিকট হইতে ব্যবসায় আরম্ভ করার অনুমতি সংগ্রহ করিতে হয়। সেই অনুমতিপত্রকে ব্যবসায় আরম্ভের অধিকার প্রমাণপত্র (Certificate of Commencement) বলে। সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান আইনত গঠিত হইলেও এবং আইনের অন্তর্গত সর্ভাঙ্গুযায়ী অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিলেও আইনত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায় আরম্ভের অধিকার প্রমাণপত্র না পায় ততক্ষণ কারবার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার হয় ব্যবসায় আরম্ভের অধিকার পত্র পাইলে। ব্যবসায় আরম্ভের অধিকার পত্র প্রাপ্তিই সাধারণ যৌথ কারবারের পক্ষে চতুর্থ ও শেষ ধাপ।

অবলেন্থন বা দায় গ্রহণ (Underwriting) : একথা বলা নিশ্চয়োজন যে যখন কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই কারবারের পক্ষে অংশপত্র ক্রেতা সংগ্রহ করা কষ্টকর। বিশেষত, যদি কারবারে অর্থ-বিনিয়োগ (Investment) খুবই ঝুঁকিপূর্ণ (full of risk) হয়। ভবিষ্যৎবর্ষের অর্থনৈতিক ও

অবলেন্থকের
মাধ্যমে অংশপত্র
বিক্রয়

বাণিজ্যিক অবস্থা এখনও এমন উন্নতি লাভ করে নাট যে বাহাদের সঞ্চয় আছে তাহারা নিজেরাই কোথায় কিভাবে সঞ্চয় বিনিয়োগ করিলে অর্থের সম্যবহার হইবে তাহার সন্ধান করিবে। পরন্তু, আমাদের দেশে সঞ্চয়কারীদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহ করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিসম্পন্ন দেশসমূহে, যেমন গ্রেটব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—এক সম্প্রদায় ব্যবসায়ী আছে বাহাদের কর্তব্যই হইল নবগঠিত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করা। এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য বিনিয়োগ-কারীর সন্ধানে ফিরে এবং তাহাদের কোন কারবারে বিনিয়োগ করিলে, কি প্রকার অংশপত্র ক্রয় করিলে লাভ হইবে এবং নিয়োজিত মূলধন নষ্ট হইবে না সে-বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে। কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে উহার অংশপত্র সহজে এবং বিনা কষ্টে বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা কম তাহা হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তখন পারিশ্রমিকের চুক্তিতে ঐ যৌথ কারবারের অংশপত্র বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠান যৌথ কারবারকে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক অথবা সমুদয় অংশপত্র বিক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর প্রতিষ্ঠান প্রকৃত ক্ষেত্রে সন্ধান করে। যদি এমন হয় যে প্রতিশ্রুতি অংশপত্র ক্রয় করার মত ক্ষেত্র পাওয়া যায় নাই তখন এই প্রতিষ্ঠানই অপূরণ অংশপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় অবলেখক বা দায় গ্রহীতা বা বুঁকি গ্রহীতা (Underwriter)। ইহাদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহাকে বলে অবলেখন দস্তুরি (Underwriting Commission)।

ন্যূনতম চাঁদা (Minimum Subscription) : স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ন্যূনতম চাঁদা আদায় না হইলে কোন যৌথ কারবার অংশপত্র বণ্টন আরম্ভ করিতে পারে না। ন্যূনতম চাঁদার কোনও পরিমাণ ন্যূনতম চাঁদা প্রয়োগ পদ্ধতি যৌথ কারবারী আইনে স্থির করা নাই। উহা যৌথ কারবারের পরিচালকমণ্ডলীই স্থির করিয়া থাকে। অংশপত্র বিক্রয় করিয়া ন্যূনতম কি পরিমাণ অর্থ আদায় করা হইবে তাহাই ন্যূনতম চাঁদা। তবে ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ, উহা কি কার্যে ব্যয় করা হইবে তাহার উপর নির্ভর করে। যে যে কার্যে ন্যূনতম চাঁদা ব্যয় হইবে এবং যাহার পরিমাণের উপর ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করে তাহা নিয়ে উল্লেখ করা হইল।

১। অস্থাপনপত্র প্রকাশ করা অবধি যে সম্পদ অধিকার করা হইয়াছে তাহার মূল্য পরিমিত, অথবা কোনও সম্পদ অধিকার করা না হইয়া ১। সম্পদের মূল্য থাকিলে বর্তমানে যে সম্পদ অধিকার করা হইবে তাহার মূল্য পরিমিত।

২। ব্যবসায়ের সংগঠন বা প্রারম্ভিক ব্যয়ের (Formation Expenses বা

২। প্রারম্ভিক ব্যয় Preliminary expenses) পরিমাণ কত, এবং ব্যবসায় যদি দস্তারির বিনিময়ে অংশপত্র বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া থাকে তাহা হইলে দস্তারি পরিশোধ করিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন।

৩। অস্থগঠনপত্র প্রকাশের দিন অবধি যে সমুদয় সম্পদ অধিকার করা হইয়াছে উহা এবং সংগঠন বা প্রারম্ভিক ব্যয় যদি ঋণ করিয়া মিটান হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ঋণ শোধ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহার পরিমাণ।

৪। কার্যকরী মূলধন ৪। কার্যকরী মূলধন হিসাবে কত অর্থের প্রয়োজন তাহা।

৫। এতদ্ব্যতীতও যদি কোন কারণে ব্যয় আবশ্যক হয় তাহা হইলে যে যে কারণে ব্যয় আবশ্যক সেই সেই কারণ উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক

৫। অপ্রাপ্ত ব্যয় কারণে কত অর্থের প্রয়োজন।

এই পাঁচটি কারণে যে অর্থের প্রয়োজন উহাই ন্যূনতম চাঁদা।

মৌখ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন (Capital of Joint Stock Company) : যে কোনও ব্যবসায়ের মূলধন যে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তাহা পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে এইটুকুমাত্র পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, সকল রকম মূলধনের কার্য বিশ্লেষণ মৌখ কারবারের মূলধন করিলে দেখা যায় যে কোনও কারবারের পক্ষে দুই প্রকার মূলধনই প্রয়োজন (১) স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) এবং (২) কার্যকরী মূলধন (Working Capital)। মৌখ কারবারী উভয়বিধ মূলধন কি উপায়ে সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা এখানে আলোচনা করা হইবে।

১। স্থায়ী মূলধন ব্যবসায় যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনই কার্য করিতে থাকিবে যেমন যন্ত্রপাতি, দালানবাড়ী ইত্যাদি। সুতরাং যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় করিতে যে অর্থের প্রয়োজন উহা স্থায়ী মূলধন ও অংশপত্র এমনত উপায়েই সংগ্রহ করা হয় যাহাতে সে মূলধন চিরস্থায়ী হিসাবেই ব্যবসায়ে থাকিতে পারে। সুতরাং স্থায়ী সম্পদের জন্ত প্রয়োজনীয় মূলধন অংশপত্র বিক্রয় করিয়াই সংগ্রহ করা হয়। কারণ অংশপত্র ক্রেতাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবসায়ের মালিক। সুতরাং মালিক কখনও চাহে না যে ব্যবসায় গুটাইবার অবস্থায় না আসিলে নিয়োজিত মূলধন তুলিয়া নেয়।

২। অংশপত্র বিক্রয় ব্যতীতও স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা যায়। খুব দীর্ঘ স্থায়ী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অথবা পরিশোধ্য ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াও স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা যায়। তবে দীর্ঘস্থায়ী ঋণপত্র হইলেও অপরিশোধ্য ঋণপত্র না হইলে সে ঋণপত্র একদিন না একদিন শোধ করিতেই হয়।

৩। কার্যকরী মূলধনও যে অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয় না তাহা

নহে। তবে যদি অংশপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করিতেই ব্যয় হয় তাহা হইলে কার্যকরী মূলধনের জন্ত স্বল্প কার্যকরী মূলধন মিয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বল্পমিয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে যে কার্যকরী মূলধন পুনঃ পুনঃ আবর্তন হয় এবং ফলে কার্যকরী মূলধনের জন্ত ঋণ পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যেই পরিশোধ হইতে পারে। স্বল্পমিয়াদী ঋণ ব্যাঙ্ক হইতেও গ্রহণ করা যায় আবার জনসাধারণের নিকট হইতেও গ্রহণ করা যায়। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত (Deposit) গ্রহণ করিয়া আর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পূর্বস্বত্ব (Lien) দিয়া সম্পদ জামানত রাখিয়া স্বল্প মিয়াদী ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং কার্যকরী মূলধনের সংস্থান করা হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আমেরিকাবাদের কাপড়ের মিলগুলি উহাদের প্রয়োজনের শতকরা সমস্ত ভাগ সাধারণের নিকট হইতে আমানত (Public Deposit) গ্রহণ করিয়া মিটাইত। বর্তমানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করার ফলে এবং কতিপয় বিশিষ্ট মূলধন সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া সাধারণ আমানতের গুরুত্ব আদৌ নাই বলিলেও চলে। সরকারী প্রচেষ্টায় ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে তাহা স্থানান্তরে আলোচনা করা হইবে।

অংশপত্র মূলধনের ভাগ (Classification of Share Capital):

অংশপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয় বা হইতে পারে অংশপত্র মূলধনের ভাগ উহাই অংশপত্র মূলধন (Share Capital)। সেই দিক হইতে অংশপত্রের আঙ্গিক মূল্য ও আঙ্গিক মূল্য আদায়ের অনুপাতে অংশপত্র মূলধনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যে কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থাপকগণ অনুমান করিয়া লয় যে প্রতিষ্ঠান যখন দাঁড়াইবে তখন মোট কত মূলধন প্রয়োজন হইতে পারে। প্রয়োজন স্থির করিয়া সেই মূলধন কত সংখ্যক অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে তাহা স্থির করা হয়। এই দুইটি বিষয় স্থির করিয়া প্রথমত স্মারকলিপিতে মূলধন কিভাবে ভাগ করা হইয়াছে (অর্থাৎ কি প্রকার কয়খানি অংশপত্র, কত মূল্যের স্থির করিয়া মোট মূলধন সংগ্রহের প্রস্তাব করা হইতেছে) তাহা দেখাইতে হয়। দ্বিতীয়ত ঐ মূলধন সংগ্রহের জন্ত মূলধন নিয়ন্ত্রণ প্রাধিকারের নিকট হইতে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া অনুষ্ঠানপত্র বা বিবরণপত্র প্রকাশ করিতে হয়। একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে কোনও যৌথ কারবারী এককালে অংশপত্রের সম্পূর্ণ মূল্য আদায় দাবি করে না। সুতরাং বিভিন্ন স্তরে অংশপত্রের মূলধন সংগ্রহ করা হয় বলিয়াই অংশপত্র মূলধনকে কতিপয় ভাগে ভাগ করা সম্ভব হইয়াছে। তাহা নিম্নরূপ:—

১। **অনুমোদিত বা রেজিস্ট্রীকৃত মূলধন (Authorized or Registered Capital)**: কোনও যৌথ কারবার নিবন্ধনকালে মোট কত অর্থ অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক তাহা স্মারকলিপিতে (Memorandum of Association) পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিতে হয়। যেহেতু নিবন্ধক স্মারকলিপি অনুমোদন করিয়া কারবার নিবন্ধন করিয়া থাকেন সেহেতু স্মারকলিপিতে লিখিত মূলধনই অনুমোদিত বা রেজিস্ট্রীকৃত মূলধন। অনুমোদিত

১। অনুমোদিত
মূলধন

মূলধনের পরিবর্তন কখনই স্মারকলিপির মূলধন ধারার পরিবর্তন

ব্যতীত সম্ভব নহে এবং তাহা সময় ও বিধিসাপেক্ষ। সুতরাং

যে কোনও কারবারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনকালে উহার প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের অনুমোদন গ্রহণ করিয়াই নিবন্ধন হয়। মনে কর, একটি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান মোট ১ লক্ষ টাকা মূলধন আদায়ের অনুমোদন লাভ করিল। ঐ ১ লক্ষ টাকাই অনুমোদিত মূলধন। একবার পুনরুদ্ধেখ নিশ্চয়োজন যে ঐ এক লক্ষ টাকা যখন এক ব্যক্তি দিবে না এবং অংশপত্র বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইবে তখন ঐ একলক্ষ টাকা কয়খানি অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে তাহা স্থির করা প্রয়োজন। মোট মূলধন যদি একপ্রকার মাত্র অংশপত্র বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হওয়া স্থির হয় তাহা হইলে অংশপত্রের সংখ্যা দ্বারা মোট মূলধনকে ভাগ করিলে প্রতিখানি অংশপত্রের আর্থিক মূল্য পাওয়া যায়। যেমন ঐ ১ লক্ষ টাকা ১০০০ ভাগ করা হইল। তাহা হইলে প্রতিখানি অংশপত্রের আর্থিক মূল্য ১০০ টাকা।

২। **বিলিকৃত মূলধন (Issued Capital)**: কোনও যৌথ প্রতিষ্ঠানই এককালে সমস্ত অংশপত্র বিক্রয় করে না অথবা বিক্রয় করিতে চাহে না। ব্যবসায়ের অবস্থা অনুযায়ী এবং বাজারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মোট অংশপত্রের

মধ্যে যে কয়খানি অংশপত্র বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়

২। বিলিকৃত
মূলধন

উহার মোট আর্থিক মূল্যই বিলিকৃত মূলধন। সুতরাং

অনুমোদিত অংশপত্র সম্পূর্ণই যদি বিক্রয় করার প্রস্তাব হয়

তাহা হইলে অনুমোদিত মূলধন ও বিলিকৃত মূলধন উভয়ই সমান হয়। কিন্তু যদি অনুমোদিত অংশপত্র সম্পূর্ণ বিক্রয় করার প্রস্তাব না হয় তাহা হইলে বিলিকৃত মূলধন অনুমোদিত মূলধন হইতে কম হইবে। মনে কর, উপরিলিখিত ১০০০ খানি অংশপত্রের মধ্যে মাত্র ৭০০ খানি অংশপত্র বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। তাহা হইলে বিলিকৃত মূলধন ৭০০×১০০ টাকা অর্থাৎ, ৭০,০০০ টাকা।

৩। **বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন (Subscribed Capital)**: বিলিকৃত অংশপত্র সবই ক্রয় করিবার জন্ত যে আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই, বিশেষত প্রতিষ্ঠান যদি খুব নতুন হয় তাহা হইলে এই অনিশ্চয়তার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বিলিকৃত মূলধনের মধ্যে যে পরিমাণ মূলধন যোগাইবার

প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে উহাই বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন বলিতে যতখানি অংশপত্র ক্রয়ের আবেদনপত্র পাওয়া যায় তাহার আঙ্কিক মূল্যকে বুঝায় না।

৩। বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন কিন্তু যে কয়খানি অংশপত্র আবেদনকারীদের মধ্যে বিলি বা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহার আঙ্কিক মূল্যের সমান। উপরিলিখিত ৭০০ খানি অংশপত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইলে, মনে কর, ৬০০ খানি অংশপত্র ক্রয় করার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে প্রতিশ্রুত মূলধন হয় ৬০০ খানি অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্যের সমান অর্থাৎ ৬০০×১০০ টাকা = ৬০,০০০ টাকা। কিন্তু, মনে কর, পরিচালকমণ্ডলী ৬০০ খানি অংশপত্র আবেদনের মধ্যে ৫০০ খানি অংশপত্র বণ্টন বা বিলি করিল। তাহা হইলে বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন ৫০,০০০ টাকা, অর্থাৎ ৫০০ খানি অংশপত্র \times প্রত্যেকখানির আঙ্কিক মূল্য ১০০ টাকা।

৪। তলবী মূলধন (Called-up Capital) : একথাও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে কোন্ যৌথ কারবারীই এককালে অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য আদায় করিয়া লয় না। শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য কয়েকটি কিস্তীতে আদায় করা হয় ততরাং আদায়ীকৃত মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে অংশপত্র বিক্রয় ৪। তলবী মূলধন করিয়া যে অর্থ কারবার আদায় করিয়াছে উহার সমান। আবেদন মূল্য (Application Money) হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিস্তি পর্যন্ত তলব দেওয়া হইয়াছে উহার মোট মূল্যই তলবী মূলধন। যদি প্রতিখানি শেয়ারের উপর ৮০ টাকা করিয়া তলব দেওয়া হইয়া থাকে তবে তলবী মূলধন = ৫০০ শেয়ার \times ৮০ টাকা অর্থাৎ ৪০,০০০ টাকা।

৫। আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital) : তলবী মূলধনের মধ্যে প্রকৃত যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হইয়াছে উহাই আদায়ীকৃত মূলধন। অর্থাৎ, মোট তলবী মূলধন হইতে বকেয়া তলবী মূলধন (Calls in arrear) বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই আদায়ীকৃত মূলধন। মনে কর ৫০০ খানি শেয়ারের মধ্যে ১০ খানি শেয়ারের উপর দ্বিতীয় তলবের ২০ টাকা করিয়া অনাদায়ী রহিল। তাহা হইলে প্রকৃত আদায়ীকৃত মূলধন ৪০০০০ টাকা - ২০০ টাকা = $৩৯,৮০০$ টাকা। ২০০ টাকা বকেয়া তলবী মূলধন।

৬। সঞ্চিত মূলধন (Reserve Capital) : যৌথ কারবারের মোট মূলধনের যে অংশ কারবার গুটাইবার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা হইবে না বলিয়া কারবার স্থির করে উহাই সঞ্চিত মূলধন। কারবার গুটাইবার ৬। সঞ্চিত মূলধন সময়ও বাহাতে কারবারের পাওনাদারদের পাওনা শোধ করিতে অনুবিধা না হয় সেইজন্যই এই প্রকার নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়। বিক্রীত:

বা প্রতিশ্রুত মূলধন হইতে তলবী মূলধন বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় উহাই সঞ্চিত মূলধন। পূর্বের লিখিত ৫০০ খানি অংশপত্রের মধ্যে, মনে কর প্রতি অংশপত্রে ৮০ টাকা করিয়া তলব করা হইল তাহা হইলে সঞ্চিত মূলধন তলবী মূলধন (৫০০×১০০ টাকা = ৫০,০০০ টাকা) বিয়োগ ($৫০০ \times ৮০ = ৪০,০০০$ টাকা) অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা। এই সঞ্চিত মূলধন যৌথ কারবার গুটাইবার সময়ই মাত্র দাবি করা হয়।

৭। বকেয়া তলবী মূলধন (Calls in Arrear) : পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে অংশপত্রের মূলধন শোধ করার তলব দেওয়া হইলে যদি অংশপত্র ক্রেতা তলবী অর্থ শোধ না করে তাহা হইলে কারবারের পরিচালকমণ্ডলী পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইলে ঐ অংশপত্র বাজেয়াপ্ত (forfeit)

৭। বকেয়া তলবী মূলধন করিতে পারে। সুতরাং তলবী মূল্যের যে অংশ অনাদায়ী রহিল উহাই বকেয়া তলবী মূলধন (Calls in arrear)। লক্ষ্য করিবার বিষয় যৌথ কারবারের উদ্ভূতপত্রে আদায়ীকৃত মূলধনই মাত্র দায় হিসাবে দেখান হয়।

অংশপত্র-মূলধন (Share Capital)

	অনুমোদিত (Authorised)	বিলিকৃত (Issued)	বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত (Subscribed)	তলবী (Called up)	আদায়ীকৃত (Paid up)	সঞ্চিত (Reserve)
গ			কখ = অনুমোদিত মূলধন		= ১০,০০০ টাকা	
ঘ			খগ = বিলিকৃত মূলধন		= ৭০,০০০ ,,	
ঙ			খঘ = বিক্রীত বা প্রতিশ্রুত মূলধন		= ৫০,০০০ ,,	
চ			খঙ = তলবী মূলধন		= ৪০,০০০ ,,	
ছ			খচ = আদায়ীকৃত মূলধন		= ৩২,৮০০ ,,	
জ			খচ = সঞ্চিত মূলধন		= ১০,০০০ ,,	
			ঙচ = বকেয়া তলবী মূলধন		= ২০০ ,,	

৮। অগ্রিম আদায় তলবী মূলধন (Calls in Advance) : অনেক সময়ে অংশপত্রের অধিকারী তলবের অপেক্ষা না করিয়াও অংশপত্রের মূল্য সম্পূর্ণই শোধ

৮। অগ্রিম আদায় তলবী মূলধন

দিতে পারে। তলবের পূর্বে যে অর্থ অংশপত্রের মূল্য বাবদ অগ্রিম আদায় হয় উহাকেই অগ্রিম আদায় তলবী মূলধন বলে। ইহা যৌথ কারবারের আদায়ীকৃত মূলধন হইলেও

আদায়ীকৃত মূলধন হইতে পৃথক করিয়াই ইহাকে দেখান হয়। কারণ পূর্বে উল্লেখ কর তইয়াছে যে যৌথ কারবারের অংশপত্র মূলধনের একাংশ প্রায় কখনই তলব

দেওয়া হয় না—যাহাকে সঞ্চিত মূলধন বলে। সুতরাং অগ্রিম আদায় মূলধন মূলধনের অংশ।

২। **সংলগ্ন মূলধন (Geared Capital)** : ইহা দ্বারা প্রকৃত মূলধনের কোনও প্রকারকে বুঝায় না। ইহা দ্বারা মোট মূলধনের মধ্যে অগ্রাধিকার অংশপত্র ও ঋণপত্রের তুলনায় সাধারণ অংশপত্র বা গ্যারান্টিড অংশপত্রের অপ্রাধান্যকে বুঝায়।

অর্থাৎ, মোট মূলধনের অধিকাংশ যদি অগ্রাধিকার ও ঋণপত্র ২। সংলগ্ন মূলধন বিলি করিয়া সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে তাহাকে সংলগ্ন মূলধন বলে। সংলগ্ন মূলধনের অল্পপাত যত বেশী হয় সাধারণ অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের মুনাফায় অংশ ততই কম পায়। **৫৮৮**

(**অংশপত্রের প্রকারভেদ (Different kinds of Shares)**) : সকল যৌথ কারবারের অংশপত্র যে একপ্রকার হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই কারণ অংশপত্র-ক্ষেত্র অর্থ বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অংশপত্র ক্রয় করিয়া থাকে। এমন অনেক বিনিয়োগকারী অংশপত্রের ভাগ আছে যাহারা মুনাফা অল্প লইতেও রাজী কিন্তু খুব বেশী ঝুঁকি লইতে রাজী নহে। এই সম্প্রদায়ে আসে স্বল্পসঞ্চয়ী ব্যক্তিগণ (Small savers)। কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়া প্রচুর ঝুঁকি নিতে রাজী, পরিবর্তে ঝুঁকির মূল্য বাবদ মোটা মুনাফাও আশা করে।

যাহারা কম ঝুঁকি লইতে চাহে, তাহাদের যাহাতে ঝুঁকির দায় কমাইয়া মূলধনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায় সেজন্য ব্যবসায়ের লাভে তাহাদের অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া অংশপত্র দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রকার ১। অগ্রাধিকার অংশপত্রকে অগ্রাধিকার অংশপত্র (Preference Shares) অংশপত্র বলে। ইহাতে অংশপত্রের আর্থিক মূল্যের শতকরা এক নির্দিষ্ট হারে লাভাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। অর্থাৎ ব্যবসায়ে যদি লাভ হয় তাহা হইলে অগ্রাধিকার অংশপত্রের মালিকদের সর্বাপেক্ষে নির্দিষ্ট হারে লাভ বিতরণ করা হয়। মনে কর, কোন ব্যবসায় ৫% অগ্রাধিকার অংশপত্র প্রতিথানা ১০০ টাকা মূল্যের ৫০০ খানা অংশপত্র বিলি করিল। যদি এই ব্যবসায় ১০০০০ টাকা লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উপরি-উক্ত ৫০০ খানা অগ্রাধিকার অংশপত্রের মালিকদের প্রথমেই তাহাদের প্রাপ্য ২৫০০ টাকা (অর্থাৎ $৫০০ \times ১০০ \times ৫\%$) বিলি করিতে হইবে।

অগ্রাধিকার অংশপত্র যদি কোনও প্রকার সর্ববিহীন হয় তাহা হইলে সেই অগ্রাধিকার অংশপত্রের উপর কেবলমাত্র যে বৎসর মুনাফা হয় সেই বৎসরই সর্বাপেক্ষে মুনাফা বা লাভ বিতরণ করা হয়। কিন্তু যে বৎসর মুনাফা পর্যাপ্ত না হয় যাহাতে অগ্রাধিকার অংশপত্র অধিকারীদেরও নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই বৎসরের মুনাফার দাবি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যে সকল বিনিয়োগকারী

খুব বেশী হ'সিয়ার এবং কোনও প্রকার ঝুঁকি নিতেই আদৌ রাজী নহে তাহার। দাবি করিতে পারে যে এক বৎসর মুনাফা হয় নাই বা কম হইয়াছে বলিয়া তাহার। নির্দিষ্ট মুনাফা হইতে বঞ্চিত হইতে রাজী নহে। এইপ্রকার অংশপত্র ক্রেতাদের

২। সঞ্চয়ী
পূর্বাধিকার
অংশপত্র

জন্ম একপ্রকার অগ্রাধিকার অংশপত্র বিলি করা যাইতে পারে। ইহাতেও মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট। কিন্তু যদি কোনও এক বৎসর মুনাফা কম হওয়ার জন্ম মুনাফা বিলি করিতে না পারে, তাহা হইলে অংশপত্রের মালিকগণ সেই বৎসরের

নির্দিষ্ট মুনাফা হইতে বঞ্চিত হয় না। পরবর্তী বৎসরে যখন ব্যবসায়ে পর্যাপ্ত মুনাফা হইবে সেই বৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের বকেয়া প্রাপ্য লাভ আগে পরিশোধ করিয়া চলতি বৎসরের লাভ বটন করিবে। এই প্রকার পূর্বাধিকার অংশপত্রকে 'সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র, (Cumulative Preference Shares) বলে। মনে কর, উপরের লিখিত ৫০০ খানা ৫% পূর্বাধিকার অংশপত্রের উপর ১৯৫৮ সালে মুনাফা বটন করা গেল না এবং ইহা যদি সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র হয় তাহা হইলে (মনে কর) ১৯৫৯ সালের হিসাবনিকাশ হইলে ১৯৫৮ সালের বাবদ প্রাপ্য ২৫০০ টাকা দিতে হইবে এবং তারপর লাভ থাকিলে ১৯৫৯ সাল বাবদ মুনাফা বটন করা হইবে।

(অগ্রাধিকার অংশপত্রের উপর নির্দিষ্ট হারে লাভ বটন করা হইলে যদি পর্যাপ্ত লাভ থাকে তাহা হইলে সাধারণ অংশপত্রের (Ordinary Shares) উপর লাভ বটন করা হয়। সাধারণ অংশপত্রকে (Ordinary Shares) ত্রায়াভাগ অংশপত্রও (Equity Shares) বলা হয়। ব্যবসায়ে যদি লাভ বেশী হয় তাহা হইলেও পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিক নির্দিষ্ট মুনাফার বেশী দাবি করিতে পারে

৩। অংশভাগ
পূর্বাধিকার
অংশপত্র

না। এই অবস্থা দেখা যায় বিশেষত খুবই চড়তি বাজারের অবস্থায়। সুতরাং পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিকগণ যাহাতে ব্যবসায়ের সমৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট হারের অধিক হারেও অংশগ্রহণ

করিতে পারে সেইজন্ম তাহাদের অগ্রাধিকারের সহিত সাধারণ অংশপত্র মালিকের মতই মুনাফায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইতে পারে। তখন তাহার। পূর্বাধিকার সর্বোৎকৃষ্ট হারে মুনাফা পাইয়াও সাধারণ অংশপত্রের মালিকের সহিত লাভাংশ পাইয়া থাকে। এই প্রকার অংশপত্রকে অংশভাগ পূর্বাধিকার অংশপত্র (Participating Preference Shares) বলে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে কারবার অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিলেও মূলধনের কিছু অংশ ব্যবসায়ের অবস্থা অস্থায়ী ফেরত দিয়া থাকে। যেহেতু সাধারণ অংশপত্রের মালিককে মূলধন ফেরত দেওয়া যায় না, সেজন্য যদি মূলধন ফেরত দিতে হয় তাহা পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিকদের দিতে হয়। এই প্রকার মূলধনকে প্রকৃত ঋণ মূলধনই (Loan Capital) বলা সম্ভব, কিন্তু ঋণ

মূলধন না বলার কারণ এই যে ঋণের উপর সুদ দিতে হয়, কিন্তু এইপ্রকার মূলধনের উপর সুদ দেওয়া হয় না, লাভের অংশ দেওয়া হয়। যে পূর্বাধিকার অংশপত্রের মূলধন যৌথ কারবার ইচ্ছা করিলে ফেরত দিতে পারে তাহাকে পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার অংশপত্র (Redeemable Preference Shares) বলে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যেযতদিন এই প্রকার অংশপত্রের মূলধন ফেরত দেওয়া না হয় ততদিন নির্দিষ্ট হারে প্রাপ্ত মুনাফা পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, পরিশোধযোগ্য পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিক দাবি করিলে মূলধন ফেরত দেওয়া হয় না। যৌথ কারবার যখন ইচ্ছা করিবে তখনই মূলধন ফেরত দেওয়া যাইতে পারে।

পরিশোধযোগ্য পূর্বাধিকার অংশপত্রের মূলধন পরিশোধ করিতে হইলে যৌথ কারবার তিনটি উপায় আইনত গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, যৌথ কারবার যখন মূলধন ফেরত দিতে কৃতসঙ্কল্প তখন প্রতি বৎসর মুনাফা সম্পূর্ণই অংশপত্রের মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া কিয়দংশ ধারা সঞ্চয় তহবিল গঠন করিতে পারে। সঞ্চয় তহবিলে পরিশোধনীয় মূলধনের পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইলেই পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্রের মূলধন ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের বাজারে (Capital Market) সুদের হার কম হয় এবং পূর্বাধিকার অংশপত্রের লাভের হার সুদের হারের সমপরিমাণ হয় তাহা হইলে লাভের হার নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া নূতনভাবে পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র বাজারে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার অংশপত্র শোধ করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়ত, যদি কোনও মূলধনী সম্পদ বা স্থায়ী সম্পদ (Capital Goods) ক্রয়মূল্য হইতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে যে মুনাফা হয় সেই মূলধনলাভও পরিশোধনীয় অগ্রাধিকার অংশপত্র পরিশোধ করিতে ব্যয় করা যাইতে পারে।

সাধারণ অংশপত্র (Ordinary Shares or Equity Shares) : বেকার ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যবসায়ের মূলধনের মধ্যে সাধারণ অংশপত্রের অল্পপাতই বেকী। সাধারণ অংশপত্র বলিতে সেই অংশপত্রকেই বুঝায় যে অংশপত্রের উপর মুনাফার হারের কোনও স্থিরতা নাই। এই প্রকার অংশপত্র কেতাই ব্যবসায়ের সর্বাধিক ঝুঁকি গ্রহণ করে। এইজন্য সাধারণ অংশপত্র বিক্রয় করিয়া যে মূলধন গ্রহণ করা হয় উহাকে ঝুঁকি মূলধন (Risk Capital) বলে। পূর্বাধিকার অংশপত্র অধিকারীর পরই লাভের উপর দাবি সাধারণ অংশপত্র অধিকারীর।

ফলে যে হিসাবনিকাশ বৎসরে ব্যবসায়ীর লাভ খুব বেশী হয় সে বৎসর সাধারণ অংশপত্রের মালিকগণ খুব উচ্চ হারে লাভ পাইয়া থাকে। যেমন, যুদ্ধকালে প্রতি ব্যবসায়েই মুনাফা খুব বেশী হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে মূলধনের উপর শতকরা

১০০ টাকা হারে লাভ হইয়াছে। কিন্তু এই উচ্চ লাভে

৪। সাধারণ বা

ভার্যমুগ

অংশপত্রের

মালিকই প্রকৃত

স্বত্ববাহক

পূর্বাধিকার অথবা সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্রের মালিক

কোনও প্রকার বিশেষ স্ববিধা পায় নাই; কারণ এই প্রকার

অংশপত্রের উপর লাভের হার কারবার নিবন্ধনকালেই বাধিয়া

দিয়াছে। ফলে তাহারা শতকরা ৫ বা ৭ বাহাই হউক না

কেন তাহাই পাইয়া থাকে। মুনাফা বেশী হওয়াতে সাধারণ

অংশপত্রের মালিকগণই উচ্চহারে মুনাফা পাইয়া থাকে। তেমনি, যদি যৌথ কারবার

কোনও হিসাবনিকাশ বৎসরে এমত পরিমাণ লাভ করিয়া থাকে, যাহাতে

কেবলমাত্র পূর্বাধিকার অংশপত্রের উপর নির্দিষ্ট হারে মুনাফা বন্টন করিয়া আর

কিছুই রহিল না বা যাহা রহিল তাহা এতই অল্প যে সাধারণ অংশপত্রের

মালিকদের লাভে অংশ দেওয়া চলে না, সে বৎসর সাধারণ অংশপত্রের

মালিকগণ কিছুই পায় না। কোনও বৎসর অথবা একাদিক্রমে কতিপয় বৎসর কম

মুনাফা পাওয়ার বা মোটেই মুনাফা না পাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করে বলিয়া যে বৎসর

অধিক মুনাফা করে সেই বৎসর সাধারণ অংশপত্রের মালিকগণ উচ্চহারে মুনাফা

পায়। উহাই প্রকৃতপক্ষে স্বত্বিক মূল্য।

সংস্থাপকের অংশপত্র বা বিলম্বিত অংশপত্র (Founders' or Deferred Shares) : আর একপ্রকার অংশপত্র যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বিলি করিয়া থাকে যাহাকে সংস্থাপক বা বিলম্বিত অংশপত্র বলে। সংস্থাপক অংশপত্র

প্রায় কখনই বাজারে বিক্রয় হয় না। ইহা সংস্থাপনার ব্যয় বহন করার দায়িত্ব

গ্রহণ করার জন্ত অথবা সংস্থাপনার মূল্য হিসাবে সংস্থাপকদের

২। সংস্থাপক বা

বিলম্বিত অংশপত্র

নগদ অর্থ না দিয়া কারবারের সম্পদে অংশগ্রহণের অধিকার

দিয়া যৌথ কারবার সংস্থাপকদের যে অংশপত্র দেয় উহাই

সংস্থাপকের অংশপত্র। ইহাকে বিলম্বিত অংশপত্র বলার কারণ এই যে অল্প সকল

প্রকার অংশপত্রের উপর লাভাংশ বন্টন বা বিতরণ হওয়ার পর বন্টনযোগ্য যে

মুনাফা থাকে উহাই সংস্থাপক অংশপত্রের মালিকদের মধ্যে অংশপত্র অধিকারের

অনুপাত হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়।

সাধারণ অংশপত্রে ব্যবসায়ের সাময়িক সমৃদ্ধি সময়ে খুব উচ্চ হারে মুনাফা

দিতে পারে। কিন্তু সাধারণত, সাধারণ অংশপত্রের উপর যে হারে মুনাফা দেওয়া

হয় তাহা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। কারণ কোনও বৎসর আকস্মিক মুনাফা

লাভ করার জন্ত খুব উচ্চ হারে মুনাফা দেওয়া হইল, পরবর্তী বৎসরে মুনাফা এতই

অগ্রচূর হইল যে মুনাফা দেওয়া সম্ভব হইল না; ফলে বাজারে যৌথ কারবারটির

স্থানাম ক্ষুণ্ণ হয়, এবং অংশপত্র ক্রয়বিক্রয়ে অল্পবিধা দেখা দেয়। এই কারণেই সাধারণ অংশপত্রের উপর মূনাফার হার এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে পরিবর্তন হয়। কিন্তু সংস্থাপকের অংশপত্র বাজারে বিক্রয় হয় না বলিয়া কোনও বৎসর আকস্মিক মূনাফার জন্ত খুব উচ্চ হারে মূনাফা দেওয়া হইল এবং পরবর্তী বৎসরে খুব নিম্ন হারে মূনাফা দেওয়া হইল বলিয়া ব্যবসায়ের স্থানাম ক্ষুণ্ণ হয় না।

সংস্থাপক অংশপত্রের গুরুত্ব খুব বেশী। কারণ সংস্থাপক অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য রাখা হয় খুব কম। মনে কর পূর্বাধিকার অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য যদি ১০০ টাকা হয়, সাধারণ অংশপত্রের মূল্য হয় ১০ টাকা তাহা হইলে সংস্থাপকের অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য হইবে ১ টাকা। ১ টাকা মূল্যের একখানা অংশপত্র অধিকারীরও ১টি ভোট, আবার ১০০ টাকা সাধারণ অংশপত্র অধিকারীরও ১টি ভোট। তাহা হইলে ব্যবস্থাপকমণ্ডলী যাহাতে নিজেদের হাতেই ব্যবস্থাপনা কায়ম করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের এবং বন্ধুবান্ধব ও অহুগতদের মধ্যে অধিকসংখ্যক সংস্থাপক-অংশপত্র বিলি করিয়া থাকে। মনে কর কোনও যৌথ

কারবারী প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন ১০০ টাকা মূল্যের ১০০০ ৬। অনাঙ্কিক মূল্য খানা সাধারণ অংশপত্রে এবং ১০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ খানা অংশপত্র . . . সংস্থাপক অংশপত্রে বিভক্ত করা হইল। মোট মূলধনের

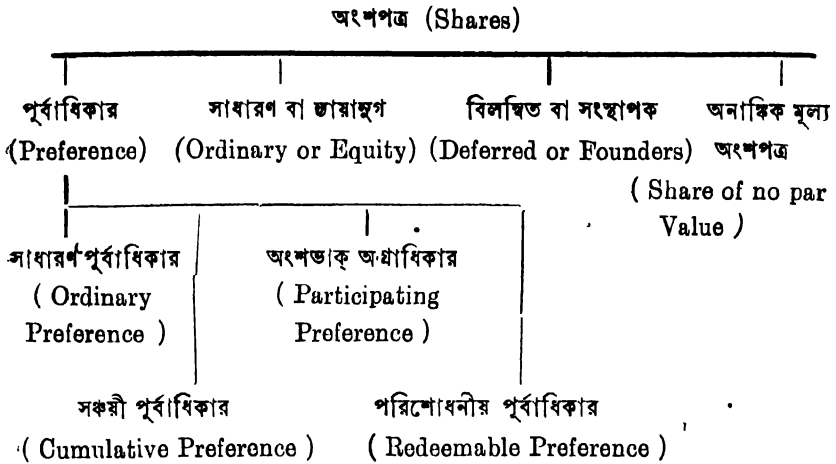
অর্ধেক যোগাইল ১০০০ জন সদস্য এবং বাকী অর্ধেক যোগাইল ১০,০০০ জন যাহারা সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট। ফলে যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভোটে নির্ধারিত হওয়ার প্রস্ন উঠে, তখন দেখা যায় যে মোট ভোট সংখ্যার মধ্যে ১/১১ অংশ সাধারণ অংশপত্রের মালিকদের হাতে এবং ১০/১১ অংশ সংস্থাপকদের হাতে। যাহাতে এবস্থিৎ অসাধু উপায়ে সাধারণ অংশপত্র অধিকারিগণ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা কোণঠাসা না হয় সেইজন্ত ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে সংস্থাপক অংশপত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অনাঙ্কিক মূল্য অংশপত্র (Share of no par Value) : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনে এক প্রকার অংশপত্র বিলি করা হয় যাহার কোন আঙ্কিক মূল্য নাই। এই প্রকার শেয়ারের মূল্য ব্যবসায়ের আর্থিক উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে। মোট সম্পদ হইতে দায় ও দেনা বাদ দিলে যাহা বাকী উহাই অংশপত্র মূলধন। অংশপত্র মূলধন বাহির করিয়া তাহাকে মোট শেয়ার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই প্রতি শেয়ারের মূল্য পাওয়া যায়।

১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে ভারতবর্ষে মাত্র দুই প্রকারের অংশপত্র বিক্রয় করিতে পারা যায়—(১) পূর্বাধিকার অংশপত্র; (২) সাধারণ অংশপত্র। পূর্বাধিকার অংশপত্র সঞ্চয়ী (Cumulative) কিংবা সাধারণ পূর্বাধিকার ইহার উল্লেখ না থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে পূর্বাধিকার অংশপত্র সঞ্চয়ী পূর্বাধিকার অংশপত্র। বিলম্বিত অথবা সংস্থাপক অংশপত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। ১৯৫৬ সালের

আইনে পঞ্জীকৃত অথবা ১৯৩৬ সালের আইনে পঞ্জীকৃত কোন যৌথ কারবার ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিলের পর বিলম্বিত অথবা অংশপত্র বিক্রয় করিতে পারে না।

উপরের আলোচনা হইতে যে কয় প্রকার অংশপত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নীচের চিত্রে দেখান হইল।



ঋণপত্র (Debenture) : কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মূলধন সংস্থানের জন্ত অংশপত্র (Shares) বিক্রয় না করিয়া ঋণপত্র (Debenture) বিক্রয় করিতে পারে। যখন কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং কারবারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয় তখনই প্রায় উঠে আবার মূলধন সংস্থানের। যেহেতু অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিলে সে মূলধন আর ফেরত দেওয়া হয় না—অবশ্য পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র ঋণপত্র বাদ দিয়া—সেই হেতু ব্যবস্থাপকমণ্ডলী চিন্তা করিতে পারে যে পুনরায় অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন বাড়ান হইবে না, ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন যোগান হইবে। ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধনের সংস্থান আরও একটি কারণে হইয়া থাকে। যদি অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধনের সংস্থান করা হয় তাহা হইলে আবহমান কাল পর্যন্তই অংশপত্র ক্রেতা লাভের অংশভাক্ হইবে। সুতরাং অংশপত্রের মালিকের সংখ্যা যত কম রাখা যায়, প্রত্যেক অংশপত্রের মালিকের অনুকার পরিমাণ তত বেশী হইবে। কিন্তু যদি ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংস্থান করা হয় তাহা হইলে যে কয় বৎসর ঋণ পরিশোধ না হইবে সেই কয় বৎসরই মাত্র অংশপত্র অধিকারিগণ লাভের অংশ কম পাইবে।

ঋণপত্র হইতেছে ঋণপ্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্র; অবশ্য স্বীকৃতি ব্যতীত কি কি সর্তে ঋণ গ্রহণ করা হয় ঋণপত্রে তাহারও উল্লেখ থাকে।

ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্য : ঋণপত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; প্রথমত, ঋণপত্রে লিখিত ঋণ যতদিন পরিশোধ না হয় ততদিনই ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্য উহার উপর নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হয় ; দ্বিতীয়ত, ঋণপত্র অধিকারীর যৌথ কারবারের সম্পদে মালিকানা স্বত্ব থাকে না ; তৃতীয়ত, ঋণপত্রের অধিকারীর ব্যবসায় গুটাইবার কালে ব্যবসায়ের সম্পদে পূর্বাধিকার থাকে ; চতুর্থত, ঋণপত্রের মালিক ব্যবসায়ে লাভ হউক কি না হউক সুদ পাইবেই। লাভ বেশী হইলেও তাঁহার কোনও অতিরিক্ত পাওনা হয় না, লাভ না হইলেও সে সুদ পাইবেই।

ঋণপত্রের প্রকারভেদ (Different kinds of Debenture) : অংশপত্রের মত ঋণপত্রকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। অংশপত্রের অর্থ প্রায় কখনই ফেরত দেওয়া হয় না কিন্তু ঋণপত্রের অর্থ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয়। অবশ্য ঋণ যদি ঋণপত্রের প্রকার চিরস্থায়ী হিসাবেই গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে ফেরত দেওয়া হয় না। সুতরাং ঋণের অর্থ ফেরত দেওয়ার সময় অনুসারে ঋণপত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পরিশোধনীয় ঋণপত্র (Redeemable Debenture) ; (২) অপরিশোধনীয় বা চিরস্থায়ী ঋণপত্র (Irredeemable or Perpetual Debenture)।

পরিশোধনীয় ঋণপত্র (Redeemable Debenture) বলিতে সেই ঋণপত্রকে বুঝায় যে ঋণপত্রে লিখিত ঋণ এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে অথবা ১। পরিশোধনীয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। যেমন ১০ বৎসর ঋণপত্র।

অপরিশোধনীয় ঋণপত্রের (Irredeemable or Perpetual Debenture) ঋণ কোনও দিন পরিশোধ হয় না। যতদিন ব্যবসায় ২। অপরিশোধনীয় চলিতে থাকে ততদিনই ঋণের মিয়াদ।

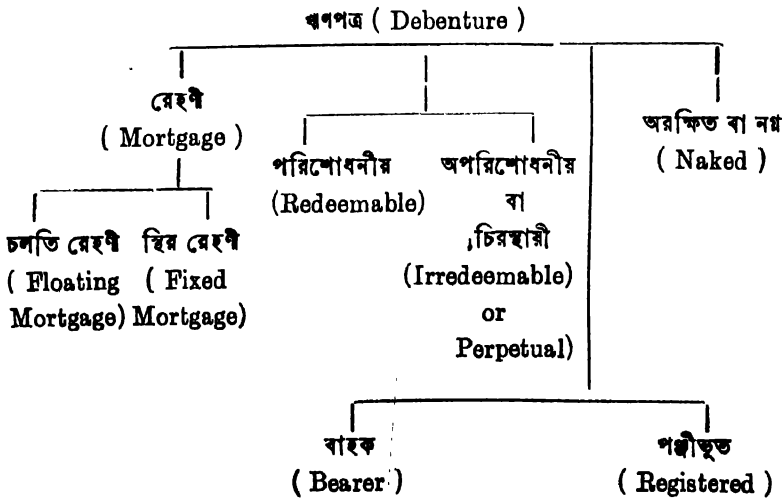
আবার ঋণদাতা ঋণ দেওয়ার সময়ে যাহাতে ভবিষ্যতে অনায়াসে ঋণ আদায় করিতে পারে সেজন্য ব্যবসায়ের সম্পদে অনেকক্ষেত্রে পূর্বাধিকার রাখিতে চাহে অর্থাৎ ঋণদাতা দাবি করে যে ব্যবসায়ের কোন বিশেষ সম্পদ অথবা সকল সম্পদই ঋণের পরিবর্তে তাহার নিকট বন্ধক দেওয়া হউক। এই প্রকার কোন সম্পদ বন্ধক দিয়া ঋণপত্র বিলি করা হইলে সেই ঋণপত্রকে রেহণী ৩। রেহণী ঋণপত্র

ঋণপত্র (Mortgage Debenture) বলে। ইহাতে ব্যবসায়ের অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণপত্র বিলি করা হয়। এই প্রকার ঋণকে সংরক্ষিত ঋণও (Secured Loan) বলা হয়। কিন্তু ঋণপত্র যদি কোনও সম্পদ বন্ধক না রাখিয়া বিলি করা হয় তবে সেই ঋণপত্রকে বলে অরক্ষিত বা নগ্ন ঋণপত্র (Naked Debenture)।

রেহণী ঋণপত্রকেও (Mortgage Debenture) আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমত, চলতি রেহণী ঋণপত্র (Floating Mortgage Debenture), দ্বিতীয়ত, স্থির রেহণী ঋণপত্র (Fixed Mortgage Debenture)। চলিত রেহণী ঋণপত্রে কারবারের সকল সম্পত্তিই ঋণদাতার নিকট বন্ধক থাকে আর স্থির রেহণী ঋণপত্রে ব্যবসায়ের কোনও বিশেষ সম্পদ বন্ধক থাকে যেমন—মনে কর যন্ত্রপাতি।

আবার ঋণপত্রের মালিকানা স্বত্ব কি উপায়ে হস্তান্তর করা যায়—তাহা বিচার করিলেও ঋণপত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—বাহক (Bearer) আর পঞ্জীভূত (Registered)। বাহক ঋণপত্রের সুবিধা এই যে কেবলমাত্র ঋণপত্রে পিছন সহি করিয়াই ঋণপত্রের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করা যায়। কিন্তু পঞ্জীভূত ঋণপত্র ব্যবসায়ের কাঁধালায়ে ঋণদাতার পঞ্জীতে (Register) পঞ্জীভূত করিতে হয়। ঐ বহিতে ঋণদাতার নাম, ঠিকানা, কয়খানা ঋণপত্রের মালিক ইত্যাদি লিখিত থাকে। ইহাতে কোনও হস্তান্তর সিদ্ধ হয় না, যতক্ষণ কারবারের বহিতে হস্তান্তর গ্রহীতার নাম পঞ্জীভূত না হয়।

নিম্নের চিত্রে ঋণপত্রের (Debenture) বিভিন্ন ভাগ দেখান হইয়াছে :



ষ্টক ও অংশপত্র (Stocks and Shares): যৌথ কারবারের অংশপত্রকে অনেক সময়ে ষ্টক বলিয়াও পরিচয় দেওয়া যায় কিন্তু সকল অংশপত্রই ষ্টক নহে। একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে সাধারণ যৌথ কারবার বা জনসংঘ (Public Company) আইনত অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে বাধ্য। এবং প্রত্যেক-

খানি অংশপত্রের এক নির্দিষ্ট আঙ্কিক মূল্য থাকে। যেমন—১০ টাকা মূল্যের ১০০০ সাধারণ অংশপত্র। প্রতি অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য ১০ টাকা ষ্টক ও অংশপত্রের এবং মোট ১০০০ খানি অংশপত্র বিলি করা হইয়াছে। এইরূপ পার্থক্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়টির অংশপত্রকে ষ্টক বলিয়াও পরিচয় দেওয়া যায়। কিন্তু তাহা কেবল বিলি হইবার পর শেয়ার বাজার বা ষ্টক বাজারে ক্রয় বিক্রয় কালে। এই ক্ষেত্রে কয়েকখানি শেয়ারের মোট আঙ্কিক মূল্য হয় ষ্টকের মূল্য। এবং যখন ষ্টকে পরিণত করা হয় তখন কয়খানি শেয়ারে একটি ষ্টক হইল তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন কত মূল্যের ষ্টক তাহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ষ্টকের মূল্য ১০০ টাকার নীচে বড় একটা দেখা যায় না সুতরাং যদি ১০০ টাকার কম মূল্যের অংশপত্র বা শেয়ার লইয়া ষ্টক হয় তাহা হইলে প্রতি খানি শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য ১০০এর গুণিতক হইবে ৫, ১০, ২০, ২৫, ৫০।

ষ্টক বিভাজন সম্ভব (Divisible) কিন্তু অংশপত্র বা শেয়ার বিভাজন সম্ভব নহে। কারণ কতিপয় শেয়ার বা অংশপত্র লইয়া হয় ষ্টক। সুতরাং ১। ষ্টক বিভাজ্য, ষ্টককে ভাঙ্গিয়া যে কয়খানি শেয়ার বা অংশপত্র লইয়া ষ্টক অংশপত্র বিভাজ্য, হইল সেই কয় ভাগে ভাগ করা যায় কিন্তু প্রতিখানি শেয়ার নহে বা অংশপত্র এক একটি একক (Unit)। একককে ভাঙ্গা যায় না।

অংশপত্রের আঙ্কিক মূল্য সম্পূর্ণ আদায় হইলেই (Full paid up) অর্থাৎ পূর্ণ আদায়ীকৃত অংশপত্রই ষ্টকে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ২। ষ্টক পূর্ণ কারবারের পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ না থাকিলে আদায়ী অংশপত্র পরিচালকমণ্ডলী অংশপত্রকে ষ্টকে পরিণত করিতে পারে না।

অংশপত্র ও ঋণপত্র (Shares and Debentures) : অংশপত্রের মালিক ঋণপত্রের মালিক উভয়েই যৌথ কারবারের মূলধন সংস্থানে অংশগ্রহণ করে বটে কিন্তু ব্যবসায়ের সহিত উভয়ের সম্পর্ক অংশপত্রের পার্থক্য সমান নহে। যেহেতু উভয়ের সম্পর্ক একরূপ নহে সেইজন্যই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

প্রথমত, অংশপত্রের মালিকের যৌথ কারবারের মালিকানা স্বত্ব থাকে, কিন্তু ঋণপত্রের মালিকের যৌথ কারবারে মালিকানা স্বত্ব থাকে না। ঋণপত্রের মালিক যৌথ কারবারের উত্তমর্শ (Creditor)।

দ্বিতীয়ত, অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের মুনাফা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সে পায় লাভাংশ, কিন্তু ঋণপত্রের মালিক মুনাফা অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সে লাভাংশ পায় না, সে পায় নির্দিষ্ট হারে সুদ।

তৃতীয়ত, অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু ঋণপত্রের মালিক ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

চতুর্থত, ব্যবসায় গুটাইলে অংশপত্রের মালিক ব্যবসায়ের সমস্ত দায় মিটান হইলে যদি কিছু উদ্ধৃত থাকে তাহা হইলে তাহারই অংশ পাইতে পারে অর্থাৎ তাহার দাবি সর্বশেষ। কিন্তু অংশপত্রের মালিকের আগেই ঋণপত্রের মালিককে পাওনা শোধ করিতে হয়।

পঞ্চমত, ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা যায় কিন্তু অংশপত্রের মধ্যে যাত্রা এক-প্রকার অংশপত্রের অর্থই পরিশোধ করা যায়। তাহা হইতেছে পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র (Redeemable Preference Shares)। সুতরাং অংশপত্র মূলধন আবহমানকাল (Perpetuity) পর্যন্তই ব্যবসায়ে থাকে, যতদিন না ব্যবসায় গুটান হয়, কিন্তু ঋণপত্রের অর্থ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই থাকার নিয়ম, অবশ্য যদি ঋণপত্র চিরস্থায়ী (Irredeemable or Perpetual) না হয়।

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা (Management of a Joint Stock Company): একক মালিকানা অথবা অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার মত যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় মালিকগণ সরাসরি অংশ গ্রহণ করে না। একক মালিকানায় ব্যবসায়ী নিজেই মালিক ও ব্যবস্থাপক। সুতরাং মূলধন সরবরাহকারীই মালিক ও ব্যবস্থাপক। অংশীদারী ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার ভার কোনও কর্মচারীর হাতে ত্রুস্ত করা যায় সন্দেহ নাই অবশ্য যদি অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার খুব বেশী না হয়। সংখ্যা বেশী হইলেও অংশীদারদের মধ্যে কাহারও উপর ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করায়ই রীতি। কিন্তু যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সকল মালিক একত্রিত হইয়া কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সম্ভব বলিয়া কেহই মনে করে না। কারণ ঘরোয়া যৌথ কারবারীর ৫০ জন সদস্য অথবা কোন সাধারণ যৌথ কারবারের বা জনসংঘের কয়েক শত সদস্যের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ত নয়ই; যদি বা সকল সদস্যই দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করে তাহাতে স্ফুলের আশা খুবই কম। তাহাতে বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের সম্ভাবনা (Too many cooks spoil the broth)।

যৌথ কারবারী আইনে (১৯৫৬) এ-বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা কোনও এক ব্যক্তির অঙ্গুলি সঞ্চালনই না চলে সে জন্ত ১৯৫৬ সনের যৌথ কারবারী আইনের ভূমিকায় তৎকালীন অর্থসচিব দেশমুখ বলিয়াছিলেন যে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে (Indirect Democracy) চলিবে। অর্থাৎ কারবারের সকল সদস্য একত্রিত হইয়া ব্যবস্থাপনার জন্ত যে পছন্দ অবলম্বন করিবে তাহাই বলবত হইবে। সদস্যবৃন্দ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে (Annual General Meeting) ভোট দ্বারা ব্যবস্থাপকমণ্ডলী গঠন

করিতে। প্রত্যেক সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৩ জন এবং প্রত্যেক ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ২ জন পরিচালক (Director) থাকা বাধ্যতামূলক। পরিচালকগণ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হয়। কিন্তু যদি পরিচালকমণ্ডলীতে (Board of Directors) সরকার মনোনীত কেহ থাকে তাহা হইলে তাহার নির্বাচন প্রয়োজন হয় না। যদিও পরিচালকবৃন্দ ব্যবসায়ের অংশপত্র মালিকদের নির্বাচনে হয় তথাপি যাহাতে তাহার যথেষ্টভাবে ব্যবসায় পরিচালন করিতে না পারে সেজন্য যৌথ কারবারী আইনে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্বের পরিধি স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যৌথ কারবারী আইন অনুসারে ব্যবসায়ের পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) হাতে ন্যস্ত থাকিবে। পরিচালকদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে বলে পরিচালক (Director) আর সকল পরিচালককে যৌথভাবে বলা হয় পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors)। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন ক্ষমতা পরিচালকমণ্ডলীর হাতে থাকিলেও তাহাদের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ প্রায়ই অসম্ভব। তাই দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার জন্য যৌথ কারবারী আইনে চারিটি বিকল্প প্রাধিকারের (Authorities) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকারের মধ্যে যে কোনও এক প্রাধিকারকে গ্রহণ করা যায়। ব্যবস্থাপনার সর্বময় ক্ষমতা থাকে পরিচালকমণ্ডলীর হাতে। পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশমত এবং খবরদারীতে (Supervision) বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকারের যে কোনও একটি প্রাধিকার ব্যবসায়ের দৈনন্দিন পরিচালন কার্য চালাইয়া থাকে।

এই চারিটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকার (Alternate Managerial Authorities) হইল—(১) ম্যানেজার (২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (৩) ম্যানেজিং এজেন্ট (৪) সেক্রেটারীস্ এবং ট্রেজারার্স্। পরিচালকমণ্ডলীর সর্বময় কর্তৃত্বাধীনে বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকারের যে কোনও একটি প্রাধিকারকেই মাত্র নিয়োগ করা যায়। যৌথ কারবারীর পক্ষ হইতে পরিচালকমণ্ডলী এবং যে বিকল্প ব্যবস্থা প্রাধিকার নিয়োগ করা হয় উভয়েরই মধ্যে একখানি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কি কি সর্তে এবং কি কি কার্য সম্পাদন করার জন্য ব্যবস্থা প্রাধিকার নিয়োগ করা হইল তাহা চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। চুক্তিপত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তির কোন সর্ত অনুমোদন না করিলে, কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ দিবে সেই নির্দেশ মত চুক্তিপত্র সংশোধন (Amend) করিতে হয়। কত দিনের জন্য নিয়োগ, পারিশ্রমিক কত; কি কি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবে তাহা; চুক্তি ভঙ্গ করিলে কি ভাবে খেসারত (Compensation) পাহবে বা দিবে তাহার উল্লেখ থাকে।

পরিচালকমণ্ডলী বনাম অংশপত্রের মালিকবৃন্দ তথা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (Board of Directors Vis a Vis Shareholders or the Company) : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হইবার পর সকল অংশপত্র মালিকদের বুঝাইতে যৌথ কারবার (কোম্পানী) কথাটি প্রয়োগ করা হয়। পরিচালকমণ্ডলীর সহিত যৌথ কারবারের মালিকবৃন্দের সম্পর্ক কি তাহা যদিও যৌথ কারবারী আইনের ধারায় নির্ধারিত আছে তথাপি অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের কার্যের পরিধি সম্বন্ধ পরিচালকমণ্ডলীর অথবা অংশপত্র ক্রেতাদের মনে অস্পষ্ট ধারণা থাকে বলিয়া আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আদালত যৌথ কারবারী আইনের যে সমুদয় মামলায় রায় প্রদান করিয়াছে তাহাতে পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্ব দ্বৈত (Dual)। পরিচালকমণ্ডলীকে একাধারে অংশপত্র মালিকদের প্রতিনিধি (Agent) অত্যাধারে অছি (Trustee) বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

পরিচালকমণ্ডলীকে (Board of Directors) অংশপত্র মালিকদের তথা যৌথ কারবারের প্রতিনিধি বলার কারণ এই যে পরিচালকমণ্ডলী যৌথ কারবারের পক্ষে যে সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে তাহা কারবারের পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা সীমাবদ্ধ। পরিমেল নিয়মাবলীতে যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই তাহা পরিচালকবর্গ যৌথ কারবারের পক্ষে সম্পাদন করিতে পারে না। অথবা সেরূপ কোন কায করিলেও যৌথ কারবারের পক্ষে মানিয়া লওয়া বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকমণ্ডলী তাহাদের সকল কার্যের জন্য যৌথ কারবারের নিকট অর্থাৎ যৌথ কারবারের অংশপত্র অধিকারীদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য।

পরিচালকমণ্ডলীকে কারবারের অছি (Trustee) বলার কারণ এই যে কারবারের অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি কারবারের মালিকদের স্বার্থে পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগ করা, রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব তাহাদের। কারবারের কারবারের অছি অর্থে নিজেরা লাভবান হওয়া, অথবা কারবারের অর্থ ও সম্পদ অপব্যবহার করিলে অছিও যেমন আইনত দণ্ডনীয় পরিচালকবর্গও তেমনি আইনত দণ্ডনীয়।

পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন (Appointment of Directors) পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগ বা নির্বাচনের অধিকার গ্রন্থ থাকে কারবারের মালিকদের হাতে। বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে পরিচালক নির্বাচন করা হয়। কিন্তু যখন যৌথ কারবার নতুন গঠন করা হয় তখন স্বাক্ষরকারিগণ নিজেদের মধ্য হইতে পরিচালক নির্বাচন করে। যদি স্বাক্ষরকারিগণ ব্যবসায় গঠন কালে নিজেদের

মধ্য হইতে আইনত ন্যূনতম সংখ্যক পরিচালক নির্বাচন না করে তাহা হইলে স্বাক্ষরকারী সকলকেই পরিচালক বলা হয় এবং সম্মিলিতভাবে পরিচালকমণ্ডলী স্বাক্ষরকারিগণই হয় পরিচালকমণ্ডলী। কারবার গঠন হইবার নিয়োগ পর প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করা হয়। প্রতি বৎসর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে ২/৩ জন সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য তাহারা পুনরায় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারে।

পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য ও অধিকার (Duties and Rights of the Board of Directors): যৌথ কারবারী আইনের ধারায় যে সমুদয় কর্তব্য ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে উহার সীমার মধ্যে থাকিয়া কারবার নিজস্ব পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) গঠন করিতে পারে ইহা পরিচালকের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাও আলোচনা করা হইয়াছে কর্তব্য ও অধিকার যে পরিচালকমণ্ডলীর কার্য পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা সীমাবদ্ধ। মোটামুটি পরিচালকবর্গ স্বেচ্ছাবে পরিচালনার জন্য কারবারের পক্ষে যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করার অধিকার পাইয়া থাকে তাহা নিম্নরূপ। অধিকার পাইলেও সে অধিকার নিরক্ষুশ নহে। তাহাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হয় যে তাহাদের কার্য যৌথ কারবারের মালিকদের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

১। পরিচালকমণ্ডলীর হাতে কারবারের দৈনন্দিন পরিচালন ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকে। ব্যবসায় পরিচালন সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় পন্থা ও নীতি পরিচালকমণ্ডলীই গ্রহণ করিয়া থাকে।

১। পরিচালনার নীতি গ্রহণ ২। ব্যবসায়ের হিসাব পত্রাদি স্বেচ্ছাবে রাখার ব্যবস্থা পরিচালকবর্গ করিয়া থাকে। হিসাব নিকাশ বৎসরান্তে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্ত হিসাবের (Final Accounts) ও উদ্ধৃত পত্রের খসড়া পেশ করে। এবং অংশপত্র-মালিকদের মধ্যে কি হারে লাভাংশ বন্টন করা যাইতে পারে তাহার সুপারিশ করে।

৩। সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করার অধিকার থাকে পরিচালকমণ্ডলীর হাতে।

৪। কারবারের দৈনন্দিক কার্য পরিচালনা করার জন্য কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগ করিবার অধিকার থাকে পরিচালকমণ্ডলীর হাতে।

৩। বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান ৪। পরিচালনার অংশ গ্রহণ ৫। পরিচালকমণ্ডলী বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হয় কিন্তু দুইটি সাধারণ অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে কোনও পরিচালকের স্থান শূন্য হইলে পরিচালকমণ্ডলীই নির্বাচন করিয়া সে আসন

পূর্ণ করে। এই প্রকার নির্বাচিত পরিচালককে বিকল্প পরিচালক (Alternate Director) বলে। বিকল্প পরিচালকের কার্যের মিয়াদ হয়

৫। পরিচালক নিয়োগ পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অথবা যাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নির্বাচিত হয় তাহার পদের মিয়াদকাল, উভয়ের মধ্যে যেটি পূর্বে ঘটিবে সেই সময় পর্যন্তই থাকে।

৬। হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ (Auditor) নিয়োগ করার অধিকার আছে।

পরিচালকমণ্ডলীর অধিকার যেমন প্রচুর তাহাদের দায়িত্বও তেমনই প্রভূত। পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ কর্তব্য উল্লেখযোগ্য :

১। কারবার হইতে দস্তুরি গ্রহণ নিষিদ্ধ (১) পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের মূনাফার জন্ত যৌথ কারবারের সহিত দস্তুরির বিনিময় কোনও প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিতে পারে না। তবে কারবারের সহিত উদ্দেশ্যে ৫০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইতে পারে।

(২) নিজেদের স্বার্থে যৌথ কারবার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

(৩) পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে উচ্চ হারে মূনাফা বণ্টন করিয়া থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূনাফা অপধাশ্ত হইলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াও মূনাফা বণ্টন করিতে প্রয়াস পায়। এইজন্ত যৌথ কারবারী আইনে রাজস্ব আয় (Revenue Expenditure) বাদ দিলে যদি মূনাফা থাকে তবেই মূনাফা বণ্টন করিতে পারে। কারবারের মূলধন ভাঙ্গিয়া হ্রাস অথবা মূনাফা দেওয়া বেআইনী করিয়া দিয়াছে।

২। নিজেদের স্বার্থে ঋণ গ্রহণ নিষিদ্ধ

৩। কারবারের মূলধন ভাঙ্গিয়া মূনাফা বণ্টনে বাধা

(৪) অনেক সময়ে দেখা যায় যে অংশপত্রের মূল্য আংশিক আদায় হইলেও সেই অংশপত্র পূর্ণ আদায় (Fully Paid up) অংশপত্রে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে পরিচালকমণ্ডলী আংশিক আদায় অংশপত্র (Partly Paid up Shares) পূর্ণ আদায়ী অংশপত্রে (Fully Paid up Shares) পরিবর্তন করিতে পারে না।

(৫) কেহ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হইতে পারে না যদি সে বিধিমত অংশপত্র ক্রয় না করে। যত মূল্যের অংশপত্র ক্রয় করিলে অংশপত্রের মালিক পরিচালক হইতে পারে তাহাকে যোগ্যতা অর্জন অংশ (Qualification Shares) বলে। প্রত্যেক পরিচালককেই যোগ্যতা অর্জন অংশপত্র ক্রয় করিতে হয়। দুইপ্রকার পরিচালকের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম আইন মানিয়া

লইয়াছে। সরকারী মনোনীত কোন পরিচালক থাকিলে এবং কারিগরী

৫। যোগ্যতা অর্জন বিশারদ কোন পরিচালক (Technical Expert Director)
অংশপত্র ক্ষয় থাকিলে তাহাদের যোগ্যতা অর্জন অংশপত্র (Qualification
Shares) ক্ষয় করিতে হয় না। যৌথ কারবারী আইনে
পরিচালকের যোগ্যতা অর্জন অংশপত্রের মূল্যে ৫০০০ টাকার নিম্নে হইতে পারে
না। তবে যদি প্রতি অংশপত্রের আঙ্গিক মূল্য ৫০০০ টাকার উর্ধ্বে হয় তাহা হইলে
অন্তত একখানা অংশপত্র ক্ষয় করিতে হয়। পরিমেল নিয়মাবলীতে যোগ্যতা
অর্জন অংশপত্রের উল্লেখ থাকিলে প্রত্যেক পরিচালককে পরিচালক নিযুক্ত
হইবার দুই মাসের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন অংশপত্র ক্ষয় করিতে হয়।

(৬) প্রত্যেক পরিচালককে, যাহারা সরকার মনোনীত নহে, অথবা কারিগরী
বিশারদ নহে, তাহার বয়স ঘোষণা করিতে হয়। কারণ যৌথ
৬। পরিচালকের কারবারী আইনে কোনও পরিচালক ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম
বয়স জ্ঞাপন অতিক্রম করিলে পরিচালক হিসাবে কার্য করিতে পারে না।

অবশ্য যদি সরকার অমুমোদিত করে তাহা হইলে ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে বয়ঃক্রমকালে
পরিচালক হিসাবে কার্য চালাইতে পারে।

(৭) পরিচালক হয়ত একাধিক যৌথ কারবারের পরিচালক হিসাবে কাজ
করে। সেক্ষেত্রে কোনও পরিচালক কয়টি যৌথ কারবারের
৭। পরিচালক পরিচালক তাহা ঘোষণা করিতে হয়। কোনও পরিচালক
হিসাবে ২০টির একই সময়ে ২০টি যৌথ কারবারের অধিক সংখ্যক কারবারের
অধিক কারবারে পরিচালক থাকিতে পারে না।

কাজ করিতে (৮) যৌথ কারবারের সহিত কাজকারবার চলিতেছে
পারে না একরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকিলে, পরিচালককে

৮। স্বার্থ ঘোষণা তাহা ঘোষণা করিতে হয়।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা পরিচালন প্রতিনিধি
(Managing Agents) : ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর মাধ্যমে যৌথ কারবার
পরিচালনাকে কারবারী ইতিহাসে ভারতবর্ষেই প্রথম উদ্ভব হয় বলা যায়।
পৃথিবীর অন্তর্গত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষেই শিল্প বিপ্লব প্রথম
দেখা দেয় একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। ঊনবিংশ
পরিচালন শতকের দ্বিতীয়াধে ভারতে প্রথমে আধুনিক উপায়ে
প্রতিনিধি মন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলন হয়। অল্পভাবে

বলিলে বলিতে হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে ভারতবর্ষে বহুল উৎপাদন প্রথা
চালু হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার মধ্যে কাপড়ের কল, চটকল, কাগজের কল,
লৌহ ইম্পাত শিল্প ইত্যাদিই প্রধান। যাহারা শিল্পায়নে অগ্রণী ছিলেন তাহাদের
মধ্যে ব্রিটিশ শিল্পপতি ও বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কিন্তু বহুল উৎপাদনে তথা যান্ত্রিক শিল্পায়নের পথে যথেষ্ট বাধা আছে। প্রথমত, প্রচুর মূলধনের সংস্থান; দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছা পরিচালন ব্যবস্থা; তৃতীয়ত, যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন। এই ত্রিবিধ কার্য স্বেচ্ছারূপে সম্পাদন করার জন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল একথা বলা যায় না। তাই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সেই স্থান পূর্ণ করিল। তাহারাই পরিচালন প্রতিনিধি (Managing Agents) বলিয়া পরিচিত।

পরিচালন প্রতিনিধিই ভারতীয় শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে কিংবা শিল্প বিপ্লবের অনিবার্ণ ফলস্বরূপ পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি তাহা বলা কষ্ট। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের পক্ষে পরিচালন প্রতিনিধির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। অবশ্য পরিচালন প্রতিনিধির দোষত্রুটি থাকা হেতু বর্তমানে সেই ব্যবস্থা আর কেহ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে চাহে না, বরং সাধারণের মতামতমুখী সরকারও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে যাহাতে ভবিষ্যতে পরিচালন প্রতিনিধির স্থলাভিষিক্ত হইয়া অল্প কোন প্রতিষ্ঠান উহার কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেও যাহাতে ভারতের শিল্প কোনও রূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তাহার জন্ত পরিচালন প্রতিনিধির সমস্ত কার্যভার অর্পণ করিয়া সাচিব ও কোষাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী এণ্ড ট্রেজারার্স) (Secretaries and Treasurers) নামে নূতন এক বিকল্প প্রাধিকার সৃষ্টি করিয়াছে। পরিচালন প্রতিনিধি, নামই ইহা কি উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত দেয়। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি হিসাবে কোনও ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয় তাহাকে পরিচালন প্রতিনিধি (Managing Agent) বলা হয়।

পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি ও কর্তব্য (Origin and functions of Managing Agents): একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বহুল

উৎপাদনের (Large Scale Production) অনিবার্ণ ফল
পরিচালন হিসাবে বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় এবং
প্রতিনিধির কর্তব্য বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমস্তার মধ্যে ৩টি বিশেষ
সমস্তা সমাধান করার জন্তই পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি হয়। এই ৩টি সমস্তা—

(১) সংস্থাপন (Promotion); (২) অর্থ যোগান (Financing) এবং
(৩) ব্যবস্থাপনা (Management)। সুতরাং এই ৩টি সমস্তা বা কর্তব্য
সম্পাদন করার জন্তই পরিচালন প্রতিনিধির উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষে শিল্পায়নে
নূতন প্রচেষ্টা কালে তাহার বৃহদাকার ব্যবসায় বা শিল্প গঠন ও ব্যবস্থাপনায়

কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। সংস্থাপকের কর্তব্য কি, কি কি
১। সংস্থাপন বিশেষ বিষয়ের উপর সংস্থাপকের নজর দিতে হয় তাহা
ভারতের তখনকার ব্যবসায়িকগণের অবদিত ছিল। কারণ ভারতের তৎকালীন

শিল্প ও বাণিজ্যে একক মালিকানা অথবা অংশীদারী মালিকানাই ছিল। সুতরাং বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হ'লে '৫ করিতে হয় তাহা ছিল শিক্ষণীয় বিষয়।

দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ব্যবসায়সমূহে আবশ্যকীয় অর্থ যোগাইত মালিক—প্রায় ক্ষেত্রেই একজন অথবা কতিপয় অংশীদার। সুতরাং বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যৌথ মালিকানা (কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন অংশগুচ্ছ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে সঞ্চয়ী এবং বিনিয়োগেচ্ছু ব্যক্তিদের কি-ভাবে আকর্ষণ করা যায় তাহাও ছিল তাহাদের অবিদিত। সুতরাং যে সকল দেশে শিল্পায়নে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে সেই সকল দেশের ব্যবসায়ীর সাহায্য ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিদেশীদের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আমাদের

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল বলিয়া

২। অর্থ সাহায্য

গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবসায়ীই ভারতবর্ষে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া,

সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিতে অগ্রণী হইয়াছিল। একথা বলিলে বোধ হয় 'অন্য় হইবে না যে গ্রেট ব্রিটেনের ভারতবর্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে উন্নততর করার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং ভারতবর্ষে আর্থিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যই ছিল মূখ্য। ভারতবর্ষের তখনকার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থায়। ব্যাঙ্কের মারফতে ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্থের সংস্থান ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) ছিলই না, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও (Commercial Bank) ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায়। সুতরাং স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন বা কার্যকরী মূলধন দ্বিবিধ মূলধন সরবরাহের ভার লইতে হইয়াছিল পরিচালন প্রতিনিধিকে (Managing Agents)। তৃতীয়ত, বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ভারতীয়দের

ছিল না। বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর

৩। ব্যবস্থাপনা

করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের উপর। উৎপাদন ব্যয়ের পড়তা

(Overhead charges) যত কম হইবে প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার আটিয়া উঠার শক্তিও তত বাড়ে। পরিচালন প্রতিনিধি উৎপত্তি হওয়ার ফলে একই পরিচালন প্রতিনিধির হাতে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া ব্যবস্থাপনার ব্যয় গড়ে প্রত্যেক ব্যবসায়েরই কম পড়ে। অর্থাৎ একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার একটি পরিচালন প্রতিনিধির হাতে থাকে বলিয়াই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে মিতব্যয়িতার সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং এই ত্রিবিধ সুযোগ লাভ করার জন্যই পরিচালন প্রতিনিধি গঠিত হয় এবং অন্ত্যাবধি পরিচালন প্রতিনিধির অস্তিত্ব আমরা মানিয়া লইয়াছি।

তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে ভারতের যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠাকল্পে বৃহদাকার শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আবশ্যকীয় অর্থ যোগাইতে ও বৃহদাকার

শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পরিচালন প্রতিনিধির দায়িত্ব ছিল অসীম এবং সে দায়িত্ব তাহারা পুরাপুরিভাবেই পালন করিয়াছে। কিন্তু এত সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও পরিচালন প্রতিনিধির কার্যকলাপে যথেষ্ট ত্রুটি দেখা দিতে লাগিল—যাহার ফলে পরিচালন প্রতিনিধি ক্রমশই তাহাদের স্বনাম হারাইতে আরম্ভ করিল। জনমত পরিচালন প্রতিনিধি প্রথার উপর এতই বিরূপ হইল যে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে যৌথ কারবারী আইনে পরিচালন প্রতিনিধির উপর কতিপয় কঠোর ধারা সম্মিলিত হইল। পরিচালন প্রতিনিধি প্রথা আস্তে আস্তে তুলিয়া দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য।

পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থার ত্রুটি : পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থায় যথেষ্ট সুফল থাকা সত্ত্বেও ইহা যে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে তাহা নিয়ে আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

প্রথমত, একই পরিচালন প্রতিনিধির হাতে একাধিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার গুরুত্ব থাকে বলিয়া পরিচালন প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়। ফলে তাহাদের উপর যে সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার থাকে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র অধিকারীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না।

দ্বিতীয়ত, একাধিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থার ভার একই পরিচালন প্রতিনিধির হাতে থাকার ফলে আর্থিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অর্থ আর্থিক দুর্বল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ হয়। ইহাকে আন্তঃ-যৌথ কারবার বিনিয়োগ (Inter-company Investment) বলা হয়। দুর্বল প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গেলে আন্তঃ-কারবার বিনিয়োগের ফলে সবল প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের মালিকদের অর্থও অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। আন্তঃ-কারবার বিনিয়োগে (Inter-Company Investment) কখনও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র মালিকদের মতামত গ্রহণ করা হইত না। পরে উল্লেখ করা হইবে যে ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে (Company Act, 1956) আন্তঃ-কারবার বিনিয়োগের (Inter-company Investment) সুফল দূরীভূত করার চেষ্টা হইয়াছে।

তৃতীয়ত, পরিচালন প্রতিনিধির হাতে সর্বময় ক্ষমতা গুরুত্ব থাকে বলিয়া যে সকল ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয় তাহাদের উদ্ভূত অর্থ পরিচালন প্রতিনিধি তাহাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিয়া থাকে। এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টাও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে (১৯৫৬) করা হইয়াছে।

চতুর্থত, পরিচালন প্রতিনিধির হাতে আভ্যন্তরীণ সকল ব্যবস্থা থাকে বলিয়া হিসাবপত্রাদি তৈয়ারীও তাহাদের

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই করা হইত। তাহাদের প্রাপ্য জ্ঞাত্য পারিশ্রমিক ব্যতীতও
৪। নানা উপায়ে নানাভাবে তাহাদের অধীনে যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
কারবার হইতে থাকে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয় বিক্রয়ের দস্তারি,
অংশ গ্রহণ অফিস পরিচালনার ব্যয় বাবদ মজুরী, অর্থ লয়ী করার জন্ত
হুদ ইত্যাদি নানা উপায়ে অর্থাগম করিত। ফলে যে সকল
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ভার পরিচালন প্রতিনিধির হাতে ছাড়িয়া
দেয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ জ্ঞাত্য প্রাপ্য মুনাফা হইতে
বঞ্চিত হয়।

প্রথমত, পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একক-মালিকানা
অথবা অংশীদারী ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। ফলে পরিচালন
৫। বংশাধিকৃত মালিকানা প্রতিনিধি ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বংশাধিকৃত-
ক্রমিক পরিচালন প্রতিনিধি ব্যবস্থা থাকার ফলে বেশীর ভাগ
ক্ষেত্রেই পরিচালন প্রতিনিধি অদক্ষ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়া যায়। ফলে
অযোগ্যতার সম্পূর্ণ ভার বহন করে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার
ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহাদের মালিকগণ। একথা কখনই স্বীকার্য নহে যে যেহেতু
রামবাবু খুব যোগ্য পরিচালন প্রতিনিধি সেহেতু তাহার পুত্র শ্রামবাবুও যোগ্য
পরিচালন প্রতিনিধি হইবেন। আবার বংশাধিকৃতভাবে পরিচালন ভার অর্পণ
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া পরিচালন প্রতিনিধি নিজেদের স্বার্থ কায়ের করার
চেষ্টা করিয়া থাকে।

পরিচালন প্রতিনিধি প্রথার দোষত্রুটি দূরীকরণের প্রয়াস (Attempts to remove defects of the Managing Agency System) : ১৯৩৬

সালের সংশোধিত ভারতীয় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান আইন দ্বারা পরিচালন
প্রতিনিধির দোষত্রুটি দূর করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা
পরিচালন সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই বলিয়া ১৯৫৬ সালের ভারতীয় যৌথ
প্রতিনিধির ত্রুটি কারবারী আইনে কতিপয় কঠোরতর ধারা সন্নিবেশিত
দূরীকরণ হইয়াছে। এ-বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে পরিচালন
প্রতিনিধি ব্যবস্থার আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

প্রথমত, ১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে যে কোনও ব্যক্তি, অংশীদারী
ব্যবসায় অথবা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান পরিচালন প্রতিনিধি
১। ভারত নিয়োগ হইতে পারে। কিন্তু যখনই কোন পরিচালন প্রতিনিধি
সরকারের নিয়োগ হয় তখনই নিয়োগপত্র ভারত সরকারের নিকট
অনুমোদন অনুমোদনের জন্ত পাঠাইতে হয়। ভারত সরকার কোনও
নিয়োগ অনুমোদন না করিলে সে নিয়োগ কার্যকরী হয় না।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৬ সালের আইন সংশোধিত হওয়ার ফলে, কোন পরিচালন

প্রতিনিধি প্রথমবার নিয়োগে ১০ বৎসরের অধিককালের জন্য নিয়োগ হইতে পারে না। পরবর্তী প্রতি পুনর্নিয়োগ হইতে পারে ৫ বৎসরের জন্য।

২। মিস্ত্রী
তৃতীয়ত, ১৯৫৬ সালের আইন সংশোধিত হওয়ার পর হইতে কোন পরিচালন প্রতিনিধি নীট মুনাফার ১০ শতাংশের অধিক পাইতে পারে না।

৩। মুনাফা
কিন্তু মুনাফা যত বাড়িতে থাকে পারিশ্রমিকের হারও ততই কমিতে থাকে। পর্বীয় পদ্ধতিতে (Slab System) বর্তমানে পরিচালন প্রতিনিধির পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যেমন—প্রথম ১০ লক্ষ টাকা মুনাফার উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা মুনাফার উপর শতকরা ৮ টাকা হিসাবে ইত্যাদি। কিন্তু মুনাফা অপরিপূর্ণ হইলে ন্যূনতম ৫০,০০০ টাকা পাইতে পারে।

চতুর্থত, বংশানুক্রমিকভাবে পরিচালন প্রতিনিধিত্ব স্থানান্তর করা যাইবে না। কারণ কোনও পরিচালন প্রতিনিধি তাহার উত্তরাধিকারীর হাতে পরিচালন প্রতিনিধিত্ব ছাড়িয়া দিলেও যতক্ষণ ভারত সরকার অনুমোদন না করে ততক্ষণ সে হস্তান্তর কার্যকরী হয় না।

৫। হস্তান্তর
পঞ্চমত, কোন পরিচালন প্রতিনিধি এখন আর যথেষ্টভাবে আন্তঃ-কারবার বিনিয়োগ (Inter-company Investment.) করিতে পারে না। বর্তমানে কোন যৌথ কারবারের উদ্ভূত অর্থ একই পরিচালন প্রতিনিধির অধীনে অথবা কোনও কারবারে বিনিয়োগ করিতে হইলে যে কারবারের অর্থ-বিনিয়োগ করা হয় উহার মালিকদের মতামত প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, কোন পরিচালন প্রতিনিধি উহার দ্বারা পরিচালিত কোনও কারবার হইতে ভারতবর্ষে ক্রয় ও বিক্রয় করার জন্য দস্তরি গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু পরিচালন প্রতিনিধির নিজস্ব কার্যালয় যদি বিদেশে কোনও দেশে থাকে এবং সেই দেশে পরিচালিত কারবারের পক্ষে কোনও ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা হইলে দস্তরি দাবি করিতে পারে।

৬। দস্তরি গ্রহণ
নিষেধ

যেমন—সরকার এণ্ড ব্রাদার্স 'রায় এণ্ড কোং' এর পরিচালন প্রতিনিধি। সরকার এণ্ড ব্রাদার্সের ইংলণ্ডে একটি কার্যালয় আছে। রায় এণ্ড কোং এর পক্ষে সরকার এণ্ড ব্রাদার্স যদি ইংলণ্ডে কোন ক্রয় বিক্রয় করে তাহা হইলে সরকার এণ্ড ব্রাদার্স 'রায় এণ্ড কোং' এর নিকট হইতে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দস্তরি দাবি করিতে পারে।

সপ্তমত, ভারত সরকার কোনও বিশেষ শিল্পে পরিচালন প্রতিনিধি নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার রাখিয়া দিয়াছে। ফলে যে কোনও প্রতিনিধি ব্যবস্থা মুহূর্তে যে কোনও শিল্পে পরিচালন প্রতিনিধির নিয়োগ বন্ধ বিলোপের অধিকার করিয়া দিতে পারে।

অষ্টমত, পরিচালন প্রতিনিধি পরিচালিত কারবারে ২ জনের অধিক

৮। পরিচালক-

মণ্ডলীতে পরিচালন

প্রতিনিধির

মনোনীত সদস্য

পরিচালক (Director) নিয়োগ করিতে পারিবে না।

কারবারের পরিচালকমণ্ডলী যদি ৫ জন পরিচালক লইয়া গঠিত হয় তাহা হইলে পরিচালন প্রতিনিধি মাত্র ১ জন, কিন্তু পরিচালকমণ্ডলী যদি ৫ জনের বেশী পরিচালক লইয়া গঠিত হয় তাহা হইলে মাত্র ২ জন পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারে।

৯। নির্দেশ ও

নিয়ন্ত্রণ

নবমত, পরিচালন প্রতিনিধি সর্বদা পরিচালিত কারবারের পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিবে।

১০। ঋণগ্রহণ

দশমত, পরিচালিত কারবার হইতে পরিচালন প্রতিনিধি কোনও সময়ে ২০,০০০ টাকার অধিক ধার গ্রহণ করিতে পারে না।

১১। পরিচালন

প্রতিনিধি ও

পরিচালিত

কারবারের সংখ্যা

শেষত, কোন পরিচালন প্রতিনিধি কোনও সময়েই ১০টির বেশী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে না।

সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ (Secretaries & Treasurers) :

যাহাতে কোনও সময়ে পরিচালন প্রতিনিধি প্রথা তুলিয়া দিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি না হয় সেজন্য

পরিচালন প্রতিনিধির কার্যাবলী যাহাতে অপর অতুল্য অথচ কম দোষ ক্রটিপূর্ণ কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়

তদ্বৎসে ১৯২৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে সেক্রেটারীস্

সেক্রেটারীস্

এণ্ড ট্রেজারার্স্

এবং ট্রেজারার্স্ নামে একটি ব্যবস্থাপন প্রাধিকারের সৃষ্টি করা হইয়াছে। "

পরিচালন প্রতিনিধি এবং সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ মধ্যে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। পরিচালন প্রতিনিধির মতই সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ চুক্তি

দ্বারা বাধ্য। সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশ মানিয়া কার্য করিতে বাধ্য। পরিচালন প্রতিনিধির মতই

সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ ব্যবসায়ের সকল আভ্যন্তরীণ কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। তবে সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ অবস্থা পরিচালন প্রতিনিধির

তুলনায় কিস্তি ভাল। কারণ পরিচালন প্রতিনিধির উপর প্রযোজ্য কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ উপর প্রযোজ্য নহে। অন্ত সকল ধারাই

সমানভাবে প্রযোজ্য। সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ উপর যে কয়েকটি ধারা প্রযোজ্য নহে :

সেক্রেটারীস্ এণ্ড

ট্রেজারার্স্ উপর

নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য

প্রথমত, পরিচালন প্রতিনিধির নিয়োগ যেমন সরকারের নির্দেশে কোনও শিল্পে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে,

সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স্ নিয়োগ এখন পর্যন্ত অবাধ।

দ্বিতীয়ত, পরিচালন প্রতিনিধি ১০টির অধিক কারবার

ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্সের বেলায় এরূপ কোন বাধ্য বাধকতা নাই।

তৃতীয়ত, সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স নবকল্পিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া পুরাতন পরিচালন প্রতিনিধির চুক্তি ১৫ই আগষ্ট শেষ হইবার ধারা উহাতে প্রযোজ্য হইবে না।

সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স ও কয়েকটি বিষয়ে পরিচালন প্রতিনিধির মত বিধিনিষেধে আবদ্ধ : প্রথমত, সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স পরিচালিত কারবারের পরিচালকমণ্ডলীতে কোন পরিচালক মনোনয়ন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স পরিচালিত সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্সের উপর কারবারের নিকট নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না অথবা পরিচালিত কারবারের পক্ষে কোনও দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, পরিচালিত কারবার হইতে পারিশ্রমিক হিসাবে নীট মুনাফার উর্ধ্বতম সাড়ে সাত শতাংশের অধিক পাইতে পারে না। কিন্তু পর্বীয় প্রথায় ন্যূনতম ৩ শতাংশ পর্যন্ত পাইতে পারে।

চতুর্থত, কোনও একক-মালিক সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স নিযুক্ত হইতে পারে না। সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্স কোনও অংশীদারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান হইবে।

ব্যবস্থাপক-পরিচালক (Managing Director.) : যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিলে পরিচালন প্রতিনিধি অথবা সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্সের হাতে পরিচালনার ভার না দিয়া পরিচালকমণ্ডলীর মধ্য হইতে যে কোনও একজনকে ব্যবসায় পরিচালনার জন্ত নিয়োগ করিতে পারে। এইরূপ একজন পরিচালককেই ব্যবস্থাপক-পরিচালক (Managing Director) বলা হয়। যৌথ কারবারী আইনে ব্যবস্থাপক-পরিচালক হিসাবে সেই পরিচালককেই গণ্য করা হইবে, (তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন) যাহার উপর কারবারের ব্যবস্থাপনার প্রায় সমস্ত ভার অর্পণ করা হয়, ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে নিয়োগ না হইলে সে সেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিত না এবং যাহার নিয়োগ হইবে কারবারের পরিচালকমণ্ডলীর সহিত এক চুক্তির বলে।

ব্যবস্থাপক-পরিচালক নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা (Qualification for being appointed as a Managing Director) : ব্যবস্থাপক-পরিচালক

কোন ব্যক্তিই মাত্র নিয়োগ হইতে পারে। কিন্তু কোন দায়মুক্ত আদেশ সাপেক্ষ দেউলিয়া (Undischarged Insolvent) ; কোন বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি, জামিনে খালাস পায় নাই এমন

অপরূপে অপরাধী কোন ব্যক্তি, অথবা উত্তমর্ণদের পাওনা পরিশোধ বন্ধ করিয়াছে অথবা তাহাদের সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক-পরিচালক নিয়োগ হইতে পারে না।

ব্যবস্থাপক-পরিচালককে একজন পরিচালক হইতেই হইবে। ব্যবস্থাপক-পরিচালক কারবারের পক্ষে পরিচালকমণ্ডলীর সকল সদস্যের মত থাকিলেই নিয়োগ হইতে পারে। তাহার নিয়োগ চুক্তি দ্বারা চালিত হয়।

ব্যবস্থাপক-পরিচালকের উপর প্রযোজ্য অন্তান্ত সর্ত্ত (Conditions applicable to Managing Director) : প্রথমত, ব্যবস্থাপক পরিচালক 'উর্ধ্বে' মাত্র ৫ বৎসরের জন্ত নিয়োগ হইতে পারে। তবে ৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে একই ব্যবস্থাপক পুনরায় নিয়োগ হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে চুক্তি দ্বারা ব্যবস্থাপক-পরিচালককে নিয়োগ করা হয় সেই চুক্তির সকল সর্ত্তই সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়ত, কোনও ব্যবস্থাপক-পরিচালক এক সময়ে দুইটির অধিক কারবারের ব্যবস্থাপক-পরিচালক থাকিতে পারে না।

চতুর্থত, কোনও ব্যবস্থাপক-পরিচালক পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারের নীট মুনাফার ৫ শতাংশের বেশী পাইতে পারে না।

ব্যবস্থাপক (Manager) : যে চারিটি বিকল্প পরিচালন প্রাধিকার (Alternative Managerial Authorities) ১৯৬৬ সালের ব্যবস্থাপক ভারতীয় ঘোষণা কারবারী আইন মানিয়া লইয়াছে তাহার মধ্যে অন্ততম ব্যবস্থাপক (Manager)।

ব্যবস্থাপকের কর্মকাল, পারিশ্রমিক, দায়িত্ব সমস্তই ব্যবস্থাপক-পরিচালকের অনুরূপ এবং উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যবস্থাপক কারবারের পরিচালক নহে। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাপক পরিচালক দুইটির অধিক কারবারের ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ হইতে পারে না কিন্তু ব্যবস্থাপক ভারত সরকারের অনুমতি পাইলে দুইটির অধিক কারবারেরও ব্যবস্থাপক নিয়োগ হইতে পারে। অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

ব্যবস্থাপক পরিচালকের উপর প্রযোজ্য অন্তান্ত দ্বারা সমস্তই ব্যবস্থাপকের উপরও প্রযোজ্য।

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন (Annual General Meeting) : প্রত্যেক ঘোষণা কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আয়োজন করা বাধ্যতামূলক। কারবারের পক্ষে পরিচালকমণ্ডলী অথবা বার্ষিক সাধারণ পরিচালকমণ্ডলীর আজ্ঞাপ্রাপ্ত (By order) কোন কর্মচারী [অবশ্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কর্মসচিব (Secretary)] বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আয়োজন করিয়া থাকে। বার্ষিক সাধারণ সভাকে অংশগ্ধ

মালিকদের অধিবেশনও বলা হয়। বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের তারিখের অন্তত ২১ দিন পূর্বে সকল অংশপত্রের মালিকদের নিকট নোটিশ (বিজ্ঞপ্তি) পাঠাইতে হয়। নচেৎ পরিচালকমণ্ডলী আইনত দণ্ডনীয়।

নবগঠিত যৌথ কারবারের পক্ষে কারবার নিবন্ধনের ১৫ মাসের মধ্যে প্রথম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করা বাধ্যতামূলক। পুরাতন অর্থাৎ চলতি যৌথ কারবারের পক্ষে যে তারিখে হিসাবানকাশ বৎসর শেষ হইবে তাহার পর ৬ মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হওয়া বাধ্যতামূলক।

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কর্মসূচী (Agenda of the Annual General Meeting): বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয় এবং আলোচনান্তে যে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহাই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কর্মসূচী। বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয় এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (১) এই অধিবেশনে ব্যবসায়ের চূড়ান্ত হিসাব ও উদ্ভূত পত্র গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত হিসাব অধিবেশনে পেশ করিবার পূর্বে সেই হিসাব যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে যৌথ কারবারের হিসাব নিরীক্ষককে একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হইতে হইবে।

(২) এই অধিবেশনে চূড়ান্ত হিসাব বিবেচনা ও আলোচনা করিয়া অংশপত্র মালিকগণ অংশপত্রের উপর লাভাংশ বণ্টন করা হইবে কিনা, বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের হইলে কি হারে বণ্টন করা হইবে, মুনাফার কত অংশ সঞ্চিতি কৰ্মসূচী খাতে জমা রাখা হইবে ইত্যাদি বিষয় স্থির করে।

(৩) এই অধিবেশনে পরবর্তী হিসাব বৎসরের জ্ঞত পরিচালক (Director) নির্বাচন করা হয়।

(৪) এই অধিবেশনে পরবর্তী হিসাব বৎসরের জ্ঞত হিসাব নিরীক্ষক (Auditor) নিযুক্ত করা হয়।

(৫) উপরিলিখিত ৪ দফা বাদে সাধারণ যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদি পরিচালকমণ্ডলী বিধিযুক্ত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আহ্বান না করে তাহা হইলে অংশপত্রের মালিকগণ অথবা কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আদালত (Court) অধিবেশন আহ্বান করার নির্দেশ দিতে পারে।

সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন (Statutory Meeting): প্রত্যেক নবগঠিত সাধারণ

সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন যৌথ কারবারের ব্যবসায় আরম্ভের দিন হইতে এক মাসের পর কিংবা ৬ মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় তাহাই সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন। ঐ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক নবগঠিত সাধারণ যৌথ কারবারের পক্ষে সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন

আস্থান করা বাধ্যতামূলক। সংবিধিবদ্ধ অধিবেশন আস্থান করা না হইলে সরকার ব্যবসায় গুটাইবার নির্দেশ দিতে পারে অথবা পরিচালকমণ্ডলী এবং কারবারের যে কর্মচারার উপর এই কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে উভয়ই বোধ ভাবে দণ্ডনীয় (দণ্ড ৫০০ টাকা জরিমানা হইতে পারে)।

সংবিধিবদ্ধ অধিবেশনের কর্মসূচী (Agenda of a Statutory Meeting):
সংবিধিবদ্ধ অধিবেশনে কারবারের অংশপত্রের মালিকদের সম্মুখে কারবার নিবন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া অধিবেশন পর্যন্ত আর্থিক লেনদেন উপস্থাপিত করিতে হয়। অধিবেশনে আর্থিক লেনদেন বাহা উপস্থাপিত করা হয় সে সম্পর্কে দুই জন পরিচালকের ও হিসাব নিরীক্ষকের সহিযুক্ত এক বিবৃতি দাখিল করিতে হয়। উহাকে বলা হয় সংবিধিবদ্ধ বিবৃতি (Statutory Report)। উহাতে সন্নিবেশিত করা হয়—(১) কয়খানি অংশপত্র বন্টন (Allot) করা হইল। উহার মধ্যে কত আদায়ীকৃত মূলধন। যদি কাহাকেও কোনও পারিতোষিক বাবদ অংশপত্র বন্টন করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কি কার্যের পারিতোষিক হিসাবে অংশপত্র বন্টন করা হয়। (২) অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত অংশপত্র বাবদ কতক নগদান (Cash) পাওয়া গিয়াছে। (৩) অধিবেশনের তারিখের ৭ দিন পূর্ব পর্যন্তের একখানি নগদান জমা খরচ (Receipts & Payments) হিসাব। (৪) নগদান জমা খরচ হিসাবে প্রারম্ভিক অথবা গঠন ব্যয়ের (Preliminary or Formation Expenses) আনুমানিক মূল্য এবং অংশপত্র বিক্রয়ের জন্য দস্তরি দেওয়া হইয়া থাকিলে কত দেওয়া হইয়াছে। (৫) পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের, পরিচালন প্রতিনিধির অথবা সেক্রেটারীস্ এণ্ড ট্রেজারার্সদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদির বিশদ বিবরণ। (৬) যদি পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক কোন চুক্তির সংশোধন (Modification) প্রয়োজন হয় তাহার প্রস্তাব। (৭) কারবারের অংশপত্র বিক্রয়ের জন্য কাহারও সহিত অবলেনের চুক্তি হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ ও সর্ব। (৮) পরিচালকমণ্ডলী অথবা পরিচালন প্রতিনিধির নিকট হইতে পাওনা বকেয়া অংশপত্রের মূল্য। (৯) কারবারের অংশপত্র বা প্রতিভূতি বিলি করার জন্য পরিচালকমণ্ডলী, পরিচালন প্রতিনিধি ইত্যাদিকে কোনও দস্তরি দেওয়া হইলে তাহার পরিমাণ।

বিশেষ উদ্দেশ্য অধিবেশন (Special Meeting): বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কোনও অধিবেশন আস্থান করা হইলে তাহাকে বিশেষ উদ্দেশ্য অধিবেশন বলা হয়। অধিবেশন যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আস্থান করা হইবে তাহা অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তিতে (Notice) পরিচালকমণ্ডলী বা পরিচালন প্রতিনিধি লিখিতে হয়। বিশেষ উদ্দেশ্য অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাকে বিশেষ সিদ্ধান্ত (Special Resolution) বলে। বিশেষ

উদ্দেশ্য অধিবেশন আহ্বান করিতেও ২১ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হইতে হইলে অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি প্রয়োজন। বিশেষ উদ্দেশ্য অধিবেশনের উদাহরণ—স্মারক লিপির অথবা পরিষেল নিয়মাবলীর কোন ধারা পরিবর্তন বা সংশোধন।

জরুরী সাধারণ অধিবেশন (Extra-ordinary General Meeting) :

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর পুনরায় সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনের জরুরী সাধারণ অধিবেশন পূর্বে কোনও জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে কারবারের সকল সদস্যদের অধিবেশনে জরুরী অবস্থার বিবেচনা করিতে হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহাকে জরুরী সিদ্ধান্ত (Extra-ordinary Resolution) বলা হয়। জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিতেও ২১ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। যদি পরিচালকমণ্ডলী জরুরী অধিবেশন আহ্বান না করে তাহা হইলে অংশগত মালিকদের মধ্যে যাহাদের মোট ভোটসংখ্যার এক-দশমাংশ ভোটদানের অধিকার আছে তাহারা সম্মিলিতভাবে অধিবেশন আহ্বান করার নির্দেশ দিতে পারে। উহাকে বলা হয় অধিবেশনের নির্দেশ (Requisition of meeting)। অধিবেশনের নির্দেশ দেওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে যদি পরিচালকমণ্ডলী অধিবেশন আহ্বান করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে যাহারা অধিবেশনের নির্দেশ দিয়াছে তাহারা নিজেরাই নির্দেশের পর ৩ মাসের মধ্যে অধিবেশন আহ্বান করিতে পারে।

ভোট প্রতিনিধি (Proxy) : বৌখ কারবারের আইনে কোনও অংশগতের মালিক যদি নিজে উপস্থিত হইয়া অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতে অপারগ হয় তাহা হইলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। যাহাকে প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা

হয় তাহাকে ভোট প্রতিনিধি (Proxy) বলে। কিন্তু পরিষেল ভোট প্রতিনিধি নিয়মাবলীতে ভোট প্রতিনিধি মারফত ভোটদানের অধিকার না থাকিলে ভোট প্রতিনিধি নিয়োগ করা চলে না। ভোট প্রতিনিধির কারবারের একজন অংশগত-মালিক হওয়া আবশ্যিক। কারবারের অংশগত ক্রয় করে নাই এমন ব্যক্তি ভোট প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারে না। ভোট প্রতিনিধিকে নিয়োগ করিয়া যে পত্র দেওয়া হয় উহা সাধারণ অধিবেশনের অন্তত ৭২ ঘণ্টা পূর্বে কারবারের কার্যালয়ে পৌছানো প্রয়োজন; নচেৎ ভোট প্রতিনিধির অধিকার প্রয়োগ করা যায় না।

সদস্যব্যবস্থার ব্যবসায় (Co-operative Business) : উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যবস্থা, সদস্যদ্বারা (মধ্যগের) উপস্থিতি যে শেষ পর্যন্ত অনেক সন্তোষকারী স্বার্থের পরিপন্থী তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ধন-আর্থিক উৎপাদন ব্যবস্থার বহুল উৎপাদন ও অটল উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বৈত মধ্যগের

৯। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের স্থান ও অবদান অনস্বীকার্য। তথাপি বাহাতে সমবায় ব্যবসায় স্বল্প আয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ মধ্যগণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে তদ্ব্যতীতই নাগরিকদের মধ্যে স্বাবলম্বী, মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা, সদিচ্ছার উদ্ভব করিয়া সমবায় প্রথায় ব্যবসায়ের প্রচেষ্টা করা হয়। সমবায় প্রথায় ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া মধ্যবর্তীদের মুনাকা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দই ভোগ করিতে পারে।

সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Co-operative Business): স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিধা দেওয়ার জন্য সমবায় সমিতি গঠিত হয় বলিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন সরবরাহ এবং ব্যবস্থাপনা সমবায় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে হয় যে সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি বিশেষের, অথবা সদস্যদের মধ্যে কোনও এক বিশেষ অংশের কৃষ্টিগত হয় না। বস্তুত, সমবায় ব্যবস্থা কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারে না যদি সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না হয়। কারণ পারস্পরিক সদিচ্ছা সহায়ত্বভূতি, মৈত্রী ও স্বাবলম্বন সকলই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার উপর নির্ভর করে।

বৈশিষ্ট্যগুলি : ১। সমবায় সমিতির কার্য কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং সমিতির সদস্য হওয়ার অধিকার সেই এলাকার অন্তর্গত অধিবাসীদেরই মাত্র দেওয়া হয়।

১। এলাকা

২। সমবায় সমিতির মূলধন স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয় বলিয়া সমবায় সমিতির অংশপত্রের মূল্য খুব নিম্নে রাখা হয়।

২। অংশপত্রের মূল্য

৩। সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে না চলিলে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া প্রত্যেক অংশপত্র অধিকারীর সমান ভোটদানের ক্ষমতা থাকে। কেহ অধিক সংখ্যক অংশপত্র ক্রয় করিয়া তুলনায় অধিক মূলধন যোগাইয়াছে বলিয়া তাহার অধিক ভোটদানের ক্ষমতা থাকে না। যে ১০ টাকা মূলধন যোগাইয়াছে তাহারও ১টি ভোট, আর যে ১০০০ টাকা মূলধন যোগাইয়াছে তাহারও ১টি ভোট। সুতরাং কেহ ভোটাধিক্যের জোরে সমিতি পরিচালনায় কার্যে মী স্বার্থ ভৈয়ার করিতে পারে না।

৪। সমবায় সমিতির সকল সদস্যেরই সমিতি পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকার থাকে। অবশ্য সমিতি বৃহদাকার হইলে সমস্ত

৪। পরিচালনা-মণ্ডলী

সংখ্যাও বাড়িয়া যায় এবং সকল সদস্যের অংশগ্রহণে স্বকল্প দেয় না। তাই যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মতই বৃহদাকার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালকমণ্ডলীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

- ৫। সমবায় সমিতি মুনাকার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। স্বতরাং মুনাকার অংশ গ্রহণের কথা পোণ।

- ৬। সমবায় সমিতি সমবায় সমিতির নিবন্ধকের কার্যালয়ে নিবন্ধন হওয়া বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন হইলে সমবায় সমিতি বোধ কারবারের মতই আবহমানকাল পর্যন্ত চলার অধিকার পায়।

সমবায় সমিতির বিভিন্ন রূপ (Different kinds of Co-operative Societies) : কেবল মাত্র সন্তোষকারীদেরই স্বযোগ দেওয়ার জন্য সমবায় সমিতি গঠিত হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদকগণ বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেজন্য ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদকমণ্ডলীর মধ্যেও সমবায় প্রধায় উৎপাদন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এই প্রকার সমবায় প্রচেষ্টাকে **শিল্প সমবায় (Industrial Co-operatives)** বলে।

শিল্প সমবাসে শিল্প সরাসরি কাঁচামাল সংগ্রহ করে। এবং শিল্পজ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজেরাই বিতরণ বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

১। শিল্প সমবায় ইহাতে উৎপাদক ও সন্তোষকারীর মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সমবায় ঋণ সমিতি (Co-operative Credit Societies) : ভারতবর্ষে সমবায় সমিতির উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমবায় ঋণ সমিতিই সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ভারতের কৃষকগণ ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকদের সহজে ও স্বল্প হুদে ঋণের সংস্থান করার উদ্দেশ্যেই ১৯০৪ সালে ভারতীয় সমবায় সমিতি আইন পাশ করিয়া সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। প্রারম্ভিক কালে ঋণ সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ঋণ সমস্তা দূর করা। মহাজন ও অতি কুসীদদের (Usurer) হাত হইতে কৃষক, তত্ত্ববায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদকদের রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সমবায় ঋণ সমিতি গঠিত হয়। নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে পরস্পর পরস্পরের আর্থিক অবস্থা জ্ঞাত। ঋণদান ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যায় এবং যেহেতু সমিতির সদস্য ঋণের জামিন হইতে পারে সেহেতু ঋণ আদায়েরও সুবিধা হয়। কিন্তু সমবায় সমিতির কার্যকলাপে দেখা গেল যে একমাত্র ঋণ সমিতি দ্বারাই গ্রামীণ সমস্তার সমাধান সম্ভব নহে। তাই ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন সংশোধন করিয়া অঋণ সমবায় সমিতিও (Non-Credit Co-operative Societies) মানিয়া লওয়া হইয়াছে। অঋণ সমবায় সমিতিই প্রকৃত প্রত্যাবে উৎপাদক সমবায় ও সন্তোষকারী সমবায় সমিতি।

তৃতীয়ত, **সম্ভোগকারী সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operative Societies)** : সমবায় নীতিতে দোকান পরিচালনা করিয়া সম্ভোগকারীদের মধ্যগ ব্যবসায়ীর হীত হইতে রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্ভোগকারীর সমবায় সমিতি গঠিত হয়। উৎপাদক যেমন বহু বিপণি ও বিভাগীয় বিপণির (Multiple Shop and Departmental Stores) খুলিয়া মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ব্যতিরেকেই

সম্ভোগকারীর সহিত সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করে এবং
৩। সম্ভোগকারী সমবায় সমিতি মুনাকার সম্ভোগকারীকে অংশ দেয়, তেমন সম্ভোগকারীর সমবায় সমিতি খুলিয়া সম্ভোগকারী নিজেই দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ যে মুনাকা করে তাহার সুযোগ সমিতির সদস্যগণই ভোগ করে।

সম্ভোগকারী সমবায় সমিতি প্রথমে ১৮৪৪ সালে গ্রেটব্রুটেনের রকডেল (Rockdale) অঞ্চলে স্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই উক্ত সম্ভোগকারী সমবায় সমিতি সাফল্য লাভ করে এবং ফলে বর্তমানে গ্রেটব্রুটেনের খুচরা ব্যবসায়ের (Retail Trade) শতকীরা ১২ ভাগ সমবায় সমিতির হাতে। সম্ভোগকারী সমবায় সমিতির সুবিধা এই যে প্রত্যেক দোকানই স্বতন্ত্র। কাহারও আর্থিক অসচ্ছলতা সমিতির সদস্য ব্যতিরেকে কাহাকেও আঘাত করে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সম্ভোগকারী সমবায় সমিতির সদস্য প্রত্যেকেই একজন মালিক এবং ক্রেতা।

সম্ভোগকারী সমবায় সমিতির মুনাকা বিতরণে একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে সমিতির সদস্য মোট বিক্রয়ের যত অংশ ক্রয় করে সে মুনাকার তত অংশ পাইয়া থাকে। যেমন সমিতির মোট বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা। (উহাই সদস্যগণ ক্রয় করিয়াছে)। মুনাকা ১০,০০০ টাকা। তাহা হইলে সদস্যদের বিক্রয়ের ও মুনাকার অনুপাত ১০ : ১। অর্থাৎ কোন সদস্য এক টাকা মূল্যের দ্রব্য সমবায় সমিতি হইতে ক্রয় করিলে ১০ পয়সা হিসাবে লাভাংশ (Dividend) পাইবে। ইহাতে সদস্য গণকে সমিতি হইতে অধিক ক্রয়ের প্রেরণা দেওয়া হয়। মনে কর মোট এক লক্ষ টাকা মূল্যের বিক্রয়ের মধ্যে ক ১০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। তাহা হইলে ক ১০০ টাকা লাভাংশ পাইবে। (১০০০০ : ১০০০ :: ১০০০ : ?)

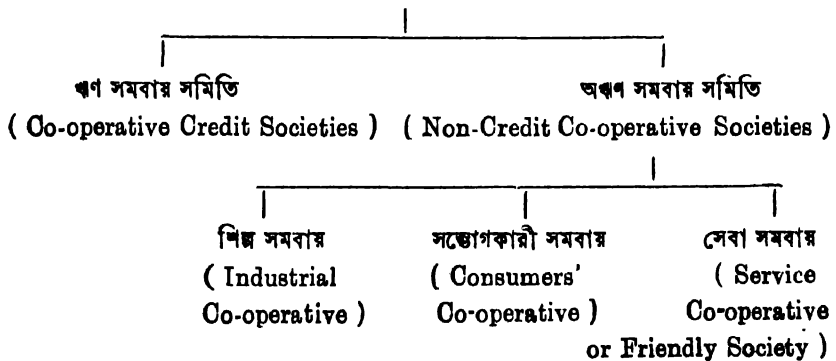
$$\frac{১০০০০ \times ১০০০}{১০০০০} = ১০০ \text{ টাকা।}$$

কিন্তু ধ—মনে কর, ১৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। তাহা হইলে ধ পাইবে ১৫০ টাকা। এই ভাবে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের সম্ভোগকারীর নিকট অতি মুনাকার দ্রব্য বিক্রয়ের পথ বন্ধ করিতে পারে। সম্ভোগকারী সমবায় সমিতির অসুবিধা এই যে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় বাস দিয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভোগকারী সমবায় ব্যবসায় সাফল্যলাভ করে না। জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্য যেমন চাউল, কাইল,

মুদি মশলার দ্রব্য, কাপড় ইত্যাদির ব্যবসায়ই সন্তোষকারী সমবায় সমিতি নিম্নে সাফলালভ করে। ইহাতে অধিকসংখ্যক সদস্য আকর্ষণ করা যায় এবং বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীর প্রয়োজন হয় না।

চতুর্থত, সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operative Societies) : সমবায় সমিতি কেবলমাত্র ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় না। অনেক সমবায় সমিতি আছে যাহারা সদস্যদের সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়। যেমন সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি (Co-operative Housing Societies) ; সমবায় বীমা সমিতি (Co-operative Insurance Societies) ইত্যাদি। ভারতবর্ষে সামগ্রিক সমাজবীমা (Social Insurance) প্রথা এখনও প্রবর্তন হয় নাই। ফলে সেবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজবীমার কার্য—যেমন অপারগ বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া সমিতির সদস্যদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। এই প্রকার সেবা সমিতিকো মিত্র সমিতিও (Friendly Societies) বলা হয়।

সমবায় সমিতি (Co-operative Societies)



Exercises

1. What are the different forms of Business ? ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা কর।
2. What are the advantages of a Partnership business over a Sole trader's business ? এক মালিকানা হইতে অংশীদারী ব্যবসায়ের কি কি সুবিধা ?
3. What are the advantages of a Joint Stock Company ? যৌথ কর্তব্যকারী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা কি ?

4. What are the salient features of a Partnership Business ?
অংশীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কি ?
5. What is a Private Limited Company ? সীমাবদ্ধ বরোদা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান কি ?
6. Explain (a) One Man Company, (b) Government Company.
আলোচনা কর : (ক) এক ব্যক্তি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান, (খ) সরকারী যৌথ কারবার ।
7. What is a Memorandum of Association ? What are its contents ?
স্মারকলিপি কি ? উহাতে কি বিষয়ের উল্লেখ থাকে ?
8. What is the difference between a Memorandum of Association and an Articles of Association ?
স্মারকলিপি ও পরিষেল নিয়মাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি ?
9. Discuss the importance and contents of a Prospectus.
অস্থান-পত্রের গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর ।
10. Who can be appointed a Director ?
পরিচালক হইবার উপযুক্ত কে ?
11. What is qualification shares ?
পরিচালক যোগ্যতা অংশপত্র কি ?
12. What are the rights and duties of a Director ?
পরিচালকের কর্তব্য ও অধিকার কি ?
13. What is understood by Managing Agents ?
পরিচালন প্রতিনিধি বলিতে কি বুঝায় ?
14. What is the difference between Managing Agents and Secretaries & Treasurers ?
পরিচালন প্রতিনিধি এবং সেক্রেটারীস্ ও ট্রেজারার্সের মধ্যে পার্থক্য কি ?
15. What is understood by Limited Liability Company ?
সীমাবদ্ধ কারবারী প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বুঝায় ?
16. What are the native managerial authorities permitted under the Companies Act, 1956 ?
১৯৫৬ সালের যৌথ কারবারী আইনে কি কি বিকল্প পরিচালন প্রাধিকারের অস্থমতি আছে ?
17. What are the points of difference between a share and a debenture ?
অংশপত্র এবং ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

(Banking)

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উৎপত্তি (Origin of Banking Business) :

ব্যাঙ্কের উন্নতির সহিত দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রসার অংগাংগীভাবে জড়িত। কোন দেশেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় উন্নত না হইলে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব নহে। আধুনিক উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহ চলতি ও কার্যকরী মূলধন যোগাইতে যথেষ্ট সাহায্য করে। বস্তুত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় না থাকিলে শিল্পে উৎপাদনের গতি ব্যাহত হয়। অর্থনীতি বিশারদগণ বহু অভিজ্ঞতার পর অবিসংবাদিতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে ব্যাঙ্কসমূহই শিল্পে উৎপাদনের চাকা চালু রাখে (Banks keep the wheels of production running)।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উৎপত্তি কুটিরেরই বলা যায়। এমন সময় ছিল যখন দেশে জন-সাধারণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করিত। কিন্তু মাহুষের স্বাভাবিক প্রেরণা ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করা তাহা ত্যাগ করিতে পারিত না। সুতরাং যাহারা ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করিত, তাহাদের নিকট সমস্তা দাঁড়াইল কিভাবে সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রাখা যায়। যাহারা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঘড়ায় করিয়া সঞ্চিত অর্থ মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত। অনেক ঘটনাই পরবর্তীকালে দেখা গিয়াছে যাহাতে পুরাতন বাড়ী ইত্যাদি সংস্কার করার সময়ে মাটির নীচে সঞ্চিত অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

সঞ্চয়কারী নিজের ভোগস্পৃহা দমন করিয়া ভবিষ্যত বংশধরদের জন্ত মাটির নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু হয়ত সে সঞ্চয় বংশধরদের কেহই ভোগ করিতে পারিল না। সঞ্চয়কারী কখনও সকলকে জানাইয়া সঞ্চয় করিত না। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সঞ্চয়কারী গুপ্তধনের সন্ধান তাহার উত্তরাধিকারীকে দিয়া বাইতে পারে নাই। এইরূপ সঞ্চয় কাহারও ভোগে বা কাজে লাগিল না। বহিঃচক্রের প্রকৃত মূহূর্ ব্যক্তির নির্দেশে মাটির নীচে হইতে ঘড়া ঘড়া সর্বমুক্তা পাউয়াই দেবী চৌর্য্য হইয়াছিল। কিন্তু নিজের জীবনশার অথবা ভবিষ্যত বংশধরগণ যাহাতে

আবশ্যক মত সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিতে পারে তৎক্ষণত সঞ্চয়কারী এমন লোকের সন্ধান করিত বাহাদের উপর তাহার বিশ্বাস আছে। এইরূপ বিশ্বাসী লোকের হাতে সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখিত এবং আবশ্যক বোধে তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিত। কেবলমাত্র বিশ্বাসী লোকেরই সন্ধান করিত না, এমন বিশ্বাসী লোকের সন্ধান করিত বাহারা গচ্ছিত অর্থ পাহারা দিয়া নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করার সামর্থ্য ছিল। এইরূপ লোকের অভাব ছিল না। তখনকার সময়ের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার সামর্থ্য ছিল এবং তাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিল বলিয়া তাহাদের উপর সাধারণের বিশ্বাসও ছিল অটুট।

এই উপায়ে দেশের সঞ্চয় কতিপয় লোকের হাতে গচ্ছিত হইতে লাগিল। তাহার নিকট সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখা হইত সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে বেশী সংখ্যক গচ্ছিতকারীই সঞ্চিত অর্থ বহুদিন পর ফেরত লয় অর্থাৎ তুলিয়া লয়। সে চিন্তা করিতে লাগিল কি উপায়ে সঞ্চিত অর্থ লাভজনক ভাবে ব্যবহার করা যায়। স্বযোগ ত তাহার হাতের কাছেই ছিল। দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া দেশের লোকেরা অভাব অভিযোগে প্রয়োজন মত তাহার নিকট ঋণ চাহিত। ঋণ দিয়া সে সুদ লইত। এইবার তাহার নিজের যাহা কিছু পুঁজি তাহার সহিত গচ্ছিতকারীর সঞ্চয় যোগ হওয়ার ফলে তাহার ধার দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়িয়া গেল। এই উপায়ে বর্তমান কালে ব্যাঙ্কসমূহ ঋণ গ্রহণও ঋণ দান যে দুইটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদন করে তাহার উৎপত্তি হয়। আবার তখনকার যুগে রেল, ষ্টীমার, গাড়ী ইত্যাদি যানবাহন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অল্পমত। ফলে সাধারণে পায়ে হাঁটিয়া এবং নৌকা যোগেই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাতায়াত করিত। স্থলপথে এবং নৌকাপথে ছিল চোর ডাকাতের উপদ্রব। ফলে যে লোক অর্থ লইয়া স্থানান্তর গমন করিত তাহারা প্রাণভয়ে ভীত থাকিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ লইয়া স্থানান্তর গমনকালে লোকে চোর ডাকাতের হাত হইতে নিকৃতি পাইত না। এই সম্রদায়ের লোকদের পূর্ব লিখিত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সাহায্য করিতে লাগিল। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট বিদেশে গমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জমা রাখিলে তাহারা বিদেশে তাহাদের পরিচিত সমব্যবসায়ী ব্যক্তিদের নিকট পরিচিতি পত্র দিয়া দিত এবং লিখিয়া দিত যে ঐ ব্যক্তি তাহার নিকট কত অর্থ মজুত রাখিয়াছে—তাহাকে যেন সেই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। বিদেশের সেই ব্যক্তিও আবার তাহার দেশে আগত ব্যক্তিদের ঐরূপ পরিচিতি পত্র দিয়া তাহাকে অর্থ দিতে অহরোধ করিত। এই উপায়ে সৃষ্টি হইল নোট চালু প্রথা। দুই জনের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে হিসাব নিকাশ হইত, কে পাইবে কে দিবে। হিসাব অন্তে বাহাকে অর্থ পাঠাইতে হইত সে লোকলব্ধ দিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া প্রাপকের নিকট অর্থ প্রেরণ করিত। বর্তমান বৈদেশিক ব্যাক ব্যবহার সূত্রমত এই উপায়ে হয়।

ব্যাঙ্কের ভাগ ও ভাষাভেদের কার্য (Different types of Banks and their functions): উপরের আলোচনা হইতে পরিষ্কার হুঁয়া যাইতেছে যে ব্যাঙ্ক যে সকল কর্তব্য সম্পাদন করে তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ অপরের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখা (Accepting Deposit); অপরকে ধার দেওয়া (Lending); অপরকে গচ্ছিত অর্থ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা (Safe keeping of Savings); নোট দ্বারা অর্থ স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা (Transfer of money by means of notes)। শেষোক্ত কর্তব্যটি বর্তমানে প্রতিদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Central Bank) একাধিকার (Prerogative)। অবশ্য ব্যাঙ্কের কার্যের মধ্যে বর্তমানে এতদ্ব্যতীতও অন্যান্য কার্য আসে। উহা পরে আলোচনা করা হইতেছে। আমরা প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank): ব্যাঙ্কের অপরের অর্থ গচ্ছিত রাখার নাম অপরের নিকট হইতে ধার করা (Borrowing)। ধার করিলেই হুঁদ দিতে হয়। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্য যাহারা অর্থ গচ্ছিত রাখে অর্থাৎ গচ্ছিতকারী (Depositors) হুঁদ পাইয়া থাকে অর্থাৎ যে অর্থ গচ্ছিতকারী নিজে ব্যবহার করিতে পারিত সেই ব্যবহার (Use of money) ব্যাঙ্ক ক্রয় করিয়া লয়। ক্রয় মূল্যই হুঁদ কারণ গচ্ছিত অর্থ ত আবার ফেরত দিতেই হইবে।

ঠিক একই ভাবে ব্যাঙ্ক যখন নিজে অর্থের ব্যবহার অল্পের নিকট হস্তান্তর করে (Transfer the use of money) তখন যাহাকে অর্থ ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করে তাহার নিকট হইতে যে মূল্য দাবি করে সে মূল্যও হুঁদ (Interest)। সুতরাং ব্যাঙ্কের লাভ হয় তখন, যখন যে মূল্য অর্থের ব্যবহার ক্রয় করে তাহার চেয়ে অধিক মূল্যে অর্থের ব্যবহার বিক্রয় করা হয়।

১। ঋণ গ্রহণ ঋণ গ্রহণ বা আমানত গ্রহণ (Accepting Deposit) এবং ঋণদান (Lending) দুইটির একটি দ্বারা কখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চলিতে পারে না।

তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কার্যের মধ্যে প্রথমত, আমানত গ্রহণ বা ঋণ গ্রহণ, দ্বিতীয়ত, ঋণ দান।

তৃতীয়ত, স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যখন বৈদেশিক বাণিজ্য আলোচনা করা হইবে, তখন দেখা যাইবে যে ব্যবসা-
৩। হতি ভাঙ্গান বাণিজ্যে বর্তমানে হতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বাণিজ্যিক হতি (Trade Bills) ডাঙ্কাইয়া (Discounting) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হতির মিস্যাদেশ পূর্বেই গ্রহণ করা যায়। আবার হতি এক প্রকার রেখাঙ্কিত (Crossed) সন্দের পত্র। রেখাঙ্কিত সন্দের পত্র (Crossed Negotiable Instruments) ব্যাঙ্কের মারকত ডাঙ্কাইতে হয়। সুতরাং হতি ভাঙ্গান ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ কর্তব্য।

চতুর্থত, ব্যাঙ্কসমূহকে আমানতকারীর পক্ষে নানাপ্রকার কার্য সম্পাদন
৪। মক্কেলের করিতে হয়। মক্কেলের চেক ভাঙাইয়া আনা, মক্কেলের
চেক ভাঙান হিসাবে কোন ঘেনাদার অর্থ জমা দিলে তাহা গ্রহণ করা
ইত্যাদি ব্যাঙ্কের কার্য।

পঞ্চমত, বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের আর্থিক সচ্ছলতার
প্রমাণপত্র চাহিলে তাহাও আমদানিকারকের ব্যাঙ্ক দিয়া থাকে। যে আর্থিক সচ্ছল-
তার প্রমাণপত্র দিলে সেই ব্যাঙ্কের উপরই রপ্তানিকারক হস্তি
৫। আমদানি কাটে। আমদানিকারকের আমদানিকৃত দ্রব্য খালাস করিতে
রপ্তানিতে সাহায্য যে সমস্ত দলিল পত্রাদি রপ্তানিকারক পাঠাইয়া থাকে তাহাও
ব্যাঙ্কের নিকট পাঠায় যেমন, বহন পত্র (Bill of Lading) ; হস্তি (Bill of
Exchange) ইত্যাদি। এই সকল দলিল ব্যাঙ্কে তাহার মক্কেলের পক্ষে গ্রহণ
করিতে হয় এবং মক্কেলের নিকট পৌছাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

ষষ্ঠত, ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র সঞ্চিত অর্থই নিরাপদে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করে
৬। মূল্যবান সম্পদ না, মূল্যবান অলঙ্কারাদি, দলিলপত্রাদি ইত্যাদি নিরাপদে
নিরাপদে রাখার রাখার ব্যবস্থা মক্কেলের পক্ষে ব্যাঙ্কে করিতে হয়। ইহাকে
ব্যবস্থা বলা হয় নিরাপদ গচ্ছিত স্থান (Safe Deposit Vault)।

সপ্তমত, ব্যাঙ্ক মক্কেলের পক্ষে অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদি করিয়া থাকে।
মনে কর কাহারও সঞ্চয় সম্পূর্ণই ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিল। এখন ব্যাঙ্কে

৭। মক্কেলকে গচ্ছিত রহিলে যে হারে সুদ পাওয়া যাইবে তাহার
সেবাদান চেয়ে অধিক মুনাফা পাওয়া যাইবে যদি কোন যৌথ
কারবারের অংশপত্রে নিয়োগ করা হয়। মক্কেল তাহার
ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে যে অমুক যৌথ কারবারের

এই কয়খানা অংশপত্র ক্রয় করা হউক। আবার মক্কেল যদি মনে
করে কোন যৌথ কারবারের অংশপত্রের মূল্য বাজারে দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে
তাহা হইলেও ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে যে অংশপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া
দেওয়া হউক। সুতরাং মক্কেলের পক্ষে অংশপত্র বা ষ্টক ক্রয়-বিক্রয়ও ব্যাঙ্কের কার্য।

অষ্টমত, ব্যাঙ্কের উপর মক্কেলের দ্বিগ নির্দেশ থাকিতে পারে যে, মাসের প্রথম
অথবা বৎসরের কয়েকটি স্থির দিনে মক্কেলের পক্ষে মক্কেলের হিসাবে গচ্ছিত
৮। মক্কেলের অর্থ হইতে তাহার পাওনাদারদের অর্থ প্রদান করিতে হইবে।
নির্দেশমত অর্থ যেমন, ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ থাকিতে পারে যে প্রতি মাসের
প্রধান প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাড়ী ভাড়া বাবদ বাড়ীর মালিককে ১০০

টাকা দিতে হইবে, অথবা মনে কর, ১লা জানুয়ারী, ১লা এপ্রিল,
১লা জুলাই, ১লা অক্টোবর তাহার জীবন বীমার টাঙ্গা (Premium) বাবদ ৫০ টাকা
বীমাকারককে (Insurer) দিতে হইবে। মক্কেলের এই কার্য সম্পাদন করার জন্য

ব্যাঙ্ক অবুজ্জই মাত্তল দাবি করিবে ; কিন্তু মক্কেলের দিজেকে এই সকল লেনদেন করিতে হইলে যে মাত্তল ব্যয় করিতে হইত, তাহার ভুলনার ব্যাঙ্কের মাত্তল কম হয়। আর ব্যাঙ্কের উপর স্থির নির্দেশ (Standing order) থাকার ফলে মক্কেল নিজেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

নবমত, ব্যাঙ্ক মক্কেলের আর্থিক সচ্ছলতা প্রমাণীকরণ করে (Certify solvency)। ব্যাঙ্কে সর্বদাই মক্কেলের অবস্থা গোপন রাখিতে হয়।

৯। মক্কেলের কিছু আবশ্যকবোধে ব্যাঙ্কেও মক্কেলের পক্ষে Referee হিসাবে অবস্থা প্রমাণীকরণ কার্য করিতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাওনাদারকে চেক পাওনা শোধ করা হইলে পাওনাদার দাবি করিতে পারে যে

চেকের উপর ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি প্রয়োজন—যে চেক নিকাগী ঘরে (Clearing House) জমা দিলে ব্যাঙ্ক চেকের অর্থ পরিশোধ করিবে। এই প্রকার চেককে প্রমাণীকৃত চেক (Certified or Marked Cheque) বলে। বর্তমানে প্রমাণীকৃত চেকের পরিবর্তে ব্যাঙ্কের ছণ্ডিই (Bank Draft) চলে।

যে সকল দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় খুবই উন্নত সেই সকল দেশের ব্যাঙ্ক মক্কেলের স্বার্থের দিকে এত নজর দেয় যে কোনও দিনে ব্যাঙ্কের কার্যের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও যদি ব্যাঙ্কে অর্থ নিরাপদে রাখিতে হয় তাহা হইলে তাহাও পারা যায়। দিনের কাজের শেষে সীলমোহরযুক্ত থলেতে নিজের নাম ইত্যাদি লিখিয়া থলেটি ব্যাঙ্কের সিন্দুক ফেলিয়া রাখিলেই চলে। পরদিন যখন ব্যাঙ্ক কার্য আরম্ভ করিবে তখন ঐ সিন্দুক হইতে থলে বাহির করিয়া অর্থ নিজের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত নহে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের লেনদেনের নির্দিষ্ট সময়ের পর আর ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখা যায় না।

ব্যাঙ্কে আমানতের প্রকারভেদ (Different forms of Deposit) :

ব্যাঙ্কের আমানতের মিয়াদ এবং কিভাবে উহা তোলা যায় তাহার উপর ব্যাঙ্কের আমানতের রূপ নির্ভর করে। মোটামুটি আমানতকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) চলতি বা তলবী আমানত (Current or Demand Deposit) ; (২) মিয়াদী আমানত (Fixed or Time Deposit) (৩) সঞ্চয় আমানত (Savings Deposit)।

চলতি বা তলবী আমানত (Current or Demand Deposit) : ব্যাঙ্কের আমানতের মধ্যে যে আমানত তলবমাত্রই দেয় তাহাই চলতি বা তলবী আমানত। যে কোনও ব্যক্তির তলবী আমানত হিসাব ও মিয়াদী আমানত হিসাব থাকিতে পারে। তলবী বা চলতি আমানত হিসাব হইতে

১। চলতি আমানত একই দিনে যতবার খুলী চেক দ্বারা অর্থ তুলিয়া আনা যায়। চলতি আমানত হিসাব রাখিতে ব্যাঙ্কে বহু লেনদেন তুহিকা প্রদর্শিত করিতে হয়। চলতি আমানত হিসাবে আমানতকারীর পাওনা প্রতি

মুহূর্তেই পরিবর্তন হইতে পারে। কারণ, মনে কর মন্ডলের সহিত লেনদেন খুব প্রচুর। হয়ত একই দিনে ১০০ খানা চেক জমা পড়ে আবার ৭০/৮০ খানা চেক কাটিয়া অর্থ তোলা হয়। ফলে যখনই একখানা চেকের অর্থ জমা হয় তখনই আমানতকারীর পাওনা বাড়ে, আবার যে-মুহূর্তে একখানা চেকে অর্থ তোলা হয়—সেই মুহূর্তেই পাওনা কমে। সুতরাং চলতি হিসাবে প্রত্যেকটি জমা ও উত্তোলন প্রতি মুহূর্তেই প্রবিষ্টি (Entry) করিতে হয়। নচেৎ মন্ডল যদি ভুল করিয়া পাওনা অর্থের অধিক অর্থের জমা চেক কাটে এবং ব্যাঙ্কে যদি প্রতিটি লেনদেন সঙ্গে সঙ্গে প্রবিষ্টি না করে তাহা হইলে তাহারও ভুলক্রমে পাওনার অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করিয়া আমানতকারীর নিকট হইতে অর্থ ব্যবহারের ক্ষমতা নিজের হাতে লয় বলিয়া আমানতের উপর স্বদ দিতে হয়। তলবী আমানত তলব মাত্র ফেরত দিতে হয় বলিয়া ব্যাঙ্ক জানে না (এমনকি আমানতকারীও হয়ত অস্বপ্ন করিতে পারে না) কখন আমানত তুলিয়া নিবে। ব্যাঙ্কে তলবী আমানত ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই কারণে তলবী আমানতের উপর ব্যাঙ্ক প্রায়ই কোন স্বদ দেয় না। যদি বা দেয় স্বদের হার খুবই কম। কিন্তু তলবী আমানত হিসাবে যদি কখনও আমানতের অতিরিক্ত অর্থ তোলা হয় তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত তোলা অর্থের উপর ব্যাঙ্ক স্বদ লইয়া থাকে। ব্যাঙ্কসমূহকে সর্বদাই তলবী অর্থের এক শতকরা ভাগ নগদ হাতে রাখিতে হয়। কারণ, তলবী আমানত ফেরত দিতে কোন মুহূর্তে অপাবগ হইলে ব্যাঙ্কের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তুলিয়া লওয়ার হিড়িক পড়ে। ফলে ব্যাঙ্ক নষ্ট হইবে কারণ সুনাম ক্ষুণ্ণ না হইলে কখনও সকল আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তুলিতে চাহে না। সকল আমানতকারী আমানত তুলিতে চাহিলে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই একই সময়ে আমানত ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে আমানত আবার অন্তর্জ ধার দেয়। ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তোলার হিড়িককে 'Run on Bank' বলে। এই কারণে ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে সকল তপনীলব্ধ ব্যাঙ্ককে (Scheduled Bank) ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক Reserve Bank of Indiaতে তলবী ও মিয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ অর্থ সর্বদা জমা রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক নিজের তহবিলে দৈনিক তলবী আমানতের একাংশ মজুত রাখে।

মিয়াদী আমানত (Fixed অথবা Time Deposit) : মিয়াদী আমানত সাধারণত এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়, ৬ মাস, ১ বৎসর, ২ বৎসর ইত্যাদি। ঐ মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমানত তুলিয়া নেওয়ার অধিকার আমানতকারীর থাকে বটে তবে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমানত তুলিয়া নিলে

যে সময়ের জন্ত ব্যাঙ্কে আমানত ছিল সেই সময়ের জন্ত কোন হুদ দিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য নহে। কারণ, চুক্তি অনুসারে মিয়াদ উত্তীর্ণ না হইলে ২। মিয়াদী আমানত তোলায় আইনত অধিকার আমানতকারীর থাকে না। ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্ত আমানত রাখার অবধি হইল ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ধার দেওয়া। সুতরাং যে সময়ের জন্ত ধার দেওয়া হইয়াছিল সেই সময় উত্তীর্ণ না হইলে আমানতকারী হুদ দাবি করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মিয়াদী আমানত তুলিয়া নিতে হইলে আমানতকারীকে বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিতে হয়। আমানতকারী কবে আমানত তুলিয়া নিতে ইচ্ছুক তাহা জানাইয়া ব্যাঙ্কে বিজ্ঞপ্তি দিয়া থাকে।

মিয়াদী আমানতের উপর হুদ পাওয়া যায় এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য সকল প্রকার আমানতের মধ্যে মিয়াদী আমানতের উপর হুদের হার বেশী।

সঞ্চয় আমানত (Savings Deposit) : সঞ্চয় আমানত গ্রহণ বস্তুত ব্যাঙ্ক-সমূহ নিজেদের কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রথমে গণ্য করিত না। সঞ্চয় আমানত সরকারী প্রচেষ্টায় সরকারের ডাক বিভাগের একটি অংশ হিসাবে আরম্ভ করা হয়। উহাকে পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক (Postal Savings Bank) বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের ইহাতে সুবিধা হয় বলিয়া সরকার সাধারণের ৩। সঞ্চয় আমানত মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্ত পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রবর্তন করেন। পরে ব্যাঙ্কসমূহও সঞ্চয় আমানত (Savings Deposit) গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

সঞ্চয় আমানত তলবী আমানতের চেয়ে অধিক কাল ব্যাঙ্ক প্রয়োগ করিতে পারে। কারণ, সঞ্চয় আমানত তলবমাত্র দেয় নহে। সঞ্চয় আমানত হিসাব হইতে সপ্তাহে মাত্র একবারই অর্থ তোলা যায়।

সঞ্চয় আমানতের হুদের হার কম।

ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান (Lending by Bank) : ব্যাঙ্কের কর্তব্যের মধ্যে উহার মক্কেলদের অর্থ ধার দেওয়া একটি। ব্যাঙ্ক যখন মক্কেলকে ধার দেয় তখন আমানত বা প্রত্যাহুতি (Security) দাবি করে। যে সম্পদ ব্যাঙ্কের ঋণের জন্ত আমানত (Security) হিসাবে রাখা হয় মক্কেল সময় মত ঋণ ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান পরিশোধ না করিলে সেই আমানত ব্যাঙ্ক বিক্রয় করিয়া মক্কেলের ঋণ শোধ করিয়া লইতে পারে। যে দ্রব্য ব্যাঙ্কের নিকট আমানত হিসাবে রাখা হয় সেই দ্রব্য মক্কেলের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে সে আমানত গ্রহণ করা হয় না। মালিকানা স্বত্ব প্রমাণক দলিলপত্রাদি ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। মনে কর, জমি বন্ধক দিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে। সে-ক্ষেত্রে জমির মালিকানা স্বত্ব প্রমাণক দলিল ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে; নির্দিষ্ট দিনে ঋণ পরিশোধ না করিলে ব্যাঙ্কের মক্কেল

ক্রমিক বিক্রয় করার অধিকার থাকে। ব্যাঙ্ক দুইটি উপায়ে মজ্জলকে ঋণ দিতে পারে। প্রথম অধিবিকর্ষ বা বিনা জামানত ঋণ (Overdraft)। দ্বিতীয় ঋণ হিসাবের মাধ্যমে বা জামানতী ঋণ (Loan Account)।

অধিবিকর্ষ বা বিনা জামানত ঋণ (Overdraft) : সাধারণত ব্যাঙ্কে যে অর্থ জমা থাকে কখনও তাহার অধিক অর্থ ব্যাঙ্ক হইতে তোলা যায় না; কিন্তু ইচ্ছা করিলে ব্যাঙ্ক জমার অতিরিক্ত অর্থ তুলিয়া নেওয়ার অধিকার মজ্জলকে দিতে পারে। যদি ব্যাঙ্ক চলতি হিসাব হইতে অতিরিক্ত অর্থ তোলার

অধিকার দেয় তাহা হইলে উহাকে অধিবিকর্ষ (Overdraft)

বলে। অধিবিকর্ষ মজ্জল তখনই গ্রহণ করিবে যখন মজ্জল নিশ্চিত করিয়া বুঝিতে পারে না যে কবে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে অথবা আদৌ তাহার আমানতের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে কিনা। মনে কর, রঞ্জন অমুমান করিতেছে যে নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তাহার কতিপয় বিল (Bill) পরিশোধ করিতে হইবে কিন্তু নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিতেছে না কবে কত টাকা তাহার প্রয়োজন হইবে। আবার রঞ্জন মনে করিতেছে যে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে হয়ত তাহার পক্ষে বিল মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত আমানত ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া সম্ভব নাও হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে রঞ্জন তাহার ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিলে ব্যাঙ্ক তাহাকে দুইটি বিকল্প (Alternative) পন্থার নির্দেশ দিতে পারে। ব্যাঙ্ক বলিতে পারে যে, যে কোনও মুহূর্তে আপনাকে আমানতের অতিরিক্ত ৫০০০ টাকা তুলিয়া নেওয়ার অধিকার দেওয়া হইল। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কে আমানত সব তুলিয়া নেওয়ার পরও ৫০০০ টাকা মূল্যের চেকের অর্থ আপনাকে অগ্রিম তুলিয়ানিতে দেওয়া হইবে। এক্ষেত্রে রঞ্জন যে ৫০০০ টাকা পর্যন্তই আমানতের অতিরিক্ত চেক কাটিবে তাহা নহে। যদি প্রকৃতই রঞ্জনের অমুমান অমুখ্যায়ী বিল পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলেই চেক কাটিবে নচেৎ নহে। রঞ্জনের চলতি হিসাব হইতে অর্থ তোলা হইতেছে, হিসাবে আমানত করা হইতেছে, উভয়ের ব্যবধান যদি কখনও তোলার অমুতুল্যে যায়—অর্থাৎ আমানত ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে স্বতন্ত্র আমানতের অতিরিক্ত তোলা অর্থাৎ অধিবিকর্ষ রহিবে ততদিনের জন্যই নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হইবে। সুদও আমানত তুলিয়া নেওয়ার মতই তাহার হিসাবে দেনা (Debit) বলিয়া লেখা হইবে।

মজ্জল যেমন ব্যাঙ্কে আমানত ও ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া নেওয়া অর্থ ব্যাঙ্কের নামে হিসাবে লিখিবে, ব্যাঙ্কও তেমনি মজ্জলের সহিত লেন-দেন মজ্জলের নামের হিসাবে লিখিবে। ব্যাঙ্ক সপ্তাহান্তে কিংবা মাসান্তে মজ্জলের সহিত লেন-দেনের একটি বিবৃতি (Statement) মজ্জলের নিকট পাঠাইয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় ব্যাঙ্ক বিবৃতি (Bank Statement)। মজ্জল ব্যাঙ্ক বিবৃতির সহিত নিজের

ব্যাঙ্কের হিসাব রাখিয়াছে উহা মিলাইয়া দেখিবে যে সমস্ত লেন-দেন উভয় হিসাবে নিতুলভাবে প্রবিষ্টি করা হইয়াছে কিনা।

নিম্নে একখানি ব্যাঙ্ক বিবৃতি দেওয়া হইল উহার সাহায্যে অধিবিকর্ষ (Overdraft) কিভাবে লেখা হয় তাহা দেখান গেল।

হিসাবের বিবৃতি হইতে, (যাহা ব্যাঙ্ক প্রসাদ বসুকে পাঠাইয়া দিয়াছে) দেখা যাইতেছে যে ৩০শে নভেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে তাহার ২২৭ টাকা ৩০ ন. প. জমা রহিয়াছে। কিন্তু সকল লেন-দেন পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে ৭ই নভেম্বর তারিখে তাহার আমানত সম্পূর্ণই তুলিয়া নেওয়ার পরও ১০০ টাকা অতিরিক্ত তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। উহাই ঐ তারিখে অধিবিকর্ষ (Overdraft)। তেমনি ১২ই নভেম্বর তারিখে অধিবিকর্ষ ৩০০ টাকা, আর ২০শে নভেম্বর তারিখে অধিবিকর্ষ ২০০ টাকা, কিন্তু অধিবিকর্ষ শোধ হইয়া ৩০শে নভেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে তাহার জমা ২২৭ টাকা ৩০ ন. প.।

ব্যাঙ্ক বিবৃতি (Bank Statement)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্‌ কলেজ স্ট্রীট ব্রাঞ্চ

United Bank of India Ltd. (College Street Branch)

হিসাব নং চলতি নং ৮০০০ হিসাব/নাম শ্রী প্রসাদ বসু

Account No. Current No. 8000 Account/Name Sri Prosad Basu

তারিখ (Date)	বিবরণ (Particulars)	দেনা (Withdrawals)	পাওনা (Deposit)	পরিমাণ (Amount)	উদ্ধৃত্ত (Balance) Cr/Dr
১৯৬০		টাকা: নং: পয়সা:	টাকা: নং: পয়সা:	টাকা: নং: পয়সা:	
নভেম্বর ১	ইজা (B/F)			১০০০ ০০	পাওনা
নভেম্বর ৩	ধীরেশ চক্রবর্তী	৫০০ ০০		৫০০ ০০	পাওনা
নভেম্বর ৪	কেশবের বসু		২০০ ০০	১০০ ০০	পাওনা
নভেম্বর ৭	শান্তিলাল মুখার্জী	৮০০ ০০		১০০ ০০	দেনা
নভেম্বর ১২	অজেন্দ্রকুমার রায়	২০০ ০০		৩০০ ০০	দেনা
নভেম্বর ২৭	সুকুমার ঘোষ		১০০ ০০	২০০ ০০	দেনা
নভেম্বর ৩০	লোকরঞ্জন দাসগুপ্ত	৫০০		১০০ ০০	দেনা
নভেম্বর ৩০	নির্মলকুমার রায়		১০০০	৩০০ ০০	পাওনা
নভেম্বর ৩০	সুদ	৬৭		২৯৯ ৩৩	পাওনা
নভেম্বর ৩০	প্রভার (দক্ষিণা)	২ ০০		২৯৭ ৩৩	পাওনা

৩০শে নভেম্বর তারিখে প্রসাদ বসুর হিসাবে সুদ বাবদে ৬৭ ন.প. ও ব্যাঙ্ক প্রভার (দক্ষিণা) (Bank Charges) বাবদ ২ টাকা মোট ২ টাকা ৬৭ ন. প. দেনা দেখান

হইয়াছে। সুদ ৬৭ ন. প. অধিবিকর্ষের (Overdraft) উপর সুদ। মনে কর, অধিবিকর্ষের উপর বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়। তাহা হইলে অধিবিকর্ষের উপর সুদ হিসাব করা হইল—১০০ টাকা ৭ই নভেম্বর হইতে ১২ই নভেম্বর ৫ দিন, ৩০০ টাকা ১২ই নভেম্বর হইতে ২০শে নভেম্বর ৮ দিন, আর ২০০ টাকা ২০শে নভেম্বর হইতে ৩০শে নভেম্বর ১০ দিন। মোট ৫০০ টাকা ১ দিন ; ২৪০০ টাকা ১ দিন এবং ২০০০ টাকা ১ দিন ; মোট ৪২০০ টাকার উপর ১ দিনের বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হিসাবে সুদ $৪২০০ \times \frac{৫}{১০০} \times \frac{১}{৩৬৫} = ৬৭$ ন.প.।

ব্যাঙ্ক প্রভার (Bank Charges) : ব্যাঙ্ক মক্কেলকে যে সেবা (Service) দেয় তাহার জন্য ব্যাঙ্ক যে দক্ষিণা (মাশুল) দাবী করে উহাই ব্যাঙ্ক প্রভার। বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে ব্যাঙ্ক প্রভার কাটিয়া নেয়। ৩০শে নভেম্বর তাই ব্যাঙ্ক প্রভার বাবদ ২ টাকা দেনা হিসাবে কাটিয়া লইয়া হিসাব দেখাইয়াছে। মক্কেল প্রসাদ বহুর কর্তব্য ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লেন-দেনের সহিত নিজে যে লেন-দেন লিপিবদ্ধ করিয়াছে উহা মিলাইয়া দেখা। মক্কেল যদি স্থিরভাবে অনুমান করিতে না পারে যে তাহার কবে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা হইলেই মক্কেল অধিবিকর্ষ (Overdraft) লইবে। কারণ, যদি মক্কেলের প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে সে আমানতের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিবে না। কারণ, অধিবিকর্ষ ব্যবস্থা অস্থায়ী অর্থ তুলিলেই সুদ দিতে হইবে।

কিন্তু মক্কেল ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় পন্থাও গ্রহণ করিতে পারে। অধিবিকর্ষ ব্যবস্থা না করিয়া সে সরাসরি ঋণের আবেদন করিতে পারে এবং ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে। ঋণ দিলে অবশ্য দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে। ঋণদান

প্রথমত, যে ঋণ মঞ্জুর করা হইল সেই ঋণের অর্থ যদি মক্কেল নাও তুলিয়া নেয় তাহা হইলেও যে সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হইল সেই সময়ের জন্য সুদ দিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, ঋণের অর্থ এক কালে পরিশোধ করিবে কিংবা কিস্তিবদ্ধীতে দিবে তাহা ব্যাঙ্কের সহিত স্থির করিবে এবং চুক্তিবদ্ধ কিস্তিবদ্ধীতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক যখন ঋণ মঞ্জুর করিল তখনই মক্কেলের হিসাবে পাওনা বাবদ মঞ্জুরীকৃত ঋণ জমা হইল এবং মক্কেলের ঋণ পরিমাণ অর্থ তুলিয়া নেওয়ার অধিকার রহিল, যেন মক্কেল ঋণ পরিমাণ অর্থ আমানত (Deposit) করিল। সেইজন্যই ব্যাঙ্ক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে একথা বলা হয় (Loan creates Deposit)। ব্যাঙ্ক কিভাবে এই ঋণ হিসাবভুক্তি করিবে তাহা নীচে দেখান হইল। ব্যাঙ্কে ঋণের অর্থ দুইটি হিসাবে দেখাইতে হইবে। প্রথমত, মক্কেলের চলতি হিসাবে (Current Account) ঋণের অর্থ পাওনা (জমা—Credit) দেখাইবে এবং দ্বিতীয়ত, একটি

ঋণ হিসাবে দেনা (Debit) দেখাইবে। যখন ঋণের অর্থ তুলিয়া লইবে তখন অন্তান্ত লেন-দেনের মতই চলতি হিসাবে লেখা হয়। অর্থাৎ, বিবৃতিতে দেনা ব্যবদ লেখা হয়। দেনা হিসাবটি যেমন রহিল তেমনি রহিয়া গেল। দুইটি হিসাব পাশাপাশি দেখিলে কোনও সময়ে তাহার নীট বত ঋণ তাহা বুঝা যাইবে। মনে কর, প্রসাদ বসু ৫০০ টাকা অধিবিকর্ষের (Overdraft) ব্যবস্থা না করিয়া ৫০০ টাকা ঋণ গ্রহণের চুক্তি করিল। কিন্তু কোনও কারণে প্রসাদ বসু ঋণের অর্থ গ্রহণ না করিলেও তাহাকে স্তম্ভ দিতে হইবেই। এই কারণেই মক্কেল সাধারণত অধিবিকর্ষের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের বিবৃতি (Statement of Account)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া-লি:

United Bank of India Ltd.

হিসাব নং ৪০০৯৩

Account No. 40093

নাম - প্রসাদ বসু

Name—Prosad Basu

১৯৬০	বিবরণ (Particulars)	দেনা (Withdrawals)	জমা (Deposit)	উদ্ধৃত (Balance)	
				পরিমাণ (Amount)	দেনা পাওনা
নভেম্বর ১	ইজা			৩০০ ০০	পাওনা
নভেম্বর ১	ঋণ-হিসাব		৫০০	৮০০ ০০	,,
নভেম্বর ২	ধরণীধর দত্ত	১০০		৭০০ ০০	,,
নভেম্বর ৩	অমলেন্দু চ্যাটার্জী	১২০০		৫০০ ০০	দেনা
নভেম্বর ৭	মোঃ আবদুল লতিফ		২০০	৮০০ ০০	পাওনা

হিসাব ঋণ (প্রসাদ বসু)

(Loan A/c) Prosad Basu

দেনা (Dr)

পাওনা (Cr)

তারিখ	বিবরণ	খং নং	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	খং নং	পরিমাণ
১৯৬০	প্রতি						
নভেম্বর ১	চলতি হিসাব		৫০০				

উপরের দুইটি হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ১লা নভেম্বর তারিখে চলতি হিসাবে ৮০০ টাকা জমা আর ঋণ হিসাবে ৫০০ টাকা দেনা। কিন্তু ২রা নভেম্বর তারিখে পাওনা ৭০০ টাকা, ঋণ ৫০০ টাকা, মোট পাওনা

২০০ টাকা। -ই নভেম্বর তারিখে চলতি হিসাবে ৪০০ টাকা পাওনা আর ঋণ হিসাবে ৫০০ টাকা দেনা মোট ১০০ টাকা দেনা। এইভাবে চলতি হিসাবে পাওনা ও দেনা লিপিত হইতে থাকিবে। যখন চলতি হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা হইবে—যনে কর ৭ই নভেম্বর তারিখে পাওনা পাড়াইল ৭০০ টাকা—ইচ্ছা করিলে প্রসাদ বস্তু চলতি হিসাব হইতে ৫০০ টাকা ঋণ হিসাবে শোধ করিল; তাহা হইলে চলতি হিসাবে ২০০ টাকা পাওনা থাকিবে। অথবা যদি কিস্তিবন্দীতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে যেমন যেমন ঋণ শোধ হইতে থাকিবে তেমন তেমন ঋণ হিসাবে পাওনার (Credit) দিকে জমা করিবে এবং ব্যাঙ্ক উহার নগদান হিসাবকে দেনা (Debit) দেখাইবে। যখন ঋণ সম্পূর্ণই শোধ হইবে তখন আর ঋণ হিসাবে কোন দেনা থাকিবে না। অর্থাৎ উদ্ভূত থাকিবে শূন্য।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্ত্রবিধা : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেহেতু স্বল্পমিয়াদী এবং চলতি আমানত গ্রহণ করে সেই হেতু ইহা দীর্ঘমিয়াদী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ বা লম্বী করিতে পারে না। ইহার সাধারণত ৩ মাসের অন্ত্র কালের জন্য ঋণ দিয়া থাকে। তবে স্বল্প মিয়াদী লম্বীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) : বিনিময় ব্যাঙ্কের কার্যই হইল বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় ব্যাঙ্কের অবদান বথেষ্ট। রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যে লেনদেনের যোগসূত্র স্থাপন করে বৈদেশিক ব্যাঙ্ক। রপ্তানিকারক আমদানিকারকের আর্থিক সচ্ছলতা প্রমাণ দাবী করিলে আমদানিকারক বৈদেশিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রত্যয় পত্র (Letter of Credit) সংগ্রহ করে। প্রত্যয় পত্র সংগ্রহ করিতে বৈদেশিক ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দিতে হয়। ব্যাঙ্ক তখন আমদানি কারকের সচ্ছলতা প্রমাণক হিসাবে প্রত্যয় পত্র দেয়। সেই প্রত্যয় পত্র রপ্তানিকারকের নিকট পৌঁছিলে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট মাল প্রেরণ করে। কিন্তু মালের মূল্য বাবদ ব্যাঙ্কের উপর হুণ্ডি কাটে। বৈদেশিক ব্যাঙ্ক তখন মক্কেলের পক্ষে হুণ্ডি সাকরণ করে এবং আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করে।

কিন্তু আমদানিকারকের সচ্ছলতা সন্দেহে রপ্তানিকারক নিঃসন্দেহ হইলে বিনিময় পত্র বা হুণ্ডি (Bill of Exchange) সরাসরি আমদানিকারকের উপস্থিতিতে কাটে। বিনিময় পত্রের মাধ্যমেই প্রায় বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ সংঘটিত হয়। সুতরাং বিনিময় ব্যাঙ্ক বাজার হইতে বিনিময় পত্র ক্রয় করে। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই বিনিময়

২। বৈদেশিক
হুণ্ডি গ্রহণ

ব্যাঙ্ক মুনাফা আয় করে। বিনিময় পত্রের কার্য বৈদেশিক বাণিজ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীতও এক দেশ হইতে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হইলেও বিনিময় ব্যাঙ্কের সাহায্য লওয়া হয়। তারযোগে অর্থ হস্তান্তর (Telegraphic Transfer অথবা Cable Transfer) করিতে হইলে যে দেশে

অর্থ প্রেরণ করিতে হয় সেই দেশের কোন ব্যাঙ্কের উপর যে ৩। তারযোগে দেশ হইতে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় সেই দেশের কোনও ব্যাঙ্ক

বিদেশে অর্থ প্রেরণ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে নির্দেশ দেয়।

কিন্তু যে ব্যাঙ্কের বিদেশে শাখা অফিস অথবা প্রতিনিধি বা অভিকর্তা নাই তাহার

নির্দেশ অন্য কোন ব্যাঙ্ক মানিতে বাধ্য নহে। মনে কর, অমিত বসু ইংলণ্ডে

তাহার বন্ধু স্থমিত মিত্রকে ৫০০০ টাকা পাঠাইবে। টাকা ইংলণ্ডে আইনানুগ মুদ্রা

(Legal Tender) নহে। সুতরাং ৫০০০ টাকার সমান পাউণ্ড ষ্টার্লিং ইংলণ্ডে

স্থমিত মিত্রকে শোধ করিতে হইবে। সুতরাং অমিত বসুকে এমন কোনও ব্যাঙ্কের

সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে যে ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে স্থমিত মিত্রকে ৫০০০

টাকা মূল্যের পাউণ্ড ষ্টার্লিং দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে। মনে কর চার্টার্ড

ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে, অর্থাৎ, একটি বিনিময় ব্যাঙ্ক। অমিত বসু

চার্টার্ড ব্যাঙ্কে ৫০০০ টাকা জমা দিবে। যেদিনে টাকা প্রেরণ করা হইবে সেই

দিনে টাকা ও পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর বিনিময় হার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জানিয়া লইবে।

ধরা যাউক, বিনিময় হার ১ টাকা = ১ শি. ৬ পে. তাহা হইলে ৫০০০ টাকার

পরিবর্তে ৩৭৫ পাউণ্ড ষ্টার্লিং পাওয়া যাইবে। এখন ব্যাঙ্ক তারযোগে ইংলণ্ডস্থ

প্রতিনিধির নিকট স্থমিত মিত্রকে ৩৭৫ পাউণ্ড ষ্টার্লিং দেওয়ার নির্দেশ দিয়া তার

(Telegram বা Cable) প্রেরণ করিবে। তারের মাণ্ডল ও ব্যাঙ্কের দস্তরি

(Commission) বাবদ মনে করা যাউক অমিত বসুর নিকট হইতে ১০ টাকা

দাবি করা হইল। অমিত বসু ৫০১০ টাকা জমা দিলেই তাহার

৪। বিনিময় বন্ধু অতি সম্বরই ইংলণ্ডে বসিয়া ৩৭৫ পাউণ্ড ষ্টার্লিং পাইবে।

ব্যাঙ্কও আমানত প্রায় প্রত্যেক বিনিময় ব্যাঙ্কই বৈদেশিক মুদ্রার আদান-গ্রহণ করে

প্রদান ব্যতীত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করিয়া থাকে।

শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank): ভারতবর্ষে শিল্প ব্যাঙ্ক বলিতে

বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে-প্রকার ব্যাঙ্কে বুঝায় সে-প্রকার শিল্প ব্যাঙ্ক

শিল্প ব্যাঙ্ক নাই। তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতিপয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে

যাহারা শিল্প ব্যাঙ্কের কাজ করে। যেমন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স

কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation); স্টেট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

(State Finance Corporation), জাতীয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (National Industrial Development Corporation) ইত্যাদি। ভাবতে শিল্পব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা হয় ১৯০৭ সালে যখন জামসেদজী টাটা পিপলস্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক (Peoples Industrial Bank) নামে প্রথম একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে ব্যাঙ্ক বেগুদিন স্থায়ী হইল না।

শিল্প ব্যাঙ্কের কার্য **শিল্প ব্যাঙ্ক** নামেই ইহার কার্য সূচনা করে। যে সকল ব্যাঙ্ক শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তাহাকেই শিল্প ব্যাঙ্ক বলে।

শিল্প ব্যাঙ্কের কার্যের মধ্যে প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিয়া শিল্পকে সাহায্য কর। একথা আলোচনা করা হইয়াছে যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-সমূহ স্বল্পমেয়াদী আমানত গ্রহণ করে বলিয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়াই মাত্র শিল্পকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু শিল্প গঠনে প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহে শিল্প ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সাহায্য করে। শিল্প ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী আমানত গ্রহণ করে বলিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ব্যতীতও শিল্পের প্রারম্ভিক মূলধন যোগাইতে শিল্প ব্যাঙ্কের অবদানও অনস্বীকার্য। শিল্প ব্যাঙ্ক নবগঠিত শিল্পের অংশপত্র বিক্রয়ের ভার নিয়া থাকে। আবশ্যিকমত, শিল্পের অংশপত্র অবলম্বন করাও শিল্প ব্যাঙ্কের একটি কর্তব্য। আমাদের দেশে ইস্যুং হাউস (Issuing House) নাহি বলিয়া শিল্প ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

কিন্তু শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) গঠনে অসুবিধা এই যে শিল্প ব্যাঙ্কের মূলধন ও আমানত সম্পূর্ণই শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হয় অসুবিধা বলিয়া কোনও শিল্প দুর্ভাগ্যক্রমে নষ্ট হইয়া গেলে শিল্প ব্যাঙ্কও শিল্পের সহিত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে যে শিল্পে ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ ভাগ্য জড়িত করে সেই শিল্পের ভাগ্যের সহিত শিল্প ব্যাঙ্কের ভাগ্য জড়িত থাকে বলিয়াই শিল্পের ভাগ্য বিপর্যয় হইলেই শিল্প ব্যাঙ্কেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে।

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank) : ভারতবর্ষের কৃষক কখনও ঋণ মুক্ত থাকে না। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার যে সকল দোষ ত্রুটি দেখা যায় তাহার মধ্যে কৃষকদের ঋণভার অত্যন্ত। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অল্প দিন হইল প্রসার লাভ করিয়াছে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবহার আদৌ জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক উন্নতি হয় নাই। কৃষকদের ঋণ যোগায় গ্রামের মহাজনগণ। অতি উচ্চ হারে সুদ দিয়া মহাজনদের নিকট হইতে কৃষকদের ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অথচ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে না। কৃষকগণ

সাধারণত বপন কালেই ঋণ গ্রহণ করে এবং শস্ত উত্তোলন করিয়া (Harvest) উৎপাদিত শস্ত বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করে। অতরাং কৃষকগণ যে ঋণ গ্রহণ করে তাহা অন্তত ২ মাস কাল স্থায়ী হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণ আদায় করার জন্ত নয় মাসকাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে এমন জামানত (security) দাবী করে যাহা আবশ্যক বোধে ঋণের মিয়াদ কাল উত্তীর্ণ হইলেই বিক্রয় করা যায়। ক্ষেত্রেও যদি জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেওয়া হয় তাহা হইলেও গ্রামাঞ্চলে বন্ধকী জমি তদারক করা এবং মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও ঋণ পরিশোধ না হইলে জাম বিক্রয় করা এই সব অসুবিধার জন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কৃষকদের ঋণ দান করিতে অপারগ। অথচ কৃষকদের স্বল্প হুদে অর্থ সাহায্য বা ঋণ দান করিবার মত কোনও ব্যাঙ্ক না থাকিলে ভারতের কৃষকদের দুর্বস্থা দূর করা সম্ভব নহে। তাই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সৃষ্টি।

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেয়। বপন কালে ঋণ দিয়া শস্ত উত্তোলন হইলেই ঋণ আদায় করিয়া লয়। আবশ্যক বোধে ব্যাঙ্ক দাবী করে যে শস্ত ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্ক নিজ তত্ত্বাবধানে সেই শস্ত বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের পাওনা কাটিয়া লইয়া যাহা উদ্ধৃত থাকে, তাহা কৃষককে ফেরত দেয়। কিন্তু যদি শস্তের মূল্য ঋণের পরিমাণেব কম হয় তাহা হইলে জমি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় করে।

জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেয় বলিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় করিতে অসুবিধা বোধ করে না। জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেয় বলিয়া ঋণের ঝুঁকিও কম।

কৃষি ব্যাঙ্ক (Agricultural Bank) : কৃষকদের দুর্বস্থার বিষয় বিশেষ আলোচনা নিম্নোক্ত কারণ কৃষকদের দুর্বস্থা সর্ববাদী সম্মত। কৃষকদের নিকট অতি উচ্চ হারে হুদে দিয়াও মহাজন সম্ভুত হয় না। অসমুপায় অবলম্বন করিয়া

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাজন কৃষকদের জমি জমা, ঘর বাড়ী

কৃষি ব্যাঙ্ক নিলাম করিয়া লয়। তাই কৃষকদের স্বল্প হুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করিবার জন্ত কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। যাহাতে কৃষি ব্যাঙ্ক সাফল্য লাভ করে সেইজন্ত জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াও কৃষকদের দুর্বস্থা দূর করিতে পারা যায় নাই বলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (State Bank of India) রাষ্ট্রীয়করণ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা অফিস খুলিয়া কৃষকদের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প যেমন তাঁতী, কামার, কুমারদের অর্থ সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্ত স্টেট ব্যাঙ্কের ৪০০ শাখা-কাৰ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank) : গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে স্বাবলম্বীতা, সোহাগতা, সমিচ্ছা উৎসাহ করিবার জন্ত সমবায়

আন্দোলন ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের গোড়ার দিকে প্রথম সমবায় আইন (Co-operative Act) পাশ করিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে স্বল্প-স্বল্পে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। সমবায় ঋণ সমিতি গঠন করিয়া কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাহায্য করাই সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য।

সমবায় ব্যাঙ্কও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ দেয়। তবে সমবায় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত তলবী আমানত (Demand Deposit) গ্রহণ করে না। মিয়াদী আমানত (Time/Fixed Deposit) গ্রহণ করাই সমবায় ব্যাঙ্কের কার্য।

আমানত ব্যতীত, সমবায় ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) দ্বারা উহার মজেলদের অর্থ ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত যে কেহই ইচ্ছা করিলে সমবায় ব্যাঙ্কের সদস্য হইতে পারে না। নির্দিষ্ট এলাকার নিবাসী না হইলে এবং সমবায় ব্যাঙ্কের অন্তত ২ জন সদস্য কর্তৃক পরিচিত না হইলে কেহ সমবায় ব্যাঙ্কের সদস্য হইতে পারে না।

আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানত ব্যতীতও প্রয়োজনবোধে সমবায় ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। সমবায় ব্যাঙ্কের প্রসারকল্পে এবং জন-প্রিয়তা গঠনকল্পে সরকারও মুক্ত হস্তে সমবায় ব্যাঙ্ককে ঋণ দান করে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াও উহার সদস্যদের প্রয়োজনবোধে ঋণ দেওয়া হয়।

সমবায় ব্যাঙ্ক সমবায় আইনানুসারে স্বদের হারের অধিক স্বদ গ্রহণ করিতে পারে না। তাই সমবায় ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

সমবায় ব্যাঙ্ক সর্বদাই চেষ্টা করে যাহাতে ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয় খুব কম থাকে। কারণ যদি ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয় খুব বেশী হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের সদস্যদের লাভাংশের হার কমিয়া যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই সদস্য নিজেদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছায় ব্যাঙ্কের কার্যভার গ্রহণ করে। খুব কমসংখ্যক কর্মচারী লইয়া সমবায় ব্যাঙ্ক চালিত হয়।

কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্ক যে মুনাফা আয় করে তাহা সম্পূর্ণই লাভাংশ হিসাবে বিতরণ করিতে পারে না। মোট মুনাফার এক-চতুর্থাংশ সঞ্চিতি (Reserve) হিসাবে জমা রাখিতে হয় এবং যতদিন সঞ্চিতি হিসাবে জমা অর্থ আদায়ীকৃত মূলধনের সমান না হয় ততদিনই সঞ্চিতি ঋণে মুনাফার এক-চতুর্থাংশ করিয়া জমা রাখিতে হয়।

সমবায় ঋণ ব্যাঙ্ক সকল ক্ষেত্রে বিবেচনার সহিত ঋণ দিতে পারে নাই। কারণ ঋণ দান করিবার যে সকল বিধি রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরাতন ঋণ পরিশোধ, স্থায়ী সম্পদ অধিকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে, ব্যাঙ্কের

সদস্য অনান ২ জনকে জামানত হিসাবে দাঁড় করাইতে হয়। তাই যখনই অর্থের প্রয়োজন হয় তখনই পুঁজাতন ঋণ পরিশোধ করার নামে ঋণ গ্রহণ করা হয়। আবার নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ব্যাঙ্কের লেনদেন সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া অঞ্চলের সকলেই সকলের পরিচিত। তাই যখন কোন সদস্য অপর কোন সদস্যকে জামানত হিসাবে দাঁড়াইতে অস্বীকার করে তখন কেহ সেই অস্বীকার এড়াইতে পারে না। সমবায় ঋণ সমিতির আর্থিক সচ্ছলতা অসুসারে এ, বি, সি, ডি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ঋণ সমবায় সমিতির মধ্যে ডি শ্রেণীর ব্যাঙ্কই সর্বাধিক।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (Reserve Bank of India) : প্রত্যেক দেশেই একটি ব্যাঙ্ক থাকে যাহার হাতে অগ্ৰাণ্য সকল ব্যাঙ্কের কারবার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকে। সেই ব্যাঙ্ককে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া গঠিত হয় ১৯৩৫ সালে। অগ্ৰাণ্য ব্যাঙ্কের মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সদস্যদের নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া প্রারম্ভিক মূলধন সংস্থান করিয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য করিতে আরম্ভ করে। উহার পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (Imperial Bank of India) সম্পাদন করিত। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (State Bank of India) নামে অভিহিত। উহা বর্তমানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক (State-owned Bank)।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ামক হিসাবেই কার্য করে না, ভারতের টাকার বাজারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যের মধ্যে নোট ছাপাইবার একাধিকার অগ্রতম। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গোড়ার কথাই বলা হইয়াছে যে স্বর্ণকার ও মণিকারগণ আমানত গচ্ছিত রাখিয়া যে রসিদ দিত উহাই নোট হিসাবে চলিত। ফলে প্রত্যেক স্বর্ণকার বা মণিকারেরই নোট চালু করার অধিকার ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ক্রটি বুঝিতে পারা গেল। অর্থাৎ, অনেক স্বর্ণকার আমানতের অতিরিক্ত নোট চালু করিতে লাগিল। ১। নোট ছাপান ফলে যখন সেই নোট ভাঙাইবার প্রয়োজন হইত তখন সেই নোটের পরিবর্তে আর চলতি মুদ্রা পাওয়া যাইত না। এইভাবে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ফেল পড়িতে লাগিল এবং আমানতকারীদের আমানত নষ্ট হইয়া গেল। এই কারণেই নোট ছাপাইবার এবং নোট চালু করিবার সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে দেওয়া হয়। কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড (Bank of England) ১৬৯৪ সালে গঠন করা

হয়। কিন্তু নতুন আইন পান.করিয়া বর্তমান ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের জন্ম হয় ১৮৪৭ সালে। ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া গঠিত হইবার পূর্বে ভারত সরকারের পক্ষে নোট ছাপাইবার অধিকার ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার হাতে।

১৯০৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া আইনে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হইল তাহার কাৰ্যাবলী ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের অনুকরণেই করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department) অপরটি ইস্যু বিভাগ (Issue Department)। ব্যাঙ্কিং বিভাগের কাৰ্য অন্তান্ত্র ব্যাঙ্কের মতই অর্থের আদান প্রদান লেনদেন ইত্যাদি করা। আর ইস্যু বিভাগের কাৰ্য নোট প্রচলন, নিয়ন্ত্রণ করা, চলতি মুদ্রা টক্কণ করা, ইত্যাদি। উল্লেখ করিবার বিষয় এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অন্তান্ত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে না বা উহার মুক্কলকে ঋণ দান করে না। নোট ছাপান ও মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় তাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয়ত, নোট প্রচলন ও মুদ্রা টক্কণ ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাৰ্য করে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ, ঋণ শোধ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া করিয়া থাকে।

২। সরকারের
ব্যাঙ্ক

ভারত সরকার অথবা রাজ্য সরকার প্রত্যর্পণত্র (Treasury Certificates) বিক্রয় করিয়া যে ঋণ গ্রহণ করে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ায় জমা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পাওনাদারদের ঋণ শোধ করে। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ঐ জমা হইতেই চেক কাটিয়া অর্থ তুলিয়া নেয়। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাহার মক্কলের পক্ষে যে কাৰ্য করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের পক্ষে সেই কাৰ্যই করিয়া থাকে। সেইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়াকে সরকারের ব্যাঙ্ক বলে।

তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবেও কাৰ্য করে।

৩। ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনও খুব অধিক হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Bank) ও অতপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক (Non-Scheduled Bank)। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কাৰ্য তদারক করার সম্পূর্ণ দায়িত্বই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার। তপশীলভুক্ত হইলে ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনেক সুবিধা পায়। তপশীলভুক্ত না হইলে কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া

হইতে কোনরূপ ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না। তপশীলভুক্ত হইতে হইলে ব্যাঙ্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘরে উহার তলবী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ এবং দীর্ঘমিয়ারী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ইচ্ছা করিলে সঞ্চিতির পরিমাণ মোট তলবী আমানতের মিমাদী আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত রাখিবার নির্দেশ দিতে পারে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের নিকাশী ঘর (Clearing House) হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কার্য করে। দ্বিতীয়ত, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের অর্ধের প্রয়োজন হইলে প্রথম শ্রেণীর বিনিময়পত্র পুনর্বাট্টা করিয়া (Rediscount) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর বিনিময়পত্র বলিতে সেই বিনিময়পত্রকেই বুঝায় যাহাতে দুইজন ব্যবসায়ীর স্বীকৃতি থাকে এবং যাহার মিমাদকাল ৩ মাসের অন্তর্গত।

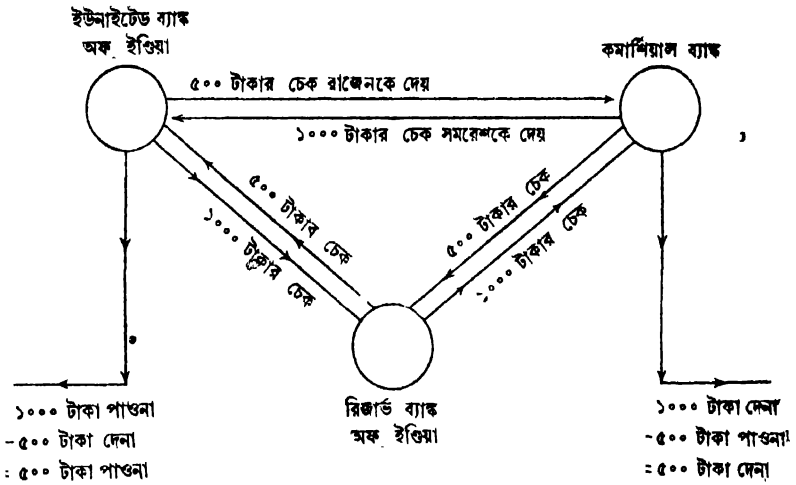
নিকাশী ঘর (Clearing House) হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া আন্ত-বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের লেনদেন (Inter Commercial Bank Transaction)

স্থির করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। রাজেন সমরেশকে

৪। নিকাশী ঘর ১০০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়া ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের উপর একখানা চেক কাটিল। বেণুতোষ খগেনকে ৫০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার উপর একখানা চেক কাটিল। ধরা যাউক সমরেশ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার মজ্জেল এবং খগেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মজ্জেল। তাহা হইলে সমরেশ যে চেকখানা পাইয়াছে তাহা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় আদায়ের জগ্ন জমা দিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চেকে লিখিত ১০০০ টাকা আদায় করিয়া সমরেশের হিসাবে পাওনা হিসাবে জমা (Credit) করিবে। অনুরূপভাবে খগেন তাহার চেকখানা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিলে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে চেকে লিখিত ৫০০ টাকা আদায় করিয়া খগেনের হিসাবে পাওনা জমা করিবে (Credit)। দুই ব্যাঙ্কের মধ্যে দেনা পাওনা কাটাকাটি (Set off) করিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ৫০০ টাকা পাওনাদার। নিকাশী ব্যবসায় কাটাকাটির ব্যবস্থাই হয়। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে ১০০০ টাকা এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে ৫০০ টাকা পৃথক ভাবে দিতে হয় না। উভয়ের চেকই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে পাঠান হইবে। সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া দৈনিক গতিয়ান করিয়া দেখিবে কোন্ ব্যাঙ্কের কত নীট পাওনা ও কোন্ ব্যাঙ্কের কত নীট দেনা। দেনা পাওনা হিসাব করিয়া যে ব্যাঙ্কের নীট পাওনা পাড়ায় সেই ব্যাঙ্কের হিসাবে পাওনা লিখিয়া যে ব্যাঙ্কের নীট দেনা সেই ব্যাঙ্কে দেনা লিখিয়া রাখে। প্রতিদিন নগদ দেনা পাওনা পরিশোধ করার আবশ্যক হয় না।

হিসাবে দেনা পাওনা লিখিয়া রাখা হয়। আবার পরবর্তী দিবসে পুনরায় দেনা পাওনা হিসাব করা হয়। হয়ত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অল্প পাওনাদার আগামী কলা হয়ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক পাওনাদার হইবে। এইভাবে পূর্বদিনের ইজার সহিত দিনের দেনা পাওনা হিসাব করিয়া সেই দিনের দেনা পাওনা স্থির করা হয়।

নিকাশী ব্যবস্থা



রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এই তারিখে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াকে ৫০০ টাকা পাওনা ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে ৫০০ টাকা দেনা লিখিয়া রাখিবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কও নগদ টাকা দিবে না। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কও নগদ টাকা পাইবে না। কিন্তু যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকাশী ঘরে উভয় ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশ হইল, তখন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সমরেশকে দেয় ১০০০ টাকার চেকখানা সেই ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিবে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক রাজেনের হিসাবে ১০০০ টাকা দেনা ভুক্তি করিবে। অর্থাৎ রাজেনের আমানত ১০০০ টাকা কমিয়া যাইবে। অহরুপভাবে খগেনকে দেয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ৫০০ টাকার চেক সেই ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া হইবে এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বেগুতোষের হিসাবে দেনাভুক্তি করিয়া রাখিবে। ফলে বেগুতোষের আমানত ৫০০ টাকা কমিয়া যাইবে।

নিকাশী ঘরে চেক পাঠান হইলে সেখানে সকল ব্যাঙ্কের একজন করিয়া কর্মচারীকে উপস্থিত থাকিতে হয়। কর্মচারীদের উপস্থিতিতে চেকসমূহের নিকাশ

হয়। নিকাশী ঘরে হিসাব হইলে চেক লেখকের (আমানতকারীর) ব্যাঙ্কে চেক ফেরত গেলে যদি দেখা যায় সে আমানতকারী চেক লেখকের হিসাবে চেকের মূল্য পরিমিত অর্থ নাই তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই অপর ব্যাঙ্কে (আদায়কারী ব্যাঙ্ক) (Collecting Bank) বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানাইতে হয় এবং সে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী ব্যাঙ্ক (Paying Bank) আবশ্যকীয় পস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

নিকাশী ব্যবস্থা না থাকিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াকে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ১০০০ টাকার চেক সেই ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া আদায় করিতে হইত, আর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে ৫০০ টাকার চেকখানা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিতে হইত। কিন্তু নিকাশী ব্যবস্থা থানার ফলে কোন ব্যাঙ্কেই নগদ অর্থ দিতে হইল না।

যে নিকাশী বিবৃতি নিকাশী ঘর তৈরার করিয়া থাকে তাহার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

ব্যাঙ্কের নাম	পাওনা			মোট	দেনা			মোট	নোট	
	ই: ব্যা: ই: লি:	ই: ক: ব্যা: লি:	ব্যা: ই:	পাওনা	ই: ব্যা: ই: লি:	ই: ক: ব্যাঙ্ক	ব্যা: ই:	দেনা	পাওনা	দেনা
ই: ব্যা:	—	৫০০	১০০	৬০০	—	৩০০	৪০০	৭০০	০	১০০
ই: ক: ব্যা:	৩০০	—	৭০০	১০০০	৫০০	—	৩০০	৮০০	২০০	০
ব্যা: ই:	৪০০	৩০০	—	৭০০	১০০	৭০০	—	৮০০	০	১০০
	৭০০	৮০০	৮০০	২৩০০	৬০০	১০০	৭০০	২৩০০	৩০০	২০০

উপরের নিকাশী বিবৃতি হইতে দেখিতে পাইবে যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে মোট ৬০০ টাকা পাইবে এবং ঐ দুইটি ব্যাঙ্কে ৭০০ টাকা দিবে। দেনা পাওনা হিসাব করিলে উহার ১০০ টাকা নীট দেনা। সেইরূপ ভাবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অপর দুইটি ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করিয়া নীট ২০০ টাকা পাইবে এবং ব্যাঙ্ক অফ

ইণ্ডিয়ার নীট দেনা ১০০ টাকা। তাহা হইলে তিনটি ব্যাঙ্কের মোট দেনা পাওনা হিসাব করিলে ই: ক: ব্যা: ২০০ টাকা পাওনাদার আর ই: ব্যা: ই: ও ব্যা: ই: প্রত্যেকে ১০০ টাকা দেনাদার। মোট দেনা মোট পাওনার সমান। কোন ব্যাঙ্কেই নগদ অর্থ দিতে হইবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া

ই: ব্যা: ই: ১০০ দেনা

ব্যা: ই: ১০০ দেনা

ই: ক: ব্যা: ২০০ পাওনা

এইভাবে হিসাব ভুক্তি করিয়া রাখিবে। পরবর্তী দিবসে পুনরায় হিসাব বিবৃতি তৈয়ার করিয়া দেনা পাওনা চলিতে থাকিবে।

পঞ্চমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া অন্তরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মত দেশের ঋণ ব্যবস্থা (Credit System) নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ঋণের পারমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্যাবস্থা (stability) আনয়ন করা হয়। ঋণের গতি

এবং পরিমাণ বাড়িয়া গেলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। মুদ্রার গতিশীলতা (Velocity) মূল্য নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়ক হয়। ঋণের পরিমাণ বাড়াইলে মুদ্রার গতিশীলতা (Velocity) বাড়ে। সুতরাং দ্রব্যের পারমাণ সমপরিমাণে না বাড়িলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আবার বাজারে অভাব দেখা দিলেও প্রয়োজন মত অর্থ না ছাড়িলে মন্দাভাব (Depression) দেখা দিতে পারে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব খুবই অধিক।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পন্থার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate); সরাসরি ক্রয় বিক্রয় (Open Market Operations); সঞ্চিতি অনুপাত (Reserve Ratio); বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control); এবং নৈতিক প্রভাব (Moral Suasion) উল্লেখযোগ্য।

ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণে একটি অঙ্গস্বরূপ। ব্যাঙ্কের হার বলিতে পুনর্বাটাকরণে (Rediscount) স্বদের হারকে বুঝায়।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সকলকে বিনিময় পত্র (Bill of Exchange) ঋণ নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ ভাড়াইয়া ধার দেয়। মনে কর জ্যোতি মতির স্বীকৃত (Accepted) ৫০০ টাকা মূল্যের তিন মাসের জন্য একখানা বিনিময় পত্র পাইয়াছে।

কিন্তু ৩ মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইচ্ছা করিলে জ্যোতি ঐ ১। ব্যাঙ্কের হার বিনিময় পত্রখানা ভাড়াইয়া অর্থ ধার করিতে পারে। ঐ বিনিময়

পত্রের পিছনে সহি করিয়া তাহার ব্যাঙ্কে দিলে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে (মনে কর শতকরা ৩ টাকা হারে) স্বদ কাটিয়া রাখিয়া জ্যোতিকে বিনিময় পত্রের মূল্য দিল। স্বদ = $৫০০ \times \frac{৩}{১০০} \times \frac{৩}{১২} = ৩৭.৫$ টাকা। জ্যোতি নগদ ৫০০ টাকা - ৩৭.৫ টাকা = ৪৬২.৫ টাকা পাইল। কিন্তু ব্যাঙ্কের যদি ইতিমধ্যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা

হইলে ব্যাঙ্ক ঐ বিনিময় পত্রখানা পুনর্বাট্টা করিয়া (Rediscount) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিতে পারে। মনে করা যাউক বিনিময়পত্র পরিমার্জনের দিনের এখনও ২ মাস বাকি আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে পুনর্বাট্টা করিয়া ঋণ পাইলে ব্যাঙ্ক আবার সেই অর্থ তাহার মজুতদের মধ্যে ঋণ দিতে পারে। অর্থাৎ উহার ঋণ দানের ক্ষমতা বাড়ে। অবশ্য দুইটি অবস্থায় ইহা সম্ভব।

প্রথমত, ব্যাঙ্কটিকে তপশীলভুক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যদি পুনর্বাট্টার হার মূল বাট্টার হারের কম হয় তাহা হইলেই ব্যাঙ্কের লাভ হইবে এবং ব্যাঙ্ক ধার করিয়া পুনরায় ধার দিতে রাজী হইবে। সুতরাং ব্যাঙ্কের হার বাড়াইয়া ব্যাঙ্ককে ঋণ গ্রহণে বিরত করিতে পারে। আবার যদি বাজারে ঋণ বাড়াইতে চায় তাহা হইলে পুনর্বাট্টার হার কমাইয়া দেওয়া হয়। পুনর্বাট্টা হারেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাজারে ঋণের হার স্থির হয়।

পুনর্বাট্টার হার বা ব্যাঙ্কের হার বাড়াইয়া ঋণসঙ্কোচ করা এবং কমাইয়া ঋণের প্রসার করা সম্ভব তাহা দেখা গেল। কিন্তু দেশের টাকার বাজার যদি সুব্যবস্থিত না হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের হার কার্যকরী হয় না। ভারতবর্ষের টাকার বাজার খুবই অব্যবস্থিত (Disorganised)। ব্যাঙ্ক বাদ দিয়াও বাহিরে ঋণ লেন দেন হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের হার খুব কার্যকরী হয় না। বিশেষত, মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায় ব্যাঙ্কের হার কার্যকরী হয় না বলিয়া দ্বিতীয় পন্থা—সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়—অবলম্বন করা হয়।

সরাসরি ক্রয় বিক্রয় (Open market operation) : দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাজার হইতে প্রত্যর্পণ ক্রয় বিক্রয়কে বুঝায়। অর্থনৈতিক অবস্থায় যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করে যে বাজার হইতে ঋণদানযোগ্য মুদ্রা তুলিয়া লওয়া আবশ্যিক, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে খর্ব করা প্রয়োজন তাহা হইলে বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে অর্থ তুলিয়া লয়। আবার যদি মনে করে যে বাজারে অর্থের প্রয়োজন তাহা হইলে বাজার হইতে প্রত্যর্পণ ক্রয় করিয়া বাজারে অর্থের প্রচলন বাড়াইয়া দেয়।

সঞ্চিতি অনুপাত (Reserve Ratio) : পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কে বাধ্যতামূলক ভাবে চলতি আমানতের শতকরা ৩ ভাগ এবং মিয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত ভাবে জমা রাখিতে হয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে বাজারে অর্থের প্রচলন কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সঞ্চিতির অনুপাত বাড়াইয়া দিতে পারে। ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া সংশোধন আইন অনুসারে কোন এক দিনের ব্যাঙ্কের আমানতকে স্বাভাবিক আমানত ধরিয়া তাহার অতিরিক্ত আমানতের উপর সঞ্চিতির অনুপাত বাড়াইতে পারে।

পারে। অতিরিক্ত আমানতের উপর যে হারেই সঞ্চিতি অল্পপাত বাড়ান হউক না কেন, সর্বাধিক সঞ্চিতি অল্পপাত মোট তলবী এবং মিয়াদী উভয় আমানতের শতকরা ১৫ ভাগের অধিক হইতে পারে না। যখন বাজার হইতে অর্থ তুলিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সঞ্চিতি অল্পপাত উক্ত পরিমাণ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যায়। আবার বাজারে যদি অর্থের প্রচলন বাড়াইতে হয় তাহা হইলে সঞ্চিতি অল্পপাত ঐ শতকরা ৩ ভাগ পর্যন্ত কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

• **বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) :** বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে গুণমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণও (Qualitative Credit Control)

বলা হয়। ইহাতে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস পায়। যে সকল আর্থিক কার্যের জন্য ঋণ দান করিলে সামগ্রিক উপকারেব সম্ভাবনা কম, সেগুলি ঋণ দান হইতে বিরত করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য। এই পদ্ধতি নেতিবাচক (Negative)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তৎকালীন আর্থিক অবস্থায় ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া খাত-শস্ত্রাদির জামানতে ব্যাঙ্কের দানন দেওয়া বন্ধ কবা হয়। কারণ খাত-শস্ত্রাদির জামানতে ব্যাঙ্কের দাননের ফলে ঐ সকল শস্ত্রের বাজারে ফটকাবাজীর পরিসর বাড়িয়া গিয়াছিল এবং খাত-শস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহাতে ফটকাবাজীর ফলে খাত-শস্ত্রের মূল্য আরও না বাড়ে সেইজন্যই বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা খাত-শস্ত্রের জামানতে ব্যাঙ্কে দানন বন্ধ করিয়াছিল।

নৈতিক প্রভাব (Moral Suasion) : নৈতিক প্রভাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন নিবেদনের মত। ইহাতে সভা ও অধিবেশনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অধিকর্তাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে কর্মচারী দেশের আর্থিক অবস্থায় ঋণ কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত সে বিষয় পরামর্শ দান ও ওয়াকিবহাল করে। নৈতিক প্রভাবের ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সহযোগিতাব পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারতীয় মুদ্রা মূল্যস্থান করণের অব্যবহিত পরেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সর্বাধিনায়ক গভর্নর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের উদ্দেশ্যে কর্মচারী-

দের এক অধিবেশনে আহ্বান করিয়া তাহাদের অল্পরোধ
৪। নৈতিক প্রভাব করিয়াছিলেন যে ফটকাবাজী বাড়িতে পারে এমন কোনও ঋণ যেন দেওয়া না হয়। আবার ১৯৫৭ সালের জুন মাসে পুনরায় এক সম্মেলনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে অল্পবোধ করিয়াছিলেন যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ যে দানন বা ঋণ দেয় উহার মোট পরিমাণ কমাটয়া দেওয়া হউক, কিন্তু ঋণ নিয়ন্ত্রণের ফলে যাহাতে শিল্প সমৃদ্ধি ঋণ পাইতে অল্পবিধা বোধ না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে অল্পরোধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমান হউক, কিন্তু

শিল্পক্ষেত্র যেন ঋণ নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্প ব্যাহত না হয়। এই প্রকার আবেদন ও সহযোগিতার আহ্বান দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে ঋণ নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করাই নৈতিক প্রভাব (Moral Suasion)। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সহযোগিতা না করিলে নৈতিক প্রভাব পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে।

মুদ্রার মূল্য মানের বা বিনিময় হারের স্থিতিকরণ (Stabilisation of Foreign Exchange Rates) : মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির না থাকিলে তাহার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও দেখা দেয়। বিনিময় হার প্রতিকূল হইলে সমপরিমাণ দ্রব্য আমদানি করিতে বিদেশী ব্যবসায়ীকে অধিক মূল্য দিতে হয়। ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থের চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়িলে অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইতে বাণিজ্যী মুদ্রা (Paper Money) ছাপাইতে হয়। ফলে সেই বাণিজ্যী মুদ্রা দেশের বাজারেই চলিতে থাকে এবং দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে আবার মজুদী বৃদ্ধির দাবী পড়ে। মুদ্রার বিনিময় বাড়ে। মজুদী বৃদ্ধি করিতে হইলে আবার অতিরিক্ত অর্থের দাবী স্থিতিকরণ চাহিদা হয়। আবার অর্থের প্রচলন বাড়ে এবং মূল্য বাড়ে। এই ভূট চক্রের (Vicious Circle) হাত হইতে আর্থিক অকল্যাণে মূক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই চেষ্টা করে আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের (Balance of Payments) সমতা বিধান করিতে। বৈদেশিক মুদ্রার সহিত নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা বৈদেশিক বিনিময় পত্র ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা করিয়া থাকে। অর্থাৎ আবশ্যক বোধে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে উহা অবাঞ্ছিত পথে ব্যবহার না হয়। বর্তমান সময়ে ভারতের বাণিজ্য উদ্ভূত প্রতিকূল বলিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাহাতে কার্যকরী হয় তৎসমূহ অনমনীয় মুদ্রা এলাকা (Hard Currency Area) হইতে যে মুদ্রা আয় করা হয় তাহা ভারত সরকারের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অল্পমতি ব্যতীত ব্যয় করা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে ব্যয় না হয় এবং সরকারের আমদানি রপ্তানি নীতি অনুমোদিত দ্রব্য আমদানিতেই যাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তাহার ব্যবস্থাপনার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে।

কৃষি ঋণ (Agricultural Credit) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া : কৃষকদের মহাজন ও হুদখোরদের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ঋণ দান সমিতির অবদান পূর্বে আলোচনা ৬। কৃষি ঋণ কর হইয়াছে। এতদসঙ্গেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াও কৃষি ঋণে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া-এর সবাসরি কৃষকদের দ্বারা দিবার অধিকার নাই। রাজ্য সমবায় সমিতির (State Co-operative Society) মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কৃষকদের কৃষি উন্নতির জন্য ঋণ

দিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কৃষি ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) বলিয়া একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্মচারীগণ রাজ্য সমবায় সমিতির সহিত যোগস্বত্ব স্থাপন করিয়া কৃষকদের ঋণ দানের নীতি গ্রহণ করে।

• **ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ (Control and Supervision of Bank) :** ভারতের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার রিজার্ভ

ব্যাঙ্কের। কোনও ব্যাঙ্ক আরম্ভ করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার হইতে অনুজ্ঞা (Licence) লইতে হয়। কোনও ব্যাঙ্ক উহার উপর নির্দেশ ও প্রধান প্রধান কাযালয় যে বাজ্যে স্থিত তাহার বাহিরে কোন নিয়ন্ত্রণ রাজ্যে শাখা খুলিতে ইচ্ছা করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মত মূলধন ও সঞ্চিতি বক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখনই ইচ্ছা করিলে তখনই যে কোন ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করিতে পারে। কোনও ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল মনে হইলে সেই ব্যাঙ্ককে অন্য কোনও সচ্ছল ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীকরণেব (Amalgamation) নির্দেশ দিতে পারে।

নোট ছাপাইবার নিয়ম (Rules regarding Note Issue) : নোট ছাপাইবার অধিকার একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কেবই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে নোট ছাপাইতে পারে না। কারণ যতক্ষণ কাগজী মুদ্রা বাজারে নোট ছাপাইবার বৈধ মুদ্রা হিসাবে (Legal Tender) গণ্য হইবে ততক্ষণ নিয়ম সরকারেব আর্থিক সচ্ছলতার উপর জনসাধারণের বিশ্বাস থাকে। কাগজী মুদ্রা দুই প্রকারেব হইতে পারে—পরিবর্তনীয় (Convertible) এবং অপরিবর্তনীয় (Inconvertible)।

পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দিলে কাগজী মুদ্রার মূল্যের ধাতব মুদ্রা দেওয়া হয়। লক্ষ্য করিলে দেখিবে ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১০০ টাকার নোটের উপর 'I promise to pay the bearer the sum of Rs... on demand from any office of issue' অর্থাৎ যে কোনও ইন্ডিয়া অফিস হইতে এই নোটের পরিবর্তে...টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলাম। পরিবর্তনীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় ঐ নোটের পরিবর্তে যে কোন ইন্ডিয়া অফিস হইতে নোটের সমান মূল্যের ধাতব মুদ্রা পাইতে পারে। মুদ্রামান যদি স্বর্ণের উপর ভিত্তি করিয়া হয় তাহা হইলে কাগজী মুদ্রায় লিখিত স্বর্ণ মুদ্রা পাইতে পারে। আর যদি রৌপ্য মান হয় তাহা হইলে নোটে লিখিত অঙ্ক ২, ৫, ১০, ১০০ পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা পাইতে পারে। কিন্তু, মুদ্রা ব্যবস্থা যদি অপরিবর্তনীয় (Inconvertible) হয় তাহা হইলে নোটের পরিবর্তে কোন ধাতব মুদ্রা দেওয়া হয় না। অপরিবর্তনীয় মুদ্রা ব্যবস্থাকে কাগজী মুদ্রামানও বলা হয়। ভারতের মুদ্রামান কাগজী মুদ্রামান। (Rupee printed on paper)। তাই ২, ৫, ১০, ১০০ টাকার নোটে যে প্রতিশ্রুতি থাকে

১ টাকার নোটে সে প্রতিশ্রুতি নাই। অর্থাৎ ১০০ টাকার নোটের পরিবর্তে প্রতিশ্রুতি অনুসারে যদি কেহ মূদ্রা দাবী করে তাহা হইলে ১ টাকার ১০০ খানা নোট দিলেই সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইল। এখন প্রশ্ন হইল যে জনসাধারণ কাগজী মূদ্রা বৈধ মূদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে কেন? গ্রহণ করে এই কারণে যে সাধারণের সরকারের উপর বিশ্বাস আছে। এইজন্য ভারতের মূদ্রা ব্যবস্থাকে প্রত্যয়ী মানও (Fiduciary Standard) বলা হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে উহার দুইটি বিভাগ আছে—ইস্যু বিভাগ (Issue Department) ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department)। ইস্যু বিভাগ নোট (কাগজী মূদ্রা) ছাপায় বটে, কিন্তু নোট প্রচলন হয় ব্যাঙ্কিং বিভাগের মাধ্যমে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (সংশোধন আইন) ১৯৫৭ অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যত মূল্যের কাগজী মূদ্রা ছাপাইবে তাহার পরিবর্তে স্বর্ণমূদ্রা (Gold Coins); স্বর্ণপিণ্ড (Bullion); বৈদেশিক প্রত্যয়পত্র (Foreign Securities); রোপ্যমূদ্রা (Rupee Coins); ভারত সরকারের প্রত্যয়পত্র (Government of India Securities) এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রহণ যোগ্য বিনিময়পত্র (Bills of Exchange and Promissory notes as are eligible for purchase by the Bank) রাখিতে হয়। কিন্তু এই সকল সম্পদের মধ্যে স্বর্ণমূদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড এবং বৈদেশিক বিনিময় পত্রের মূল্য অন্তর ২০০ কোটি টাকা মূল্যের হইবে এবং এ ২০০ কোটি টাকার মধ্যে অন্তর ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণমূদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড থাকিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে প্রতি সপ্তাহে ইস্যু বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগের পৃথক পৃথক উদ্ভূত পত্র (Balance Sheet) প্রকাশ করিতে হয়। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল যে উদ্ভূত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল উহার সাহায্যে মূদ্রা ছাপাইবার ও প্রচলনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা গেল।

ইস্যু বিভাগ (Issue Department)

দায় (Liabilities)

(কোটি টাকায়)

ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোট	৭'২
বাজারে চলতি নোট	১৬১২'৭
	১৬২৭'৬

সম্পদ (Assets)

(কোটি টাকায়)

ভারতে স্বর্ণমূদ্রা ও পিণ্ড	১১৭'৮
বিদেশে স্বর্ণমূদ্রা ও পিণ্ড	০'০
বৈদেশিক প্রত্যর্থ পত্র	২১৬'০
	৩৩৩'৮
রোপ্য মূদ্রা	১২৭'৬
ভারত সরকারের প্রত্যর্থ পত্র	
বিনিময়পত্র, ইত্যাদি	১১৬৬'২
	১৬২৭'৬

ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department)			
দায় (Liabilities)		সম্পদ (Assets)	
(কোটি টাকায়)		(কোটি টাকায়)	
মূলধন	৫০০	নোট	৭২০
সঞ্চিতি তহবিল	৮০০	রৌপ্য মুদ্রা	১০৩
অগ্রান্ত	৩৪৭.২	নিদর্শন মুদ্রা	১০২
	৪০২.২	অগ্রান্ত	৪২৪.২৫
			৪০২.২

ইহা বিভাগের উদ্ভূত পত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে ইহা বিভাগের মোট দায় সমস্তই নোটে। উহার মধ্যে ৭২ কোটি টাকার মূল্যের নোট ব্যাঙ্কিং বিভাগে রাখা হইয়াছে। আর ঐ ৭২ কোটি টাকার নোট ব্যাঙ্কিং বিভাগের সম্পদ হিসাবে দেখান হয়। মোট ১৬২৭.৬ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রত্যর্থ পত্র স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ডের মোট মূল্য ৩৩৩.৮ কোটি টাকা মূল্যের। অর্থাৎ প্রায় ৩৩% ভাগ। জুবার ব্যাঙ্কিং বিভাগের দায় ও সম্পদ বিবেচনা করিলে দেখিবে যে মোট দায়ের মধ্যে অংশপত্র ও সঞ্চিতি তহবিল বাদ দিলে বাহিরের দেনা ৩৪৭.২ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগে যে সম্পদ তাহার মধ্যে কোন স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণপিণ্ড নাই। বাহিরের দেনার মাত্র ২ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে।

যদি কখনও বাহিরের দেনা পরিশোধ করার দাবী বাড়ে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অগ্রান্ত সম্পদ বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থের সংস্থান করিবে।

ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে (Bank creates money) : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্য আলোচনা কালে এ কথা বলা হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের ধার আমানত তৈয়ার করে (Loan creates Deposit)। একই কথা ভিন্ন ভাবে বলা হয় ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে (Bank creates money)। ব্যাঙ্কের লেন দেন চেকে হয় বলিয়াই ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে। চেক অর্থ নহে কিন্তু চেক অর্থের কার্য করে। চেক গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে। চেক দাতার উপর চেক গ্রহীতার বিশ্বাস থাকিলেই চেকে লেন দেন সম্ভব। চেকে লেন দেনের পরিমাণও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। চেকের সুবিধা অসুবিধা পরে আলোচনা করা হইবে।

ব্যাঙ্ক কি উপায়ে অর্থ তৈয়ার করে তাহা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হইল।

মনে কর অজিত একটি মোটর গাড়ী ক্রয় করিবার জন্ত তাহার ব্যাঙ্কের নিকট ৫০০ টাকা ধার চাহিল। ব্যাঙ্ক তাহাকে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করিল। ধার মঞ্জুর করা হইলেই অজিতের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটার অধিকার ছিল। ব্যাঙ্ক তখন হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে যে প্রবিষ্টি দিবে তাহা নিম্নরূপ :

অজিতের হিসাব		মক্কেলের ঋণের হিসাব	
	টাকা		টাকা
মক্কেলের ঋণ	৫০০	অজিত	৫০০

অজিত এখন একখানা চেক দিয়া ভূষণকে মোটরের মূল্য শোধ করিল। ভূষণের ব্যাঙ্ক ও অজিতের ব্যাঙ্ক একটিই। ভূষণ চেকের মূল্য নগদ গ্রহণ করিল না। চেকখানা সে ব্যাঙ্কে জমা দিল। ফলে ব্যাঙ্ক অজিতের হিসাবে দেনা (Debit) দেখাইল এবং ভূষণের হিসাবে পাওনা ভুক্তি (Credit) করিল। ভূষণ তাহার পাওনাদার রাজেনকে ৫০০ টাকার একখানা চেক দিল। রাজেন তাহার পাওনাদার অজিতকে দেনা শোধ করার জন্ত ঐ ৫০০ টাকার চেকখানা পিছনসহ (Endorse) করিয়া হস্তান্তর করিল। চেকখানা অজিত তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিল। ফলে ব্যাঙ্ক ভূষণের হিসাবে দেনা ভুক্তি (Debit) করিয়া অজিতের হিসাবে পাওনা ভুক্তি (Credit) করিল। অজিতের হিসাবে এখন ৫০০ টাকা জমা হইয়াছে যাহা দ্বারা সে তাহার দেনা শোধ করিল। ব্যাঙ্ক মক্কেলের ধার হিসাবে পাওনা ভুক্তি (Credit) করিয়া অজিতের হিসাবে দেনা ভুক্তি (Debit) করিল। এইবারে হিসাব তিনটি নীচে দেখান হইল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কোন হিসাবে কিছুই উদ্ভ্রান্ত নাই। তিনটির প্রত্যেকটি হিসাবেই মোট দেনা মোট পাওনার সমান।

হিসাব অজিত		হিসাব মক্কেলের ধার	
দেনা	পাওনা	দেনা	পাওনা
হিঃ ভূষণ ৫০০	হিঃ মক্কেলের ধার ৫০০		
হিঃ মক্কেলের ধার ৫০০	হিঃ ভূষণ ৫০০	হিঃ অজিত ৫০০	হিঃ অজিত ৫০০
১০০০	১০০০		

হিসাব ভূষণ

দেনা	পাওনা
হিঃ অজিত ৫০০	হিঃ অজিত ৫০০

তোমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেন দেন হওয়ার ফলে নগদ অর্থ হস্তান্তরের কোনও প্রয়োজন নাই। অথচ চেক লেন দেনের সুবিধা

না থাকিলে প্রত্যেককেই নগদ অর্থে লেন দেন করিতে হইত। নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা চেক দ্বারা মিটান হইল। এইজন্যই বলা হয় ব্যাঙ্ক অর্থ তৈয়ার করে।

একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে ব্যাঙ্কের আমানতে একাংশ নগদান তহবিলে রাখিলেই ব্যাঙ্ক মঙ্কেলদের অর্থের চাহিদা মিটাইতে পারে। আমানতের কত অংশ ব্যাঙ্ক নগদান তহবিলে রাখিবে তাহা ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা হইতে স্থির করিবে। মনে কর ব্যাঙ্কের আমানত হইতে দৈনিক শতকরা ৫ ভাগের বেশী নগদান অর্থ তোলা হয় না। কোনও ব্যাঙ্কে যদি আমানতকারী ১০০ টাকা নগদ জমা দেয় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হইল যে সে উহা হইতে ৫ টাকা তুলিয়া নিতে পারে—ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই স্থির হইয়াছে। তাহা হইলে ৫ টাকা বাদে বাকী ৯৫ টাকা শতকরা ৫ হারে আরও ১২০০ টাকা আমানতের নগদান অর্থের দাবী মিটান যায়। কারণ ৫ টাকা নগদান রাখিলে ১০০ টাকা আমানতের দাবী মিটান যায়। ৯৫ টাকা হাতে থাকিলে $\frac{৫০০}{১০০} \times ৯৫ = ১২০০$ টাকা আমানতের দাবী মিটান যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক যদি তাহার মঙ্কেলদের ১২০০ টাকা ধার দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কোনও অসুবিধা নাই। তাহা হইলে ব্যাঙ্কের নগদান তহবিল ১০০ টাকার ১২ গুণ পর্যন্ত ধার দিতে পারে। দুইটি উদ্ভূত পত্র দ্বারা উদাহরণটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হউক। উহা হইতে শতকরা ৫ ভাগ আমানত

উদ্ভূত পত্র (১)

দায় (Liabilities)		সম্পদ (Assets)	
	টাকায়		টাকায়
আমানতকারীর পাওনা	১০০	নগদ	১০০

তুলিয়া নিতে পারে। তাহা হইলে উপরের আলোচনা হইতে নগদ ১০০ টাকা দ্বারা ২০০০ টাকা আমানতের দাবী মিটান যায়। ৫ টাকা দ্বারা ১০০ টাকার আমানতের দাবী ১০০ টাকা দ্বারা $\frac{৫০০}{১০০} \times ১০০ = ২০০০$ টাকা আমানতের দাবী মিটান যায়। আমানত আছে ১০০ টাকা। তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ১২০০ টাকা ধার দিলে ১২০০ টাকা আমানত হইতে পারে ইহা পূর্বে দুইবার আলোচনা করা হইয়াছে। ১২০০ টাকা ধার দিয়া আমানত তৈয়ার হইলে উদ্ভূত পত্র নিম্নরূপ হইবে।

উদ্ভূত পত্র (২)

দায় (Liabilities)		সম্পদ (Assets)	
আমানতকারীর পাওনা	১০০	নগদ	১০০
অগ্রান্ত আমানত		মক্কেলদের ধার	১২০০
(ঋণ)	১২০০		—
	২০০০		২০০০

মনে কর এইরূপ অবস্থায় এক মক্কেল ১০ টাকা আমানত করিল। তাহা হইলে নগদ তহবিল দাঁড়ায় ১১০। আমানতকারীর ঋণদ দায় ১১০ আর অগ্রান্ত আমানত (ঋণ) ১২০০। নগদ তহবিল ১১০ হওয়ার ফলে ব্যাঙ্ক শতকরা ৫ টাকা হিসাবে $২০০ \times ১১০ = ২২০০$ টাকার আমানতের দাবী মিটাইতে পারে। কিন্তু আমানত আছে ২০১০ টাকা; তাহা হইলে আরও ১২০ টাকার আমানত তৈয়ার করিতে পারা যায়। অর্থাৎ ১২০ টাকা মক্কেলদের ধার দিলেই ১২০ টাকা আমানত তৈয়ার হয়। অর্থাৎ দশ টাকা নগদান আমানত হওয়ার ফলে ১২০ টাকা ধার দেওয়ার আমানত তৈয়ার করার ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে উদ্ভূত পত্র নিম্নরূপ হইবে।

উদ্ভূত পত্র (৩)

দায় (Liabilities)		সম্পদ (Assets)	
আমানতকারীর পাওনা	১১০	নগদ	১১০
অগ্রান্ত আমানত (ঋণ)	২০২০	মক্কেলদের ধার	২০২০
	২১৩০		২১৩০

এখন যদি কোনও মক্কেল ২০ টাকা নগদ তুলিয়া নেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের নগদান তহবিল থাকে ২০ টাকা। নগদান তহবিল দ্বারা মাত্র $২০০ \times ২০ = ৪০০০$ টাকা আমানতের দাবী মিটাইতে সক্ষম। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কি করিবে? উহার আমানত ত মোট ২২০০ টাকা। ব্যাঙ্ক তখন উহার দেনাদারের নিকট হইতে ঋণ কেরত চাহিবে। কিন্তু চাহিবা মাত্র ত ঋণ আদায় নাও হইতে পারে। এ কারণেই ব্যাঙ্ক এমনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে যাহাতে অতি সত্তরই অর্থ প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাঙ্ক, একথা পূর্বে বলি হইয়াছে যে প্রথম শ্রেণীর বিনিয়োগপত্র, ছাড়া ইত্যাদি ক্রয় করে। প্রয়োজন হইলে সেই সমস্ত বিনিয়োগপত্র

বা হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া অর্থের সংস্থান করিতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুনর্বাট্টা হার বাড়াইয়া দেয়, বাহাতে পুনর্বাট্টা করিয়া অর্থের সংস্থান লাভজনক না হইয়া লোকসান হয়। তাই ব্যাঙ্ক এমনতর ভাবে ঋণ দেয় যে তলব মাত্রই কিছু ঋণ আদায় হইতে পারে। ইহার মধ্যে আন্তর্ব্যাঙ্ক ঋণ (Inter Bank Loans) প্রধান। আন্তর্ব্যাঙ্ক ঋণের এক প্রকার, তলব ও স্বল্প বিজ্ঞপ্তিতে পরিশোধনীয় ঋণই (At Call and short notice) ব্যাঙ্কে এই অবস্থায় সাহায্য করে।

চেক (Cheque) : চেকই যে ব্যাঙ্কের লেনদেনের প্রধান মাধ্যম তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। চেকের (Cheque) সংজ্ঞা নিম্নরূপ : “চেক ব্যাঙ্কের উপর তলবমাত্র দেয় আদিষ্ট সম্প্রদেয় দলিল” Cheque is a Negotiable Instrument drawn on Banks payable on Demand.”

চেক অর্থের কাজ করে ইহাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একখানা চেকের নমুনা দেওয়া হইল উহা চেকের কার্য বুঝান যাইতেছে।

No. A 375001	No. A 375001	5th June 1961
5th June 1961	United Bank of India Ltd.	
Rs. 500 = 10nP.	College Street Branch	
Payee—Sudhansu	College Street Market	
Guha	Calcutta-12	
	Pay...Sudhansu Guha or bearer/Order	
	Rupees Five Hundred and ten nayapaise only	
	Rs 500 = 10nP.	Monindra Majumder

উপরের চেকখানা একখানা কাগজ মাত্র। কিন্তু উক্ত কাগজখানার মূল্য ৫০০ টা: ১০ ন: প:। মনোজ মজুমদার স্বধাংগু গুহকে অথবা বাহক অথবা আদিষ্ট কাগজকেও ৫০০ টা: ১০ ন: প: দেওয়ার নির্দেশ দিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াকে আদেশ দিয়াছেন। এই চেক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় উপস্থাপিত করিলেই উক্ত অর্থ পাওয়া যাইবে, অবশ্য যদি মনোজ মজুমদারের হিসাবে ঐ পরিমাণ আমানত থাকে, অথবা না থাকিলে অধিবিকর্ষ (overdraft) অথবা ঋণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। চেকে লিখিত অর্থ পাইয়াছে তাহার রসিদ বা প্রমাণ হিসাবে প্রাপক স্বধাংগু গুহ চেকের পিছনে মাত্র সহি করিবে। সচ্ছিদ্র অংশের (Perforated) ডান দিকের অংশই চেক, আর বাঁ দিকের অংশকে চেকের মূরি (Counter foil of Cheque) বলা হয়। চেক মূরিতে চেকের সম্পূর্ণ বিষয় বস্তু, অর্থাৎ প্রাপকের নাম চেকের মূল্য

এবং তারিখ লিখিয়া রাখিতে হয়। ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের বিবৃতির সহিত মিলাইতে অথবা কোনও প্রকার প্রমাণ পত্র হিসাবে ঐ মূরি উপস্থাপিত করা যায়।

চেকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Cheque) : প্রথমত চেকের

তিনটি দল থাকে। চেকদাতা এক্ষেত্রে মনীজ্ঞ মজুমদার, চেকের বৈশিষ্ট্য প্রাপক স্বধাংশু গুহ এবং ব্যাঙ্ক, যাহার উপর চেকের অর্থ ১। তিনটি পক্ষ পরিশোধ করার আদেশ থাকে।

২। আমানতকারী দ্বিতীয়ত, আমানতকারী ব্যতীত কেহই চেক দিতে চেক দিতে পারে পারে না।

৩। চেক আদান তৃতীয়ত, চেক দাতার উপর চেক গ্রহীতার বিশ্বাস না প্রদান বিশ্বাসের থাকিলে চেক দ্বারা আদান প্রদান সম্ভব নহে। উপর ভিত্তি চতুর্থত, চেকের অর্থ তলব মাত্র দেয়।

৪। তলব স্বাক্ষর প্রথমত, চেক হস্তান্তর করিয়া লেন দেন সম্ভব। অর্থাৎ ৫। হস্তান্তর এই ক্ষেত্রে স্বধাংশু গুহ যেমন মনীজ্ঞ মজুমদারের উপর বিশ্বাস ৬। বোধ্যতা স্থাপন করিয়া চেক গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি মনে করা যাউক, রবীন্দ্র সেনগুপ্তের স্বধাংশু গুহের উপর বিশ্বাস আছে। রবীন্দ্র সেনগুপ্তের অনুকূলে ঐ চেকখানা স্বধাংশু গুহ পিছন সহি করিয়া দিলে রবীন্দ্র সেনগুপ্তকে চেকে লিখিত অর্থ শোধ করিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য।

চেকের প্রকার ভেদ (Different kinds of Cheque) : চেক আইনত

ছই প্রকারের—বাহক চেক (Bearer Cheque) এবং আদিষ্ট চেকের প্রকার চেক (Order Cheque)। কিন্তু চলতি নিয়মে চেকের আরও ভাগ করা হয় পর-তারিখী চেক (Postdated Cheque) ; পূর্ব তারিখী চেক (Antedated Cheque), রেখাঙ্কিত চেক (Crossed Cheque)।

বাহক চেক (Bearer Cheque) : উপরে যে চেকের নমুনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে “Pay Sudhansu Guha or bearer” অর্থাৎ ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে স্বধাংশু গুহ অথবা যে কেহই চেক খানা ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করিবে তাহাকেই চেকে লিখিত অর্থ দেওয়া হউক। ইহাই বাহক চেক। যে কোনও লোক এই প্রকার চেক ভাঙ্গাইতে পারে।

১। বাহক চেক কেহ বাহক চেক চুরি করিয়া নিলে সেও ভাঙ্গাইতে পারে এবং চেকের অর্থ লইতে পারে। বাহক চেক দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। কারণ হারাইয়া গেলে বা চুরি গেলে যাহার হাতেই চেক পড়িবে সেই চেক ভাঙ্গাইয়া অর্থ লইতে পারে।

আদিষ্ট চেক (Order Cheque) : উপরে লিখিত চেক খানিকে আদিষ্ট

২। আদিষ্ট চেক চেক বলা হইবে যখন প্রাপকের নামের পর ‘Or Order’ এইরূপ লিখিত থাকিবে। ‘Pay Sudhansu Guha or order’

এইরূপ লিখিত হইলে আদিষ্ট চেক হইবে। আদিষ্ট চেক পিছন সহি (Endorsement) না হইলে ভান্ডান যায় না। পিছন সহি করিতে (Endorse) কেবল মাত্র সহি করিলেই চলে।

পর-তারিখী চেক (Postdated Cheque) : যে তারিখে চেক লেখা হয়

৩। পর-তারিখী চেকে যদি তাহার পরবর্তী কোন তারিখ বসান হয় তবে তাহাকে পর-তারিখী চেক বলে। যেমন প্রকৃত প্রস্তাবে একথানা চেক লেখা হইল ৭ই অক্টোবর, ১৯৬১। কিন্তু চেকে

যদি ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১ লেখা হয় তাহা হইলে উহা পর-তারিখী চেক হইল। পর-তারিখী চেকে আমানতকারীর হিসাবে অর্থ জমা না থাকিলে, চেক কাটার তারিখ এবং যে তারিখে চেকের অর্থ তুলিয়া লওয়া যায় উহার অন্তর্বর্তী কালে আমানতকারী ব্যাঙ্কে অর্থ জমা দেওয়ার সুযোগ পায়। কারণ ৭ই অক্টোবর তারিখ দিয়া চেক লেখা হইলে চেক সেই দিন ব্যাঙ্কের কার্যের সময়ের পূর্বে ভান্ডান যাইত, কিন্তু আমানতকারীর হিসাবে হয়ত অর্থ নাই, চেক জমা দিলে অর্থ পাওয়া যাইবে না, ফ্রাহাতে চেকদাতার সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে। সুতরাং ৭ তারিখ চেক দিল বটে কিন্তু চেকের অর্থ ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে পাওয়া যাইবে না। ইহার মধ্যে চেকে লিখিত অর্থ জমা দেওয়ার সুযোগ চেকদাতা পাইল।

পূর্ব তারিখী চেক (Antedated Cheque) : চেক যে তারিখে

প্রকৃত লেখা হয় তাহার পূর্বের (বিগত) কোন তারিখ চেকে বসান হইলে উহাকে

৪। পূর্ব তারিখী চেক বলা হয়। যেমন ৭ই অক্টোবর চেক লেখা হইল বটে কিন্তু চেকে লেখা হইল ১লা অক্টোবর। এই প্রকার চেক বিরল বটে। তবে ভুল সংশোধন করার জন্ত অথবা

কোনও হিসাব সমাধান কালে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে পূর্ব তারিখী চেক দেওয়া যাইতে পারে।

রেখাঙ্কিত চেক (Crossed Cheque) : চেকের গায় দুইটি সমান্তরাল

সরল রেখা টানিয়া দিলেই সে চেক রেখাঙ্কিত চেক হয় (Crossed

৫। রেখাঙ্কিত চেক Cheque)। চেক রেখাঙ্কিত হইলে সে চেক অন্য কোনও

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভান্ডাইতে হয়। রেখাঙ্কণের অর্থ এই যে চেক যখন ভান্ডান হইবে তখন ব্যাঙ্ক আগে চেকের অর্থ নিজের আদায় করিবে এবং পরে প্রাপককে দিবে।

রেখাঙ্কণের উদ্দেশ্য যে চেকের অর্থ যাহাকে দেওয়া হইবে সেই যাহাতে প্রকৃত চেকের অর্থ পাইতে পারে। হারাইয়া গেল বা চুরি হইল এবং যাহার হাতেই চেক পড়িল সেই যাহাতে চেকের অর্থ লইতে না পারে তজ্জনাই রেখাঙ্কণ করিতে হয়।

রেখাক্রিত চেক ভান্ডাইবার উপায় (Means to cash a Crossed Cheque): রেখাক্রিত চেক কখনই ব্যাঙ্কে সরাসরি উপস্থিত করিলে ব্যাঙ্ক চেক লিখিত অর্থ দেয় না। রেখাক্রিত চেক প্রাপক বলিয়া যাহার নাম লিখিত থাকিবে সে তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিলে তাহার ব্যাঙ্ক আদিষ্ট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চেকের মূল্য আদায় করিয়া প্রাপকের হিসাবে জমা করিবে। পরে প্রাপক তাহার ব্যাঙ্ক হইতে চেকের অর্থ তুলিয়া লইবে। উপরের চেকখানা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের উপর স্বধাংশ গুহকে ৫০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ আছে। কিন্তু চেকখানা রেখাক্রিত। স্বধাংশ গুহ সেই চেক ভান্ডাইতে হইলে সরাসরি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই অর্থ পাইবে না। স্বধাংশ গুহকে ঐ চেক পিছন সহি করিয়া তাহার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। মনে কর তাহার ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব গ্রাশানালা ব্যাঙ্ক লিঃ। সে পাঞ্জাব গ্রাশানালা ব্যাঙ্কে চেক জমা দিলে, পাঞ্জাব গ্রাশানালা ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের (Clearing House) মাধ্যমে চেকের অর্থ আদায় করিয়া স্বধাংশ গুহের হিসাবে জমা দিবে। তারপর স্বধাংশ গুহ চেকের অর্থ তুলিতে পারিবে। তবে স্বধাংশ গুহের যদি নিজের কোন ব্যাঙ্ক হিসাব না থাকে তাহা হইলে সে যাহার কোনও ব্যাঙ্কে হিসাব আছে সেইরূপ কোনও ব্যক্তির অমুকূলে পিছন সহি (Endorse) করিয়া দিলে সেই ব্যাঙ্কে পূর্ব লিখিত উপায়ে অর্থ আদায় করিবে।

রেখাক্রণ করার সুবিধা এই যে, রেখাক্রিত চেক যখন কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যতীত আদায় করা যায় না তখন যে ব্যাঙ্ক চেকের অর্থ আদায় করিবে সেই ব্যাঙ্ক চেকের মালিকের সত্যতা প্রমাণ করে। কোনও প্রকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপাত্রে জমা পড়িলে তাহার জন্ত আদায়কারী ব্যাঙ্ক (Collecting Bank) দায়ী থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের রেখাক্রণ (Different kinds of Crossing):

রেখাক্রণ দুই প্রকারের হইতে পারে—সাধারণ রেখাক্রণ (General Crossing) এবং বিশেষ রেখাক্রণ (Special Crossing)।

সাধারণ রেখাক্রণ (General Crossing): যে কোনও চেকের গায়

দুইটি সমান্তরাল সরল রেখা টানিয়া দিলেই সাধারণ রেখাক্রণ

১। সাধারণ

হইল। কিন্তু সাধারণ রেখাক্রণও বিশেষ রেখাক্রণের মত কার্য

রেখাক্রণ

করিতে পারে। নিম্নে যে কয়টি রেখাক্রণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল

তাহা সকলই সাধারণ রেখাক্রণ। তবে ৩নং এবং ৪নং রেখাক্রণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

বিশেষ রেখাঙ্কণ (Special Crossing)এ চেকদাতা বিশেষ কোন ব্যক্তির হিসাবে, বিশেষ কোন জায়গায় এবং বিশেষ কোন ব্যাঙ্কেই
 ২। বিশেষ চেকের অর্থ আদায় দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। নিম্নের
 রেখাঙ্কণ দৃষ্টান্ত কয়টি আলোচনা করা যাউক।

১মং উদাহরণে রেখাঙ্কণের মধ্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এণ্ড কোং লেখা আছে। উহা কেবলমাত্র এলাহাবাদ ব্যাঙ্কেরই আদায় করার অধিকার আছে। ২নং রেখাঙ্কণে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ডালহৌসী স্কোয়ারেরই মাত্র আদায় করার অধিকার আছে। ৩নং রেখাঙ্কণে যে চেকখানি ব্যাঙ্কে জমা দিবে তাহার হিসাবেই মাত্র জমা পড়িবে।

১	Allahabad Bank & Co.	২	Allahabad Bank & Co. Dalhousie Square	৩	A/C Payee only
---	----------------------	---	--	---	----------------

পিছন সহি (Endorsement) : যে চেকের পিছনে সহি করিলেই হস্তান্তর করা যায় উহাকেই পিছনসহি বা স্বত্বদান বলে। পিছনসহিও দুই প্রকার হইতে পারে সাদা পিছন সহি (Blank Endorsement) এবং বিশেষ পিছন সহি (Special Endorsement).
 ১। সাদা পিছন সহি স্বত্বদাতা বা পিছন সহিকারক চেকের পিছনে সহি করিলেই তাহাকে সাদা পিছন সহি (Blank Endorsement) বলে। যেমন চেকের পিছনে

Amrita Chakrabarty

সহি করা হইল। অমৃত চক্রবর্তী সাদা পিছন সহি (Blank Endorsement) করিল।

কিন্তু অমৃত চক্রবর্তী যদি—

Pay Sib Sinha

এইভাবে পিছন সহি করে তবে তাহা বিশেষ পিছন সহি হইল। পিছন সহি করিয়া চেকের হস্তান্তর (Transferability or
 ২। বিশেষ পিছনসহি Negotiability) বন্ধ করা যায়। অমৃত চক্রবর্তী যদি—

Pay Bires Bose only

এইভাবে পিছন সহি করে তবে বীরেশ বসু ব্যতীত এই চেকের অর্থ কেহ লইতে পারে না। ইহা দ্বারা বীরেশ বসুর হস্তান্তরের ক্ষমতা লোপ করা হইল।

• **পিছন সহি করার ফল (Consequence of Endorsement) :** চেক পিছন সহি করা হইলে চেক দাতা চেকে লিখিত অর্থ পারিশোধ না করিলে অর্থাৎ চেক অনাদৃত হইলে (Dishonour) পিছন সহিকারক চেকে লিখিত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং যে সর্বশেষ পিছন সহি করে চেকের অর্থ পরিশোধ করিতে তাহার দায়িত্বই প্রথম। যেমন অমিয় দাশগুপ্ত কালীপদ মিত্রকে একখানা চেক দিল। কালীপদ মিত্র সেই চেক পিছন সহি করিয়া সুধীন্দ্র চক্রবর্তীকে হস্তান্তর করিল। সুধীন্দ্র চক্রবর্তী সেই চেক পিছন সহি করিয়া পশুপতি গাঙ্গুলীকে হস্তান্তর করিল। পশুপতি গাঙ্গুলী যখন সেই চেক তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিল, ব্যাঙ্ক চেক অনাদৃত (Dishonoured) বলিয়া ফেরত দিল। এখন শেষ পিছন সহিকারক বা স্বত্ব হস্তান্তরকারী (Endorser) সুধীন্দ্র চক্রবর্তী। পশুপতি গাঙ্গুলী সুধীন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হইতে চেকের মূল্য আদায় করিবে। সুধীন্দ্র চক্রবর্তী কালীপদ মিত্রের নিকট হইতে এবং কালীপদ মিত্র অমিয় দাশগুপ্তের নিকট হইতে চেকের অর্থ দাবী করিবে।

এই চেকের পিছন সহি নিম্নরূপ হইবে—

Pay Sudhindra Chakrabarty or order
Kalipada Mitra,
Pay Pasupati Ganguly or order
Sudhindra Chakrabarty
Pay.....
Pasupati Ganguly.

পশুপতি গাঙ্গুলী কেবলমাত্র সহি করিয়া তাহার ব্যাঙ্কে চেক জমা দিবে। ব্যাঙ্ক উহার নাম বসাইয়া দিবে। নাম বসাইয়া দিলে চেক বিশেষ পিছন সহি হইবে।

গতমিয়াদ বা বাতিল চেক (Stale Cheque) : চেক কাটার দিন হইতে কতদিন পর্যন্ত সেই চেক চলিতে পারে তাহা আইন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হয়। আইনে চেক লেখার দিন হইতে ৬ মাস পর্যন্ত চেকের জীবনকাল। ৬ মাস অতিবাহিত হইলে সেই চেক গত মিয়াদ অথবা বাতিল (Stale) বলিয়া গণ্য হয়। কোনও ব্যাঙ্ক এইরূপ চেক ভাঙ্গাইতে রাজী নহে। সেইরূপ চেক ব্যাঙ্ক চেক লেখকের নিকট তাহার সমর্থনের (Confirmation) জন্য পাঠায়। চেক লেখক ঐ চেক পরিশোধ সমর্থন করিলেই চেকের অর্থ আদায় হয়, নচেৎ নহে।

অনাদৃত চেক (Dishonoured Cheque) : কোন চেক দাতার হিসাবে আমানতের অধিক অর্থের জন্য চেক কাটা হইলে আদিষ্ট ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দেয় (অবশ্য যদি অধিবিকর্ষের (overdraft) ব্যবস্থা না থাকে) ব্যাঙ্ক অনাদৃত চেক চেকের উপর 'চেকদাতার নিকট প্রেরণ' (Refer to Drawer) বলিয়া ফেরৎ দেয়। 'চেক দাতার নিকট প্রেরণ' লিখিলেই বুঝিতে হয় যে চেকে লিখিত অর্থ চেক দাতার হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা নাই। এই কারণেই চেক বৈধ নুহা

(Legal Tender) নহে। অপরিচিত লোকের নিকট হইতে চেক গ্রহণ বিপজ্জনক।

চেক অনাদৃত হইলে অন্যদের প্রমাণস্বরূপ এবং ভবিষ্যতে কোনও মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন মনে করিলে অনাদৃত চেক লেখ্য

প্রামাণিকের (Notary Public) অফিসে নিকরাই বা লেখ্য অনাদৃত চেক ও প্রমাণ (Noting) করাই হয়। লেখ্য প্রামাণিকের কার্যালয়ে নিকরাই নির্দিষ্ট মাসুল জমা দিলেই নিকরাই বা লেখ্য প্রমাণ করান যায়।

লেখ্য প্রমাণের জন্য বা নিকরাইর জন্য যে মাসুল (Charges) দিতে হয় উহাকে নিকরাই ব্যয় (Noting Charges অথবা Notarial Charges) বলা হয়।

চেক প্রামাণিক (Notary Public) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী।

Exercises

1. What is the difference between a Ten-Rupee Note and a Cheque for Rs. 10/-

দশ টাকার একখানি নোট এবং একখানা ১০ টাকা মূল্যের চেকের মধ্যে পার্থক্য কি?

2. From the following particulars and any other particulars necessary make out a cheque, dated 3rd January, 1961.

Drawer—Rajen ; Drawee—Allahabad Bank Ltd. ; Payee—Soumen, Value—Rs. 1000/.

নিম্নলিখিত তথ্য হইতে এবং আরও কোন তথ্য আবশ্যক হইলে তাহা যোজন্য করিয়া

৩রা জানুয়ারী ১৯৬১ তারিখের একখানি চেক তৈয়ারী কর :

দাতা—রাজেন ; গ্রহীতা—সৌমেন ; আদিষ্ট ব্যাংক—এলাহাবাদ ব্যাংক লি. ;
মূল্য ১০০০ টাকা।

3. What is the difference between a Current Account and a Deposit Account?

চলতি হিসাব ও আমানত হিসাবের পার্থক্য কি?

4. What is the difference between a loan and an overdraft?

ঋণ ও অধিবিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

5. Explain, how Bank creates deposit?

ব্যাংক কি উপায়ে আমানত তৈয়ার করে বিশ্লেষণ কর।

6. What is an Exchange Bank?

বিনিময় ব্যাংক কি?

7. Explain the utility of a Land Mortgage Bank and a Co-operative Bank.

ভূমি বন্ধকী ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।

8. What is a Central Bank? What are its functions?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি? উহার কার্যাবলী কি?

9. What are the advantages of a Crossed Cheque?

রেখাঙ্কিত চেকের সুবিধা কি?

নবম অধ্যায়

বীমা

(Insurance)

বাবসায়ের প্রসাবে বীমা (Insurance) যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রত্যেক বাবসায়ীরই বাবসায় করিতে কিছু কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। বাবসায় পরিচালনা কালে চুরি, অসদুপায়ে কর্মচারীর বাবসায়েব অর্থ আত্মসাৎ, বাবসায় প্রসার বাবসায়েব বাড়ী-দালান অগ্নিতে ধ্বংস ; মাল বিলি দিব্যর লরি কল্লে বীমার স্থান পথিমধ্যে নষ্ট হওয়া, জাহাজ সমুদ্রপথে ডুবিয়া যাওয়া, কর্মচারী বা শ্রমিকের কার্ধকালে দৈহিক ক্ষতি এবং ফলে কর্মচারীর কার্ধে অপারগতা ইত্যাদি নানা প্রকাব ঝুঁকি লইয়া বাবসায়ীকে বাবসায় চালাইতে হয়। বাবসায়ী যদি কোনও উপায়ে এই সকল ঝুঁকি হইতে লোকসান পূবণের কোনও পথ পায় তবে অনেকটা নিশ্চিত মনে বাবসায় চালাইতে পারে। নচেৎ সর্বদাই বাবসায়ীকে কোনও দৈব দুর্ঘটনা হইতে লোকসানের ভয়ে ভীত থাকিতে হয়। বাবসায় পবিচালনার পথে দৈব দুর্ঘটনা হইতে ক্ষতির ভয় বাধা সৃষ্টি করে। যে উপায়ে দৈব দুর্ঘটনা হইতে লোকসান হইলে তাহা পূবণের বাবস্থা করা যায় তাহাকে বলে বীমা (Insurance)।

বীমাব মূল কথা ভাগ্যবানের ভাগ্যহীনকে সাহায্য করা (fortunate helping the unfortunate)। একথা সকলেই জানে যে প্রতিবৎসর কোনও স্থানে কয়েকখানা ঘর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইবে কিন্তু কাহার ঘর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইবে তাহা কেহই জানে না। তেমনি সমুদ্রপথে যে সকল জাহাজ মাল বহন করে তাহার মধ্যে কোন কোন জাহাজ সমুদ্রবল্লে ডুবিয়া যাইবে অথবা অস্ত্রাস্ত্র প্রাকৃতিক দৈব দুর্ঘটনায় নষ্ট হইবে। তবে কোন জাহাজখানি সমুদ্রবল্লে দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং সকল বাবসায়ীই এই প্রকার অনিশ্চিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনায় ভীত থাকে। কোন লোক এইরূপ কোনও দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হইলে জনসাধারণের সহায়ভূতি আকর্ষণ করে এবং কোনরূপ বীমার বাবস্থা না থাকিলে দেখিবে জনসাধারণ অল্প অল্প অর্থ দিয়া এই প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত লোককে সাহায্য করে। বীমা বাবস্থাও বীমা দ্বারা বাবসায়ে অমূরূপ। কতিপয় বাবসায়ী এবিধ দৈব দুর্ঘটনা হইতে ঝুঁকিগ্রহণে সহায়তা লোকসান পূবণের জন্য একত্রিত হইয়া কিছু কিছু অর্থ জমা দিয়া একটি তহবিল গঠন করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ তহবিল হইতে ক্ষতির পূরীমাণ

স্বত অর্থ সাহায্য করে। তবে সেই সকল ব্যক্তিই ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা সাহায্য পাইতে পারে বাহারা ঐ তহবিলের সদস্য। দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইলে তখনই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সর্বদা এইরূপ সাহায্য সম্ভব হয় না বলিয়াই বীমাও (Insurance) এক প্রকার ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। বাহারা তহবিলের সদস্য হইতে চাহে তাহাদের নির্দিষ্ট নিয়মে টাকা দিতে হয়। সুতরাং অল্প অল্প লোকসান স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতে খুব বেশী লোকসান হইতে রেহাই পাওয়ার জ্ঞানই বীমা। টাকাকে বলে বীমার টাকা (Insurance Premium)। বীমা এখন ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায় যে সকল প্রতিষ্ঠান বীমার ব্যবসায় করে তাহাদের বীমা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। তাহাদের বলা হয় বীমাকারক বা অবলম্বক (Insurer) অথবা Underwriter)। আর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বীমাপত্র গ্রহণ করে অর্থাৎ টাকা দিয়া দৈব দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি পূরণের অধিকার গ্রহণ করে তাহাকে বলে বীমা গ্রহীতা (Insured)। উভয় পক্ষের মধ্যে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় তাহাকে বলে পলিসী (Policy)।

বীমার উদ্দেশ্য দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণ করা। সুতরাং বীমা গ্রহণ করিয়া লাভবান হওয়া উদ্দেশ্য নহে। বীমা গ্রহণ করিয়া লাভবান হওয়া উদ্দেশ্য নহে বটে কিন্তু বীমাকারক ব্যবসায়ী বীমার ব্যবসায় করিয়া লাভ করিবে বটে। কারণ বীমা গ্রহীতার বীমাপত্র গ্রহণ করিয়া লাভবান হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে যে দৈব দুর্ঘটনার ক্ষতি এড়াইবার জ্ঞান বীমা গ্রহণ করা হয় সেইরূপ দৈব দুর্ঘটনা নিজেই ঘটাইয়া বীমাকারীর নিকট হইতে ক্ষতি আদায় করার চেষ্টা সকলেই করিবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জীবনবীমা (Life Insurance) এবং অন্যান্য বীমার মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জীবনবীমার বেলায় বীমার নিয়ম এই যে নির্দিষ্ট হারে টাকা (Premium) দিতে থাকিলে এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে

অথবা মৃত্যু, বাহাই আগে ঘটুক, বীমাকৃত অর্থ পাওয়া যায়।

জীবনবীমা

অন্যান্য বীমায় কোনও দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইলেই মাত্র ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। সুতরাং জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার জীবদ্দশাতেও বীমাকৃত অর্থ পাইতে পারে কিন্তু অন্যান্য বীমায় দুর্ঘটনা না ঘটিলে এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতি না হইলে বীমাকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার জীবদ্দশায়ই হউক কিংবা তাহার মৃত্যুর পরই হউক, যতমূল্যের বীমাপত্র গ্রহণ করা হয় সেই অর্থই পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য বীমায় যত মূল্যের বীমাই হউক না কেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণের অধিক পাওয়া গেলে বীমা গ্রহীতার লাভ হয় কিন্তু বীমা পত্র গ্রহণ করিয়া লাভ করা বীমা গ্রহীতার উদ্দেশ্য নহে এবং আইনত বীমা গ্রহীতাকে বীমাপত্র দ্বারা লাভ করিবার অধিকার দেওয়া হয় না।

বীমার সর্ভ (Conditions of Insurance): সকল প্রকার বীমাই চুক্তি (Contract)। চুক্তি কার্যকরী হইতে হইলে চুক্তির পক্ষ সমুদয়কে কতকগুলি সর্ভ মানিয়া লইতে হয় এবং সে সর্ভ পূরণ না করিলে চুক্তি কার্যকরী হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বীমার চুক্তি দ্বারা যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে সক্ষম তখন যে পক্ষ ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে তাহার উপরই বীমার সকল সর্ভ পূরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা প্রমাণ করার দায়িত্ব।

প্রথমত, বীমার চুক্তির ভিত্তি চরম বিশ্বাস (utmost good faith)—ল্যাটিন প্রতিশব্দ (Uberrimae fidei)। বীমাপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে ১। চরম বিশ্বাস বীমাকারী নিঃসন্দেহ হইবে যে বীমা গ্রহীতা বীমা পত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যই প্রকাশ করিয়াছে। কোনও তথ্য গোপন করে নাই। ভবিষ্যত কালে যদি প্রমাণ হয় যে এমন কোন তথ্য প্রকাশ করা হয় নাই, বাহা প্রকাশ করিলে বীমাকারী (Insurer) বীমার চুক্তি করিত না, তাহা হইলে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য নহে। মনে কর কোনও এক ব্যক্তি তাহার দালান অগ্নিকাণ্ড হইতে দুর্ঘটনার ভয় বীমা করিতে ইচ্ছুক। সেই দালানে একটি কোঠায় প্রচুর পরিমাণে প্রজ্জ্বালক তৈল (যেমন কেরোসিন) রাখা হয়। এই বিষয়টি বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। পরে সেই প্রজ্জ্বালক তৈলে অগ্নি সংযোগ হওয়াতে দালানটি অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইল। এক্ষেত্রে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য নহে। কারণ হয়ত প্রজ্জ্বালক তৈল রাখা হইত জ্বালিলে বীমাকারী ঐ দালান বীমা করিত না অথবা বীমা করিলেও টাদার হার অধিক হইত।

দ্বিতীয়ত, বীমার চুক্তিতে বীমা গ্রহীতার (Insured) বীমাহিত (Insurable Interest) থাকা প্রয়োজন। বীমাহিত (Insurable Interest) নাই এমন

২। বিমাহিত ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করিতে পারে না। বীমাহিত বলিতে বীমাকৃত অর্থ আদায় করিবার আইনত অধিকারকে বুঝায়। অর্থাৎ বীমা গ্রহণ সেই ব্যক্তিই করিতে পারে যে বীমার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। বাহ্যিক বীমায় কোনও স্বার্থ থাকিতে পারে না তাহার বীমায় বীমাহিত থাকে না। মনে কর, আমার দালান আগুনে ক্ষতি হইলে তোমার কি স্বার্থ। তুমি হয়ত একবার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিবে ‘আহা! ভুলোকের কত ক্ষতি হইল!’ সুতরাং আমার দালান বীমা করায় তোমার কোন স্বার্থ নাই। কাজে কাজেই—তুমি আমার দালান বীমা করিতে চাহিলেও আমি তাহাতে রাজী নহি। কেননা, তোমাকে যদি আমার দালান বীমা করার অধিকার দেই তাহা হইলে বীমা পত্র গ্রহণ করিয়া দুই দিন পরে তুমি যে সকলের অলক্ষিতে আমার দালানে অগ্নি সংযোগ করিবে না তাহার প্রমাণ কি? তুমি বীমা গ্রহীতা হিসাবে আমার দালানে

অগ্নিসংযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করিলে এবং লাভবান হইলে। কোনও বীমাকারী এ ব্যবস্থায় রাজী হয় না। সুতরাং বীমাহিত প্রমাণ করিতে না পারিলে বীমাকারী বীমা করে না। আবার মনে কর, তোমার পাড়ায় একজন লোকের জীবন তুমি ১০০০০ টাকায় বীমা করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করিলে। তিন দিন পরে সে ব্যক্তিকে হত্যা করিলে। সুতরাং তাহার জীবন বীমা করিয়া এবং পরে তাহাকে হত্যা করিয়া লাভবান হওয়াই তোমার উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তোমার কোন বীমাহিত নাই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পিতার জীবনে পুত্রের বীমাহিত আছে, স্বামীর জীবনে স্ত্রীর বীমাহিত আছে।

তৃতীয়ত, বীমার চুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity)। যে সকল দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি উল্লেখ করিয়া বীমা করা হয় সেই সকল দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইলেই মাত্র ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে নচেৎ নহে।

৩। ক্ষতিপূরণের আবার যে পরিমাণ ক্ষতি নির্ধারণ হইবে মাত্র সেই পরিমাণই চুক্তি

ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। মনে কর, কোন বাড়ীর মূল্য ৫০০০ টাকা। বাড়ীর মালিক বাড়ী বীমা করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করিল। বাড়ীর একাংশ মাত্র অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইয়াছে। ধরা যাউক ১/৪ অংশ। তাহা হইলে তাহার ক্ষতি হইয়াছে ১২৫০ টাকা। যদিচ ৫০০০ টাকার বীমাপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে তথাপি ক্ষতির পরিমাণের অতিরিক্ত (এক্ষেত্রে ১২৫০ টাকার অধিক) ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে না। তবে ক্ষতির পরিমাণ যদি বীমাকৃত মূল্যের অধিক হয় তাহা হইলেও বীমা মূল্যের অধিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। ৫০০০ টাকায় বাড়ীখানি ২৫০০ টাকায় বীমা করা হইল। সেক্ষেত্রে বাড়ীখানি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলেও ২৫০০ টাকার অধিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না। কিন্তু ছাত্রদের পুনরায় অরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে জীবন বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে (Not a Contract of Indemnity)। জীবন বীমা একপ্রকার প্রতিশ্রুতি (Assurance) কারণ জীবনহানিতে জীবনের ক্ষতির পরিমাণ কি স্থির করা যায়—জীবন ত অমূল্য ?

বিভিন্ন প্রকারের বীমা (Different kinds of Insurance) : বর্তমানে বীমার পরিধি ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে। জীবনযাত্রা যতই জটিল হইতেছে, মানুষের কার্ণে ঝুঁকিও তত বেশী হইতেছে। তাই বর্তমানে প্রায় সকল প্রকার বীমাই গ্রহণ করা যায়। প্রচলিত বীমাগুলির নীচে আলোচনা করা হইল।

- ১। অগ্নিবীমা (Fire Insurance)
- ২। সামুদ্রিক বীমা বা নৌ বীমা (Marine Insurance)
- ৩। জীবনবীমা (Life Assurance)
- ৪। মোটরবীমা ও তৃতীয় পক্ষ বীমা (Motor Insurance and Third Party Insurance)

৫। অসাধুতা জনিত ক্ষতিপূরণের বীমা (Fidelity Insurance অথবা Guarantee)

৬। শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা (Workman's Compensation Insurance)

৭। কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা (Employee's State Insurance)

৮। অপহরণ বীমা (Burglary Insurance)

৯। অর্থপ্রেরণ বীমা (Cash in transit Insurance)

অগ্নিবীমা (Fire Insurance) : ব্রাহ্ম অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইলেই যে ক্ষতি হইবে উহা পূরণের প্রতিশ্রুতিতে যে বীমা কর হয় তাহাই অগ্নিবীমা।

অগ্নিবীমায় নানা প্রকারের বীমাপত্র বা পলিসি (Policy) অগ্নিবীমা

লওয়া যাইতে পারে। তবে অগ্নিবীমায় যে সম্পদ বীমা করা হয় তাহার সম্পূর্ণ মূল্যই বীমা গ্রহীতাকে ঘোষণা করিতে হয়। ইহাকে যদিও মূল্যায়িত বীমাপত্র বলে তথাপি মূল্যই ফেরত পাওয়া যায় না। বীমাকৃত সম্পদের যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে মাত্র সেই পরিমাণই ক্ষতির মূল্য আদায় করিতে পারা যায়। মনে কর কোন ব্যক্তির বাড়ীর মূল্য ১০০০০

অগ্নি বীমা পত্রের টাকা। সেই বাড়ীর অর্ধাংশ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হইল। প্রকার

এক্ষেত্রে বাড়ীখানির অর্ধেক মূল্যই বীমাকারী প্রদান করিবে।

১। মূল্য নিরূপিত এইজন্তই অগ্নিকাণ্ডে কোনও প্রকার ক্ষতি হইলে মূল্য নিরূপক (Assessor) দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। মূল্য নিরূপক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করিলে সেই নিরূপিত ক্ষতির পরিমাণই পূরণ করা হয়। উপরের উদাহরণে মূল্য নিরূপক যদি ৫০০০ টাকা ক্ষতির পরিমাণ বলিয়া স্থির করে তাহা হইলে বীমাকারী (Insurer) ৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ করিবে।

দ্বিতীয়ত, গড় বীমাপত্র (Average Policy) গ্রহণ করা যায়। বীমা গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে সম্পদের পূর্ণ মূল্যের জন্ত বীমা না করিয়া আংশিক মূল্যের জন্তও বীমা

গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতেও সম্পদের প্রকৃত পূর্ণ মূল্য ঘোষণা

২। গড় বীমাপত্র করিতে হয়। বীমাকারী নিজের নিরাপত্তার জন্তই আংশিক মূল্যের বীমাপত্র প্রদান করিলে বীমাপত্রে গড় (Average) সর্ব জুড়িয়া দেয়। ইহাকেই গড় পলিসি (Average Policy) বলে।

গড় পলিসিতে সম্পদের মোট মূল্যের সহিত বীমাকৃত মূল্যের যে অল্পপাত, বীমামূল্যের ঠিক সেই অল্পপাতেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। মনে কর কোন বাড়ীর মূল্য ১০০০০ টাকা কিন্তু বীমা গ্রহীতা ৫০০০ টাকা মূল্যের বীমাপত্র গ্রহণ করিল। বাড়ীখানির ৩০০০ টাকা মূল্যের অংশ অগ্নিতে ধ্বংস হইল। ক্ষতিপূরণের নীতি

(Principle) অল্পসারে বীমাগ্রহীতা ৩০০০ টাকাই ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে। কিন্তু যেহেতু বীমাপত্রে (Average Policy) ক্ষতিপূরণ বীমাকৃত মূল্য ও সম্পদের প্রকৃত মূল্যের সমানুপাতিক হইবে সেইজন্য বীমা গ্রহীতা এক্ষেত্রে মাত্র ১২০০ টাকা পাইবে। কারণ বীমাকৃত সম্পদের প্রকৃত মূল্য : বীমা মূল্য : : ক্ষতিমূল্য : ? অর্থাৎ ১০০০০ : ৪০০০ : : ৩০০০ : ? । $৪০০ \times ৩ = ১২০০$ টাকা। কিন্তু বীমাকৃত সম্পদ যদি সম্পূর্ণও ধ্বংস হয় তাহা হইলেও আনুপাতিক ক্ষতিপূরণের অধিক আদায় করিতে পারে না। সম্পদ সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে মাত্র বীমাকৃত মূল্যই ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাইয়া থাকে। কারণ ক্ষতির মূল্য ও বীমাকৃত সম্পদের মূল্য সমান। যেমন উপরের উদাহরণে বাড়ীখানি যদি সম্পূর্ণই ধ্বংস হয় তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ হইবে ১০০০০ : ৪০০০ : : ১০০০০ : ? = ৪০০০ ।

প্রকৃত মূল্যের কম মূল্যের বীমা কবা হইলে তাহাকে নান বীমা (Under Insurance) বলা হয়। গড় বীমাপত্রে ক্ষতির সম্পূর্ণই ক্ষতিপূরণ করা হয় না তাহার কারণ এই যে সম্পদের যে অংশের জন্য বীমা গ্রহণ করা হয় না সেই অংশকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করাব দায়িত্ব থাকে সম্পদের মালিকের। যে অংশের ক্ষতি হইল সে অংশও ত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব মালিকের। কারণ কোন অংশ বীমা করা হইল এবং কোন অংশ বীমা কবা হইল না তাহার উল্লেখ ত আর বীমাপত্রে থাকে না। সুতরাং যে অংশের ক্ষতি পূরণ করা হইল সেই অংশ ক্ষতির হাত হইতে বক্ষা করা দায়িত্বের মাশুল হিসাবেই বীমাকারী অল্পপাত্রে ক্ষতিপূরণ কাটিয়া লয়।

চলমান বীমাপত্র (Floating Policy) : ইহা কেবলমাত্র অগ্নি বীমাতেই চলমান প্রযোজ্য। কোনও ব্যবসায়ীর সম্পদ যদি একাধিক জায়গায় বীমাপত্র রাখা হয় এবং সমস্ত সম্পদই যদি একখানি পলিসি (বীমাপত্র) দ্বারা বীমা করা হয় তাহা হইলে সেইপ্রকার বীমাপত্রকে চলমান (Floating) বীমাপত্র বলে।

তৃতীয়ত, অগ্নিবীমা ক্ষতির পরিমাণ নিরপেক্ষও হইতে পারে। উহাকে বলে নিশ্চিত বীমাপত্র (Specific Policy)। এইপ্রকার বীমাপত্রে ৩। নিশ্চিত বীমাপত্র বীমাপত্রের মূল্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের কম হইলেও, যত মূল্যের জন্য বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়, ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ অগ্নিতে ক্ষতি হইলে সেই মূল্যই দিতে হয়।

চতুর্থত, ব্যাপক বীমাপত্র (Comprehensive Policy) : রাষ্ট্রবিধিব, দাঙ্গা-৪। ব্যাপক হাঙ্গামা প্রভৃতি কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণের বীমাপত্র চুক্তি করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়। তাহাকে ব্যাপক বীমাপত্র বলে।

পঞ্চমত, ফলত লোকসান বীমাপত্র (Consequential Loss Policy): অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে, যতদিন পর্যন্ত ব্যবসায় পুনরুদ্ধারে কার্য করিতে অপারগ হয় ততদিন ব্যবসায় লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সেই লোকসানকে বলা হয় ফলত লোকসান। এইপ্রকার ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য যে বীমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাহাই ফলত লোকসান বীমাপত্র। যে সময়ের জন্য ব্যবসায় মুনাফা আয় করিতে অপারগ হয়, সেই সময়ে গড়ে কত মুনাফা হইতে পারে তাহাই ক্ষতি পূরণের মূল্য। ইহাতে ব্যবসায়ের আকার ও প্রকার বিশেষে কতদিনে পুনরায় লাভ আয় করার অবস্থায় আসিতে পারে, সেই সময় স্থির করিয়া সেই সময়ের গড় মুনাফা বাহির করা হয়। সেই সময়ের লোকসানকেই ফলত লোকসান বলা হয় এবং উহার ক্ষতিপূরণ করা হয়।

(সামুদ্রিক বীমা বা নৌ বীমা (Marine Insurance): অগ্নিবীমার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমা গ্রহীতা (Insured) বীমাদাতার অথবা সামুদ্রিক ও নৌ অবলৈখকের (Insurer অথবা Underwriter) নিকট হইতে বীমা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। সামুদ্রিক বীমায় সমুদ্রপথে জাহাজে মাল চলাচল করিবে কোনও ক্ষতি হইলে জাহাজের মালিক অথবা মালের মালিক বীমাদাতা অথবা অবলৈখকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। অর্থাৎ সমুদ্রের বিপদ হইতে কোনও প্রকার ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি আদায় করিবার পথ-সামুদ্রিক বীমা অথবা নৌ বীমাপত্র গ্রহণ।)

সামুদ্রিক বীমাও ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity)। সামুদ্রিক বীমার ভিত্তিও চরম বিশ্বাস (Uberrimae fidei or Utmost good faith)। সামুদ্রিক বীমায়ও বীমাহিত (Insurable Interest) না থাকিলে কেহ বীমা গ্রহণ করিতে পারে না, তবে বীমাপত্র গ্রহণের পূর্বে বীমাহিত প্রমাণ না করিয়াও সামুদ্রিক বীমাপত্র গ্রহণ করিবার অধিকার বীমা গ্রহীতার আছে। সামুদ্রিক বীমায় বীমাহিত প্রমাণে ইহা একটি ব্যতিক্রম বটে। তবে বীমাকৃত দ্রব্যের কোনও ক্ষতি হইলে বীমাহিত প্রমাণ না করিয়াও বীমাপত্র গ্রহণ করিলে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে কোনও অন্তর্বিধা হয় না। কারণ সেই প্রকার বীমাপত্রকে বীমাপত্রই বীমাহিত প্রমাণক (Policy Proof of Interest) বলে। ইহাতে বীমাপত্র উপস্থাপিত করিলেই দ্রব্যে বীমাহিত (Insurable Interest) প্রমাণিত হয়।

সামুদ্রিক বীমা অন্ত্যস্ত বীমার মত চুক্তি পত্র দ্বারা সম্পাদিত হইলেও চুক্তি সামুদ্রিক বীমায় পক্ষে লিখিত সর্ব ব্যতীতও কতিপয় সর্ব থাকে যাহাকে একেবারে নিহিত সর্ব (Implied Warranty) বলে। একেবারে নিহিত সর্ব পূরণ করিতে না পারিলে সামুদ্রিক বীমাপত্রের অন্ত্যস্ত সর্বও প্রযোজ্য হয় না। সামুদ্রিক বীমায় একেবারে নিহিত সর্বের মধ্যে দুইটির উল্লেখ

প্রয়োজন—প্রথমত, জাহাজের সমুদ্রে চলাচলের সক্ষমতা (Seaworthiness of the ship) ; দ্বিতীয়ত, চুক্তির বৈধতা (Legal Validity of Contract) ।

বীমাপত্র গ্রহণের পূর্বে জাহাজের সমুদ্রে চলাচলের সক্ষমতা প্রমাণ করার ১। জাহাজের আবশ্যক হয়। সমুদ্রে চলাচলের সক্ষমতা যাহাতে বীমাদাতা সমুদ্রে চলাচলের (Insurer) স্থির করিতে পারে তজ্জন্ত তাহার লয়েডস্ পঞ্জী সক্ষমতা (Lloyd's Register) আলোচনা করে। লয়েডস্ পঞ্জীতে (Lloyd's Register) মোটামুটি প্রত্যেকটি জাহাজের জন্ম-ঠিকৃদ্ধি থাকে।

মাল প্রেরণের বৈধতা প্রমাণ করিতে না পারিলে বীমাপত্রের চুক্তির সর্ব প্রয়োগ করা যায় না। কারণ কোন দ্রব্যের আমদানি যদি নিষিদ্ধ হয় এবং সেই দ্রব্য আমদানিকারক যদি বীমা করে তাহা হইলে সেই দ্রব্যের ক্ষতি হইলে ক্ষতি-পূরণ আদায় করা যায় না। কারণ যে দ্রব্য বীমা করা হইল ২। মাল প্রেরণের উহার আমদানিই যখন আইনত অবৈধ, তখন সেই দ্রব্যের বৈধতা ক্ষতিপূরণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং আদালতেও

সেই ক্ষতি পূরণের দাবী গ্রহণীয় হয় না। মনে কর, সরকারের অনুমতি ব্যতীত দেশে স্বর্ণ আমদানি বা দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানি আইনসিদ্ধ নহে। কেহও যদি সরকারের অনুমতি-পত্র না লইয়া স্বর্ণ আমদানি রপ্তানি করে তাহা হইলে সেইরূপ আমদানি রপ্তানি বীমা করা হইলে উহা আইনত গ্রহণীয় নহে। এইরূপ কোনও আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ক্ষতি হইলে উহা পূরণের জন্য বীমাদাতা (Insurer) দায়ী নহে এবং বীমা গ্রহীতাও দাবি উত্থাপন করিতে পারে না।

এই দুইটি সর্ব বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে না কিন্তু উভয় পক্ষই এই দুইটি সর্ব সম্পর্কে সচেতন। কারণ অন্ত্যান্ত সর্ব পূরণ হইলেও এই দুইটি সর্বের ব্যতিক্রম হইলে বীমাপত্রের চুক্তি কার্যকরী হয় না।

সামুদ্রিক বীমা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে অভাবনীয় সাহায্য করিয়াছে। সামুদ্রিক বীমার অবর্তমানে ব্যবসায়ী সর্বদা ইষ্ট নাম জপ করিত যাহাতে সমুদ্রে জাহাজ কোনও দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ তখন জাহাজ সমুদ্রে বিপদের সম্মুখীন হইয়া কোন ব্যবসায়ীর আমদানি দ্রব্যের ক্ষতি হইলে ক্ষতি পূরণের কোনও উপায় ছিল না।

কাজেই তখনকার যুগে ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকি খুবই বেশী ছিল। বীমা প্রবর্তনের ফলে ঝুঁকি ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার সুবিধা হইয়াছে, কারণ সামুদ্রিক বীমা এখন আর সমুদ্র পথে কোনও জাহাজের ক্ষতি হইলে জাহাজের মালিককে জাহাজের ক্ষতি বহন করিতে হয় না, বা আমদানি কারককেই আমদানিকৃত দ্রব্যের ক্ষতি হইলে সমস্ত ক্ষতি বহন করিতে হয় না, কারণ এখন বীমাকৃত জাহাজ অথবা বীমাকৃত দ্রব্যের ক্ষতি

হইলে সে ক্ষতি বহন করে অসংখ্য বীমা গ্রহীতাগণ অর্থাৎ বীমা কারবারের মক্কেলগণ। মনে কর ৫০ জন মক্কেলের টাকা লইয়াই কোনও বীমা কারবার চলে, উহার মধ্যে মাত্র ১ জন মক্কেলের ক্ষতি হইল। ক্ষতিপূরণ করিল বটে বীমা কারবারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু অর্থের সংস্থান হইল বীমা কারবারীর মক্কেলদের বীমার টাকায়। পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে যে 'ভাগ্যবানের ভাগ্যহীনকে সাহায্য' (Fortunate helping the unfortunate) বীমার মূল কথা। সুঁকি ছড়াইয়া দেওয়ার সুযোগ সামুদ্রিক বীমার থাকাতে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার হয়, ফলে আর্থনানিকারী রকম দেশ ও রপ্তানিকারী দেশ উভয়েরই আর্থিক উন্নতি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য অধ্যায়ে এ বিষয় আলোচনা করা হইবে। সামুদ্রিক বীমা বা নৌ বীমা প্রধানত তিন প্রকারের হইতে পারে।

❖ জাহাজ বীমা (Hull Insurance) : জাহাজ বীমা করা হইলে সমুদ্র পথে জাহাজের কোনও ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করা হয়।

১। জাহাজ বীমা কেবলমাত্র জাহাজ বীমা (Hull Insurance) হইলে জাহাজে যে মাল বহন করা হয় সেই মালের ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করা হয় না।

❖ মাল বীমা (Cargo Insurance) : জাহাজের ক্ষতি না হইয়াও মালের ক্ষতি হইতে পারে। যাহাতে মালের ক্ষতি হইলে ২। মাল বীমা সেই ক্ষতি পূরণ আদায় করা যায় তজ্জন্ত মালের বীমা করা হয়।

❖ মাণ্ডল বীমা (Freight Insurance) : অনেক সময়ে দেখা যায় যে মাল গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে মালের মাণ্ডল দেওয়া হয়। এই নিয়মে মাণ্ডল আদায় করাকে মাণ্ডল দেয় (Freight forward অথবা ৩। মাণ্ডল বীমা Freight due অথবা Freight to pay) বলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মাল গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলেই মাত্র রপ্তানিকারক আর্থনানিকারকের নিকট হইতে মালের ভাড়া আদায় করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে রপ্তানিকারকের মালের ভাড়া আদায় করিতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্তই রপ্তানিকারক মালের ভাড়াও বীমা করিতে পারে। জাহাজ কোনও ক্ষতির সম্মুখীন হইলে রপ্তানিকারক ভাড়া হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থাও বীমা করিয়া রক্ষা করা হয়। এমনও হইতে পারে যে জাহাজের মালিক ভাড়ানা লইয়াই মাল বহন করার চুক্তি করিল। সে ক্ষেত্রে জাহাজের মালিক যাহাতে মাল বহনের ভাড়া হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার জন্ত জাহাজের মালিক ভাড়া বীমা করিতে পারে।

সামুদ্রিক বা নৌ বীমার জন্ম (Birth of Marine Insurance) : পৃথিবীতে

সর্বপ্রথম এবং বিখ্যাত সামুদ্রিক বীমাকারী প্রতিষ্ঠান : সামুদ্রিক বা (Insurance Co.) লয়েডস্ নামে পরিচিত। সামুদ্রিক বীমার নৌ বীমার জন্ম লয়েডস্-এর স্থান। এতই অধিক যে প্রায় প্রত্যেক বীমা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানই লয়েডস্-এর ব্যবস্থাপনায় কোনও বীমা প্রতিষ্ঠান বা বীমাকারীর নিকট

হইতে বীমাপত্র লইতে চাহে। ইহার কারণ এই যে লয়েডস্-এর অধীনে যাহারা নৌ বীমা ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহারা ঝুঁকির পরিমাণ এবং প্রকৃতি এমন সুস্থভাবে বিচার করে যে তাহারা কখনও মনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই ঝুঁকি গ্রহণ করে না। জাহাজ সম্বন্ধীয় সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া যদি জাহাজ বীমা যোগ্য মনে হয় তাহা হইলেই তাহারা বীমা করিতে রাজী হয় নচেৎ নহে।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে জাহাজের 'জন্মটিকুজি' বিচার করিয়া যদি জাহাজ বীমায়োগ্য হয় তাহা হইলেই বীমাপত্র দেওয়া হয়। জাহাজের জন্ম টিকুজি থাকে লয়েডস্ পঞ্জীতে (Lloyd's Registry)। লয়েডস্-এর ব্যবসায় যতদিন গ্রেট ব্রিটেনেই রাজ সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন লয়েডস্ পঞ্জীতে (Lloyd's Registry) কেবল গ্রেটব্রিটেনে তৈয়ারী জাহাজসমূহের টিকুজিই থাকিত। কিন্তু ক্রমশ পৃথিবীর সর্বত্রই লয়েডস্ সামুদ্রিক বীমার ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিল। ফলে আজ পৃথিবীর

প্রায় সকল জাহাজেরই জন্ম বৃত্তান্ত লয়েডস্ পঞ্জীতে (Lloyd's Registry) পাওয়া যায়। কোন্ জাহাজ কোন্ মাল মশলার তৈয়ারী, কোন্ শিল্প-বৈজ্ঞানিক জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন, কোন্ তারিখে জাহাজ তৈয়ারী সমাপ্ত হইয়াছে, কোন্ তারিখে প্রথম জলে ভাসান হইয়াছে, পরে কবে মেরামত হইয়াছে, বর্তমান অবস্থা কিরূপ, ইত্যাদি যে সকল সংবাদ জানা না থাকিলে বীমাকারীর পক্ষে ঝুঁকির পরিমাণ স্থির করা কষ্টকর, সকলই লয়েডস্-এর পঞ্জীতে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক বীমা ব্যবসায়ীদের পক্ষে লয়েডস্ পঞ্জী (Lloyd's Registry) একখানি অমূল্য সম্পদ।

গ্রেট ব্রিটেনে সমুদ্রকূলবর্তী এক পঞ্জীতে একটি কফিখানার মালিক ছিলেন মিঃ লয়েডস্। সমুদ্রকূলবর্তী বলিয়া জাহাজের নাবিক, সওদাগর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সেই কফিখানায় আড্ডা দিত। মিঃ লয়েডস্ লক্ষ্য করিতেন যে নাবিক ও সওদাগরদের আলোচনার বিষয়ই ছিল, সমুদ্রের অবস্থা, কোন্ জাহাজ সমুদ্রে বিপদের সম্মুখীন হইল, কি ভাবে জাহাজ উদ্ধার হইল, কোন্ জাহাজ ডুবিয়া গেল, যে জাহাজ ডুবিয়া গেল তাহাতে কোন্ কোন্ সওদাগরের ক্ষতি হইল, ক্ষতির পরিমাণ কত ইত্যাদি। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেন, যে কোন কোন সওদাগর বা জাহাজের মালিক কফিখানায় আসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেন। অহুসঙ্কানে ভানিতেন যে সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়িয়া জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে কিংবা মালের ক্ষতি হইয়াছে। সেই ক্ষতির জন্তই সওদাগর বা জাহাজের মালিক কাঁদিতেছে। দৈনিক একটি বিষয়ের আলোচনা শুনিতে শুনিতে লয়েডসের মনে সমুদ্রের খবর শুনিবার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইল। কোনও দিন সমুদ্রের খবর না পাইলে তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিত। ফলে নিজেই সমুদ্র বিষয়ক খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্ত 'সংবাদবাহী বালক' (News boy) নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। সংবাদবাহী বালক প্রতিদিন বন্দরে উপস্থিত থাকিত এবং বন্দরের লোকেদের, জাহাজী প্রতিষ্ঠানসমূহের

এ.বং নাবিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমুদ্র এবং জাহাজ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিত এবং লয়েডসের নিকট বিবৃত করিত। কোন কোন দিন জাহাজের দুর্ঘটনা ইত্যাদি মর্মস্পর্ক সংবাদে লয়েডসকে পীড়িত করিত। এমনত অবস্থায় লয়েডসের উদ্ভাবনী শক্তি কার্য করিল।

লয়েডস ভাবিলেন যে জাহাজ ডুবিয়া অথবা অন্তর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত লোকেদের আর্থিক সাহায্য দিতে পারিলে তাহারা পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত। অথচ কাহারও একার পক্ষে এই গুরুভার বহন করা সম্ভব নহে। তাহার কক্ষখানায় জাহাজের নাবিক ও সওদাগরগণ ব্যতীত কতিপয় লর্ড শ্রেণীর ভ্রমলোক ও আড্ডা দিতে আসিতেন। লয়েডস বিছুদিন ধরিয়া সংবাদবাহী বালক (News boy) জাহাজ দুর্ঘটনার যে তথ্যসমূহ বহন করিত তাহা দিনওয়ারী একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। দেখিলেন যে শতকরা হয়ত ১ খানা জাহাজ দৈনিক সমুদ্রে ঝণ্ডাবাত্যা ও ঢেউএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তিনি তাহার মকেলদের মধ্যে যাহারা ধনবান তাহাদের নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। উহা হইল নিয়ম—সকল জাহাজের মালিকদের এবং সওদাগরদের বলা হউক যে তাহারা সমুদ্র গমনোত্তর জাহাজসমূহ এবং জাহাজের মালসমূহ সমুদ্রবক্ষে বাড়ি ঝণ্ডা অথবা অমরূপ কোন দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেই ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি লউন। যাহারা তাহাদের নিকট হইতে এই প্রকার ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি লইতে চাহিবেন তাহারা তাহাদের জবাবের বা জাহাজের মূল্যের নির্দিষ্ট শতকরা হারে টাকা দিবে। তাহা হইলে মনে কর যদি ১০০ খানি জাহাজের মালিক অথবা সওদাগরের নিকট হইতে ৫ টাকা হারে টাকা আদায় হয়, এবং ১ খানা জাহাজ বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে ঐ ৫০০ টাকা প্রয়োগ করা যায়। ধরা যাউক জাহাজের মূল্য বাবদ জাহাজের মালিককে ২০০ টাকা দেওয়া হইল। ৩০০ টাকা উদ্ধৃত্ত রহিল। উহা হইতে আনুমানিক ব্যয় বাদ দিয়া ধরা যাউক ১০০ টাকা; ২০০ টাকা প্রতিশ্রুতিদাতাগণ নিজেদের ভিতর বন্টন করিয়া লইতে পারে। এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিবে যে বীমা গ্রহীতাগণ টাকা হিসাবে যে অর্থ জমা দেয় উহা হইতেই আবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতি পূরণ করা হয়। লয়েডস-এর এই প্রস্তাবে তাহার মকেলদের ভিতরে যাহারা এই ব্যবসায়ের স্বার্থ নিতে রাজী হইল তাহারা একটি সমিতি গঠন করিল।

এই সংবাদ যখন জাহাজের মালিক এবং আমদানি রপ্তানি সওদাগরগণ জানিতে পারিল তখন তাহারা খানিকটা আশঙ্কিত হইল। ক্রমে ক্রমে সেই সকল ব্যক্তি লয়েডসের কক্ষখানায় ভীড় করিতে লাগিল এবং লয়েডসের নিকট অসহস্কান করিতে লাগিল কি ভাবে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ তাহাদের জাহাজ অথবা জাহাজে বাহিত মাল বীমা করা যায়। লয়েড তখন জাহাজের অথবা

মালের অমূল্যমানিক মূল্য জানিতে চাহিতেন। মূল্যের শতকরা হারে মনে কর শতকরা ১০ ভাগ টাকা হিসাবে জমা দাবী করিত। তবে সর্ব এই যে তাহাদের মালের বা জাহাজের কোনও রূপ ক্ষতি না হইলে টাকার অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে না। তাহারা এই সর্ব রাজী হইলে, লয়েডস্ তখন তাহার প্রস্তাবে (যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) যে সকল ব্যক্তি রাজী ছিল তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে সম্ভাব্য ক্ষতির কত অংশ সে ব্যক্তিগতভাবে পূরণ করিতে রাজী তাহা লিখিয়া সহি গ্রহণ করিতেন। মনে কর কোনও সওদাগর তাহার ৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য লয়েডসের সহিত বীমা করিতে ইচ্ছুক হইল। বীমার টাকা বাবদ ৫০০ টাকার দশ-শতাংশ ৫০ টাকা জমা দিল। লয়েডস্ তখন ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঐ ৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যের ক্ষতি হইলে কে কত পূরণ করিবে তাহার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন। একখানা কাগজে বীমা গ্রহীতা (সওদাগরের) নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখা হইত। কি মাল জাহাজে পাঠান হইতেছে বা আনা হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ লেখা হইত। মালের মূল্য লিখা হইত, কোন্ বন্দর হইতে জাহাজ কোন্ বন্দরে যাইবে, কোন্ পথে জাহাজ যাতায়াত করিবে ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ এই কাগজখানিতে লেখা হইত। তাহার নীচে দ্রব্যের মূল্য ৫০০ টাকার মধ্যে মনে কর জনসন শতকরা ১০ ভাগ, রবিনসন শতকরা ২০ ভাগ, উইলিয়ামস্ শতকরা ৫০ ভাগ এবং ডেভিড শতকরা ২০ ভাগ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিল। তাহারা প্রত্যেকে কত অংশ ক্ষতিপূরণ করিতে রাজী তাহা লিখিয়া ঐ কাগজখানির তলায় সহি করিল। এইজন্যই বীমা গ্রহণের ঝুঁকি দাতাদের বলা হয় অবলেখক (Underwriter)। যদি প্রকৃতই এই ব্যক্তির দ্রব্যের ক্ষতি হয় তাহা হইলে এই প্রতিশ্রুতি পত্রখানা লয়েডস্ উপস্থাপিত করিলেই, জনসন প্রমুখ প্রতিশ্রুতিদাতাগণ প্রতিশ্রুত অর্থ লয়েডস্এ জমা দিবে এবং লয়েডস্ ঐ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে বীমা গ্রহীতাকে (Insured) ফেরত দিবে। সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে আর কোন অবলেখকের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয় না। লয়েডসের (Lloyd's) সামুদ্রিক বা নৌ বীমার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ১৬৮৮ সালে।

লয়েডস্এ বীমা গ্রহণের পদ্ধতি (Method of obtaining Lloyd's Policy): লয়েডস্এ বীমাপত্র গ্রহণের জন্য কেহ সরাসরি লয়েডস্ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া বীমাপত্র লইতে পারে না। লয়েডসের স্তন্য লইয়া এবং লয়েডস্ পদ্ধতিতে যে সকল সামুদ্রিক বীমা প্রতিষ্ঠান বীমা করিয়া থাকে তাহারা কখনও বীমা গ্রহীতাদের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে না।

লয়েড বীমাপত্র গ্রহণের নিয়ম লয়েডস্ বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (Agent) সর্বজ থাকে। সেই প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বদা বীমা গ্রহণেছু ব্যবসায়ীদের সন্ধানে থাকে।

বীমা গ্রহণেছু ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জাহাজের অথবা দ্রব্যের বিবরণ গ্রহণ করিয়া

লয়েডসের অবলেখক অথবা বুকিংবাহীদের নিকট পাঠান হয়। বুকিংবাহীগণ তখন দ্রব্যের মূল্য, প্রকৃতি এবং বুকিং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া বীমার চান্দা কি হইবে তাহা স্থির করিয়া প্রতিনিধিকে জানাইয়া দেয়। প্রতিনিধি তখন বীমা গ্রহণেচ্ছু ব্যবসায়ীকে বীমার চান্দা এবং অবলেখকগণের নাম ইত্যাদি জানায়। বীমা গ্রহণেচ্ছু অবলেখকদের সর্ব মানিয়া লইলে অবলেখকগণকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং বীমা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়। লয়েডসের প্রধান কার্যালয় লণ্ডনের লেডেন হল স্ট্রীটে।

বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক বীমাপত্র (Different kinds of Marine Insurance Policy) : অগ্নিবীমায় দেখা হইয়াছে যে চুক্তির সর্ব অস্থায়ী

বিভিন্ন প্রকারের বীমাপত্র গ্রহণ করা যায়। অল্পরপণ্যে, সামুদ্রিক সামুদ্রিক বা নৌ বীমাপত্রও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। বীমাপত্রের রকম উহার মধ্যে যে কয়টি প্রধান তাহা নিয়ে উল্লেখ করা হইল।

প্রথমত, মূল্য নিরূপিত বা মূল্যাক্ত বীমাপত্র (Valued Policy) : মূল্য নিরূপিত বা মূল্যাক্ত বীমাপত্রে যে দ্রব্য বীমা করা হয় তাহার ১। মূল্য নিরূপিত মূল্যের উল্লেখ থাকে। জাহাজ অথবা মাল অথবা উভয়ই যদি বীমা করা হয়, তাহা হইলে জাহাজের মূল্য কত, মালের মূল্য কত ইহা পৃথকভাবে উল্লেখ করা থাকে। যখন ক্ষতিপূরণের দাবী করা হয় তখন বীমাপত্রে লিখিত মূল্য অস্থায়ী ক্ষতিপূরণের হিসাব করা হয়। মনে কর কোনও একখানি জাহাজ বীমা করা হইল। ঐ জাহাজের মূল্য ৫০০০০ টাকা হইলে বীমাপত্রের মূল্য ৫০০০০ টাকা। তেমনি যে দ্রব্য বীমা করা হইল উহার মূল্য যদি ২৫০০০ টাকা হয় তাহা হইলে মাল বাবদ বীমাপত্রের মূল্য ২৫০০০ টাকা।

দ্বিতীয়ত, অনিরূপিত বীমাপত্র বা মুক্ত বীমাপত্র (Unvalued Policy or Open Policy) : পূর্ব লিখিত উপায়ে বীমাকৃত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ না করিয়া দ্রব্যের অথবা জাহাজের অস্থানিক মূল্য ধরিয়াও বীমাপত্র গ্রহণ করা যায়। বীমাপত্রে অবশ্য একটি মূল্যের উল্লেখ থাকে কিন্তু সেই মূল্যই যে বীমাকৃত দ্রব্যের

২। মূল্য প্রকৃত মূল্য তাহা নহে। তবে বীমাকৃত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণের অনিরূপিত দাবী উপস্থাপিত হইলে বীমাকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা বীমাপত্র হয়। অস্থানিক মূল্যের উপর বীমার চান্দা দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থাপিত হইলে যদি দেখা যায় বীমার অস্থানিক মূল্য প্রকৃত মূল্য হইতে কম তাহা হইলে যে অতিরিক্ত মূল্য বীমাপত্র দ্বারা সংরক্ষিত হয় তাহা তাহার অন্তর্গত পরিপূরক বীমাপত্র (Supplementary Policy) গ্রহণ করিতে হয় এবং পরিপূরক বীমাপত্রের মূল্যের উপর বীমার চান্দা দিতে হয়। কিন্তু যদি প্রকৃত মূল্য অস্থানিক মূল্যের কম হয়, তাহা হইলে যে অতিরিক্ত মূল্যের অন্তর্গত অতিরিক্ত বীমার চান্দা দেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরত পায়। প্রকৃত মূল্য

অধিক মূল্যের জ্ঞান বীমা গ্রহণ করা হইলে তাহাকে বলে অধিবীমা (Over Insurance)। মনে কর, কোনও একখানি জাহাজ বীমা করা হইল। উহার প্রকৃত মূল্য ১ লক্ষ টাকা। কিন্তু অনির্ধারিত বীমাপত্র বলিয়া অল্পমানিক ৮০০০০ টাকায় বীমাপত্র গ্রহণ করা হইল। বীমার চাঁদাও ৮০০০০ টাকার উপর দেওয়া হইল। যখন এই জাহাজখানির জ্ঞান ক্ষতিপূরণের দাবী করা হইবে, তখন ইহার প্রকৃত মূল্য ১ লক্ষ টাকার জ্ঞান বীমাপত্র লইতে হইলে ২০০০০ টাকার একখানি পরিপূরক বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বীমাকালে ৮০০০০ টাকা মূল্যের জ্ঞান ৫০০ টাকা চাঁদা দিতে হয় তাহা হইলে ১ লক্ষ টাকার উপর আরও ১২৫ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। কিন্তু, যদি বীমাপত্রের মূল্য ১২০০০০ টাকা হইত, এবং বীমার চাঁদা ৭৫০ টাকা হইত তাহা হইলে ২০০০০ টাকা অধিবীমার (১২০০০০ - ১০০০০০ - ২০০০০) উপর চাঁদা ১২৫ টাকা বীমাগ্রহীতা ফেরত পাইতে।

তৃতীয়ত, মিয়াদী বীমাপত্র (Time Policy) : মিয়াদী বীমাপত্রে বুকের মিয়াদ এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহাতে নির্দিষ্ট মিয়াদেব মধ্যে জাহাজ যতবার ইচ্ছা দুইটি নির্দিষ্ট বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করিতে পারে। তবে জাহাজকে এক নির্দিষ্টপথে যাতায়াত করিতে হয়। ইহার সুবিধা এই যে জাহাজখানি যে কয়বার দুইটি বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করিবে প্রত্যেক যাত্রার জ্ঞানই পৃথকভাবে বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হয় না। মনে কর জলউষা জাহাজখানি মিয়াদী বীমাপত্রে বীমা করা হইল। উহার মিয়াদ ১ বৎসর কাল। বীমাপত্র গ্রহণের তাবিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯৬১। জাহাজখানি কলিকাতা এবং লণ্ডন বন্দরদ্বয়ের মধ্যে স্বেচ্ছ পথে (Suez Route) যাতায়াত করিবে। এই বীমাপত্রের মিয়াদ ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬১। ইহার মধ্যে যতবার ইচ্ছা স্বেচ্ছ পথে কলিকাতা বন্দর ও লণ্ডন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করিতে পারিবে। প্রত্যেক যাত্রার জ্ঞান পৃথক পৃথক বীমা করিয়া বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হইবে না।

চতুর্থত, যাত্রা বীমাপত্র (Voyage Policy) : যাত্রা বীমাপত্রে দুইটি নির্দিষ্ট বন্দরের মধ্যে চলাচলের সময়ে কোনও ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি থাকে। ইহাতে এক বন্দর হইতে অন্য কোনও নির্দিষ্ট বন্দরে জাহাজ নিরাপদে পৌঁছিলেই বীমাকারী বা বীমান্তার (Insurer) দায়িত্ব শেষ হয়। তবে জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পরও নির্দিষ্ট স্থিতিকাল (Lay days) পর্যন্ত বীমান্তার দায় থাকে। স্থিতিকাল বলিতে সেই সময়কে বুঝায় যে সময় জাহাজে মাল তুলিতে অথবা জাহাজ হইতে মাল নামাইতে আবশ্যক হয়। সাধারণত জাহাজ বন্দরে ভিড়িলে ৩ দিন (৭২ ঘণ্টা) স্থিতিকাল বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে স্থিতিকাল উক্ত পক্ষের মধ্যে চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

মনে কর, একখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে ভ্যানকুভার বন্দরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বীমা করা হইল। কলিকাতা বন্দর হইতে যদি জাহাজ বীমা করা হয় তাহা হইলে কলিকাতা বন্দরে মাল তোলা আরম্ভ হইলে বীমাদাতার দায় আরম্ভ হইবে এবং ভ্যানকুভার বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়া মাল নামান হইলে তাহার দায় সমাপ্তি হইবে। সামুদ্রিক বীমায় বেশীর ভাগ বীমাপত্রই যাত্রা বীমাপত্র (Voyage Policy)।

জীবন বীমা (Life Assurance) : একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে জীবন বীমা অগ্নাত বীমার মত ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে। জীবন বীমার নীতি অবশ্যই অগ্নাত বীমা হইতে পৃথক। জীবন বীমায় জীবনের কোন ক্ষতি না হইলেও অর্থাৎ মৃত্যু না ঘটিলেও বীমাকৃত অর্থ পাইতে সক্ষম। এতদ্ব্যতীত জীবন বীমা যে সর্বের উপর সম্পাদিত হয় উহা অগ্নাত বীমার সর্ব হইতে পৃথক নহে। যথা,

বীমায় বীমাস্থিত, চরম বিশ্বাস এই দুইটি সর্ব পূরণ না জীবনবীমা হইলে বীমা কার্যকরী হয় না। জীবন বীমায় বীমাহিতের পরিসর একটু অধিক। যেমন পিতা পুত্রের জীবনে পরস্পরের বীমাহিত, স্বামীর জীবনে স্ত্রীর বীমাহিত, এমন কি দেনাদারের জীবনে পাওনাদারের বীমাহিতও আইনত স্বীকৃত।

জীবন বীমায়ও অগ্নাত বীমার ন্যায় সকল আবশ্যকীয় তথ্য অকপটে প্রকাশ করিতে হয়। জীবন বীমায় বীমাগ্রহীতার বয়স ও স্বাস্থ্য বিষয় কোনও তথ্য পরবর্তীকালে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে বীমাকারী বীমার মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়। জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতার প্রকৃত বয়স ঘোষণা করার গুরুত্ব খুবই বেশী, কারণ ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বীমার টাঙ্গার হার ভিন্ন ভিন্ন। একজন ২০ বয়স্ক যুবকের জীবন বীমা করিতে হইলে যে টাঙ্গা দিতে হইবে একজন ৬০ বয়স্ক বৃদ্ধের জীবন বীমা করিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশী টাঙ্গা দিতে হইবে। ইহার কারণ দুইটি—প্রথমত জীবনের গড় আয়ু ধরিয়া লইলে ২০ বৎসরের যুবকের দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকার সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু একজন ৬০ বয়স্ক বৃদ্ধ আর কতদিন পৃথিবীর আলো দেখিবেন তাহা বলা কঠিন। কেবলমাত্র বয়স সত্যভাবে বিবৃত করিলেই চলিবে না, স্বাস্থ্যের অবস্থাও অকপটে বিবৃত করিতে হয়। কারণ বয়সের সহিত স্বাস্থ্যের অঙ্গাদ্বী সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মানুষের জীবনকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়। বাড়তি (period of growth) জন্ম হইতে ৩৫-৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সাধারণত শরীরের উন্নতি দৃষ্ট হয়। ঐ জন্ম ঐ বয়সকে বাড়তির বয়স বলা হয়।

স্থিতিাবস্থা (Static period) : ৪০ হইতে ৫৫ বৎসর পর্যন্ত বয়সকে বলা যায় স্থিতিাবস্থা। এই বয়সে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না বটে, তবে স্বাভাবিক অবস্থায় শরীর

মোটামুটি একটানা চলিতে থাকে। ৫৫ হইতে পরবর্তী কালকে বলা যায় ক্ষয় অবস্থা (Period of decay)। চলতি কথায় বলা হয় জীবনের ভাটার টান। সুতরাং জীবনের আয়ুষ্কাল যতই মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হইতে থাকে জীবন বীমার দায়িত্বও ততই বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, অন্তান্ত বীমা ব্যবসায়ে বীমা গ্রহীতার নিকট হইতে যে টাকা বাবদ অর্থ পাওয়া যায় উহা হইতে বীমাকৃত দ্রব্যের কোন ক্ষতি না হইলে কিছুই ফেরত দেওয়া হয় না। কিন্তু জীবন বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Contract of Indemnity) নহে বরং

জীবনবীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নহে

বলিয়া ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে সে কথা প্রয়োজ্য হয় না। চুক্তির রকম অনুসারে বীমা গ্রহীতাকে এক নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমা গ্রহীতাকে অথবা তাহার মৃত্যুর পর তাহার

উত্তরাধিকারীকে বীমাকৃত অর্থ ফেরত দিতে হয়। বীমার টাকা খাটাইয়া যে আয় হয় তাহা হইতে ব্যবসায় পরিচালনের ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ। সুতরাং বীমাকারী যত দীর্ঘদিন বীমার টাকা খাটাইতে পারে তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল। বীমার টাকার হার নির্ধারণে হ্রদের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কারণ বীমার টাকা খাটান হয় বটে কিন্তু এমত ভাবে খাটাইতে হয় যাহাতে প্রয়োজন মত সেই বিনিয়োগ (Investment) নগদান অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আমাদের দেশে বহু জীবন বীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের বিনিয়োগ এমন ঋটিপূর্ণ ছিল যে প্রয়োজন মত বিনিয়োগ নগদান অর্থে রূপান্তর সম্ভব হয় নাই এবং বীমা গ্রহীতাদের সহিত চুক্তি মত বীমার অর্থ পরিশোধ করিতে পারে নাই। এই কারণেই ভারত সরকার ১৯৩৮ সালে আইন পাশ করিয়া বীমা কারবারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারের ঋণপত্রে জীবন বীমার টাকার শতকরা ৫৫ ভাগ বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, বীমার টাকা চক্রবৃদ্ধি হ্রদের নিয়মে খাটান হয়। সুতরাং বীমার হার স্থির করা হয় বয়স এবং হ্রদের হার দ্বারা। কোন বয়সের লোকের পক্ষে বীমার টাকা কি হইবে তাহা বীমাগণিতজ্ঞ (Actuary) স্থির করিয়া থাকে।

জীবন বীমায় বীমাকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করে—

(১) চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞাত চুক্তি করা হইলে সেই চুক্তির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে; (২) মৃত্যু ঘটিলে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞাত বীমা গ্রহণ করা হইলেও সেই চুক্তির মিয়াদের মধ্যে যে কোনও সময়ে বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী বীমাকৃত অর্থ পাইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের জীবন বীমা (Different Kinds of Life Assurance) : জীবন বীমাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মিয়াদী (Endowment), দ্বিতীয়ত, আয়ুত্যা (Whole life), তৃতীয়ত, বার্ষিক বৃত্তি।

মিষাদী জীবন বীমাপত্র (Endowment Life Policies)—মিষাদী বীমাপত্রে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত কিস্তীতে চাঁদা (premium) আদায় দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বীমা গ্রহীতা (Assured) এবং বীমাকারীর (Assurer) মধ্যে

চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। নিয়মিত কিস্তীবন্দীতে চাঁদা আদায়

মিষাদী জীবন বীমা হইলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমা গ্রহীতা বীমার অর্থ পাইয়া থাকে। তবে যদি বীমা গ্রহীতার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারী বীমাকৃত অর্থ পাইয়া থাকে। কিন্তু যদি বীমা গ্রহীতা বীমা গ্রহণের পর বীমাপত্র জামানত রাখিয়া কোনও ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পাওনাদারই বীমাকৃত অর্থ আদায় করিবে। আদায়ীকৃত অর্থ যদি পাওনাদারের পাওনার বেশী হয় তাহা হইলে তাহার পাওনা শোধ হওয়ার পর যাহা বাকী থাকিবে তাহা বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারীকে দিতে হইবে।

অনেক সময় বীমাপত্র গ্রহণ করিবার সময়ে বীমাকৃত অর্থ মিষাদের মধ্যে বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হইলে কে পাইবে তাহার উল্লেখ থাকে না। বীমা গ্রহীতা দুই উপায়ে তাহার বীমাপত্রের স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারে : (১) স্বত্বার্পণ দ্বারা (by assignment), (২) মনোনয়ন দ্বারা (by nomination)। বীমা

গ্রহীতা বীমাপত্র জামানত রাখিয়া ঋণ করিলে স্বত্বার্পণ দ্বারা বীমার স্বত্ব হস্তান্তর করা হয়, সাধারণভাবে মৃত্যুর

১। স্বত্বার্পণ পর কোনও নিকট আত্মীয়কে মনোনয়ন করিয়া বীমাপত্রে

২। মনোনয়ন উল্লেখ থাকে এরূপক্ষেত্রে সেই মনোনীত ব্যক্তিই বীমাকৃত অর্থ পাইবে। জ্ঞী, পুত্র, স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি যে কেহকেই মনোনীত বলিয়া বীমাপত্রে উল্লেখ করা যায়। সুতরাং কোনও ব্যক্তি মিষাদী বীমাপত্র (Endowment Policy) ক্রয় করিলেও মিষাদের পূর্বে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বত্বার্পণ দ্বারা স্বত্বাধিকারী (Assignee) বীমার মূল্য পাইয়া থাকে। বীমাপত্র গ্রহণকালে মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বত্ব গ্রহীতার (Assignee) নাম উল্লেখ না থাকিলে উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্র (Succession Certificate) না পাইলে উত্তরাধিকারী বীমাকৃত অর্থ আদায় করিতে পারে না।

আমৃত্যু বীমাপত্র (Whole Life Policy) : আমৃত্যু বীমাপত্রে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই নিয়মিত কিস্তীতে বীমার চাঁদা দিতে হয়। ইহাতে বীমার চাঁদা সাধারণত মিষাদী বীমার চাঁদার হারের কম হয়। আমৃত্যু বীমাপত্রেও বীমাগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি (Assignee) বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বীমাকৃত অর্থ আদায় করিতে পারে। এই প্রকার বীমাপত্রের অর্থ

বীমাগ্রহীতা তাহার জীবদ্দশায় ভোগ করিতে পারে না।

আমৃত্যু বীমাপত্র আমৃত্যু বীমাপত্র দ্বারা মধ্যবিস্তৃত ঘরের লোকেরা পরিবারের

নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যুর পর কিঞ্চিৎ অর্থের সংস্থান করে।

মিলাদী বীমা : মৃত্যুর পর বীমার মূল্য দেয় (Endowment Policy Payable after death) : যাহারা নিজেদের জীবদ্দশায় বীমার অর্থ ভোগ করিতে চাহে না এবং কেবলমাত্র পরিবারবর্গের জন্য অর্থ মিলাদী বীমা মৃত্যুর সংস্থানের উপায় হিসাবে বীমাপত্র গ্রহণ করে তাহারা পর দেয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বীমাপত্র গ্রহণ করে বটে কিন্তু বীমাকৃত অর্থ আদায় হইবে তাহার মৃত্যুর পর।

বার্ষিক বৃত্তি (Annuity) : বীমাগ্রহীতা বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয় করিতে অক্ষম হইলে যাহাতে প্রতিমাসে কিছু কিছু অর্থের সংস্থান হয় তাহার জন্য বার্ষিক বৃত্তি নিয়মে বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে এককালীন কিছু অর্থ বীমাকারীকে দিয়া থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে বীমাগ্রহীতা প্রতিমাসে কিছু কিছু অর্থ বীমাকারীর নিকট হইতে পাইয়া থাকে।

বীমা সঞ্চয়ের উপায় (Assurance as a means of Savings) : মধ্যবিত্ত ঘরের লোকের পক্ষে প্রতিমাসে কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। যদিও অর্থনীতি ও কুটনীতিবিশারদ চাকর্য বলিয়াছেন যে আয়ের ১/৪ অংশ নিজের জন্য, ১/২ অংশ পরিবারের জন্য এবং ১/৪ অংশ সঞ্চয়ে প্রয়োগ করিবে। অনেক বীমা ও সঞ্চয় সময়ে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহকর্তার মৃত্যু হইলে পরিবারবর্গ চরম দুর্দশায় সম্মুখীন হয় এবং সাধারণের সাহায্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। এই কারণে মধ্যবিত্ত ও স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকের পক্ষে জীবন বীমা একটি মঙ্গলস্বরূপ কাজ করে। জীবন বীমা করিলে বীমার টাকা পরিশ্রমিত অর্থকে জোরপূর্বক সঞ্চয় (Compulsory বা Forced Saving) বলা হয়।

মূল্যাকার বীমা গ্রহীতার অংশ গ্রহণ : বীমা গ্রহীতার টাকার অর্থ বিনিয়োগ করিয়াই বীমা কারবারী প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বেচ্ছায় বীমাগ্রহীতা কারবারের লাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যদি বীমার সর্ভে লাভে অংশ গ্রহণের অধিকার বীমা মূল্যাকারী গ্রহীতাকে দেওয়া না হয় তাহা হইলে কেহ লাভের অংশ দাবী করিতে পারে না। বীমাগ্রহীতা ইচ্ছা করিলে লাভের অংশ গ্রহণের দাবী ত্যাগ করিয়াও বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে। এই বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতাকে লাভে অংশ গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয় সেই বীমাপত্রকে সলাভ (With Profit) বা মূল্যাকা সমেত এবং যে বীমাপত্রে বীমাগ্রহীতা মূল্যাকার অংশ গ্রহণ করিতে রাজী নহে সেই বীমাপত্রকে মূল্যাকা বিহীন বা লাভবিহীন (Without Profit) বীমাপত্র বলে। সলাভ বা মূল্যাকা সমেত বীমার টাকার হার মূল্যাকা বিহীন বীমার টাকার হারের তুলনায় কিছুটা অধিক।

মিরাদী এবং আয়ত্ম বীমা উভয়ই সলাভ এবং লাভবিহীন হইতে পারে। তাহা হইলে সাধারণত জীবন বীমাপত্র চারি প্রকারের হয় : (১) সলাভ মিরাদী বীমাপত্র (With Profit Endowment Policy), (২) লাভবিহীন মিরাদী বীমাপত্র (Without Profit Endowment Policy), (৩) সলাভ আয়ত্ম বীমাপত্র (With Profit Whole Life Policy), (৪) লাভবিহীন আয়ত্ম বীমাপত্র (Without Profit Whole Life Policy) ।

জীবন বীমার অধিলাভ (Bonus in Life Assurance) : জীবন বীমার মূল্যফাকেই অধিলাভ বলা হয়। প্রত্যেক জীবন বীমা ব্যবসায় কারবারকে প্রতি ৫ বৎসরে একবার সম্পদ ও দায়ের হিসাব নিকাশ করিতে হয়। হিসাব নিকাশ কালে যদি দেখা যায় যে বীমা গ্রহীতার এবং অন্তান্ত দায় মিটাইয়াও ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ থাকিবে অধিলাভে অংশ তাহা হইলে বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে সেই লাভের অংশ গ্রহণ অধিলাভ বা বোনাস হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। অধিলাভ বীমাপত্র চালু থাকিলে সকল প্রকার সলাভ বীমাপত্র গ্রহীতাদেরই বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। তবে অধিলাভ কাহাকেও নগদান দেওয়া হয় না, উহা বীমার মূল্যের সহিত জমা করিয়া রাখা হয়। যখন বীমাপত্রের অর্থ পাওনা হয় তখন বীমার অর্থের সহিত অধিলাভও শোধ করা হয়।

বীমাপত্রের মূল্য অন্যান্য ১০০০ টাকা হইতে হয়। অধিলাভও প্রতি হাজার টাকা মূল্যের বীমাপত্রের উপর প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার দেওয়া হয়। অবশ্য অধিলাভ দেওয়া বাধ্যতামূলক নহে। কারবারের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী যদি সম্পদ দ্বারা সকল দায় মিটাইবার সম্ভাবনা থাকে তবেই অধিলাভ দেওয়া হয়; নচেৎ নহে। প্রতি ১০০০ টাকায় যদি ৪০ টাকা অধিলাভ ঘোষণা করা হয় তাহা হইলে যাহার ১০০০০ টাকার বীমাপত্র আছে সে অধিলাভ হিসাবে ৪০০ টাকা পাইবে।

একক জীবন এবং যৌথ জীবন বীমা (Single Life and Joint Life Assurance) : কোন এক ব্যক্তির মাত্র জীবন বীমা করিয়া যে বীমাপত্র দেওয়া হয় তাহাকে একক জীবন বীমাপত্র বলে। একক জীবন বীমাপত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি, তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বত্বার্পণ দ্বারা স্বয়ং একক জীবন বীমা গ্রহীতা অথবা উত্তরাধিকারীই মাত্র বীমাকৃত অর্থ পাইতে পারে। বীমার ফলভোগী বীমাপত্রে উল্লেখ থাকে অথবা উত্তরাধিকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির জীবনও এক বীমাপত্রে বীমা করা যায়। সেই প্রকার বীমাকে যৌথ জীবন বীমা বলে (Joint Life Assurance)। এবং যৌথ জীবন বীমা করিয়া যে বীমাপত্র দেওয়া হয় তাহাকে যৌথ জীবন বীমাপত্র (Joint

Life Assurance Policy) বলে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী ও স্ত্রীর জীবন একই বীমাপত্র দ্বারা বীমা করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে যৌথ জীবন বীমা বীমাকৃত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে কাহারও মৃত্যু হইলে বীমা-গ্রহীতাদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিগণ বীমার মূল্য পাইয়া থাকে।

যৌথ জীবন বীমার উপকারিতা সর্বাধিক অল্পভূত হয় অংশীদারী ব্যবসায়ে। অংশীদারী ব্যবসায়ে কোনও একজন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অংশীদারের সম্পূর্ণ পাওনা শোধ করিতে হয়। কোনও অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে যাহাতে তাহার পাওনা পরিশোধ করিতে প্রয়োজনীয় নগদান অর্থের সংস্থান করিতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্মই যৌথ বীমা গ্রহণ করা হয়। ফলে অংশীদারের মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা আইনত প্রতিনিধিকে (Legal Representative) পাওনা অর্থ শোধ করিতে ব্যবসায়ের কোনই অসুবিধা হয় না। যৌথ জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে মিয়াদকালে কাহারও মৃত্যু না ঘটিলে মিয়াদ অন্তে সকল বীমাগ্রহীতা যৌথভাবে বীমাকৃত অর্থ পাইয়া থাকে। যৌথ জীবন বীমা মিয়াদী বীমাই হয়।

জীবন বীমার কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় :

প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender Value) : জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীমার টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতিতে বীমাপত্র গ্রহণ করিলেও কোন কারণে বীমাপত্র চালু রাখিতে অনিচ্ছুক হইলে অথবা অপারগ হইলে মিয়াদের পূর্বেও বীমাকারীকে বীমাপত্র ফেরত দিতে প্রত্যর্পণ মূল্য পাবে। এইরূপ ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা যে বীমার টাকা আদায় দিয়াছে তাহা হইতে সম্পূর্ণই যাহাতে বঞ্চিত না হয় তজ্জন্ম প্রত্যর্পণ মূল্যের ব্যবস্থা। কোনও বীমাপত্রেব প্রত্যর্পণ মূল্য বীমাকারীর সহিত বীমা গ্রহীতার চুক্তি দ্বারাই স্থির হয়। তবে প্রত্যেক বীমা গ্রহীতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন হারে প্রত্যর্পণ মূল্য স্থির করা হয় না। প্রত্যেক বীমা ব্যবসায়েই প্রত্যর্পণ মূল্যের এক স্থির নিয়ম থাকে। ১৯০৮ সালের বীমা আইন পাশ হওয়ার ফলে, আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক বীমা ব্যবসায়ে অনধিক ৩ বৎসর কাল বীমার টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হইলেই বীমাপত্রে প্রত্যর্পণ মূল্য জন্মায়। প্রত্যর্পণ মূল্য স্থিরীকরণেও ভিন্ন ভিন্ন বীমা কার্যবার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। তবে মোট যে টাকা আদায় হয় উহা হইতে প্রথম বৎসরের টাকা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহার উপর শতকরা ৪০ হইতে ৯০ ভাগ পর্যন্ত প্রত্যর্পণ মূল্য হইতে পারে। মিয়াদের মধ্যে যত অধিক দিন বীমাপত্র চালু থাকে প্রত্যর্পণ মূল্যও তত বেশী হয়। ন্যূনতম কয়েক বৎসর চালু না থাকিলে প্রত্যর্পণ মূল্য দাবী করা যায় না। জীবনবীমার বেলাই মাত্র প্রত্যর্পণ মূল্য দেওয়া হয় অথবা দাবী করা যায়, অন্য কোনও প্রকার বীমায় প্রত্যর্পণ মূল্য জন্মায় না। বীমাপত্র প্রত্যর্পণ মূল্য হিসাবে গণ্য করিতে

হইলে বীমাগ্রহীতার বীমাকারীকে বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিতে হয়। প্রত্যর্পণ পত্রে (Surrender Form) সহি করিয়া বীমাকারককে জমা দিতে হয়। বীমাকারীর কার্যালয়ে প্রত্যর্পণ পত্র জমা দিলেই প্রত্যর্পণ কার্যকরী হয়।

আদায়ীকৃত বীমাপত্র (Paid up Policy) : জীবন বীমায় বীমা গ্রহীতা কোনও কারণে বীমা চালু রাখিতে অনিচ্ছুক হইলে অথবা বীমার চান্দা শোধ করিতে অপারগ হইলে বীমাকারীকে বীমাপত্র আদায়ীকৃত (Paid up) বলিয়া গণ্য করিবার জ্ঞা অম্বরোধ করিতে পারে। বীমাপত্র আদায়ীকৃত বীমা আদায়ীকৃত বলিয়া গণ্য করা হইলে বীমাগ্রহীতাকে আর চান্দা দিতে হয় না। আদায়ীকৃত মূল্য পাইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও বীমাপত্রকে আদায়ীকৃত বীমাপত্রে পরিণত করার জ্ঞা বীমাকারীর নিকট আবেদন করিতে হয় এবং বীমাকারী অম্বমোদন করিলে আদায়ীকৃত বীমাপত্রের দলিল সম্পাদন করিতে হয়। আদায়ীকৃত বীমাপত্র দলিলের নির্দিষ্ট প্রপত্র (Form) আছে।

স্বত্বাৰ্পণ (Assignment) : বীমার চান্দা যত বেশী শোধ করা হয় বীমার প্রত্যর্পণ মূল্যও তত অধিক হয়। বীমাপত্রও বীমাগ্রহীতার নিবট একটি সম্পদ বিশেষ। কারণ উহার আর্থিক মূল্য আছে। কোনও বীমাগ্রহীতা ইচ্ছা করিলে বীমাপত্রের স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া ধার লইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে স্বত্বাৰ্পণ বীমাপত্রই জামানত হিসাবে ঋণদাতাকে স্বত্বাৰ্পণ করা হয়। ঋণদাতাই হয় ভুখন বীমার মূল্য প্রাপক। তবে বীমা গ্রহীতাকে নিয়মিত বীমার চান্দা আদায় দিতে হয়।

বীমাপত্র স্বত্বাৰ্পণ করিতে হইলে স্বত্বাৰ্পণ পত্রে (Assignment Form) সহি করিয়া নির্দিষ্ট ফী (সাধারণত ১ টাকা) জমা দিতে হয়ে এবং উহা বীমাকারকের কার্যালয়ে জমা দিতে হয়। স্বত্বাৰ্পিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা স্বত্বগ্রহীতার অম্বকূলে বীমাপত্র পিছন সহি করিয়া ঋণদাতার নিকট জমা রাখিতে হয়।

বীমাপত্র স্বত্বাৰ্পণ হইলে পাওনাদার বীমার মিয়াদ অন্তে বীমাগ্রহীতার পক্ষে বীমাকারীর নিকট হইতে বীমার মূল্য আদায় করিয়া তাহার পাওনা কাটিয়া রাখিয়া বাকী অংশ বীমাগ্রহীতাকে ফেরত দেয়।

বীমাপত্র জামানত রাখিয়া ঋণ দেওয়া হইলে প্রত্যর্পণ মূল্যের উপর ঋণের পরিমাণ নির্ভর করে। যাহার অম্বকূলে স্বত্বাৰ্পণ করা হয় তাহাকে বলা হয় স্বত্বগ্রহীতা (Assignee) আর যে স্বত্বাৰ্পণ করে তাহাকে বলে স্বত্বদাতা (Assignor)।

অস্বয়ংক্রিয় চলতি বীমাপত্র (Automatic Non-forfeiture Policy) : বীমাগ্রহীতা বীমার চান্দা নিয়মিত শোধ করিতে অপারগ হইলেও যাহাতে বীমায় তাহার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার ব্যবস্থাও প্রায় প্রত্যেক বীমাকারীরই থাকে। ইহাতে বীমার

প্রত্যর্পণ মূল্য জন্মিলেই বীমা স্বয়ংক্রিয় উপায়ে চালু থাকে। প্রত্যর্পণ মূল্য হইতে বীমা গ্রহীতাকে ঋণ দিয়া বীমার চাঁদা শোধ করা হয় এবং বীমা চালু রাখা হয়। যতদিন প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender Value) দ্বারা অনাদায়ী চাঁদা শোধ করা যায় ততদিনই স্বয়ংক্রিয় উপায়ে বীমা চালু রাখা হয়। যখন প্রত্যর্পণ মূল্য দ্বারা আর বীমা চালু রাখা যায় না তখন বীমাগ্রহীতাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে বীমার চাঁদা আদায় না দিলে বীমাপত্র নষ্ট (Lapse) হইয়া যাইবে।

ভারতে জীবন বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রায়করণ (Nationalisation of Life Insurance Business in India) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশেষত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্তির গণ্ডি পৌঁছিবার মুখে ভারত সরকার জীবন বীমা রাষ্ট্রায়করণে (জাতীয়করণে) বীমা ব্যবসায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন (Life Insurance Corporation—L.I.C.) নামে একটি স্বাধীন সংস্থা স্থাপন করিয়া উহার হাতে জীবন বীমা ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। ঐ সংস্থাটি ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে। স্বাধীন সংস্থা হইলেও কর্পোরেশনটির ব্যবস্থাপনার নীতি সমগ্রই ভারত সরকারের অর্থদপ্তর (Finance Ministry) হইতে স্থির হয়।

জাতীয়করণের উদ্দেশ্যের মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্পে সহজে মূলধন সংগ্রহ করা। অবশ্য রাষ্ট্রায়করণ না হইলে জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পে মূলধনের অভাব হওয়ার কোন কারণ ছিল বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করে না। কেননা জীবন-
১। রাষ্ট্রীয় শিল্পের বীমা আইন অনুসারে জীবন বীমা তহবিলের অনানু-
মূলধন সংস্থান ৪৫ ভাগ ভারত সরকারের প্রত্যর্থ পক্ষে বিনিয়োগ করা
বাধ্যতামূলক।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল বীমা গ্রহীতাদের স্বার্থ রক্ষার পথ দৃঢ়তর করা। বীমা গ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা করা সকল দেশের সরকারেরই কর্তব্য
২। বীমা গ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়-
করণের ফলে বীমা গ্রহীতার স্বার্থ দৃঢ়তরভাবে রক্ষা হইতেছে কিনা তাহা লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের বিনিয়োগ ক্রটি দ্বারাই অনুসৃত হয়। বিনিয়োগ ক্রটি লোকসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এ বিষয় অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন বোর্ড কমিশন বসান হইয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত। আর সরকারী দপ্তরের লাল কিতার (Red Tape) আওতায় বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হইলে বীমামূল্য আদায় করিতে যে কিভাবে নাজেহাল হইতে হয় তাহারও দুই-চারিটি নিদর্শন সংবাদপত্র পাঠকগণ জানেন।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল জীবন বীমা ব্যবসায় পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করা।

৩। পরিচালনার উদ্ভোগে ব্যবসায় পরিচালিত হইলে ব্যবসায়ী যে মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা করে সে মিতব্যয়িতা রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগের ব্যয় হ্রাস শিল্প হইতে আশা করা যায় না। মিতব্যয়িতা রাষ্ট্রীয়করণ না করিয়া জীবন বীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কতিপয় একত্রীকরণ করিলেই বোধ হয় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত। আর্থিক দুর্বল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সম্বল প্রতিষ্ঠানের সহিত একত্র করিলে বোধ হয় অধিক মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবসায় পরিচালিত হইত।

চতুর্থত, জীবন বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া বীমা গ্রহীতাদের টাকা দ্বারা ফটকাবাজী করার ঝুঁকি বন্ধ করা ভারত সরকারের একটি শুভ কল্পনা ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণের দুই বৎসরের মধ্যেই লাইফ ইনসিওরেন্স ৪। ফটকাবাজী কর্পোরেশনের এবং ভারত সরকারের কতিপয় উদ্বৃত্তন কর্মচারীর বিরুদ্ধে জীবনবীমা তহবিল লইয়া ছিনিমিনি খেলার যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ লোকসুভায় বিরোদ্ধ গান্ধী উপস্থিত করিলেন তাহাতে লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের পরিচালনাব ক্ষমতা ও সততার উপর অনেক বীমা-কারীর বিশ্বাসই অটুট থাকে নাই।

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন ৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত। সম্পূর্ণ মূলধনই ভারত সরকার যোগাইয়াছেন। লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় বোম্বাই। কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী এবং মাদ্রাজে ইহার আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয় (Zonal Head Quarters)।

বিবিধ বীমা (Miscellaneous Insurance): বীমার উপকারিতা ও গুরুত্ব দিনদিন বাড়িয়া যাওয়াতে সাধারণও বীমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে এবং বীমা মনোভাবাপন্ন (Insurance minded) হইয়াছে। বীমা ব্যবসায়ীসমূহও বীমার পরিধি দিনদিন বাড়াইয়া দিতেছে। এমন কোন বিষয়ই বোধ হয় বর্তমানে নাই যাহা বীমা করা যায় না। অগ্নি, সামুদ্রিক এবং জীবন এই প্রধান তিন প্রকারের বীমা ব্যতীতও যে সকল বীমা ব্যবসায় বর্তমানে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে সে সকল বীমা সাধারণের জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

মোটর বীমা (Motor Insurance): ষ্টেনলিন সংবাদপত্রে দেখিবে যে মোটরগাড়ী দুর্ঘটনার বড় বড় সহরে কিছু লোক হতাহত হয়। পথচারী দুর্ঘটনার কতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীতও দুর্ঘটনায় মোটর গাড়ীর ক্ষতি হয় মোটর বীমা এই সকল কারণেই মোটর গাড়ী বীমার প্রয়োজনীয়তা বিশদ আলোচনা নিম্নরূপে। প্রতি মোটর গাড়ীর মালিকই বর্তমানে মোটর বীমা করিয়া থাকেন যাহাতে দুর্ঘটনায় মোটরের কোনও ক্ষতি হইলে স্বীকৃতকারী

নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। মোটর গাড়ীর বেলাতেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির উপর নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীতও মোটর চালক নিজেও বীমা করার নিয়ম আছে। দুর্ঘটনায় মোটর চালকের কোনও ক্ষতি হইলে উহাও বীমাকারী পূরণ করিয়া থাকে।

১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে ভারতবর্ষে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা গ্রহণ করিতে হয়। বীমার চুক্তিতে দুইটি পক্ষ থাকে—বীমাদাতা বা বীমাকারক এবং বীমা গ্রহীতা। মোটর গাড়ী বীমার চুক্তিও দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়। কিন্তু মোটর গাড়ী বীমার উপকারিতা বীমা গ্রহীতা ব্যতীত তৃতীয় পক্ষ কোন ব্যক্তি পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। মনে কর তোমার মোটর গাড়ীর তলায় হরেন চাপা পড়িল। ফলে হরেন আহত হইল। এখন হরেন আহত হওয়ায় তাহার যে আর্থিক ক্ষতি হইল উহা কে পূরণ করিবে? তোমার গাড়ীর তলায় চাপা পড়িয়া যখন আহত হইয়াছে তখন তোমারই ক্ষতিপূরণ করা উচিত। কিন্তু এই বিপদেরও আর্থিক ভার যদি অন্য কাহারও উপর অপসারণ করিতে পার অর্থাৎ, তুমি নিজে ক্ষতিপূরণ না করিয়া যদি এমন লোক পাওয়া যায় যে তোমার পক্ষে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ করিবে, সে চেষ্টা কি তুমি করিবে না? তাই অল্প চাঁদার বিনিময়ে বীমা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তুমি তৃতীয় পক্ষ কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার লইতে পার। ইহাই তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা (Third Party Accident Insurance)। এই উদাহরণটিতে বীমা প্রতিষ্ঠান একপক্ষ; তুমি দ্বিতীয় পক্ষ এবং পথচারী অনির্দিষ্ট (অবশ্য এক্ষেত্রে হরেন) তৃতীয় পক্ষ। তোমার মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনার জন্য তৃতীয় পক্ষ কাহারও ক্ষতি হইলে উহা পূরণ করার ভার বীমাদাতার। তাই ইহাকে বলা হয় তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা। জনসাধারণ যাহাতে নিরাপত্তার সহিত রাস্তায় চলাফেরা করিতে পারে তাহার জন্যই তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা (Workman's Compensation Insurance):
 শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমার প্রথম শিল্প শ্রমিকের বেলায়ই প্রযোজ্য। শিল্পে এমন অনেক কার্খ আছে যাহা খুবই বিপজ্জনক, যেমন অগ্নি নিবারক সংস্থার (Fire Brigade) কর্মীদের অনেক সময়ে খুব ঝিপদের সম্মুখীন হইয়া কার্খ করিতে হয়। আবার শিল্পে খুব ভারী যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করারও বিপদ যথেষ্টই আছে। তাই শিল্পে শিল্পশ্রমিকগণ যদি এই সকল বিপজ্জনক কার্খ করিবার শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা পূর্বে জানিতে পারে যে কার্খকালে কোনও প্রকার দুর্ঘটনায় পতিত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হইবে, তাহা হইলে শ্রমিক অনেকটা আশস্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে কার্খ করিতে পারে। বর্তমানে প্রায়

প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশে মালিকের শিল্পে কার্যকালে শ্রমিক কোনও দুর্ঘটনায় পতিত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করা বাধ্যতামূলক করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে প্রত্যেক শিল্প মালিকই শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের ভার বীমাকারীর উপর অপসারণ করার সুযোগ লয়।

শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমায় শ্রমিককে তখনই ক্ষতিপূরণ করা হইবে যখন মালিকের পক্ষে কার্য করা কালেই দুর্ঘটনায় ক্ষতি হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়িলেই ক্ষতিপূরণ পাইবে এই ধারণার বশবর্তী ক্ষতিপূরণ আদায় হইয়া যদি শ্রমিক কার্যে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন না করে এবং তাহার গাফিলতির ফলে যদি দুর্ঘটনা হয় তাহা হইলে শ্রমিক মালিকের কার্যকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে না। ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হওয়ার পূর্বে বীমাকারী অন্ত্যায় বিষয়ের মধ্যে এই দুইটি সর্তের উপর নজর দিয়া থাকে।

মালিকের পক্ষে কার্যকালে এবং আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও দুর্ঘটনায় শ্রমিকের ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিই শ্রমিক-ক্ষতিপূরণ-বীমা দ্বারা সংরক্ষিত হয়।

অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা (Fidelity Insurance) : সংবাদপত্র পড়িলে দৈনিক দুই একটি বিশ্বাসভঙ্গের বা প্রতারণার সংবাদ পাওয়া যায়। অসাধু উপায়ে মালিকের অর্থ আত্মসাৎ করা কর্মচারীর পক্ষে অন্ত্যায় হইলেও কোন কোন কর্মচারী সেই প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। ফলে তহবিল উচরুপ করা, অথবা মালিকের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইত্যাদির নিদর্শন হৃদয়শোথী পাওয়া যায়।

কোনও মালিক কর্মচারী নিয়োগকালে স্থির নিশ্চয় হইতে পারে না যে কর্মচারী ভবিষ্যতে অসাধু হইবে না এবং অসাধু উপায়ে মালিকের অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ করিবে না। যে কর্মচারী আজ খুবই বিশ্বাসী সে যে আগামীকাল বিশ্বাসভঙ্গের কার্য করিবে না সে কথা হালক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তাই কর্মচারীর অসাধু

কার্যের ফলে কোনও মালিক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহা অসাধুতাজনিত পূরণ করার জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতিপূরণ বীমা বীমা গ্রহীতার কর্মচারীর অসাধু কার্যের ফলে বীমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। এই প্রকার বীমাপত্র তখনই গ্রহণ করা হয় যখন কর্মচারীর উপর প্রচুর অর্থ বা সম্পদ আদান-প্রদানের ভার থাকে যে ক্ষেত্রে কর্মচারীর পক্ষে আর্থিক আদান-প্রদান মূল্য সম্পূর্ণই নগদান জামানত রাখা সম্ভব নহে।

উদাহরণ : ক-এর ব্যবসায়ের একজন সস্তার রক্ষক (Store Keeper)। দৈনিকই সস্তারখানা হইতে সস্তার আদান-প্রদান হয়। ইচ্ছা করিলে হস্ত

কিছু কিছু দ্রব্য অসং উপায়ে গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারে। ঋ-এর অসাধু কার্যের ফলে ক-এর কোন ক্ষতি হইতে পারে। উহা পূরণ করার জন্য মনে কর গ বীমা দান করিল। ফলে কখনও ঋ-এর কার্যের ফলে ক-এর ক্ষতি হইলে যে অর্থের ক্ষতিপূরণের বীমা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই পর্যন্ত ক্ষতি বীমাকারক গ-এর নিকট হইতে আদায় করিতে পারে।

অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণের বীমায় যে বীমাপত্র দেওয়া হয় উহাকে অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকারপত্র (Fidelity Bond) বলে।

অসাধুতাজনিত
ক্ষতিপূরণ বীমায়
নিহিত সর্ব
১। কার্যের
প্রকৃতি বদলে
বীমাকারীর দায়
সমাপ্তি
২। আবশ্যকীয়
সতর্কতা অবলম্বন

অসাধুতাজনিত ক্ষতিপূরণ বীমায় দুইটি নিহিত সর্ব থাকে। প্রথম, কর্মচারীর কার্যের প্রকৃতি বদল হইলে বীমাদাতার দায়িত্ব শেষ হয়। যেমন সম্ভাররক্ষককে যদি ক্যাসিয়ার পদে উন্নীত করা হয় তাহা হইলে সম্ভার রক্ষক হিসাব কার্যকালে অসাধু কার্যের ফলে ক্ষতিপূরণের বীমা বাতিল হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মালিক কর্মচারীর সম্মুখে অসাধু উপায় অবলম্বনের পথ যদি উন্মুক্ত রাখে এবং আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে অসাধুতাজনিত ক্ষতি হয় তাহা হইলে বীমাকারকের দায়িত্ব থাকে না।

অপহরণ বীমা (Burglary Insurance) : এমন অনেক ব্যবসায় আছে যেখানে অপহরণ বীমা করা প্রয়োজন। চুরি ডাকাতির ঝুঁকির হাত হইতে ব্যবসায়ী নিজেকে মুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করিলে অপহরণ বীমা গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তালি খুলিয়া অথবা দরজা ভাঙিয়া জিনিষপত্র অপহরণ করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে তবে ইহা হামেসাই ঘটে না সত্য। হামেসা না ঘটিলেও কখন কোন ব্যবসায়ী অপহরণ জনিত ক্ষতির সম্মুখীন হইবে তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। সুতরাং বীমা গ্রহীতা চান্দার বিনিময়ে অপহরণ বীমা বীমা কারকের নিকট হইতে অপহরণ বীমাপত্র গ্রহণ করে। যে

কোন বীমা ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা একটি লাভজনক বিভাগ। কারণ বীমার চান্দা অল্প হইলেও বীমাকারীকে অপহরণ লোকসান বাবদ খুব কম ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। এক্ষেত্রেও বীমা গ্রহীতাকে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

অর্থপ্রেরণ বীমা (Cash-in-transit Insurance) : দিন ছুপুরে রাজপথে ফুসাইসী ডাকাতির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একস্থান হইতে অন্যত্র নগদ তহবিল প্রেরণ কালে এই কলিকাতা মহানগরীতেও দিন ছুপুরে ডাকাতি কতবার হইয়াছে। ব্যাংক টাকা জমা দিবার জন্য টাকা পাঠান হইল। পথিমধ্যে ছুর্তগণ গাড়ী থামাইয়া পাহারাদারকে জখম করিয়া টাকার খলি ছিনাইয়া অর্থপ্রেরণ বীমা লওয়া এ ঘটনাও ঘটিয়াছে। প্রচুর নগদান তহবিল স্থানান্তর কালে নগদ অর্থ ছিনাইয়া লওয়ার আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। এই কারণেই সর্বদা

ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই নগদ অর্থ একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে হয় তাহারা অর্থ প্রেরণ বীমা গ্রহণ করে। ইহাতে এক স্থান হইতে অন্য কোনও স্থানে অর্থ প্রেরণ কালে কোন দুর্ঘটনার (চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি) ফলে বীমা গ্রহীতার অর্থ নষ্ট হইলে বীমাদাতা (বীমাকারী) ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকে।

কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা (Employees State Insurance): মানুষের জীবন-যাত্রা যতদিন সহজ ছিল এবং জটিলতার সম্মুখীন হয় নাই ততদিন মানুষ কতিপয় ঝুঁকি অনুভব কবে নাই। বর্তমানে জীবনযাত্রা এতই জটিল হইয়াছে যে প্রতিটি লোক সর্বদাই নানা প্রকার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রকৃতির কর্মচারী রাষ্ট্রীয় উপব নিভর্ষ করিয়া যতক্ষণ মানুষ বসবাস কবে ততক্ষণ তাহার বীমা ঝুঁকি থাকে কম। কিন্তু যে সমাজ ব্যবস্থায় আমবা এখন বাস করিতেছি সেই সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের সকলেবই ঝুঁকি রহিয়াছে। আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলে আমার অর্থোপার্জনের ক্ষমতা রহিত হইল, বাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে চিরস্থায়ীরূপে অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে আমার আয় করার ক্ষমতা লোপ পাইল, কোনও কারণে আমি বেকার হইয়া পড়িলে আমার আয়ের পশা লোপ পাইল। এই প্রকাব নানা কাবণে লোক সাময়িকভাবে আয় করার ক্ষমতা হাবাইতে পারে। এই ঝুঁকি সমাজ ব্যবস্থাব এবং পরোক্ষ উৎপাদনেব গোড়া হইতে ছিল। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা এত জটিল ছিল না বলিয়াই, উপরি-লিখিত কারণে কাহারও আয়ের ক্ষমতা রহিত হইলে সমাজের দশজনের সাহায্যে তাহার জীবন চলিত। সেজন্য প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর সমাজ সেবা সমিতি (Social Service Societies) ছিল। সমিতির সদস্যবৃন্দের চাঁদায় সমিতির কোন সদস্য সাময়িকভাবে আয় করার ক্ষমতা হারাইলে তাহাকে সাহায্য দেওয়া হইত। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির অর্থ সংস্থান এত অপ্রচুর ছিল যে এই প্রকার বিরাট কর্তব্য পালনে তাহারা সব সময়ে সমর্থ হইত না।

ক্রমে ক্রমে বাষ্ট্রেব কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন দেখা দিল। এখন আর রাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কার্যেই মাত্র ব্যাপৃত থাকে না। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই সমাজ-কল্যাণকর কার্যভার গ্রহণ করিতেছে। সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়িলে, অথবা অসুস্থ হইয়া আয়ের ক্ষমতা লোপ পাইলে উহার প্রতিক্রিয়া সমাজের সকল অঙ্গেই দেখা দেয়। তাই বাষ্ট্রও সমাজ-কল্যাণকর কার্যভার গ্রহণ করিতেছে। এখন আর সাময়িক অপারগ ব্যক্তিদের সাহায্য ভার কোনও সমিতির অথবা কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির উপরই বর্তায় না।

প্রায় সকল দেশেই বর্তমানে প্রমিক ও অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। বীমার মারকতে এই আর্থিক নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করা হয়। তাই বর্তমানে ব্যাপক বীমা প্রধার প্রবর্তন করা হইয়াছে-

(Comprehensive Insurance Plan)। যে সকল কারণে প্রমিক এবং স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোক সাময়িক আর্থিক অসুবিধায় পড়িতে পারে সেই সকল ঝুঁকি বীমা দ্বারা সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে বীমার টাকা হইতে বীমাকৃত ব্যক্তিদের সাহায্য করা হয়। এইজন্যই ইহাকে কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা বীমা (Social Security Insurance) বলা হয়। শিল্প প্রমিক ও চাকুরিয়াদের মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী বলিয়া প্রমিক রাষ্ট্রীয় বীমায় শিল্প প্রমিক ও স্বল্প আয়বিশিষ্ট চাকুরিয়াদের সামাজিক বীমার আওতায় আনা হইয়াছে। গ্রেটব্রিটেনের মত শিল্পোন্নত দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বীমার আওতায় কেবলমাত্র শিল্প প্রমিক ও চাকুরিয়াদেরই আনা হয় নাই; সমাজের সকল স্তরের সকল আয়বিশিষ্ট লোকই সামাজিক নিরাপত্তা বীমার স্বযোগ পায়। যেমন জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা (National Health Insurance) আইন পাস হওয়ার ফলে গ্রেটব্রিটেনের ধনী দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ই হাসপাতাল হইতে বিনা মূল্যে চিকিৎসার স্বযোগ লইতে পারে। আমাদের মত গরীব দেশে পূর্ণায়তন সামাজিক নিরাপত্তা বীমা পদ্ধতি গ্রহণ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। তবে পীড়িতাবস্থায় সাহায্য দান; অকর্মণ্য অবস্থায় সাহায্য দান, চিকিৎসার স্বযোগদান ও পোষ্যদের চিকিৎসার স্বযোগদান এই কয়টি বিষয়ের স্বযোগ দান করিবার জন্য প্রমিক রাষ্ট্রীয় বীমায় (Employees State Insurance) প্রবর্তন হইয়াছে।

বীমাকৃত প্রমিক বা চাকুরিয়া; ব্যবসায়ী বা শিল্প মালিক এবং সরকার (কেন্দ্রীয় বা রাজ্য) এই তিন দলের চাঁদায় প্রমিক রাষ্ট্রীয় বীমা সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। ৪০০ টাকা অনুধ্বংস আয়বিশিষ্ট প্রমিক অথবা চাকুরিয়া সমাজ নিরাপত্তা বীমার স্বযোগ লইতে পারে। প্রমিক রাষ্ট্রীয় বীমা সংস্থার হাতেই বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার ভার। প্রমিক ও চাকুরিয়ার আয়ের অনুপাতে টাকা আদায় এবং আর্থিক সাহায্য দান করা হয়।

Exercises

1. "Insurance is one of the main branches of Commerce." Explain.

“বীমা বাণিজ্যের একটি প্রধান অঙ্গ।”—আলোচনা কর।

2. What is Insurable Interest? Has a Creditor insurable interest upon the life of a Debtor?

বীমাহিত কি? পাওনাদারের কি দেনাদারের জীবনে বীমাহিত আছে?

3. What are the advantages of Insurance?

বীমার সুবিধা কি?

4. Goods worth Rs. 10,000 are insured for Rs. 8000. Rs. 6000 worth of goods are destroyed by fire. How much will the Insurance Co. pay ? Give reasons.

১০০০ টাকা মূল্যের মাল ৮০০০ টাকায় বীমা করা হইল। ৬০০০ টাকার দ্রব্য অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইল। বীমা প্রতিষ্ঠান কত ক্ষতিপূরণ দিবে ? কারণ বল।

5. Discuss the conditions of a Valid Insurance Policy ?

আইনসিদ্ধ বীমাশত্রের সর্তাবলী আলোচনা কর।

6. Explain (a) Third Party Accident Insurance, (b) Burglary Insurance, (c) Employees State Insurance.

ব্যাখ্যা কর :—(ক) তৃতীয় পক্ষ দুর্ঘটনা বীমা ; (খ) অপহরণ বীমা, (গ) শ্রমিক রাষ্ট্রীয় বীমা।

7. What are the causes of Nationalisation of Life Insurance Business ?

জীবন বীমা জাতীয়করণের কারণ কি কি ?

দশম অধ্যায় যানবাহন ব্যবস্থা (Transport)

কোনও দেশের শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যই উন্নত যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। বস্তুত যানবাহন ব্যবস্থায় বিপ্লব দেখা দেওয়ার পরই শিল্পোন্নতির পথ উন্মুক্ত পথ। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বহুমুখী আর্থিক কার্যকলাপ। আর্থিক কার্যকলাপের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের গুরুত্ব কেহ কখনই অস্বীকার করিতে পারে না।

আধুনিক কালের বহুল উৎপাদন পদ্ধতির সাফল্য কখনই যানবাহন ব্যবস্থার বহুল উৎপাদনের অভাবে সম্ভব নহে। বহুল উৎপাদন পদ্ধতির সাফল্য কতিপয় সফল্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের গতিশীলতা (Mobility of Labour) মূলধনের সহজলভ্যতা (Availability of Capital), কাঁচামালের সহজলভ্যতা (Availability of Raw Materials)।

এই সকল অবস্থার মধ্যে শ্রমিকের গতিশীলতা ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতেই যানবাহন ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করা যাইবে।

শ্রমিকের গতিশীলতা বলিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজে শ্রমিকের যাতায়াতকে বুঝায়। শ্রমিকের গতিশীলতা না থাকিলে শ্রমিকের অর্থনীতি ও বাণিজ্য এক একটি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। গতিশীলতা বহুল উৎপাদন প্রথা বাজার ও শিল্পের সঙ্গীর্ণতা তাদিয়াই প্রবর্তন করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—ভারতীয় শিল্প ব্যবস্থা গ্রাম-কেন্দ্রিক (Centred round Villages) ছিল। প্রতি গ্রামকে এক একটি আর্থিক অঞ্চল (Economic Zone) বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের প্রাধান্য ছিল। ১০০ বৎসরের শিল্প ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে যদিও বৃহদায়তন শিল্প কুটির শিল্পের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে তথাপি কুটির শিল্পের গুরুত্ব ভারতবর্ষে অস্বীকৃত হয় নাই। সে যাহা হউক, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে কাঁচামাল ও শ্রমিক শিল্পস্থলে সহজে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। শিল্পীয় কাঁচামাল উৎপাদন কেন্দ্র এবং শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে সহজে সংযোগ সাধনযোগ্য কোনও যানবাহন পদ্ধতি না থাকিলে কাঁচামাল উৎপাদনের স্বার্থকতাই বা কোথায় আর শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অর্থই বা কি? পাট ভারতের নানা স্থানেই জন্মে কিন্তু পাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে হুগলী-নদীর তীরে, কলিকাতা, হাওড়া, রিওড়া অঞ্চলে।

যদি কাঁচামাল উৎপাদন স্থলের সহিত শিল্পের যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে পাট শিল্প গড়িয়া উঠিত কি? ইহা কেবল পাট শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই একই কথা বলা চলে।

বহুল উৎপাদনের সহিত আর একটি বিষয়ও গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বহুল উৎপাদনের অর্থই চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন। চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎপাদন কেন্দ্রে অব্যয় আধিক্য কিন্তু অন্তান্ত স্থলে যোগানের অভাবকেই বুঝায়। উৎপাদন কেন্দ্রে চাহিদার অধিক উৎপাদন অন্তর্জ বিক্রয়ের স্বযোগ না থাকিলে বহুল উৎপাদন হইত না এবং বহুল সংযোগ ব্যবস্থা ও উৎপাদনের স্বযোগ কেহই লইতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং বহুল উৎপাদন উৎপাদন কেন্দ্র ও ভোগ কেন্দ্রের মধ্যে সুসংযুক্ত সংযোগ ব্যবস্থার জন্তই পরিবহনের গুরুত্ব এত অধিক। অথবা এই কথা বলাই বোধ হয় সম্ভব যে বহুল উৎপাদন ব্যবস্থায় চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন অন্তর্জ বিক্রয় করিবার প্রচেষ্টা সফল করার উদ্দেশ্যেই যানবাহনের প্রয়োজন।

ইহা যেমন সত্য, তেমনি যানবাহনের স্বযোগ না থাকিলে, শিল্প গঠনের আনুসঙ্গিক স্বযোগ থাকা সত্ত্বেও শিল্পের উন্নতি হয় না। যদি স্রষ্টা যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে অন্তান্ত স্বযোগ থাকা সত্ত্বেও জামসেদপুরে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। আবার যানবাহন ব্যবস্থার স্বযোগ আছে বলিয়াই কাওলাতে প্রাকৃতিক বন্দর গঠন সহজ হইয়াছে। বন্দর গঠনের ফলে আর্থিক কার্য, যেমন—আমদানি, রপ্তানি ব্যবসায়, গুদাম ঘর, ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন এবাদি আর্থিক কার্যের প্রসারলাভ করিতেছে। সুতরাং যানবাহনের স্বযোগ লইয়া সহর বন্দর গড়িয়া উঠে এবং সহর বন্দর ইত্যাদি গড়িয়া উঠিলে আর্থিক কার্যকলাপ প্রসারলাভ করে।

স্রষ্টা যানবাহনের স্বযোগ থাকিলে অতি দূরবর্তী স্থানও নিকটবর্তী হয়। আর্জেন্টিনাতে যে অতিরিক্ত গম উৎপাদন হয় উহা উৎপাদনের যানবাহন ব্যবস্থা ও কোন সার্থকতাই থাকিত না; এডেন বন্দর হিসাবে কখনই গুরুত্ব লাভ করিতে পারিত না যদি সুরক্ষা খাল খনন করিয়া যানবাহনের পথ উন্মুক্ত করা না হইত।

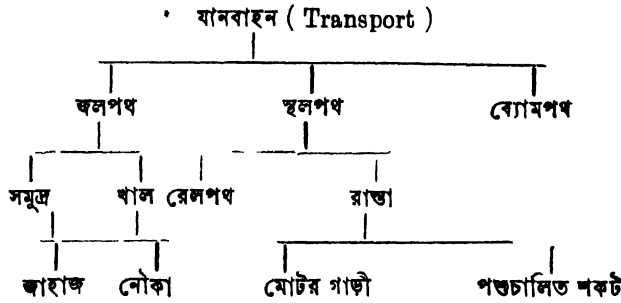
উপরের আলোচনা হইতে যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :

- (১) কাঁচামাল উৎপাদন অঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলের সহিত যোগাযোগ ;
- (২) জনবহুল অঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলে অর্থিক গ্রহণ (অর্থিক গতিশীলতা) ;
- (৩) শিল্পাঞ্চল এবং বিক্রয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ;

যানবাহনের
প্রয়োজনীয়তা

(৪) সহর বন্দর ইত্যাদি গঠন ও অর্থনৈতিক কার্যের প্রসার।

যানবাহনের ভাগ (Different kinds of Transport) : যানবাহনের পথ হিসাবে যানবাহনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়; (১) জলপথ; (২) স্থলপথ; (৩) ব্যোমপথ। স্থলপথে যানবাহনের মধ্যে একটি বিশেষ যানবাহন রেলপথ। যানবাহন ব্যবস্থাকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়।



এক স্থান হইতে অগ্ৰস্থানে পণ্য আদান প্রদানে যানবাহন ব্যবস্থার গুরুত্বের উল্লেখ নিম্নয়োজন। তবে কোন্ দ্রব্য কোন্ পথে বহন করিলে সুবিধা হইবে তাহা কতিপয় অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রধানত, দ্রব্যের আকৃতি-
 দ্রব্যের আকৃতি-
 প্রকৃতি ও যানবাহন
 হইবে তাহা স্থির করা হইবে। দ্রব্য যদি পচনশীল হয় তাহা হইলে দ্রুত বহনক্ষম যানবাহনের সাহায্য লওয়া হয়। আবার দ্রব্য যদি খুব ভারী হয় এবং দীর্ঘদিন রক্ষণযোগ্য হয় তাহা হইলে মন্থগতি যানবাহনের সাহায্য গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। তবে দ্রব্যের আকৃতি-প্রকৃতি ব্যতীত দূরত্বও (অর্থাৎ যে দুইটি স্থানের মধ্যে পণ্য চলাচল করা হইবে তাহার দূরত্ব) যানবাহনের মাধ্যম নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

যানবাহনের তুলনামূলক বিচার (Comparative Study of different means of Transport) : অতি প্রাচীন কালেও যেমন অন্তর্বাণিজ্য ছিল তেমনই বহির্বাণিজ্যও ছিল। অন্তর্বাণিজ্য প্রধানত জলপথ ও স্থলপথে হইত আর বহির্বাণিজ্য হইতে জলপথে। আধুনিক যুগেও ইহার খুব পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নহে। এখনও বহির্বাণিজ্য প্রধানত জলপথেই হয় আর অন্তর্বাণিজ্য হয় স্থলপথে ও জলপথে। তবে স্থলপথে রেলপাড়ীর প্রধান্য এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে স্থলপথে মাল চলাচল বুঝাইতে প্রধানত রেলপথে মাল চলাচলই বুঝায়।

জলপথে মাল চলাচলের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Water Transport) : জলপথে মাল আদান প্রদানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য।

অন্তর্বাণিজ্য বলিতে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অপর কোন স্থানে মাল চলাচলকে বুঝায়। অন্তর্বাণিজ্য আবার উপকূলীয় বাণিজ্যও (Coastal Trade) হইতে পারে। দেশের সমুদ্র উপকূলস্থ এক বন্দর হইতে অল্প জলপথে বাণিজ্যের কোন বন্দরে মাল চলাচলকে উপকূলীয় বাণিজ্য বলে। আবার অন্তর্বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমেও হইতে পারে।

উহাতে সমুদ্র উপকূলীয় বন্দরের সহিত দেশের অভ্যন্তরের বন্দরের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়, নদী ও খালের মাধ্যমে। সুতরাং অন্তর্বাণিজ্য উপকূলীয় ও আভ্যন্তরীণ দুই-ই হইতে পারে। বহির্বাণিজ্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমুদ্রপথে হইয়া থাকে। সেইজন্য বহির্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্য (Overseas Trade) প্রায় সমার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমুদ্রপথে যানবাহন (Ocean Transport): সমুদ্রপথে বাণিজ্য খুব প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্রপথে মাল চলাচলের সুবিধা:

সমুদ্রপথ প্রাকৃতিক দান হিসাবেই পাওয়া যায়। সুতরাং সমুদ্রপথের সুবিধা যানবাহনের পথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তৈয়ার প্রকৃতিই করিয়া দেয়। যানবাহনের পথ তৈয়ার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল মহাদেশের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা সম্ভব। অষ্ট্রেলিয়ার সহিত আমেরিকার অথবা আফ্রিকার সহিত ইউরোপের বাণিজ্য সমুদ্রপথে হওয়াই সম্ভব। কারণ সমুদ্রবক্ষে পূল ও সড়ক তৈয়ার করিয়া রেলযোগে অথবা রাস্তাপথে বাণিজ্য কোনও যুগে সম্ভব হইবে, কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমুদ্রবক্ষে রেলপথ, রাস্তা তৈয়ার হইলেও ব্যবসায়ের দিক হইতে উহা সফল হইবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। কারণ রাস্তা, রেলপথ তৈয়ার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ত পণ্যের উপরই চাপান হইবে; সুতরাং পণ্য সামগ্রীর মূল্যও বাড়িয়া যাইবে।

তৃতীয়ত, আন্তঃ মহাদেশ (Inter Continent) ব্যবসায় রেলপথ অথবা রাস্তা পথে সম্ভব না হইলে শেষ বিকল্প পন্থা ব্যোমপথ। কিন্তু ব্যোমপথে ত সকল প্রকার দ্রব্য চলাচল সম্ভব নহে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলসমূহের জন্য কয়লা আনয়ন করিতে হইত তাহা হইলে কি ব্যোম-পথে বহন করা সম্ভব? একে ত কয়লা খুবই ভারী; দ্বিতীয়ত, মূল্যের অনুপাতে কয়লা যে স্থান অধিকার করে তাহাতে বহন মাণ্ডল যাহা পড়িবে তাহাতে এ কয়লার ব্যবহার অনার্থক (Uneconomic) হয়। কাজেই ভারী এবং মূল্যানুপাতে অতিরিক্ত স্থান দখলকারী দ্রব্য বহির্বাণিজ্যে জলপথে পাঠানই সম্ভব।

সমুদ্রপথে ব্যবসায় বাণিজ্যের যে অসুবিধা নাই তাহা নহে। সমুদ্রপথে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হইলে সর্বপ্রথম জাহাজ তৈয়ারের প্রস্তুতি বিবেচনা করিতে হয়। সকল দেশে জাহাজ তৈয়ারীর সুযোগ থাকে না। আবশ্যকীয় বনজ দ্রব্যের (কাঠ দ্রব্যাদির) যোগানের প্রাচুর্য না থাকিলে জাহাজ তৈয়ার সম্ভব নহে।

কেবল জাহাজ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠদ্রব্যের যোগান হইলেই যে জাহাজ তৈয়ার সম্ভব হয় তাহা নহে। জাহাজ তৈয়ারের জন্য উন্মুক্ত নির্বাত স্থানের প্রয়োজন হয়। সমুদ্রবক্ষে উন্মুক্ত বাত্যাবিস্কৃৎ স্থলে জাহাজ নির্মাণ সম্ভব নহে। উপকূল ভাগ ভয় না থাকিলে জাহাজ তৈয়ারীর উপযুক্ত নির্বাত স্থান পাওয়া কষ্টকর। আবার জাহাজ প্রস্তুতের পর জাহাজ জলে নামান, জাহাজ নোঙরের উপযুক্ত স্থান না থাকিলেও জাহাজ প্রস্তুতের সুবিধা হয় না। ভারতবর্ষের জাহাজ নির্মাণ স্থান নির্বাচন হইতে উপরি-উক্ত অবস্থার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। আবশ্যকীয় সকল সুযোগ আছে বলিয়াই বিশাখাপত্তমে (Vizagapattam) ভাবতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয়ত, জাহাজ নির্মাণে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক হয় বলিয়াই অপেক্ষাকৃত মূলধন গরীব দেশের পক্ষে জাহাজ নির্মাণ সম্ভব নহে। জাহাজ নির্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন যতদিন সরকারী প্রচেষ্টায় সংগ্রহেব প্রতিশ্রুতি দেওয়া না হইয়াছে ততদিন ভাবতেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই।

সমুদ্রপথে গমনাগমনকারী জাহাজসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় (১) নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (Liner Ship); (২) অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (Tramp Ship)।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (Liner Ship) : জাহাজ কোনও দুইটি নির্দিষ্ট বন্দরের মধ্যে নিয়মিত মাল বহন করিতে থাকিলে সেই জাহাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (Liner ship) বলে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী ব্যবসায়ের নিয়মিত লক্ষ্য বৈশিষ্ট্য এই যে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত বন্দর হইতে জাহাজকে পাল তুলিতেই হইবে অর্থাৎ বন্দর ত্যাগ করিয়া অপর নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলের দিকে রওনা দিতেই হইবে। জাহাজের বহন ক্ষমতা (Tonnage) অনুসারে মাল সংগ্রহ হউক কিংবা নাই হউক, জাহাজকে এই নিয়ম মানিতেই হইবে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের অসুবিধা এই যে জাহাজ মাল বহনের জন্য যে পথ বাছিয়া লয় সেই পথের বাহিরে যাইতে পারে না। যেমন কোন নির্দিষ্ট পথ ব্যতীত চলিতে পারে না নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ যদি কলিকাতা ও লণ্ডন বন্দরের মধ্যে মাল বহন করিবার জন্য সুশ্রেষ্ঠ পথ বাছিয়া লইয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে সুশ্রেষ্ঠ পথেই যাতায়াত করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে যে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) পথ ধরিয়া চলিবে তাহার উপায় নাই।

আবার নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ যে দুই বন্দরের মধ্যে বহন করার ক্ষমতা মালের যোগান স্থির থাকিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং বৎসরের কোন

সময় হয়ত দুই বন্দরের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজের (নির্দিষ্ট চাহিদার স্থিরতার অভাব লক্ষ্য জাহাজের) চাহিদা খুবই অধিক থাকে, আবার কোনও

সময় হয়ত আদৌ চাহিদা থাকে না। ফলে জাহাজের পক্ষে লাভজনক উপায়ে ব্যবসায় করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই ব্যক্তিগত জাহাজী মালিকগণ একত্রিত হইয়া জাহাজী ব্যবসায়ের জোট (Ring অথবা Conference) গঠন করে। ফলে জোট প্রতিষ্ঠানটির হাতে বহু জাহাজের মিলন ঘটে। এক একটি জাহাজ এক এক পথ বাছিয়া লয়।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজে মাল চলাচল ব্যতীত যাত্রী বহন করাও হয়। এইখানে বাজীবাহী জাহাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ হইতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ সুযোগ লাভ করে। কারণ নির্দিষ্ট পথ চলাচলে কত সময় লাগিতে পারে তাহা যাত্রী পূর্বে বুঝিতে পারে এবং সেইভাবে নিজের কর্মপন্থা স্থির করিতে পারে। অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজে চলাচলে সে সুযোগ থাকে নহে।

অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (Tramp Ship): অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ কোন নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে না। জাহাজের বন্দর ত্যাগ করারও কোনও নির্ধারিত সময় থাকে না। যখন জাহাজের বহন ক্ষমতা পরিমাণ মাল পূর্তি হয় তখন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে। যতদিন জাহাজের বহন ক্ষমতা পরিমাণ মাল সংগ্রহ করা না হয় ততদিন জাহাজ নঙ্গর গাড়িয়া থাকে। এই কারণে অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ সাধারণত যাত্রী বহন করে না।

অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের গতিপথ নির্দিষ্ট থাকে না বলিয়া যখন যে পথে চলাচল করিলে ব্যয় কম হইবে সেই পথেই চলাচল করে। আবার অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের পক্ষে সময়ের স্থিরতা রাখা করার প্রয়োজন থাকে না বলিয়া সময়ের দ্রুত লাঘবের প্রয়োজন হয় না। এক বন্দরে কিছু মাল থামাস দিয়া আবার মাল সংগ্রহ করিয়া অল্প কোনও বন্দরের দিকে রওনা হইতে পারে। এইভাবে মাল সংগ্রহের এবং চলাচলের রীতি আছে বলিয়াই অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ অপেক্ষাকৃত কম মাণ্ডলে মাল বহন করিতে পারে।

অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতায় সর্বদাই কম মাণ্ডল দাবী করে বলিয়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ প্রায়শ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। এই কারণেই ঘরোয়া জাহাজী মালিকগণ একত্রিত হইয়া 'জোট' (Conference) গঠন করে। জোট প্রথা প্রবর্তন হয় গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৭৫ সালে। জোট প্রথার সমস্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ (Liner) সমান দ্রুত ও সমান ওজনের মাল

বহনের জন্ত সমান হারে মাণ্ডল লইতে প্রতিশ্রুত থাকে। জোট প্রথায় জাহাজের মাণ্ডল নির্ধারণ হইলেও অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহাদের কোনও সুবিধা হয় না। নিদিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ায় মাণ্ডলের হার একই হয় কিন্তু অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ হইতে কম মাণ্ডল আদায় করে।

এই কারণে ১৮৭৭ সালে নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রিত হইয়া এক নতুন নীতি অবলম্বন করে। উহাকে বলে বিলম্বিত বাট্টা প্রথা (Deferred Rebate System)। নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী জোটের অন্তর্গত সকল জাহাজই বিলম্বিত বাট্টা প্রথার (Deferred Rebate System) সুযোগ দিয়া মাল বহনের জন্ত চুক্তি করিতে পারে। ইহাতে কোনও ব্যবসায়ী কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল বহন করিলে মালের মাণ্ডলের উপর বাট্টা পাইয়া থাকে। তবে সেই বাট্টা মাল পাঠান কালেই দেওয়া হয় না। পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও যদি সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজী প্রতিষ্ঠানের জাহাজে মাল পাঠায় বিলম্বিত বাট্টা তবেই বাট্টা পাইবে। এই কারণেই ইহাকে বিলম্বিত বাট্টা প্রথা বলা হয়। এই প্রথায় সর্বপ্রথম ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ভারতে

সুতী বস্ত্র বহন করা হয়। বিলম্বিত বাট্টা প্রথার উদাহরণ : মনে কর তুমি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ Repulse এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে যে ১৯৫২ সালে যে ঐ জাহাজেই মাত্র সমস্ত দ্রব্য বহন করিবে। যদি ১৯৬০ সালেও তুমি অল্পরূপ চুক্তি কর তবে ১৯৫২ সালে যে মাণ্ডল ঐ জাহাজের মালিককে দিয়াছ তাহার উপর নির্দিষ্ট হারে বাট্টা পাইবে। ১৯৬০ সালে যদি অল্প কোনও জাহাজে মাল বহন না কর তাহা হইলে এই সুযোগ পাইবে না।

উল্লেখ করিতে হয় যে ভারতবর্ষের জাহাজী ব্যবসায় ভারতীয়দের নিজের হাতে আনার ইহাও একটি কারণ ছিল। বর্তমান ভারত সরকার জাহাজী ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইহার কুফল হইতে রেহাই দিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বিলম্বিত বাট্টা প্রথায় সুযোগ প্রদানকারী জাহাজে মাল পাঠান নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করায় ব্রিটিশ জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি চুক্তি প্রথা

নিয়ম প্রবর্তন করিল। উহাকে বলা হয় চুক্তি প্রথা (Agreement system)। চুক্তি প্রথায় জাহাজের মালিক জাহাজে মাল প্রেরকের সহিত একরূপ চুক্তিবদ্ধ হয় যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত মাল প্রেরণের চুক্তি করিলে জাহাজী প্রতিষ্ঠান জাহাজে স্থান সঙ্কলনের ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ; নিয়মিত মাল বহনের প্রতিশ্রুতি ; এবং মোটামুটি মাণ্ডলের হারের স্থিরতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

নৌভাটক (Charter Party) : কেহ ইচ্ছা করিলে অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাড়া করিয়া জাহাজ ব্যবহার করার অধিকার লইতে পারে। এই প্রকার ব্যবস্থাকে নৌভাটক বলে। এইভাবে জাহাজ ব্যবহার করার

অধিকার গ্রহণ করিলে জাহাজ ভাড়াকারীর (Charterer) চেষ্টা থাকে বাহাতে নৌভাটকের সঙ্গে জাহাজের বহন ক্ষমতা পরিমাণ ব্যবহার করিতে পারে। নিজের মালের ওজন যদি জাহাজের বহন ক্ষমতার (Tonnage) কম হয় তাহা হইলেও সে জাহাজখানি সম্পূর্ণই ভাড়া করিতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহাকে সম্পূর্ণ জাহাজখানির জন্ত নিম্নতম মাসুল (Dead Freight) দিতে হয়। ভাড়াকারীর নিজের মালের ওজন যদি বহন ক্ষমতার কম হয় তাহা হইলে অল্প ব্যবসায়ীর মাল বহন করিতে পারে। সম্পূর্ণ জাহাজখানি ভাড়া করা হইলেও জাহাজে মাল পুতি হইলে বহনপত্র (Bill of Lading) গ্রহণ করিতে হয়। বহনপত্র হইলে লক্ষ্যস্থলে পৌছিলে মালের মালিক মাল খালাস করিতে পারে না। এইভাবে চুক্তি দ্বারা কোন জাহাজ ভাড়া করা হইলে সেই জাহাজকে বলা হয় ভাড়াকৃত জাহাজ (Chartered Ship)।

জাহাজ ভাড়াকারী (Charterer) এবং জাহাজের মালিকের মধ্যে দুই প্রকার চুক্তি হইতে পারে—(১) কোনও নির্দিষ্ট যাত্রার জন্ত ভাড়া; যখন কোনও নির্দিষ্ট যাত্রার জন্ত জাহাজ ভাড়া করা হয় তখন তাহাকে যাত্রার ভাড়া (Voyage Charter) বলে এবং (২) যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ভাড়া করা হয় তখন তাহাকে বলা হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ভাড়া (Time Charter)। যাত্রার ভাড়ার প্রত্যেক যাত্রার জন্ত পৃথকভাবে ভাড়া বা মাসুল স্থির করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের জন্ত ভাড়া করা হইলে সেই সময়ের মধ্যে যতবার খুসী জাহাজ মাল লইয়া চলাচল করিতে পারে।

নৌভাটক প্রকৃতপক্ষে ভাড়াকারী এবং জাহাজের মালিকদের মধ্যে চুক্তিকেই বুঝায়। এই চুক্তিপত্রে অগ্ৰাণ চুক্তির মতই পক্ষদ্বয়, চুক্তির কাল, চুক্তির বিষয়বস্তু, চুক্তির করকট চুক্তি ভঙ্গ করিলে ক্ষতিপূরণের সর্ব, জাহাজে মাল উত্তোলন ও খালাস করিবার জন্ত কতদিন সময় দেওয়া যাইতে পারে (Lay days); জাহাজের সমুদ্র গমনের যোগ্যতা (Seaworthiness); জাহাজের কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকিলে জাহাজের অধ্যক্ষের ভাড়াকারীর নির্দেশ মানিয়া চলার সর্ব, মালের বিশদ বিবরণ, ওজন, স্থান পরিমিতি ইত্যাদির সর্ব থাকে।

জাহাজ ভাড়া করিবার পূর্বে জাহাজের অবস্থা জানা প্রয়োজন। জাহাজের অবস্থার বিশদ বিবরণ যুক্ত একখানি পুস্তক লয়েডস্ জাহাজী ব্যবসায় প্রকাশ করিয়াছে। উহাকে বলে লয়েডসের পঞ্জী (Lloyd's Register)। লয়েডসের পঞ্জীতে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের মধ্যে যত জাহাজ তৈরী করা হইয়াছে লয়েডস্ পঞ্জী উহার প্রত্যেকটির ঠিকজি আছে। কোন তারিখে জাহাজ তৈয়ার হইল; জাহাজ তৈয়ারে কোন দেশের কাঁচামাল ব্যবহার করা হইয়াছে; জাহাজে কি প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইয়াছে, জাহাজের বহন ক্ষমতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। লয়েডসের পঞ্জীতে জাহাজসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—

প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর। জাহাজ ভাড়া করার পূর্বে জাহাজের অবস্থা সম্যক বিবেচনা করা প্রয়োজন। জাহাজের অবস্থা অনুসারে জাহাজের ভাড়া স্থির হয়।

জাহাজে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি : জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে জাহাজের

মালিকের সহিত চুক্তি করিয়া জাহাজে স্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে সকল দেশে জাহাজী পরিবহণ ঘরোয়া ব্যবস্থায় থাকে সে সকল দেশে জাহাজের মালিকের প্রতিনিধি থাকে। জাহাজের মালিকের প্রতিনিধি জাহাজ ভাড়াকারীর সন্ধানে থাকে। এদিকে জাহাজ ভাড়াকারীও জাহাজের সন্ধানে থাকে। উভয়ের

যোগাযোগ হইলে এবং উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা পাকাপাকি জাহাজে মাল হইলে ভাড়ার চুক্তি করা হয়। গ্রেটব্রিটেনে Baltic পাঠাইবার পদ্ধতি Exchangeএ জাহাজের মালিকদের প্রতিনিধিগণ ও জাহাজ ভাড়াকারীর মিলন হয়। কেহ জাহাজ ভাড়া করার অর্থ্যাৎ জাহাজে মাল প্রেরণের ইচ্ছা করিলে এই স্থানে সমবেত হয়।

ভারতবর্ষে জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ করিলেই তাহারা জাহাজে স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ম্যাকিনিন শ্যাকেরির নাম উল্লেখযোগ্য।

জাহাজে মাল পাঠাইবার চুক্তি করা হইলে নির্দিষ্ট দিনে জাহাজের গুদাম ঘরে মাল জমায়েত করিতে হয়। জাহাজে মালপুতি করার জন্ত এবং জাহাজ হইতে মাল নামাইতে হইলে কয়দিন সময় দেওয়া হইবে তাহাও চুক্তি স্থিতিকাল কালে স্থির হয়। জাহাজে মাল উঠাইবার ও নামাইবার জন্ত নির্ধারিত সময়কে বলে স্থিতিকাল (Lay days)। স্থিতিকাল সাধারণত জাহাজ বন্দর ছাড়িবার পূর্বে তিন দিন এবং জাহাজ বন্দরে ভিড়িলে পর তিন দিন।

স্থিতিকালের মধ্যে (Lay days) জাহাজে মাল বোঝাই না হইলে অথবা জাহাজ হইতে মাল নামান না হইলে জাহাজের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ঐ ক্ষতিকে বলে (Demurrage)।

জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে যে নিয়মে মাণ্ডল আদায় হয় তাহাকে বলা হয় What the traffic will bear। জাহাজ চলার জন্ত যে ব্যয় হইবে উহা

সম্পূর্ণই জাহাজ ভাড়াকারীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। জাহাজে মাণ্ডল নির্ধারণ তাহাতে জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই হউক কিংবা আংশিক বোঝাই হউক কিছু আসে যায় না। জাহাজে মাল পাঠাইলে যে সকল

সময়ই মাল যে স্থান অধিকার করে তাহার উপর মাণ্ডল নির্ভর করে তাহা নহে। কয়লার মূল্য খুব কম, কিন্তু স্থানের প্রয়োজন খুব বেশী। কয়লার উপর মাণ্ডলের হার অধিক হইলে উহার সাহায্যে যে পণ্য তৈয়ার হইবে তাহার মূল্যও বাড়িয়া বাইবে। কলে কয়লার ব্যবহার সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু খুব মূল্যবান সম্পদের উপর যেমন সোনা রূপা ইত্যাদি উচ্চ হারে মাণ্ডল আদায় করিলেও সম্ভোগ সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং একই পরিমিত স্থান অধিকার করার জন্ত কয়লার উপর যে হারে মাণ্ডল আদায় করা হইবে উহার বহুগুণ মাণ্ডল

সোনা রূপার উপর আরোপ করা হইবে যদিও একই পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহাকেই বলা হয় ‘মাল বাহা বহন করিতে পারে উহাই মাণ্ডল নির্ধারণের নির্দেশ’। জাহাজে মাল চলাচলে জাহাজের অধ্যক্ষের করেকটি অধিকার থাকে। উহা নীচে আলোচনা করা হইল।

সমুদ্রবক্ষে জাহাজ কোনও প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইলে জাহাজ রক্ষা করলে জাহাজের অধ্যক্ষ প্রয়োজন বোধ করিলে জাহাজ হইতে মাল ফেলিয়া দিয়া জাহাজ হাক্কা করিতে পাবে। এইরূপ ইচ্ছাকৃত মাল ফেলিয়া দেওয়াকে মালক্ষেপণ

‘মালক্ষেপণ’ বলে। ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Jettison। জাহাজ সম্পর্কিত সকল পক্ষ—যেমন জাহাজের মালিক ; মাণ্ডল প্রাপক এবং মাল চালানকারী সকলকেই মালক্ষেপণের ব্যয় বহন করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন না হইলেও জাহাজের নাবিক ও খালাসীরা অনেক সময়ে অসাধু উপায়ে মালের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে এবং সমুদ্রে মাল ফেলিয়া দিতে পারে। প্রতাবণাব উদ্দেশ্যে অথবা অসাধু উপায় গ্রহণ করিয়া মালের ক্ষতি সাধন করিলে তাহাকে বলে Barratry।

জাহাজেব একস্থান হইলেও অগ্নিস্থানে যাতায়াত কালে মেরামতের প্রয়োজন হইতে পারে। পথিমধ্যে অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হইলে জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ, পোতবন্ধক পত্র * মাল এবং ভাড়া সম্পূর্ণ বন্ধক দিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। যে প্রতিশ্রুতি পত্র দ্বারা ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে বলে পোতবন্ধকপত্র (Bottomry Bond)।

কিন্তু এক ষ্টেশনে ঋণ গ্রহণ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে আবশ্যক হইলে পুনরায় ঋণ গ্রহণ করার অধিকারও জাহাজের অধ্যক্ষের আছে। কিন্তু মালবন্ধক পত্র দ্বিতীয় বার ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে মাত্র জাহাজের মালই বন্ধক দেওয়া যায়। যে ঋণপত্র দ্বারা ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে মালবন্ধক পত্র। ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Respondentia।

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Water-ways) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জলপথের দান কত বড় তাহা আর অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও জলপথের গুরুত্ব অধিক। অবশ্য দেশের ভৌগোলিক গঠন ; অবস্থান, ইত্যাদির উপর আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা নির্ভর করে। তবে প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায়, যে সকল স্থান আভ্যন্তরীণ রেলপথ দ্বারা যোগস্থাপন করা যায় না সেই সকল স্থানে জলপথের গুরুত্ব আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রয়োজন সমধিক। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য তৈয়ার হইলেও খাল (Canal) বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

স্বয়েজ খাল পথ তৈয়ার হওয়ার ফলে ইংলণ্ড এবং কলিকাতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩০০০ মাইল কমিয়া গিয়াছে। ফলে ঐ পথে মাল চলাচলের গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। স্বয়েজ খাল খননের ফলে পূর্ব-আফ্রিকার অল্পমত দেশসমূহে আন্তর্জাতিক কার্ণের গতি দ্রুততর হইতে লাগিল। কানাল খাল খননের ফলে সহজে ইউরোপীয়

দেশসমূহে পূর্ব-আফ্রিকার আর্থিক দ্রব্য রপ্তানির সুযোগ বাড়িয়া গেল। সুয়েজ খাল খননের পূর্বে সমস্ত পূর্ব আফ্রিকার সহিত ইউরোপীয় দেশসমূহের বাণিজ্যের জন্য জাহাজসমূহকে (উত্তরাংশ) অন্তরীপ পথ (Cape Route) পরিক্রমা করিতে হইত। সুয়েজখালের অল্পসরণে পানামা খাল (Panama Canal) তৈয়ারী হইল এবং আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে বাণিজ্য দ্রুতগতিতে প্রসারলাভ করিল। পানামা খাল খননের পূর্বে আমেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে জলপথে পশ্চিম উপকূলের সহিত বাণিজ্য চলিত হর্ণ অন্তরীপ (Cape Horn) পথে।

আবার অভ্যন্তর অঞ্চলের সহিত বন্দরের যোগাযোগ রাখার জন্য খাল খননের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের বাকিংহাম খাল মাদ্রাজের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। মাদ্রাজ বন্দরের সহিত উত্তর ও দক্ষিণ মাদ্রাজের যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছে বাকিংহাম খাল দ্বারা। এই খালটি স্থানে স্থানে মজিয়া যাওয়াতে উহা সংস্কারের ভার ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করিয়াছেন।

দেশের অভ্যন্তরের সম্পদ খাল পথে বন্দরে আনয়ন করা অথবা বিদেশ হইতে জলপথে মাল আমদানি করিয়া দেশাভ্যন্তরে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে খাল ব্যবস্থার প্রয়োজন যথেষ্ট। বন্দরের সহিত দেশাভ্যন্তরের যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য যে কয়টি খাল আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংলণ্ডের ম্যাক্লেটার খাল ; জার্মানীর কিয়েড খাল।

নদীপথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রসিদ্ধ। ভারতের এই বিরাট উপ-মহাদেশে (Sub-Continent) যত দিন রেলপথ গঠন হয় নাই ততদিন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদী একমাত্র বাহক ছিল। রেলপথ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও ব্যবসায় বাণিজ্যই নদীপথে চলিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ইত্যাদিই ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বাহক। সিন্ধু নদের উৎপত্তি স্থল হইতে ৮০০ মাইল ডেরা ইসমাইল খাঁ পর্যন্ত নাব্য (Navigable) ছিল ; এবং রেলপথ বিস্তারের পূর্বে পাঞ্জাবের শতদ্রু ও সিন্ধু নদের সাহায্যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য চলিত।

অল্পরূপভাবে উত্তর ভারতের ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বনজ ও কৃষিজ সম্পদ বহনের উপায় ছিল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। আসামের চা ও বনজ সম্পদ ; উত্তর প্রদেশের বনজ দ্রব্য, পূর্ববঙ্গের পাট, ইত্যাদি অর্থকরী সম্পদ সকলই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে বহন করা হইত। কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ রক্ষা করিতে গঙ্গার উপকূলে গড়িয়া উঠিল কয়েকটি বন্দর, পাটনা ; কানপুর ; এলাহাবাদ (হরিদ্বার) ইত্যাদি।

রেলপথের প্রসারের ফলে ভারতের নদী পথের উপর আর অভ্যন্তরীণ খাল ও নদীর গুরুত্ব নষ্ট হয় নাই। আবার ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে দ্রুত করার জন্য কতিপয় সেচ খাল (Irrigation Canal) খননের প্রয়োজন হইল। সেচ খাল খননের ফলে এবং স্থানে স্থানে বাধ ইত্যাদি

দেওয়ার ফলে নদীর সহজাত গতিপথ অনেকাংশে ব্যাহত হইল। ফলে গঙ্গা ও সিন্ধুর নাব্যতা (Navigability) নষ্ট হইল।

ভারতের মত বিরাট দেশের অর্থনীতির ভিত্তি কয়েকটি শিল্প অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়াই হয় নাই। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামই স্বর্ণপ্রসূ। এই সকল গ্রামের সহিত বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষায় রেলপথ সফল হয় নাই। তাই যে সকল স্থানে রেলপথ গঠন সম্ভব হয় নাই, সেই সকল অঞ্চলে নদীপথই ব্যবসায় বাণিজ্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

দেশবিভাগের ফলে আসামের সহিত পশ্চিমবঙ্গের, তথা আসামের সহিত কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ রক্ষার এক বিরাট অসুবিধা দেখা দিয়াছে। এ যাবত কাল আসামের চা, কাষ্ঠাদি ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সাহায্যে কলিকাতা আনয়ন করা হইত, কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে উহার একাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর রাজ্যের মধ্যে জলপথের গুরুত্ব এতই অধিক যে ভারত সরকার বাধ্য হইয়া কৌশল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। নেপালের সহিত সহযোগিতায় কৌশল পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হইবে। অল্পরূপভাবে কলিকাতা বন্দরের সহিত দুর্গাপুর অঞ্চলের জলপথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় দামোদরকে নাব্য করার চেষ্টা হইতেছে।

দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী মাল বহনে সাহায্য করিতেছে বটে তবে পরিমাণ অল্প।

ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থায় খাল ও নদীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার একটি আভ্যন্তরীণ জলপথ কমিটি গঠন করিয়াছেন।

স্থলপথে পরিবহণ (Land Transport) : ব্যবসায় বাণিজ্যের গোড়াপত্তন হইতেই স্থলপথে পরিবহণ প্রচলন ছিল। বেশী দিনের কথা নয় ব্যবসায়ী জনমজুরের (Human labour) মাথায় মাথায় মাল চাপাইয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ব্যবসায় করিত।

কিন্তু বহু দূর অঞ্চলে মাথায় করিয়া মাল বহন করা সময় সাপেক্ষ এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ বলিয়া পশুর সাহায্য লইতে আরম্ভ করিল। তাই দেখা দিল ঘোড়া, গরু এবং উটের প্রচলন। এখনও মক্ক অঞ্চলে উটের পিঠেই বোঝা বহন করা হয়। পরবর্তী যুগে আসিল শকটের ব্যবস্থা। শকট পরিচালিত হইত বলদ মহিষ ঘোড়া দ্বারা। কলিকাতা সহরেই টাম গাড়ী টানিত ঘোড়ায়। গ্রেট ব্রুটেনে রেল গাড়ী টানিত বলদ ও ঘোড়ায়। ধীরে ধীরে শকটের স্থান অধিকার করিল রেলগাড়ী। সুতরাং দেশাভ্যন্তরের ব্যবসায় বাণিজ্যে যান্ত্রিক পথে পরিবহণ নদী পথে পরিবহণের চেয়ে কোন অংশ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বর্তমান নদী পথে পরিবহণের তুলনায় স্থলপথে পরিবহণের গুরুত্ব অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে।

বর্তমান কালে স্থলপথে পরিবহণের উপায়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে

রেলপথ, দ্বিতীয় সড়ক (Road)। সড়ক পরিবহণ সকল দেশেই সম্ভব নহে।
 রেলপথ ও ভারতবর্ষের কথা ধরা যাউক, ভারতবর্ষ মোহম্মী অঞ্চলের
 সড়ক অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বৎসরের মধ্যে ৩-৪ মাস প্রবল বৃষ্টি হয়।
 ফলে কাঁচা রাস্তাসমূহে যান চলাচলের কোনই সুবিধা থাকে না।
 ভারতের গঠন কঠিন শিলাস্তরে না হওয়ার জন্য রাস্তা কর্দমাক্ত হয় এবং রাস্তায়
 যান চলাচলের অসুবিধা হয়।

যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হইতে হইলে রাস্তা বাক্কান (Macadamised
 হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ডে রাস্তা কারিগর Macadam এর নামানুসারে
 Macadamised কথাটি প্রবর্তন হয়। রাস্তা পাকাকরণ
 পাকা রাস্তা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই কারণে ভারতের মত বিরাট দেশে
 সড়ক পরিবহণের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যান চলাচল উপযোগী সড়কের
 যথেষ্ট অভাব। ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সড়কের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই
 পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রাণ্ড ট্রাক সড়ক তৈয়ার করেন সম্রাট শের শাহ।

সড়কের গুরুত্ব ভারত সরকার অবহিত। তাই সমগ্র ভারতবর্ষে যাহাতে সড়ক
 দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তজ্জগৎ কয়েকটি ট্রাক রোড (ট্রাক সড়ক)
 তৈয়ারীর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সড়ক-
 রেলপথে ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থলে
 নাগপুর রোড সহযোগিতা রক্ষার উপায় হিসাবে কতিপয় ট্রাক রোড বা
 কংগ্রেস সড়ক তৈয়ারের সুপারিশ করে নাগপুর রোড কংগ্রেস। উক্ত
 কংগ্রেসটি হইতেছে ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের সকল সড়ক নির্মাণ বিশারদদের
 (Road Engineers) সম্মেলন। ঐ সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত
 সরকার কলিকাতা হইতে বোম্বাই; বোম্বাই হইতে দিল্লী; দিল্লী হইতে
 মাদ্রাজ; মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই; এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ ইত্যাদি
 জাতীয় রাজপথ (National Highway) তৈয়ারের পরিকল্পনা গ্রহণ
 করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে প্রতি রাজ্যে কতিপয় রাজপথ থাকিবে যাহা গঠন ও ব্যবস্থাপনার
 ভার থাকিবে রাজ্যসরকারের হাতে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি
 সড়ক।

সড়ক পরিবহণের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and disadvantages
 of Road Transport) : রেলপথ প্রবর্তনের ফলে সড়ক পরিবহণের গুরুত্ব অনেক
 দ্বারা পাইলেও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। বিশেষত যে সকল দেশে রেলপথ
 স্থলপথে ব্যবসায় বাণিজ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটাইতে পারে না।
 সড়ক পরিবহণের ভারতবর্ষের মত দেশের, অথবা রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের
 সুবিধা কথা মনে করিলে সড়কের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের গুরুত্ব
 বিশেষ উপলব্ধি করা যায়। ভারতবর্ষে প্রচুর অঞ্চল রহিয়াছে যেখানে রেল-
 পথ গঠন এখনও সম্ভব হয় নাই।

সড়কের সুবিধা এই যে (১) যে সকল স্থানে রেলপথ গঠন করা সম্ভব হয় না- সেই সকল স্থানেও সড়ক তৈয়ার করা সম্ভব এবং সড়কের রেলপথ সংযোগের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে ; (২) যে দ্রব্য সহজেই নষ্ট হইয়া যায় ; এবং ভঙ্গুর দ্রব্যও সহজে ও নিরাপদে স্থানান্তরিত করিতে সড়ক পরিবহণ যথেষ্ট সাহায্য করে, (৩) যে কোনও সময়ই দ্রব্য বহন করা যায়। কারণ, রেলপথে মাল পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত পাঠান সম্ভব নহে। আবার রেলে যদি স্থানের অভাব হয় (মনে কর ওয়াগন পাওয়া গেল না) তাহা হইলেও সড়ক পরিবহণ ভাল। এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহাব চলাচল অতি সঙ্গীর্ণ স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন ইট। ইটের চলাচল সাধারণত খুব প্রসার নহে। সুতরাং এই সমস্ত দ্রব্য সড়ক পরিবহণের মাধ্যমেই বহন করা সম্ভব ও সুবিধাজনক। (৫) মাল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এবং দায়িত্ব কম। কারণ রেলপথে বা জাহাজ পথে মাল চলাচলে গুদাম ভাড়া ইত্যাদির যে ব্যয় আছে তাহা সড়ক পরিবহণে নাই। সাধারণত, এক স্থান হইতে মাল গ্রহণ করিয়া আর কোনও স্থানে মাল খালাস দেওয়াই সড়ক পরিবহণের রীতি। তবে জাহাজে মাল প্রেরণে যেমন বীমা প্রায় বাধ্যতামূলক হিসাবেই ধরা হয়, সড়ক পরিবহণে মোটর গাড়ীর তৃতীয় পক্ষ ছুঁটনা বীমা (Third Party Accident Insurance) অবশ্য করণীয়।

এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ সম্ভব ও সুবিধাজনক হয় না। প্রথমত, উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সকল দেশে সকল সময়ই সড়ক পরিবহণ সম্ভব নহে। যেমন ভারতবর্ষে মৌসুমী বায়ুর জন্ত প্রায় ৩-৪ মাস প্রবল বারিপাতের ফলে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়া থাকে এবং কর্দমাক্ত থাকে। সুতরাং ঐ সকল রাস্তা পাকাকরণের (Macadamise) ব্যয় ব্যতীতও রাস্তায় শকটাদি চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়ায়। সুতরাং ভারতবর্ষের মত দেশে সড়ক পরিবহণ ঋতুর উপর নির্ভর করে। এই সকল দেশে শীত ও গ্রীষ্মকালেই সড়ক পরিবহণ সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, রেলপথে যেমন ইচ্ছা করিলে অল্প ওজনের মাল প্রেরণ সম্ভব, সড়ক পরিবহণে তেমনি সর্বদা অল্প ওজনের মাল পাঠান সম্ভব হয় না। একখানা মোটর লরি ভাড়া করিতে হইলে লরির বহন ক্ষমতা পরিমাণ মাল পাঠাইতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রেই লরি ভাড়া পাইতে অসুবিধা হয়। এই প্রকার অসুবিধা রেলপথে বড় দেখা যায় না। নেহাৎ অল্প হইলে বাজীবাহী ট্রেনেও (Passenger Train) মাল বহন করা যায়।

তৃতীয়ত, ক্রততর দ্রব্য হইতে সড়ক পরিবহণ, অর্থাৎ মোটরলরি, পালক গাড়ী

ক্ষমতার দিক
হইতে সড়ক রেল
পথের পিছনে

মোড়ার গাড়ী ইত্যাদি রেলগাড়ীর অনেক পিছনে থাকে।
সুতরাং দূরাঞ্চলে ক্ষমতামূলক বহনের প্রয়োজন হইলে সে প্রয়োজন
সড়ক পরিবহণ মিটাইতে পারে না।

সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিলে অরশু সড়কের পক্ষে যুক্তির
জোর মোটেই পাওয়া যায় না। তথাপি অবস্থা বিশেষে সড়ক পরিবহণের
প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। অনেক সময়ে সড়ক পরিবহণের উপর
রেলপথের পরিবহণের সম্ভাব্যতাও নির্ভর করে। ভারতে সড়ক পরিবহণের অংশ
খুব কম নহে। বরং কোন কোন অঞ্চলে সড়ক পরিবহণ রেলপথের সহিত
প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। কম ভাড়ায় মাল বহনের প্রতিশ্রুতি ও অগ্ৰাণু সুযোগ
দান করিয়া মাল সংগ্রহ করার চেষ্টা ঘরোয়া পরিবহণ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই করিয়া
থাকে। সড়ক পরিবহণ প্রতিষ্ঠানসমূহ রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া

সহযোগিতা করিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে।
রেলসড়ক সংহতি
এই অভিযত ১৯৩৬ সালে ওয়েজউড কমিশন (Wedgewood
Commission) প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ কমিশনকে ভারতের রেলপথের উন্নতি
বিধানের পথ নির্দেশ করিয়া সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছিল। ওয়েজউড
কমিশনের মতে ভারতবর্ষে রেলপথ ও সড়ক পরিবহণের মধ্যে সংহতি (Rail-
Road Co-ordination) অপরিহার্য। কিছুটা উক্ত কমিশনের সুপারিশে, কিছুটা
নাগপুর রোড্ কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার কয়েকটি জাতীয় ও
কয়েকটি রাষ্ট্রীয় রাজপথ তৈয়ারি প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেক সড়ক পরিবহণ
প্রতিষ্ঠান রেলপথের সহিত সহযোগিতায় কার্য করে।

সড়ক পরিবহণে মালপ্রেরণের পদ্ধতি : মোটরলরি অথবা পশুচালিত
শকটে মাল পাঠাইতে হইলে পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের কার্খালয়ে মাল উপস্থিত করিতে
হয়। যদি মালের মালিক নিজেই মাল বাস্কেবন্দী, বস্তাবন্দী বা মোড়ক করিয়া না
আনে, তাহা হইলে পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের হাতে মোড়ক বা বাস্কেবন্দী করার দায়িত্ব
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান বহনযোগ্য দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে মোড়ক
করিতে অভিজ্ঞ হয়। পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের হাতে মোড়ক করার ভার ছাড়িয়া
দিলে, মোড়কের দোষত্রুটির জন্ত ক্ষতি হইলে সে ক্ষতি পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের
নিকট হইতে আদায় করা যায়।

মোটরলরি ইত্যাদি পরিবহণ ব্যবস্থায় মাল স্থানান্তর করা হইলে সাধারণত মাল
খালাস দেওয়া হইলেই বহন মাণ্ডল দেওয়া হয়। অগ্রথায় মালের মাণ্ডল অগ্রিমও
দেওয়া যায়। মাল পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের হাতে সমর্পণ করিলে
মালের রসিদ
মাল পরিবহণ প্রতিষ্ঠান জাহাজী প্রতিষ্ঠানের বহন পত্রের (Bill
of Lading) মত রসিদ দিয়া থাকে। সেই রসিদ মালপ্রাপকের নিকট
পাঠাইয়া দিলে মালপ্রাপক মালের খালাস লয়।

ভুক্তিপত্র
দ্বিতীয় উপায় অতি সহজ। নৌভাটক অর্থাৎ জাহাজ ভাড়ার
মতই (Charter Party) পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে

মোটর লরি অথবা শকট ভাড়া লইতে পারে। নিজের দায়িত্বে মাল পুঁতি মাল বহন ও খালাস হয়। পরিবহণ প্রতিষ্ঠান অগ্রিম ভাড়া লইতে পারে অথবা যে সময়ের জন্ত ভাড়া করা হয়, সেই যাত্রার শেষে মাসুল পরিশোধ করা হয়।

রেলপথ (Railways) : পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে রেলপথ তৈয়ার এবং রেলপথে চলাচল অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রেলপথ যুগের (Railway Era) স্বচনা রেলপথের স্বচনা হয়। রেলগাড়ী আবিষ্কারের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। জেম্‌স্‌ ওয়াটস্‌ বাষ্পচালিত যন্ত্র (Locomotive Engine) আবিষ্কার করেন। সেই যন্ত্রের উন্নতি করেন জর্জ স্টিফেনশন। জর্জ স্টিফেনশনের (George Stephenson) গবেষণার ফলে ১৮২৫ সালে যে এঞ্জিন তৈয়ার হয় সেই এঞ্জিন প্রতি ঘণ্টায় ৪ মাইল চলিতে সমর্থ ছিল। ঐ এঞ্জিন কয়লা খনিতেই ব্যবহারোপযোগী ছিল। পরে এঞ্জিনের আরও উন্নতি হইলে বর্তমান বেলপথের প্রবর্তন হয়।

বেলপথ আবিষ্কারের ফলে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা দিতে লাগিল। যদিও শিল্প বিপ্লব শুরু হয় জেম্‌স্‌ ওয়াটসেব (James Watts) যন্ত্র আবিষ্কারের পর, তথাপি বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকরী হইতে আরম্ভ হয় স্টিফেনশনের রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর। প্রচুর পৰিমাণে দ্রব্য অতি দ্রুত বহনের অভাব রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার হইতে মোচন হয়। বর্তমানে যত মাল এবং যাত্রী চলাচল হয় উহার অধিকাংশই রেলপথে।

একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শ্রমিকের গতিশীলতা (Mobility of Labour) এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা, শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য। রেলপথ উক্ত দুইটি কার্যই সম্পাদন করিয়াছে। রেলপথের জন্তই এক একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুত শ্রমিকের গতিশীলতা অনেক দেশে—যেমন কানাডা, ভারতবর্ষ, রেলপথই দেশের ও রেলপথ উন্নতির বাহক এবং রেলপথই সেই সকলকে বর্তমান অবস্থায় পৌছাইয়া দিয়াছে। অনেক দেশে অবশ্য রেলপথ ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় নাই। ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিরক্ষা ও ভূমিত্তিক নিবারণের জন্তই গঠিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে রেলপথ ভারতের অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। একথা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের বেলায়ই সত্য।

রেলপথের সুবিধা-অসুবিধা : খুব দ্রুত ভারী মাল স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে

রেলপথের মত অন্য কোন পরিবহণ ব্যবস্থাই সক্ষম নহে।

সুবিধা

দ্রুতগতি

একখানি রেলগাড়ী যখন ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলিবে, মোটর

লরি বা গাড়ী হয়ত ৩০-৪০ মাইল বেগে চলিতে থাকিবে।

দ্রুততার কথা বাদ দিলেও রেলগাড়ীর যেমন খুব ভারী দ্রব্য বহন করার ক্ষমতা আছে, মোটর গাড়ী, লরি, শকটামির সে ক্ষমতা নাই।

দ্বিতীয়ত, রেলগাড়ী খুব দূর দূরান্তরে মালবহন করিতে পারে যাহা শেপ্টরগাড়ী বা দুরান্তরের সহিত মোটর লরির পক্ষে সম্ভব নহে। খুব দূর দূরান্তরেই যে কেবল যোগাযোগ মাল বহন করিতে পারে তাহা নহে খুব ভারী মালও দূর দূরান্তরে বহন করিতে পারে।

তৃতীয়ত, অল্প ব্যয়ে বহু দূরেও মালবহন করা যায়। রেলগাড়ী একই সময় প্রচুর পরিমাণে মালবহন করে বলিয়া দূরত্বের তুলনায় বহন ব্যয়ের স্বল্পতা ব্যয় কম পড়ে।

চতুর্থত, রেলপথে চলাচলের স্থির এবং নির্দিষ্ট সময় আছে স্থির সময় বলিয়া নির্দিষ্ট সময়ে মাল আদানপ্রদানে অসুবিধা হয় না।

পঞ্চমত, রেলগাড়ীতে পচনশীল দ্রব্যও দূর দূরান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব। রেলপথ এত ক্ষুদ্র প্রসার লাভ করিয়াছে এবং মালবহনে রেলপথের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা এত বাড়িয়াছে যে রেলযোগে বিভিন্ন প্রকার মাল বহন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার গাড়ী তৈয়ার হইতেছে। যেমন, কয়লা বহন করার জন্য বন্ধ গাড়ী এবং পেট্রল জাতীয় প্রজ্জ্বালক তৈল বহন করার জন্য ট্যাক গাড়ী। অত্যন্ত পচনশীল দ্রব্য বহন করিবার জন্য যেমন ফল ইত্যাদি শীতাতপ, নিয়ন্ত্রিত রেল-অসুবিধা গাড়ী তৈয়ার হইতেছে রেলপথ খুব ক্ষুদ্র গতিতে উন্নতি করিলেও উহা যে ক্ষুটিহীন, তাহা নহে।

প্রথমত, রেলপথের অল্প দূরত্বে মাল প্রেরণে ব্যয় পড়ে অধিক। কারণ অল্প দূরত্বের জন্য যে পড়তা ব্যয় (Overhead Charges) হইবে তারতম্যমূলক মাণ্ডল তাহা কখনই অধিক দূরত্বের পড়তা ব্যয়ের সমান হইবে না। রেলপথের মাণ্ডল তারতম্যমূলক হারে আদায় করা হয়। এ বিষয় পরে আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, রেলপথ তৈয়ারী করিতে প্রচুর ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। তৈয়ার করা ব্যতীতও রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও প্রচুর। রেলের লাইন স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল। ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের অথবা রাজী চলাচল খুব অধিক না হইলে সে সকল স্থান রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত হওয়া কঠিন।

তৃতীয়ত, রেলপথে সর্বদাই যে স্থান পাওয়া যাইরে তাহা নহে। ওয়াগন পাওয়া না গেলে, পথ নষ্ট হইলে বা মেরামতের আবশ্যক হইলে অনেক সময় মাল চলাচলে বিলম্ব হয়। সুতরাং চাহিদা অল্পসারেই যে ক্ষুদ্র মাল পাঠান সম্ভব তাহা নহে। তদুপরি রেলগাড়ীতে মাল পাঠাইতে হইলে আনুষ্ঠানিক ভাবে কতিপয় স্তরভেদ করিতে হয়। নানা প্রকার কয়ল প্রেরণ করা, মাল গ্রহণের স্বীকৃতি সংগ্রহ উহাতেও বেশ কিছু সময়ের আবশ্যক হয়।

চতুর্থত, রেলপথে দ্রুত পচনশীল দ্রব্য চালান দেওয়া কষ্টকর। অনেক রেলপথই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ী তৈয়ার করিতে সক্ষম হয় নাই। দ্রুত পচনশীল দ্রব্য এক্ষেত্রেও অবশ্য ব্যয়ের প্রায়ই সর্বাগ্রে উঠে। কারণ শীতাতপ বহুদূরে প্রেরণ নিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ী তৈয়ার করিতে প্রচুর অর্থব্যয় হয় বলিয়া অসম্ভব সেই সকল গাড়ীতে মাল বহনের মাতুলও খুব অধিক হয়। ফলে দ্রব্যের প্রতিযোগিতার শক্তি খর্ব হয়।

পঞ্চমত, রেলপথ কখনও একই হারে সকল দ্রব্যের উপর মাতুল আদায় করে না। দ্রব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োগ অনুসারে মাতুলের তারতম্য ঘটে। পরিবহণ ব্যয় অধিক এখানেও ‘মাল বাহা দিতে পারে’ (What the traffic will bear) এই নিয়মে মাতুল আদায় হয়। সুতরাং মাল বিশেষে মাতুল এত উচ্চ হইতে পারে যে রেলপথে মাল না পাঠাইয়া, নদীপথে অথবা সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় পরিবহণ স্থলভ হয়।

সকল প্রকার সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিলেও দেখা যায় যে সড়ক, রেলপথ ও নদীপথের মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে রেলপথ শীর্ষস্থানীয়। তথাপি অস্ত্রান্ত পরিবহণ ব্যবস্থাও যে রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে তাহার কারণ রেলপথ সকল শ্রেণী সন্তোষকারীর অথবা পরিবহণের অসুবিধা দূর করিতে সক্ষম হয় নাই।

রেলপথের মাতুল নির্ধারণ : একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে রেলপথ কখনও সেবামূল্য ভিত্তিতে মাতুল নির্ধারণ করিতে পারে না। এই কারণেই রেলপথসমূহ ‘যাহা মাল বহন করিতে পারে’ (What the traffic will bear) নিয়মে মাতুল নির্ধারণ করে। রেলগাড়ী ব পক্ষে মাল বহনের ব্যয়ের হিসাব অঙ্কন করিয়া মাতুল আদায় করা কষ্ট। রেলগাড়ী ব নানা প্রকার আনুসঙ্গিক ব্যয় (Overhead Charges) থাকার ফলে আনুসঙ্গিক ব্যয় বণ্টন মাতুল নির্ধারণে একটি অতি জটিল পদ্ধতি। সুতরাং আনুসঙ্গিক ব্যয়ের কত পড়তা ব্যয় অংশ কোন মালের উপর কি হারে বসান হইবে তাহা সূক্ষ্ম হিসাব অঙ্কন দ্বারাও নির্ভুলভাবে বিচার করা কঠিন। একজন গার্ডের বেতনের কত অংশ মালের উপর, কত অংশ যাত্রীর উপর, কত অংশ ৫ মাইল দূরত্বের জন্ত ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভাগ সম্ভব নহে বলিয়াই রেলপথসমূহ ‘যাত্রী বা মাল বাহা বহন করিবে’ (What the traffic will bear) নীতিতে মাতুল স্থির করে। এই কারণেই রেলপথসমূহ দ্রব্যের মূল্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করে। অল্প মূল্যের দ্রব্যসমূহ নিম্ন শ্রেণীর এবং উচ্চ মূল্যের দ্রব্য উচ্চ শ্রেণীর। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর দ্রব্যের উপর গুণের হার খুব কম; আর উচ্চ শ্রেণীর দ্রব্যের উপর গুণের হার উচ্চ। এই প্রভেদ মূলক মাতুল বা গুণের হার (differential freight) রেলপথের মাতুলের বৈশিষ্ট্য।

সর্বদাই যে মালের শ্রেণীর উপর ভিত্তি করিয়াই মাতুল স্থির করা হয় তাহা নহে। দ্রব্য যে আদৌ বিবেচনা করা হয় না তাহাও নহে। তবে গুণের উপর পূর্বা

নীতিতে (Slab System) মাণ্ডল দাবী করা হয়। করনীতিতে পর্বীয় পদ্ধতিতে পর্বীয় পদ্ধতিতে আয় বাড়িলে :প্রত্যেক পর্বে (Slab) আয়করের হার মাণ্ডল নির্ধারণ বাড়়ে, রেলপথের শুদ্ধ বা মাণ্ডলে ইহার বিপরীত। দূরত্ব যত বাড়়ে মাণ্ডলের হার গড়়ে তত কমে। যদি কেবলমাত্র দূরত্ব বিচার করিয়াই মাণ্ডল স্থির করা হয় তাহা হইলে যত অধিক দূর মাল বহন করা হয় মাণ্ডলের হারও ততই অধিক হওয়া উচিত।

এই কারণেই রেলকর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর নূতন করিয়া শুদ্ধ বা মাণ্ডলের হার স্থির করে। কারণ মাণ্ডল বৃদ্ধির ফলে যদি মাল চলাচল অথবা যাত্রী চলাচল কমিয়া যায় তবে তাহা হইলে একদিকে যেমন জাতির সামগ্রিক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি হয়, অত্র দিকে তেমনি রেলকর্তৃপক্ষের আয় কমিয়া যায়। সুতরাং মাণ্ডল সর্বদাই এমনভাবে স্থির করা হয় যাহাতে মাল ও যাত্রী চলাচল না কমিয়া বাড়িয়া যায়। রেলপথে চলাচলের ও মাল বহনের উৎসাহ দান করার জন্তই রেলকর্তৃপক্ষ 'What the traffic will bear' নীতিতে মাণ্ডল নির্ধারণ করে।

দূরত্ব ও মালের গুরুত্ব অনুসারে মাণ্ডল নির্ধারণ করা হইলেও আর একটি ব্যয় আছে যাহা সকল মালের উপর সমান হারেই প্রযোজ্য। উহাকে প্রান্তীয় মাণ্ডল (Terminal Charge) বলা হয়। প্রান্তীয় মাণ্ডল মালের ওজনের উপর দাবী করা হয়—দূরত্বের উপর নহে। প্রান্তীয় মাণ্ডল যাত্রা আরম্ভের স্থলে এবং গন্তব্য স্থলে পৌঁছিলে কর্তৃপক্ষ যে সেবা (service) দেয় উহার জন্তই আদায় করা হয়। সুতরাং রেলপথের মাণ্ডলের ত্রিবিধ ভাগ পাওয়া যায় : (১) দূরত্ব ; (২) মালের ভাড়া বহনক্ষমতা ; (৩) প্রান্তীয় মাণ্ডল।

রেলপথে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি : রেলপথে মাল পাঠাইতে হইলে প্রথমেই খুব স্থলরূপে মাল মোড়ক করিয়া রেল কর্তৃপক্ষের অফিসে উপস্থিত করিতে হয়। রেলকর্তৃপক্ষের যে বিশেষ কার্যালয়ে মাল উপস্থিত করিতে হয় তাহার নাম মাল অফিস (Goods Office)। মোড়ক বা বাক্স, যাহাই হউক না কেন, উহার গায়ে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা ; প্রাপকের নাম ও ঠিকানা ; মালের ওজন ও প্রকৃতি (অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা) ; কোন স্টেশন (আড্ডা) হইতে কোন স্টেশনে পাঠান হইতেছে ; রেল লাইনের বা অঞ্চলের নাম ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে লিখিয়া দিতে হয়। অনেক ব্যবসায়ী এই সকল বিবরণ কাগজে ছাপাইয়া উহা মোড়কের গায়ে আঁটা দিয়া লাগাইয়া দেয়। মাল উঠাইতে নামাইতে ঐ কাগজ ছিঁড়িয়া বাইতে পারে অথবা নষ্ট হইয়া বাইতে পারে বলিয়া, ঐরূপ ছাপান কাগজে সকল বিবরণ দেওয়া থাকিলেও মোড়কের গায়ে মোটা হরফে পুনরায় বিবরণসমূহ লিখিয়া থাকে।

মাল মোড়ক করা হইলে উহা মাল অফিসে (Goods Office) লইয়া বাইতে

হয়। সেখানে মাল প্রেরণ-লিপি (Consignment Note) প্রদান করা হয়। মাল প্রেরণ-লিপিতে, মাল প্রেরকের নাম,

মালপ্রাপকের নাম; মালের ওজন ও প্রকৃতি (ভালিয়া বাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা); মালের ভাড়া আদায় দেওয়া হইয়াছে কিংবা প্রাপক আদায় দিবে অর্থাৎ 'Freight to pay' কিনা, মাল মালিকের দায়িত্বে কিংবা রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে পাঠান হইল কিনা উহা লিখিতে হয়। মাল প্রেরণ-লিপি (Consignment Note) পূরণ করিয়া মাল অফিসের কর্মচারীর (Goods Clerk) নিকট জমা দিতে হয়। মাল অফিস হইতে তখন মালের ওজন লওয়া হয় এবং

রেল রসিদ

মোড়কটির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ইহার পর

মাণ্ডল নির্ধারণ করিয়া এবং মাল গ্রহণ করিয়া মাল অফিসের কর্মচারী একখানা রসিদ দিবে। উহাকে বলে রেল রসিদ (Railway Receipt)। মাণ্ডল যদি গন্তব্য স্থলে পৌঁছিলে মাল প্রাপককে দিতে হয় তাহা হইলে রসিদের গায়ে মাণ্ডল দেয় (Freight to pay) ষ্টাম্প মারিয়া দিতে হয়। প্রেরক ঐ রসিদ (Railway Receipt) প্রাপকের নিকট পাঠাইয়া দিবে। এমতভাবে পাঠাইবে যাহাতে মাল পৌঁছবার পূর্বেই রসিদ প্রাপকের নিকট পৌঁছায়।

ইচ্ছা করিলে যাত্রী নিজেই মাল লইয়া যাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। যাত্রী নিজেই যদি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে রেলগাড়ীতে মাল উঠাইবার ও নামাইবার ব্যবস্থা মালিককেই করিতে হয়। কিন্তু মাল যদি রেলকর্তৃপক্ষের হেপাজত করিয়া উহাকেই সকল ভার দেওয়া হয় তাহা হইলে রেলগাড়ীতে মাল তোলায় ব্যবস্থা রেলকর্তৃপক্ষকেই করিতে হয়।

মালসমেত রেলগাড়ী গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলে প্রাপককে মাল পৌঁছবার সংবাদ দিতে হয়। রেলকর্তৃপক্ষ নির্দেশপত্র (Advice Note) পাঠাইয়া প্রাপককে সংবাদ দিয়া থাকে। নির্দেশপত্র পাইলে প্রাপককে উপরি-লিখিত

নির্দেশ পত্র
রেলের রসিদ (Railway Receipt) লইয়া রেল অফিসে উপস্থিত হইয়া মালের খালাস লইতে হয়। ষ্টেশনে মাল পৌঁছিলে কয় দিনের মধ্যে খালাস লইতে হইবে তাহা নির্দেশপত্রে উল্লেখ থাকে। মাল খালাস করিতে

যে কয়দিন সময় দেওয়া হয় তাহাকে বলে স্থিতিকাল (Lay
স্থিতিকাল
Days)। স্থিতিকালের মধ্যে মাল খালাস না লইলে রেল কর্তৃপক্ষকে খেসারত (Demurrage) দিতে হয়। মাল বহনের মাণ্ডল যদি 'দেয়' হয় তাহা হইলে মাল খালাস করিবার পূর্বে মাণ্ডল আদায় দিতে হয়।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মাল প্রেরকের নিজের দায়িত্বে (Owner's Risk) অথবা রেলকর্তৃপক্ষের দায়িত্বে (Railways' Risk) পাঠাইতে পারে।

নিজের দায়িত্বে মাল বহন করা হইলে মাণ্ডলের হার কম হয়।
নিজ দায়িত্বে
মাল প্রেরণ
কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে পাঠান হইলে মাণ্ডলের হার বেশী হয় বটে, কিন্তু যাত্রাপথে মালের কোনরূপ ক্ষতি হইলে রেল-

কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকে।

মাল খালাস লইবার কালে প্রাপককে বিলিবহিতে (Delivery Book)

মালপ্রাপ্তির স্বীকৃতি হিসাবে সহি করিতে হয়। যদি মালের কোনও প্রকার দোষক্রটি দেখা যায় তাহা হইলে বিলিবহিতে (Delivery Book) সে-কথা উল্লেখ করিয়া সহি করিতে হয়; নচেৎ ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে রেলকর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের বিষয় বিবেচনা করে না। মালের কোনরূপ ক্ষতি হইলে রেলকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হয় অন্যথায় রেলকর্তৃপক্ষ ক্ষতি পূরণের দাবী গ্রাহ্য নাও করিতে পারে।

বরাবর পরিবহণ (Through Transport) : অনেক সময়ে রেলকর্তৃপক্ষ জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা মোটর পরিবহণ প্রতিষ্ঠানের সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে যে কোনও এক স্থান হইতে অল্প কোনও স্থানে মাল পাঠাইতে যদি একাধিক পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য লইতে হয় তাহা হইলে বরাবর পরিবহণের যাত্রার সময়ে যে পরিবহণ ব্যবস্থার হাতে মাল দেওয়া হয়, সেই পরিবহণই পথিমধ্যে অল্প পরিবহণ ব্যবস্থার হাতে মাল সমর্পণের ব্যবস্থা করিবে। ভাড়া হয় যাত্রা স্বরূপ পরিবহণ ব্যবস্থার হাতে অথবা গন্তব্যস্থলে যে পরিবহণ পৌছাইয়া দেয় উহার হাতে, একটি কর্তৃপক্ষের হাতে দিলেই চলে।

এই নিয়ম ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন ও রয়েল ষ্টীম নেভিগেশন এবং রেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচলিত আছে। মনে কর, গোহাটি হইতে কোনও মাল কলিকাতায় পাঠাইবে। কলিকাতায় পৌছিতে রেল এবং জাহাজ (ষ্টীমার) উভয়ের সাহায্যই প্রয়োজন। গোহাটিতে রেলকর্তৃপক্ষের হাতে মাল সমর্পণ করিয়া দিয়া ভাড়া চুকাইয়া দেওয়া হইল। রেলকর্তৃপক্ষই ষ্টীমার হইতে পাণ্ডা

উদাহরণ টেনে মাল নামাইবার ব্যবস্থা করিবে, ষ্টীমার কর্তৃপক্ষ রেলের মাল তুলিয়া দেওয়ার জন্তও দায়ী। আবার মনিহারী ঘাটে রেলকর্তৃপক্ষ ষ্টীমারে মাল তুলিয়া নিবে, কিন্তু অপর পারে টেনে মাল তুলিয়া দিবে ষ্টীমার কোম্পানি। আর শিয়ালদহ টেনে মাল নামাইবার ব্যবস্থা করিবার ভার থাকিবে মাল প্রেরকের নিজের।

বরাবর বহনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেক সময় জাহাজান্তর (Transshipment) ব্যবস্থার জন্তই প্রেরককে মালের সহিত ভ্রমণ করিতে হয়।

ভারতবর্ষের রেলপথ (Indian Railways) : ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে রেলপথের গুরুত্ব ১৮৪০ সালে তৎকালীন ডাইসরয় লর্ড ডালহৌসী তাঁহার অন্নগীয় পত্র (Despatch) দ্বারা ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করেন। রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি ঐ পত্রে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ২টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, স্বর্ণপ্রসূ ভারতের দূর

দূরাক্শে যে কাঁচামাল ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা গ্রেটব্রিটেনে রপ্তানি-পথ সহজ হয় যদি ভাল রেলপথ থাকে। দ্বিতীয়ত, গ্রেটব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যও ভারতের বাজারে বিক্রয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

লর্ড ডালহৌসীর চিঠির বর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সম্ভাব্য ভারতের কাঁচামাল স্বদেশে লইয়া সেই কাঁচামালের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া পুনরায় অধিক মূল্যে ভারতে বিক্রয় করা, এবং ফলে ভারতের শিল্পের অগ্রগতির পথ রোধ করার চেষ্টা।

লর্ড ডালহৌসী রেলস্থাপনের পক্ষে আরও যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতির খেয়ালের উপর (Vagaries of Nature) নির্ভর করে। সুতরাং কোন বৎসর শস্ত না জন্মিলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে স্ত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। লর্ড ডালহৌসীর যুক্তির মথার্থতা পরবর্তী সময়ের ভারতে শিল্প ও কৃষির ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। রেলপথের কল্যাণে বর্তমানে দুর্ভিক্ষ আর থাকে দুর্ভিক্ষ নহে, দুর্ভিক্ষ অর্থের (It is no longer a famine of food but a famine of money)।

লর্ড ডালহৌসীর প্রচেষ্টায়ই ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপন হয় ১৮৫৩ সালে। বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ২০ মাইল পথে হয়। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পর ১৯৫২ ভারতের মোট রেলপথ দাঁড়াইয়াছে ৩৫০৮১ মাইল।

পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকার পরিবহণ রেলপথের ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ (রাষ্ট্রীয়করণের) নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। আঞ্চলিক বিভাগে তবে উহার মধ্যে সর্বাগ্রে রেলপথকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে।

জাতীয়করণের পর ভারতের রেলপথ পুনর্বিভাগ করা হইয়াছে। পুনর্বিভাগের ফলে ভারতের সমগ্র রেলপথকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলকে বলে জোন (Zone)। আটটি অঞ্চল—পূর্বাঞ্চল (Eastern); দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (South-Eastern); উত্তর-পূর্বাঞ্চল (North-Eastern); উত্তরাঞ্চল (Northern); পশ্চিমাঞ্চল (Western); মধ্যাঞ্চল (Central); উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (North-Eastern Frontier); দক্ষিণাঞ্চল (Southern)।

ভারতের রেলপথ ঘরোয়া ব্যবস্থায় ও সরকারী সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথের পরিচালনা স্ত্রী ও স্বসংহতভাবে হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া এবং রেলপথ পরিচালনের ব্যয় সঙ্কট করিবার জন্তই ভারতের সমগ্র রেলপথের পুনর্বিভাগ করা হইয়াছে।

উপরের ৩৫০৮১ মাইল রেলপথের মধ্যে ৩৪৬৩৬ মাইল ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায়। বাকী অংশ যদিও ছোট ছোট রেলপথ প্রতিষ্ঠানের হাতে তথাপি অদূর ভবিষ্যতে উহাও রাষ্ট্রীয়করণ করা হইবে।

বিমান পরিবহণ (Air Transport): ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রেলপথের ও জলপথের গুরুত্বের তুলনায় বিমান পরিবহণের বিমান পরিবহণ গুরুত্ব কম না হইলেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে (Commercial bases) বিমান পরিবহণ অতি অল্প দিনেরই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীব্যাপী

কারিগরী বিস্তার যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয় উহার ফলেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিমান পরিবহণ সম্ভব হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে একথা অল্পভূত হইয়াছিল যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আকাশযান ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। তাই প্রথম বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে লণ্ডন এবং প্যারিসের মধ্যে। তদবধি বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় আশ্চর্যজনক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ঐতিহ্যের দিক, হইতে বিমান পরিবহণের সমান পর্ষায়ে আ' কোনও পরিবহণ ব্যবস্থা অগ্রসর হইতে পারে নাই। তথাপি বিমান পরিবহণ ব্যয় এত অধিক যে যাত্রী ও ডাক চলাচলেই বিমান পরিবহণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। খুব ভারী মাল বিমানে পরিবহণ করা কষ্টকর এবং খুবই ব্যয়সাধ্য। এই কারণে হাল্কা অথচ মূল্যবান সম্পদই বিমানপথে পরিবহণ করা হয়।

বিমানে পরিবহণের উন্নতি করিতে হইলে বিমানঘাঁটি বা বিমান বন্দর তৈয়ার করিতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত দক্ষ চালকের প্রয়োজন। এই সকল কারণে বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। যাত্রী ও ডাক চলাচল ব্যতীত বিমানে যে মাল পরিবহণ করা হয় না তাহা নহে। তবে উহার পরিমাণ রেলপথে ও জলপথে পরিবহণের তুলনায় অতি অল্প।

ভারতের বিমান পরিবহণ রাষ্ট্রীয়করণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে বেসামরিক বিমান চলাচল (Civil Aviation) আরম্ভ হয় ১৯২৪ সাল হইতে। ভারত সরকার বিমান চলাচল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া দুইটি সংস্থা স্থাপন করিয়াছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল গঠন করা হইয়াছে।

কুত্র কুত্র বিমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় যথেষ্ট গলদ এবং ত্রুটি ছিল বলিয়াই স্থলসংহত ব্যবস্থাপনার জন্য বিমান পরিবহণ ও রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আবার বেসরকারী বিমান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা; ক্ষুদ্রায়তন বিমান পরিবহণে যে অপচয় হয়, এই সকল দোষত্রুটি হইতে বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাকে মুক্ত করার জন্যও বিমান পরিবহণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার পর বিমান পথে যাত্রী চলাচল প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বেসামরিক বিমান ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

Exercises

1. Give an account of the services rendered by in Transport Industry and Commerce. Give suitable illustrations.
পরিবহণ ব্যবস্থা নিম্ন ও বাণিজ্যে কি সহায়তা দেয় উদাহরণ সাহায্যে তাহার বিবরণ দাও।
2. Compare the advantages of Road and Rail Transport.
রাস্তাপথে ও রেলপথে পরিবহণের সুবিধার তুলনা কর।
3. Describe the formalities of despatching goods by rails ?
রেলপথে মাল পাঠাইবার পদ্ধতি আলোচনা কর।
4. Distinguish a Liner Ship from a Tramp Ship ?
নির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজ ও অনির্দিষ্ট লক্ষ্য জাহাজের মধ্যে পার্থক্য কি ?
5. What is a Charter Party ? What are its contents ?
নৌচুক্তি কি ? উহার বিষয়বস্তু কি ?
6. Write notes on :
(a) What the traffic will bear ; (b) Deferred Rebate System ;
(c) Guarantee System ; (d) Lay days ; (e) Jettison ; (f)
Bottomery Bond ; (g) Respondentia ?
সংক্ষেপে আলোচনা কর :—
(ক) মাল যাহা বহন করিতে পারে ; (খ) বিলম্বিত বাউ পদ্ধতি ; (গ) প্রতিজ্ঞা
প্রণী ; (ঘ) স্থিতিকাল ; (ঙ) মালক্ষেপণ ; (চ) পোতবদ্ধক পত্র ; (ছ) মালবদ্ধক
পত্র।

একাদশ অধ্যায়

কারখানা ও অফিস সংগঠন

(Factory and Office Organisation)

ব্যবসায়ের পরস্পর-সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল অংশসমূহকে সুসংহত পূর্ণাংগ অবস্থায় আনয়ন করাকেই সংগঠন বলা হয়। (Organisation means the bringing together into a harmonious whole the related and inter-dependent parts of a business.—S. E. Thomas).

সংগঠন লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে পৌঁছিতে উপায় হিসাবে সংগঠন করা হয়। ব্যবসায়ের লক্ষ্য ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া, দক্ষতা বজায় রাখিয়া বহুল উৎপাদন করা। সকল কারখানার বিভাগ-ব্যবসায়ের লক্ষ্যই মূনাফা অর্জন করা। কিন্তু সুসংহতভাবে (well-organised) এবং দক্ষতার সহিত (efficiently) করণ

উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালন করিতে না পারিলে উৎপাদনে ব্যয় সংক্ষেপের সুযোগ গ্রহণ অসম্ভব। ফলে প্রতিযোগিতায় ঐটিয়া উঠা কষ্টকর।

পরিচালন (Organisation) ব্যবসায়ের লক্ষ্যে পৌঁছিতে কার্যের প্রকার অনুসারে বিশেষজ্ঞদের হাতে কার্যের ভার ছাড়িয়া দিতে পারে—ইহাকে ইংরেজীতে বলে Functionalising ; আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকের কার্য এক নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতেও পারে ; যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত কার্য স্বয়ংক্রিয় (Automatic) উপায়ে চলিতে পারে।

ব্যবসায়ের লক্ষ্যে পৌঁছিতে সুসংহত পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যবসায়ের আঙ্গিক গঠন বিভাগের (Lay Out of Premises) উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ব্যবসায়ের কারখানার গঠন পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে সহজেই ব্যবসায় প্রসার করা যায়। আবার গঠন পদ্ধতি যদি ব্যবসায়ের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণ করা না হয় তাহা হইলেও ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া ব্যবসায়ের কার্য করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞ কার্যসমূহ বিকেন্দ্রীভূত (decentralise) না করিলে কোনও ব্যবসায়ই উদ্দেশ্য লাভে সফলকাম হইতে পারে না। কারণ একই ব্যক্তির পক্ষে

ব্যবসায়ীর সকল বিশেষ কার্যের ফলাফল বিচার করা বিশেষজ্ঞতা

অথবা দক্ষতার সহিত পরিচালন করা সম্ভব নহে। বহুল উৎপাদন ব্যবস্থার বাহাতে প্রশ্রবিভাগের সর্বপ্রকার সুফলের সুযোগ লওয়া যায় তদ্ব্যতীতই ব্যবসায়ে প্রশ্রবিভাগ ও মায়িস্বের পরিধি নিরূপণ আবশ্যক হয়।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ের স্বল্প পরিচালনের জন্য আন্তর্বিভাগীয় সহজে সংহত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভাগ যদি নিজের খুসীমত চলিতে থাকে এবং বিভাগ-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি না থাকে

তাহা হইলে ব্যবসায়ের কার্যকরী শক্তির অপচয় ঘটে। প্রত্যেক কর্মীর কার্যই যে দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে এবং দ্রব্যের দোষত্রুটি ও গুণের জন্য তাহার কার্যও যে অংশত দায়ী একথা যাহাতে কর্মীদের মনে দৃঢ়তর ভাবে মূল গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চতুর্থত, প্রত্যেক ব্যবসায়ের সাফল্য উহার সুনামের উপর নির্ভর করে। ক্রেতার চাহিদার সহিত উৎপাদন ও বিলি বণ্টন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটাইতে না পারিলে ব্যবসায় সুনাম অর্জন কবিতে পারে না।

সুতরাং উপরের আলোচনা হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে স্বল্প সংগঠনের অভাবে যে স্বযোগ গ্রহণ করা যাইতে না, সেই স্বযোগ গ্রহণ করিয়া লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসায়ে কর্মের বিভাগ ও বিশেষীকরণের প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াই কোন ব্যবসায় লাভ করিতে পারে না, উৎপাদিত দ্রব্য সুলভে বাজারে বিক্রয়ও করিতে হয়। সুতরাং ব্যবসায় স্বল্প পরিচালনের জন্য সমগ্র ব্যবসায়টিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করিতে হয়—এবং সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য পরিচালক দায়ী থাকেন।

ব্যবসায়ের স্বল্প পরিচালনের কোন নির্দিষ্ট সূত্র (formula) নাই। প্রত্যেক ব্যবসায়ের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সংগঠন পদ্ধতি স্থির করা হয়। তবে মোটামুটি একটি পদ্ধতি প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই অনুসরণ করা হয়। সেই পদ্ধতি অনুসারে ব্যবসায় সংগঠন বিচার করা যাউক।

কোনও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রথম করণীয় বিষয় উহার স্থান নির্বাচন (Selection of Site)। স্থান নির্বাচনে যে কয়টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তাহা হইতেছে—(১) উৎপাদন কেন্দ্র শক্তি সরবরাহ

কেন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়া প্রয়োজন। অধুনা জলবিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অনেক দূরেও কারখানা স্থাপিত হইলে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শিল্প গঠনের গোড়ায় কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চলেই কারখানা স্থাপিত হইত। (২) কারখানা যাহাতে বিক্রয় কেন্দ্র হইতে খুব দূরে স্থাপিত না হয় তাহাও কারখানা কর্তৃপক্ষের দেখা প্রয়োজন। (৩) কাঁচামালের নিকটবর্তী অঞ্চলে না হইলে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। (৪) কারখানার স্থান নির্বাচনে প্রয়োজন হইলে কারখানা সম্প্রসারণের জন্য জায়গা পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও দেখা প্রয়োজন। (৫) কারখানা প্রায় কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে হইলে অনেক সময়ে প্রমিত সংগ্রহে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। (৬) কারখানার সহিত বহির্জগতের সহজে যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্বল্প পরিবহণ ব্যবস্থা আবশ্যিক।

এই সকল অবস্থা বিচার করিয়া কারখানার স্থান নির্বাচন করি। প্রয়োজন।
 কারখানার বিভিন্ন কারখানা বাদেও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্গত বিভাগ থাকে।
 বিভাগ প্রথমেরই কি কি বিভাগ থাকা প্রয়োজন তাহা বিবেচনা করিয়া
 প্রত্যেক বিভাগের কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ক্রয় বিভাগ (Purchase Department) : প্রত্যেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের
 পক্ষে একটি ক্রয় বিভাগ অপরিহার্য। ক্রয় বিভাগের অধিনায়ক ক্রয় বিষয়ে অভিজ্ঞ।
 ক্রয় বিভাগ স্বতরাং ক্রয় বিভাগ ক্রয় বিশেষজ্ঞ লোকের হাতে সমর্পণ করিলে
 প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় বিষয়ে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্রয়
 বিশেষজ্ঞ বলিয়া, কোথায় কোন্ দ্রব্যের যোগান অধিক ; কোথায় দ্রব্য কম মূল্যে
 পাওয়া যাইতে পারে ; কোন্ সময়ে ক্রয় অধিক করিতে হইবে ; অর্থাৎ ক্রয়
 বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলিয়া সর্বনিম্ন দরে এবং সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য
 ক্রয়ের সুযোগ পাওয়া যায়।

সম্ভার বা ভাণ্ডার বিভাগ (Stores Department) : কাঁচামাল কিংবা
 আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইলে উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকে সম্ভার বা
 ভাণ্ডার বিভাগের কর্তার হাতে। ভাণ্ডার বিভাগের কর্তার
 সম্ভার বা ভাণ্ডার বিভাগ কর্তব্য কেবল দ্রব্যের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি দেওয়াই নহে।
 বিভাগ ভাণ্ডার নিঃশেষ হইবার পূর্বেই যথেষ্ট অবকাশ দিয়া ক্রয়
 বিভাগের কর্তাকে দ্রব্যের অবস্থা জানাইতে হয়। সাহায্যে ক্রয় বিভাগের কর্তা
 সময় থাকিতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন। আবার উৎপাদন
 বিভাগের কর্তার নির্দেশমত ভাণ্ডার বা সম্ভার হইতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি সরবরাহ
 দেওয়াও তাহার কর্তব্য।

উৎপাদন বিভাগ (Production Department) : উৎপাদন বিভাগে স্থান
 অধিবিভাগ করা না হইলে একজন অধিনায়কের হাতেই বিভাগীয় ভার স্তম্ভ করা
 হয়। উৎপাদন বিভাগের অধিনায়কের কর্তব্য হইবে উৎপাদন অব্যাহত রাখার
 উপাদান বিভাগ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা। অবশ্য উৎপাদন বিভাগের অধিনায়ক
 তাহার কার্যের জন্ত ইচ্ছা করিলে তাহার বিভাগকে কয়েকটি
 ছোট ছোট অংশে ভাগ করিতে পারেন। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা যতই জটিল হইবে
 বিশেষজ্ঞ সহকারীর প্রয়োজনও তত অধিক হইবে। যেমন অঙ্কন বিভাগ (Drawing
 Section) ; পরিকল্পনা বিভাগ (Planning Section) ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের
 কার্য সুদৃষ্টরূপে পরিচালনের জন্ত একজন করিয়া বিভাগীয় পরিদর্শক থাকিতে পারেন।

বিলি বিভাগ (Despatch Department) : উৎপাদনের পর উৎপাদিত
 বিলি বিভাগ দ্রব্য মালগুদামে রাখা হয়। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের নমুনা
 প্রতিষ্ঠানের সদর কার্যালয়ে, উৎপাদন কেন্দ্রে অথবা কোনও
 ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে ; সাহায্যে নমুনা দুষ্টে বিক্রয় করার সুযোগ ঘটে।
 উৎপাদিত দ্রব্য গুদাম ঘর হইতে বাজারে প্রেরণের কর্তব্যও বিলি
 বিভাগের।

প্রতিষ্ঠান যখন খুব বৃহদায়তন হয় তখন ব্যবসায়ের নিজের প্রয়োজনেই পরিবহণ বিভাগ সংগঠন করিতে হয়। পরিবহণ বিভাগের কার্য দ্বিবিধ। প্রথমত বাহির হইতে যখন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করা হয় তখন পরিবহণ ব্যবস্থার যথোপযুক্ত সাহায্য করা উচিত। আবার বাজারে দ্রব্য চালান দিতেও যত্ন পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরিবহণ ব্যবস্থা সূচক্ৰমে পরিচালিত না হইলে ব্যবসায়ে স্থিতিবস্থা (Standstill) দেখা দিতে পারে এবং উৎপাদন ও বিতরণ ব্যাহত হইতে পারে। এই কারণেই খুব বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা থাকে। তৎপরতার সহিত কার্য না করার ফলে পরিবহণ বিভাগ অনাবশ্যক সম্ভার গুদামজাত করাইতে পারে। পরিবহণ বিলি ব্যবস্থা (Despatch) বিভাগের অন্তর্গত।

বিক্রয় বিভাগ (Sales Department) : ক্রয় বিভাগ যেমন বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর হাতে শ্রুত করিলে অধিক সফল পাওয়া যায়, বিক্রয় বিভাগেও তেমন বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর হাতে শ্রুত করার রীতি দেখা যায়। বিক্রয়-বিশেষজ্ঞ বাজারের অবস্থান সম্বন্ধে সর্বদাই ওয়াকিবহাল। কোন্ বাজারে দ্রব্যের বিক্রয় বিভাগ চাহিদা অধিক, কোন্ বাজারে চাহিদা তৈয়ারীর চেষ্টা করা প্রয়োজন এই সকল বিষয়ে পরামর্শদান করা বিক্রয় বিভাগের অধিকর্তার কর্তব্য। অর্থাৎ বিক্রয় বিভাগের অধিনায়ককে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিক্রয় বিভাগের সাফল্য কেবলমাত্র বিভাগীয় অধিকর্তার পারদর্শিতা, অভিজ্ঞতা ও বিক্রয় কুশলতার উপরই নির্ভর করে না। বিক্রয় বিভাগের সাফল্য অনেকাংশে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগ (Publicity and Advertisement Department) : উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিক্রয় বিভাগের সাফল্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগের কার্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগের কার্যের ফলেই প্রকৃতপক্ষে বাজারে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু প্রচার বিভাগ যদি চাহিদা তৈয়ারীতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে হয়ত বিক্রয় বিভাগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেও পারে।

যেখানে প্রতিষ্ঠানের আয়তন, মূলধন ইত্যাদি সূত্রচূর নহে, সেখানে হয়ত বিক্রয় বিভাগই বিলি বিভাগ, প্রচার বিভাগ এবং বিজ্ঞাপন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে হয়ত একটি বিভাগকেই ওটি ছোট বিভাগে ভাগ করা হয়।

অফিস (Office) : উপরে বর্ণিত কার্যের পরিধি এক নির্দিষ্ট গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকটি বিভাগেরই দায়িত্ব স্থির রাখিয়াছে। কিন্তু কোনও বিভাগের সহিত কোনও বিভাগের যোগাযোগ নাই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য কখনই সফল হইতে পারে না যদি ঐ বিভাগসমূহের মধ্যে যোগাযোগ না থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ক্রয় বিভাগের কোনও

নির্দেশ বিক্রয় বিভাগের কর্মচারী নাও মানিতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও উহা স্বসংবদ্ধ বা স্বসংহত না হইলে কখনও কার্যের ফল আশাহরূপ হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার কার্য অফিসের।

দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র বিভাগীয় সংহতি বজায় রাখিলেই অফিসের কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ হয় না অথবা ব্যবসায়ের সাফল্য লাভ হয় না। বাহিরের মক্কেলদের সহিত কাজ করার করিয়া সুনাম অর্জন করিতে পারিলেই ব্যবসায়ের সাফল্য। সুতরাং বাহিরের মক্কেলদের সহিত যোগাযোগ, তাহাদের মক্কেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পত্রাদির জবাব; তাহাদের সহিত আর্থিক আদানপ্রদানে ভর সম্পূর্ণই অফিসের হাতে ন্যস্ত।

সুতরাং অফিসটিকে ভাঙ্গিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বা উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বিভাগ; হিসাব বিভাগ; কর্মচারী বিভাগ, নগদান তহবিল বিভাগ; অনুসন্ধান বিভাগ; ইত্যাদি।

অফিসের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নহে। কারণ অত্যধিক কর্মবিভাজনের ফলে কাহার দায়িত্বের পরিধি কোথায় শেষ হইবে উহা লইয়া অনেক সময়েই মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তাহা হইলেও অফিসই সম্পূর্ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র।

অফিসের ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগের ভার এক একজন কর্মচারীর হাতে। শ্রম বিভাগের ফলে বিভাগীয় কর্মচারীদের কার্যের পবিধি এবং দায়িত্বের সীমা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্মবিভাগের (Division of Labour) সকল সফল পাওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়।

অফিসের উপবিভাগ (Sub-division অথবা Section) : ১। প্রায় প্রত্যেক অফিসেই দৈনিক বহু চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়। চিঠিপত্র গ্রহণ, উহার নথিকরণ ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ ভবিষ্যতে কোনও অফিস

চিঠির সূচক (reference) বাহির করিতে হইতে পারে। সেক্ষেত্রে চিঠি কবে পাওয়া হইল; বিষয়বস্তু কি ছিল ইত্যাদি সহজে বাহির করার জন্য চিঠি অনেক হইলে উহার রেকর্ড বা বিবরণ রাখা প্রয়োজন। অল্পরূপভাবে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া হইল; কোন চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই, ইত্যাদি বাহির করিতে হইলে অফিসের চিঠিপত্র আদানপ্রদানকারী বিভাগে সমস্ত তথ্যের সার লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

কর্মচারী বিভাগ (Personnel Department) : কোনও অফিসই কর্মচারী ব্যতীত চলিতে পারে না। কর্মচারী নিয়োগ, ছাঁটাই, কর্মচারী বিভাগ কার্যের বিভাগ এবং কার্য সম্পর্কিত বাবতীয় বিষয় দেখাওনার ভার কর্মচারী বিভাগের হাতে। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সাধারণত Personnel Officer বলিয়া জাত।

অনেক অফিসে কর্মচারী বিভাগ এবং অফিস পরিচালন বিভাগ (Establishment Section) একজন কর্মচারীর হাতেই থাকে। অফিসের আয়তন খুব বড় না হইলে এই ব্যবস্থাই আদর্শ। নচেৎ অফিস পরিচালন বিভাগ পৃথক কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত করা যায়।

ক্যাশ বিভাগ (Cash Section) : ক্যাশ বিভাগকে নগদান বিভাগও বলা হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ‘ক্যাসিয়ার’ বলা হয়। ইহার কর্তব্য ম্যানেজার অথবা অনুরূপ কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর ‘প্রদান আদেশ’ (Pay Order) পাইলে অর্থ প্রদান করা, ক্রেতা বা অগ্রাঙ্ক মক্কেল যখন ব্যবসায় অর্থ প্রদান করে তখন উহা ব্যবসায়ের পক্ষে গ্রহণ করা। চেক আদানপ্রদানের ভারও ক্যাসিয়ারের হাতে। সাধারণত চেক বহি ক্যাসিয়ারের হেপাজতেই থাকে। কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী দৈনিক নগদান তহবিল মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

হিসাবরক্ষণ বিভাগ (Accounts Section) : হিসাবরক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে হিসাবরক্ষক বলা হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবরক্ষক বাঞ্ছিত হয়। দেশের আইনও অনেক সময়ে যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ হিসাবরক্ষক নিয়োগ করিতে বাধ্য করে। হিসাবরক্ষকের অধীনে খতিয়ানরক্ষক (Ledger Keeper), চালানকাবক (Challan Maker) ইত্যাদি কর্মচারী থাকে।

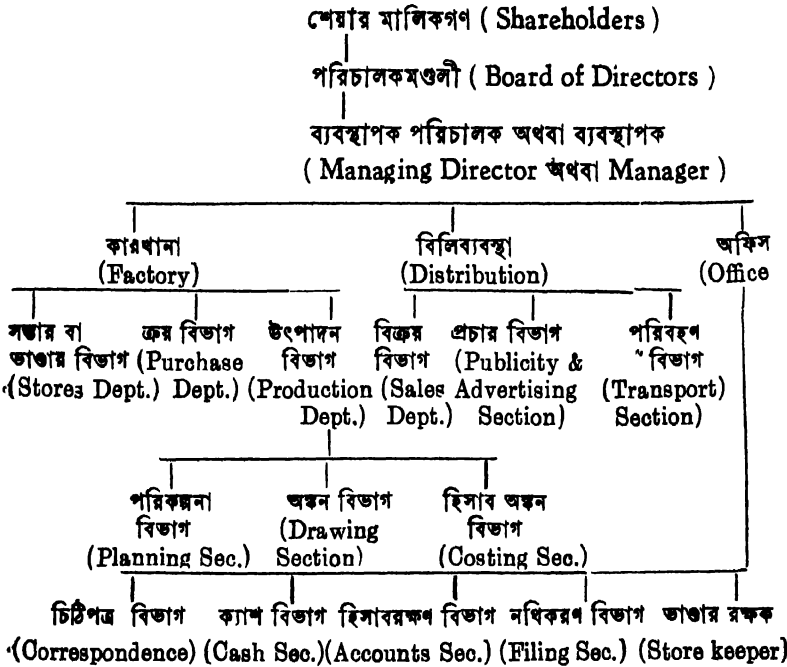
ভাণ্ডার বিভাগ (Stores Section) : কারখানার বিভাগ বিবেচনাকালে সম্ভার বা ভাণ্ডার বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণ অফিসেও অনুরূপ একটি সম্ভার বা ভাণ্ডার বিভাগ থাকিতে পারে। এই বিভাগের কর্মচারীর নাম ভাণ্ডার বক্ষক (Store Keeper)। অফিসের কার্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্য যেমন কাগজ, খাতা, কালি, নানা প্রকার ফরম, ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ ভাণ্ডার বিভাগ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনমত কর্মচারীদের সরবরাহ করার দায়িত্ব ভাণ্ডাররক্ষকের। ভাণ্ডারে যে সকল দ্রব্য ক্রয় হয় উহার একটি খতিয়ান (Ledger) রাখিতে হয়। ঐ খতিয়ানে কোন্ দ্রব্য কোন্ তারিখে কত ক্রয় করা হইল, কত বিলি হইল, মজুত কি রহিল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

রেকর্ড বিভাগ বা দস্তাবেজখানা (Records Section) : বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার দলিল প্রস্তুত হয়। ব্যবসায়ের ভিত্তি চুক্তি। সুতরাং চুক্তির প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ দস্তাবেজ বিভাগে নথিকরণ দলিল দস্তাবেজ বিভাগ (File) করা হয়। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলা হয় দস্তাবেজ রক্ষক (Record Keeper)।

নথিকরণ বিভাগ (Filing Section) : প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইলে উহা নথিকরণের প্রয়োজন হয়। বিভাগীয় কার্য

সময় হইলে চিঠিপত্র নথিকরণ বিভাগে (Filing Section) প্রারম্ভ হয়। নথিকরণ বিভাগ এখানে উহা নথিকরণ হয়। ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত আবার বাহির করার সুবিধা এই নথিকরণে পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনা হইতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ চকের সাহায্যে দেখান হইল। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ব্যবসায় যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত।



উপরের চকে লক্ষ্য করিবে যে কতিপয় ব্যক্তি আছেন যাহাদের কার্যের পরিধি খুবই প্রসারিত। প্রত্যেক বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকেন। সেই বিভাগের স্ত্রী পরিচালনার জন্ত তিনিই দায়ী তবে তাহার কার্য যে কেবল স্ত্রী পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে; প্রত্যেকেই তাহার বিভাগীয় কার্যসম্বন্ধে প্রয়োজনমত নীতি গ্রহণ করিতে পারেন। সরাসরি নীতি গ্রহণ বা নিয়ম তৈয়ারীর অধিকার হয়ত অনেক কর্মচারীর থাকে না। কিন্তু তাহার বিভাগের স্ত্রী পরিচালনার জন্ত উপরওয়ালাগণ তাহাদের পরামর্শ লইয়া আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কাহন তৈয়ার করিয়া থাকেন।

অফিসের কার্যপ্রণালীর উদাহরণ: কিপ্রত্যয় সহিত কার্য সম্পাদন

করিতে পারিলে অফিসের তথা ব্যবসায়ের স্থান (Goodwill) সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাড়ে। সুতরাং অফিস পরিচালনার উৎকর্ষজনক কর্মচারীর

একটি প্রধান গুণ কিপ্রত্যয় সহিত কোনও বাণিপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (quick

decision)। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইজন্য সাধারণত, কোনও চিঠিপত্র আসিলে, সেই চিঠির সারসর্ম্ম (Précis) তৈয়ার করিয়া উৎকর্ষতন কর্মচারীর নিকট পেশ করা হয়। চিঠির উপরেই সারসর্ম্ম লেখা হয়।

উৎকর্ষতন কর্মচারী সারসর্ম্ম পাঠ করিয়া চিঠির উত্তর দিবার জন্য কাহার নিকট সারসর্ম্ম বা Précis চিঠিখানা পাঠাইতে হইবে অথবা নিজেকেই জবাবের বিষয়বস্তু লিখিয়া দিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া দেন। সারসর্ম্ম তৈয়ার করার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, বাহাতে অতি অল্পকথায় চিঠির বিষয়বস্তু গুছাইয়া লেখা যায়।

আবার অনেক সময়ে একটি বিষয়ের পরিসমাপ্তি যদি একখানা চিঠির উত্তরেই না হয় অথবা কোনও বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতিপয় বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে অথবা একাধিক বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে অধস্তন কর্মচারীদের নোট (Note) তৈয়ার করিয়া দিতে হয়, বাহাতে উৎকর্ষতন কর্মচারী সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

চিঠিপত্র, কাগজাদি সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ বা নথিকরণ না হইলে অনেক সময়ে অনর্থক সময় অপচয় হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। ফলে হয়ত ব্যবসায়ীর যথেষ্ট লোকসান হয়।

চিঠি আসিলে সেই চিঠিখানি হইতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে এমন সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। আগত চিঠি যে বহিতে অগত চিঠি নথিকরণ লিপিবদ্ধ করা হয় উহার একখানি নমুনা নীচে দেওয়া হইল :

আগতপত্র বহি

(Letter Receiving Register)

তারিখ (Date)	আগত নম্বর (Inward No.)	প্রেরকের পত্রের নম্বর (Sender's Letter No.)	প্রেরকের নাম (Sender's Name)	বিষয়বস্তু (Contents)	মন্তব্য (Remarks)

পত্র গ্রহণ করিয়া উহার উপর প্রাপককে অফিসের একখানি স্ট্যাম্প দিতে হয়।
এই স্ট্যাম্পে নিম্নোক্তের প্রবিষ্টি নম্বর ; পত্র পাওয়ার তারিখ এই দুইটি অবশ্যই দিতে
হয়। স্ট্যাম্পের নমুনা—

চিঠি পাওয়ার তারিখ.....
প্রবিষ্টি নম্বর.....
উত্তর দেওয়ার তারিখ.....
চিঠির নম্বর.....

এ চিঠিখানি তখন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট পাঠান হয়। কর্মচারী এই চিঠির
বহির্ভূত চিঠি উপর গ্রহণীয় কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া পুনরায় চিঠিপত্র বিভাগে
পাঠাইয়া থাকেন। চিঠিপত্র বিভাগ হইতে আস্ত:চলাচল
বহিতে (Internal Despatch) প্রবিষ্টি করিয়া নির্দেশিত বিভাগে পাঠাইবেন।
সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জবাব লিখিয়া অথবা আবশ্যকীয় কার্য গ্রহণ
করিয়া চিঠিখানি নথিকরণ বিভাগে (Filing Section) পাঠাইয়া দিবেন।

চিঠির উত্তর পাঠান হইলে উহাও বহির্গমন বহিতে (Issue Register)
প্রবিষ্টি করিতে হয়। এই বহিতে প্রবিষ্টির নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

চিঠি বহির্গমন বহি

(Letter Issue Register)

তারিখ	নম্বর	প্রাপকের নাম-ঠিকানা	বিষয়বস্তু	কি উপায়ে পাঠান
(Date)	(Number)	(Name and address of the person sent to)	(Contents)	হয় (Method of Delivery)

উত্তরের একখানি প্রতিলিপিও নথিকরণ বিভাগে (Filing Section) পাঠান
হয়। নথিকারক কর্মচারী (Filing Clerk) মূল পত্রখানির সহিত উত্তরের
প্রতিলিপি (Copy) আঁটিয়া রাখিবেন।

চিঠির উপর যে স্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে এই স্ট্যাম্পে নির্দিষ্ট স্থানে নথিকারক যে
চিঠি পাঠান হইল তাহার নম্বর ও তারিখ লিখিয়া রাখিবেন।

চিঠিপত্র আদানপ্রদান খুব অধিক হইলে নথিকারক, চিঠি গ্রহণকারী কর্মচারী, মেল ক্লার্ক চিঠি প্রেরণকারী কর্মচারী, আঞ্চলিক ভিত্তিতে অথবা মফস্বলের আঞ্চলিক ভিত্তিতে একাধিক কর্মচারীও নিয়োগ হইতে পারে। যদি ডাকযোগে চিঠিপত্র পাঠাইবার জন্য যদি পৃথক কর্মচারী নিয়োগ হয় তবে তাহাকে মেল ক্লার্ক (Mail Clerk) বলে।

পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। ডাকযোগে পত্র আসিলে সাধারণত পিওন চিঠিপত্র দিয়া যায়। রেজিস্ট্রিকৃত (Registered) অথবা বীমাকৃত (Insured) চিঠিপত্র হইলে পিওন অফিসে জমা দিয়া রসিদ লয়। অন্তর্গত চিঠির বাক্সে (Letter Box) চিঠি ফেলিয়া রাখে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিঠির চিঠির বাক্স বাক্স খুলিয়া চিঠি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলে ডাক বিভাগের সহিতও ব্যবস্থা করা যায়। ডাক বিভাগে একটি বাক্স থাকে। ঐ বাক্সে একটি নম্বর দেওয়া থাকে। সকল চিঠিপত্র ঐ নম্বরে লিখিতে হয়। ডাক বিভাগ ঐ বাক্সে চিঠি ফেলিয়া রাখে। উহাকে বলে পোষ্ট বাক্স (Post Box)। পোষ্ট বাক্স ভাড়া করিতে বাৎসরিক ১৫ টাকা মাসুল দিতে হয়। প্রতিদিন নিজেদের বাহক (Bearer) পাঠাইয়া বাক্সটি খুলিয়া চিঠি সংগ্রহ করা হয়।

পত্রপ্রেরণ বিভাগ (Letter Issue Section) : সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সহি হইলে পত্র প্রেরণ বিভাগে পাঠান হয়। পত্র প্রেরণ বিভাগের পত্র প্রেরণের বিশেষ নির্দেশ থাকিলে সেইমত পত্র প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পত্রে যদি রেজিস্ট্রিকৃত (Registered) লিখা থাকে, তাহা হইলে রেজিস্ট্রি পত্র প্রেরণ বিভাগ করিয়া পাঠাইতে হয়। পত্রের উপর 'Registered' লেখা থাকে। আবার রেজিস্ট্রিকৃত যদি প্রাপকের রসিদ সহ হয় (With Acknowledgement Due) তাহা হইলে লিখিতে হয় Registered with A/D। লেফাপার উপরও বাম কোণে উহা লিখিতে হয়।

পত্রখানিকে জরুরী বিবেচনা করার অনুরোধ থাকিলে পত্রের উপর 'Express' কথাটি লিখিতে হয়। আবার বুক পোষ্ট হইলে (অর্থাৎ লেফাপা বন্ধ করা না হইলে এবং ছাপান চিঠি হইলে) চিঠির লেফাপার উপর 'Book-Post' বুক পোষ্ট লিখিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ই ঐ সমস্ত নির্দেশ হাতে লিখিতে সময় লাগে বলিয়া রবার স্ট্যাম্প তৈয়ার করিয়া লয়। প্রয়োজন অনুযায়ী স্ট্যাম্প দেওয়া হয়।

ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিতে হইলে ডাক টিকিট (Postage Stamp) লাগাইতে হয়। কিন্তু একসময় বহু চিঠি পাঠাইতে হইলে পোষ্টাল স্ট্যাম্প লাগাইতেও যথেষ্ট সময় লাগে। সময় এবং পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য ডাক বিভাগ (Postal Department) হইতে মেশিন ভাড়া লওয়া যাইতে পারে। ডাক বিভাগ ঐ মেশিনের সাহায্যে লেফাপার অথবা পোষ্ট কার্ডে বিভিন্ন মূল্যের ডাক টিকিটের ছাপ দেওয়া হয়। অগ্রিম অর্থ জমা দিয়া এই মেশিন

ভাড়া লইতে হয়। উহার নাম **Franking Machine**। যত মূল্যের ডাক টিকিটের জন্ত ভাড়া দেওয়া হয় ঠিক তত মূল্যের ডাক টিকিটের ছাপ দেওয়া চলে। নির্দিষ্ট মূল্যের ডাক টিকিট ব্যবহৃত হইলে পুনরায় অর্থ জমা দিতে হয়।

একই সময় অনেক চিঠি পাঠাইতে হইলে ঠিকানা লিখিতেও অনেক সময় লাগে। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্ত এবং পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্ত ঠিকানা লিখিবার যন্ত্র ব্যবহার করা চলে। উহাকে বলা হয় **Addressograph**।

ঠিকানা এবং উপযুক্ত ডাক টিকিট লাগান হইলে চিঠি ডাকবিভাগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু অবস্থা বিশেষে অফিসের পিওন মারফতও চিঠি বিলি দেওয়া হয়। তবে ইহা এক নির্দিষ্ট এলাকার (যেমন একটি সহর) মধ্যে কার্যকরী হয়।

চিঠিপত্রের নথিকরণ (Filing) : অফিসের সকল কাগজপত্রই মূল্যবান। এক টুকরা কাগজ হারাইলে হয়ত ব্যবসায়ীর এক কোটি টাকা লোকসান হইল। কোনও কর্মচারী একখানি নির্দেশ হারাইলে হয়ত সেই কর্মচারীর চাকুরী লইয়া গোলযোগ বাধিল। এই সকল কারণে অফিসের চিঠিপত্র, দলিল নথিকরণ

ইত্যাদি সমস্তই সুবিধাস্বভাবে নথিকরণের প্রয়োজন হয়। আবশ্যক হইলে যাহাতে সময় নষ্ট না করিয়া সত্তরই চিঠিপত্র, দলিলাদির হদিস পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎই নথিকরণের প্রয়োজন।

ব্যবসায়ের দক্ষতা ও সুনাম পত্রাদি নথিকরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কোনও চিঠির উত্তর যদি খুব ক্ষিপ্ততার সহিত দেওয়ার প্রয়োজন হয় অথচ ঐ চিঠির বিষয়বস্ত্তসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হদিস করা না যায় তাহা হইলে চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

বিভিন্ন প্রকারের নথিকরণ (Different Types of Filing) : নথিকরণের উদ্দেশ্য সহজে চিঠি ও দলিলপত্রাদির হদিস করা। নথিকরণ প্রথা কেরাগীর অভিজ্ঞতা হইতেই প্রসূত। তবে যে কয়প্রকার নথিকরণ প্রথা (System of Filing) কার্যকরী দেখা যায় তাহা নীচে আলোচনা করা হইল।

১। **ক্রমানুক্রমিক নম্বর অনুসারে (Numerical Basis) :** ক্রমানুক্রমিক নম্বর অনুসারে পত্রাদি নথি করা হইলে, নথিভুক্ত করার পূর্বেই বিষয়বস্ত্ত হিসাবে অথবা মক্কেলের নাম অনুসারে ফাইলের নম্বর দিতে হয়। যেমন ক্রয়ের জন্ত চিঠি পত্রের ফাইলের নম্বর ১; বিক্রয় বিভাগের ফাইলের নম্বর ২; ক্রমানুক্রমিক চালানপত্রের ফাইলের নম্বর ৩; ইত্যাদি। সুতরাং চিঠিপত্র নথিভুক্ত করার পূর্বেই চিঠির বিষয়বস্ত্ত অনুসারে ভাগ করা হয়। তারপর ক্রমানুক্রমিক ভাবে নথিকরণ হয়।

ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে (Geographical Division) : ব্যবসায়ের মক্কেলদিগকে যখন ভৌগোলিক ভিত্তিতে ভাগ করা হয়, তখন নথিপত্রাদি ভৌগোলিক ভিত্তিতে

রাখা হয়। যেমন জাপান; চীন; ইংলণ্ড; জার্মানী ইত্যাদি। এই প্রথায় প্রথমে দেশের নাম, তারপরে প্রদেশের নাম, তারপরে জিলার নাম এবং তারপরে মহকমার নামের ভিত্তিতে নথিকরণ হয়।

৩। বিষয়বস্তুর বিভাগ অনুসারে (Subject Classification) : বিষয়বস্তু অনুসারে নথিকরণের পদ্ধতিতে প্রথম বিষয়বস্তু হিসাবে নথির নম্বর দিতে হয়। যেমন ক মার্কা নথি, কর্মচারী বিষয়ক। 'ক' নথিকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আবার ভাগ করিতে হয় ক_১ মজুরীর হার; ক_২ কর্মচারীর আবেদনপত্র ইত্যাদি। 'খ' মার্কা নথিতে হয়ত কর্পোরেশন সম্পর্কিত সকল পত্রাদি নথিক করা হইবে। খ_১ ট্যাক্সের চালান; খ_২ ট্যাক্সের রসিদ।

৪। আন্তর্কর অনুসারী (Alphabetical Order) : মহকমাদের নামের আন্তর্কর অনুসারে নথিকরণ করা যায়। ইহাতে পদবী অনুসারে নথি ভাগ করা হয়। যেমন বহু; দাস; চক্রবর্তী ইত্যাদি। বহু মার্কা নথিতে আন্তর্কর অনুসারী আবার অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি ক্রমানুসারে নথির ভাগ করা হয়। আন্তর্কর অনুসারে নথিকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ টেলিফোন ডাইরেক্টরী (Telephone Directory)।

অফিসে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি : আধুনিক অফিসে নিত্য নব শ্রম-সঞ্চয়ের (Labour saving) পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে। অতি দ্রুত কার্যের পরিমাণ বাড়ান এবং নিখুঁত কার্য সম্পাদনের জন্তই যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করা হয়। হাতে যে কার্য করা না যায়, সেই কার্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা যায়। মনে কর, একখানা পত্রের ১০ খানা প্রতিলিপি (Copy) করার প্রয়োজন হইলে ১০ দশজন লোককে শ্রম সাঞ্চয়ের একখানা করিয়া প্রতিলিপি তৈয়ার করিতে বলা যায়। কিন্তু প্রয়োজন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে তৈয়ার হইল কার্বন কাগজ। এক একফর্দ কাগজের নীচে এক এক ফর্দ করিয়া কার্বন কাগজ দিয়া এক সময়ে কয়েকখানা কপি (প্রতিলিপি) তৈয়ার করা যায়। নানাবিধ উপায়ে শ্রম সাঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

টাইপরাইটার (Typewriter) : টাইপরাইটার অথবা টাইপরাইটিং মেশিনে একই সময়ে একই ক্রমের নিখুঁত বহুখানা প্রতিলিপি তৈয়ার করা যায়। মনে কর, একখানা চিঠির ৫ খানা প্রতিলিপি দরকার হইলে হাতে না টাইপরাইটার করিয়া টাইপরাইটার মেশিনে অতি অল্প সময়েই, নিখুঁতভাবে প্রস্তুত সম্ভব। কেবলমাত্র সময় সংক্ষেপ বা শ্রম সাঞ্চয় করাই ইহাই উদ্দেশ্য নহে। টাইপরাইটারের সাহায্যে কাজের একরূপতা (Uniformity) পাওয়া যায়।

কার্বোটাইপ (Carbotype) : অনেক সময়ে টাইপ কার্বোটাইপ রাইটারে কোমণ্ড ক্রমের বহুসংখ্যক প্রতিলিপি তৈয়ার করিতে একরূপতা বজায় রাখিতে অসুবিধা হয়। একইভাবে 'Margin' রাখিতে পারা যায়

না; অনেক সময়ে কার্বন কাগজ ভাঁজ হইয়া পড়ে ইত্যাদি কারণে কাজের এক-রূপতা নষ্ট হয়। একই সময় নির্ভুলভাবে বহু প্রতিলিপি তৈয়ার করিতে চিঠির কাগজের যে কয়খানি প্রয়োজন সেই কয়খানা কাগজের একটি 'সেট' (set) তৈয়ার করিয়া মেশিনের ভিতরে বসাইয়া দিলে চিঠির একরূপতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার চিন্তার কারণ থাকে না। কারণ টাইপরাইটার মেশিনে বসাইলে হাতে কার্বন বসাইতে হয় এবং হয়ত একখানা কাগজের পিছনে কার্বন দিতে ভুল হইল অথবা ভাঁজ হইয়া পড়িল, অথবা সব কয়খানা কাগজ একই অবস্থায় বসান হইল না। এই প্রকারে একরূপতা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কার্বোটাইপ মেশিনে থাকে না। সেট খানি মেশিনে চাপাইলে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সব কয়খানা কার্বন কাগজ এবং ছাপিবার কাগজ একই অবস্থায় আসে এবং উপরের অংশ সহিষ্ণু (Perforated) হয়। মেশিন হইতে কাগজ নামাইয়া ছিঁড়ের লাইন ধরিয়া এক একখানা কপি পৃথক করা হয়।

ডুপ্লিকেটর (Duplicator) : বহু প্রকারের ডুপ্লিকেটর আছে। উহার মধ্যে যোনীও প্রথায় ডুপ্লিকেটরের ব্যবহার সর্বাধিক। এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রতিলিপি পাওয়া যায়। স্টেনসিলের (Stencil) সাহায্যে প্রতিলিপি তৈয়ার করা ডুপ্লিকেটরের এক বিশেষ স্রবিকা। স্টেনসিলখানা সুন্দরভাবে রাখিয়া দিলে আবার ব্যবহার করা যায়। স্টেনসিলের ডুপ্লিকেটর সাহায্যে প্রতিলিপি তৈয়ারের একটি অস্রবিকা এই যে স্টেনসিল একপ্রকার বিশেষ কাগজ। আর স্টেনসিলের সাহায্যে যে প্রতিলিপি তৈয়ার হয় সেই প্রতিলিপির কাগজও বিশেষ প্রকারের হয়। অবশ্য সাধারণ কাগজে যে স্টেনসিলের সাহায্যে প্রতিলিপি তৈয়ার করা যায় না তাহা নহে; তবে গুণের দিক হইতে হীন হয়।

স্টেনসিল একপ্রকার মোমযুক্ত কাগজ (Waxed Paper)। সাধারণ টাইপ রাইটারেই স্টেনসিল করা হয়। কাগজখানা টাইপ রাইটারে বসাইবার পূর্বে টাইপ-রাইটারের ফিতা (Ribbon) খুলিয়া টাইপগুলি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া স্টেনসিলের উপর টাইপ করিতে হয়।

ঐ স্টেনসিলখানা ডুপ্লিকেটরের মধ্যে দিলে মেশিনের রোলারের মধ্যে একখানা করিয়া কাগজ প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তখন রোলারের চাপে স্টেনসিলের বিষয়-বস্তুটির প্রতিলিপি ছাপা হয়। প্রতি মিনিটে প্রায় ৬০ খানা কাগজ এইভাবে নকল করা সম্ভব।

ডিকটাকোন (Dictaphone) : ডিকটাকোন অনেকটা গ্রামোফোনের মত। তবে গ্রামোফোনে বিষয়বস্তু রেকর্ডে লিপিবদ্ধ থাকে। ডিকটাকোনের বিষয়বস্তু একটি ফিতায় লিপিবদ্ধ হয়। গ্রামোফোনের মতই প্রয়োজনমত ডিকটাকোনের যন্ত্রটি চালাইয়া উহার বিষয়বস্তু পুনরায় শুনিতে পারা যায়। অফিসের কার্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অল্পভূত হইতেছে। উক্ত বস্তুটির কার্যকারী ডিকটাকোন প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অল্পভূত হইতেছে। উক্ত বস্তুটির কার্যকারী ডিকটাকোনে কথা বলিবার যন্ত্রটি (Mouth Piece) সামনে ধরিয়া তাঁহার বস্তু বলিয়া যান। স্বয়ংক্রিয় উপায়ে তাহার বস্তু রেকর্ড হইয়া

রহিল। পরে যন্ত্রটি চালাইয়া অধস্তন কর্মচারী উৎখতন কর্মচারীর বক্তব্য জানিয়া লন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উৎখতন কর্মচারী কোন পত্রের জবাব ডিকটাকোনে নির্দেশ দেন। অধস্তন কর্মচারী তাহাব অবসর মত মেসিনটি বাজাইয়া জবাব টাইপ করেন। ইহার আবেকটি স্থবিধা এই যে ভবিষ্যতে কোনও বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে মেসিনটি বাজাইলেই বক্তার কণ্ঠে তাহা প্রকাশ পায়।

স্পিকোকোন (Speakophone) : অফিস বৃহদায়তন হইলে অফিসের বিভিন্ন বিভাগের সহিত স্মৃষ্টি যোগাযোগের উপর ব্যবসায়ের দক্ষতা ও কার্যের ক্ষিপ্ৰতা নির্ভর করে। তিন তলায় বড় সাহেবের অফিস, একতলায় কোন কর্মচারীকে তাহার স্পিকোকোন প্রয়োজন। তাহাকে ডাকাইতে হইলে, পিওন বা পিয়াদা পাঠাইয়া ডাকানো যায়। তাহাতে যথেষ্ট সময়ের অপচয় হয়। সুতরাং অতি সহজে এক বিভাগ অন্ম কোন বিভাগের সহিত কথা বার্তা চালাইতে স্পিকোকোনের ব্যবহার হয়।

টেলিপ্রিন্টার (Teleprinter) : বহু দূর দূরাকলে খবর বৃত্তান্ত অতি সহজেই টাইপ করা অবস্থায় যাহাতে পাওয়া যায় তাহার জন্য টেলিপ্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। টেলিপ্রিন্টার সংবাদপত্র অফিস, ষ্টক বাজার; ব্যাক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাবণ বিভিন্ন দেশের সহিত সংযোগ রক্ষার উপরুই এই সকল ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে।

ফ্রাঙ্কিং মেসিন (Franking Machine) : ডাক টিকেট লাগাইবার কার্য এই যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে।

এড্রেসিং মেসিন (Addressing Machine) : এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু চিঠিতে ঠিকানা লেখা যায়। সময় সংক্ষেপ ও দ্রুততার সহিত এবং নির্ভুল ঠিকানা লিখিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার হয়। বীমা কোম্পানী; স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যাহাদের দৈনিক বহু মক্কেলের সহিত চিঠির আদানপ্রদান করিতে হয়, তাহারাই এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে Addressographও বলে।

একাউন্টিং মেসিন (Accounting Machine) : এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুত বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুত হিসাব তৈয়ার করিতে পারা যায়। সুতরাং দ্রুত হিসাব তৈয়ার করিতে এই যন্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন।

টাইম রেকর্ডিং মেসিন (Time Recording Machine) : শ্রমিকের মজুরী কার্যের সময় অনুসারে দেওয়ার নীতি থাকিলে শ্রমিকের কার্যের সময়ের নির্ভুল হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়। শ্রমিকের আগমন সময় ও কার্য বিরতির সময় নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্যই এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়।

ফটোস্ট্যাট (Photostat): চিঠিপত্র, দলিল, হিসাবাদির অবিকল প্রতিচ্ছবি
 ফটোস্ট্যাট এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করা যায়। ইহা এক প্রকার বিশেষ
 ধরনের ফটো তুলিবার যন্ত্র (Camera)।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আসবাব সজ্জা (Layout of a Business):
 ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সূচু পরিচালনার সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন পদ্ধতি এবং
 আসবাব সজ্জার যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। বিভাগীকরণের (Departmenta-
 lisation) ফলে দক্ষতা বাড়ে সত্য কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে অল্প সকল বিভাগের
 সহজে যোগসূত্র না থাকিলেও পরিচালনা সূচু হয় না।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন যদি এমনত হয় যে এক এক বিভাগের সহিত অল্প
 বিভাগের সংযোগ রাখিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বিভাগীয় কার্যের
 ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা কঠিন। আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে
 গঠন বিভাগ তাই দেখা যায় যে বৃহৎ হলঘরকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ
 করা হয়। উর্ধ্বতন কর্মচারীর জন্য ঐ হলঘরেই বেঠেনী করিয়া
 দেওয়া হয়। উর্ধ্বতন কর্মচারীর কোঠাটির সাধারণত কাচের ঝুলান দরজা
 (swing door) থাকে। ইহাতে অধস্তন কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা সহজ হয়।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের জন্যই এইরূপ পৃথক বসিবার বন্দোবস্ত থাকে
 নিয়ন্ত্রণ বটে; তবে সকল বিভাগের অধস্তন কর্মচারীগণকে হয়ত এক
 বিরাট হলঘরেই বসিবার বন্দোবস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থায়
 স্বতই নিয়ন্ত্রণ (Automatic Check) হয়।

যে ভাবেই কর্মচারীদের বসিবার ব্যবস্থা করা হউক না কেন, কর্মস্থলে প্রচুর
 আলো-বাতাস না থাকিলে কর্মচারীগণের দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য আধুনিক
 বৈজ্ঞানিক যুগে, বৈজ্ঞানিক আলো ও পাখার সাহায্যে স্বাভাবিক আলো-বাতাসের
 অভাব অনেকাংশে মিটান হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক, ইত্যাদি এমনভাবে সাজাইতে হয় যাহাতে
 সহজেই ঘোরাক্ষেরা করা যায়। কোনও উর্ধ্বতন কর্মচারী হঠাৎ
 পরিদর্শন করিতে আসিয়া সহজে ঘোরাক্ষেরা করিতে না পারিলে
 অধস্তন কর্মচারী তাহাদের কার্যের জটিল লুকাইবার সুযোগ পায়।

তৃতীয়ত, অফিস ঘর সর্বদাই ফিটফাট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। নচেৎ
 কর্মচারীদের মনের উপর যেমন বিপরীত ক্রিয়া হয়, তেমনি
 বহিরাগত মকেলদের মনেও ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে ধারাপ
 পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধারণা জন্মে। উহাতে ব্যবসায়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়।

বিজ্ঞাপন বিষয় আলোচনা কালে একধার উল্লেখ করা হইয়াছে যে পরিষ্কার-
 পরিচ্ছন্নতা ব্যবসায়ের অজ্ঞাতে বিজ্ঞাপনের (Unconscious
 বিজ্ঞাপন ভাষা Advertisement) কার্য করে।

সুশাসন সুতরাং কর্মচারীর স্বাস্থ্যরক্ষার, ব্যবসায়ের সুনাম গঠনে, কর্মচারীর
 উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করে এমনভাবে আসবাবসজ্জাদি সাজাইতে হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication System) : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বড় হইলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে স্থূল যোগাযোগ রক্ষার জন্য আভ্যন্তরীণ টেলিফোনের (দূর ভাষ) ব্যবস্থা করা হয় একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

টেলিফোন (Telephone) : বাহিরের মক্কেলদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার নানাবিধ উপায় আছে। নিজের অফিস হইতে বহুদূরের মক্কেলদের সহিত কথাবার্তা বলিতে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়। টেলিফোনে দূর টোলকোন দূরান্তের মক্কেলদের সহিত কথাবার্তা বলা চলে। ইহাতে উৎকর্ষিত কর্মচারিগণ গোপনীয় বিষয়ও নিজেরদের মধ্যে আলাপ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে কোন স্থানের সহিত টেলিফোনে কথা বলাকে ট্রাঙ্কল বলা হয় Trunk Call। কলিকাতা এবং উহার সহর-তলী অঞ্চলে স্থানীয় টেলিফোন ব্যবস্থাই চলে। কিন্তু যদি কলিকাতা ও বোম্বাই-এর মধ্যে টেলিফোনে কথা বলা হয় তবে উহাকে বলে Trunk Call।

টেলিগ্রাম (Telegram) : নিজেরদের মধ্যে, কথাবার্তা না বলিয়াও সংবাদ আদানপ্রদান চলে। অতি সহজ সংবাদ আদানপ্রদান করিতে হইলে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া পোষ্ট অফিসে পাঠাইলে, পোষ্ট অফিস হইতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তারযোগে সেই সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকে। সময়সংক্ষেপের জন্যই তারযোগে সংবাদ আদানপ্রদান হয়। যখন কোনও এক দেশের মধ্যে তারযোগে সংবাদ আদানপ্রদান হয় তখন তাহাকে বলে অন্তর্দেশীয় টেলিগ্রাম (Inland Telegram)।

কেবলগ্রাম (Cablegram) : তারযোগে বিদেশে সংবাদ প্রেরণকে বলে কেবলগ্রাম (Cablegram)। কলিকাতা ও নিউইয়র্কের মধ্যে তারযোগে সংবাদ আদানপ্রদান 'কেবলগ্রামের' উদাহরণ।

রেডিওগ্রাম (Radiogram) : বেতারে সংবাদ আদানপ্রদান। বেতার বিভাগের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। অতিক্রান্ত সংবাদ আদানপ্রদানের পক্ষে রেডিওগ্রামই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।

গুটলেথ (Codes) : সংবাদ কঠোরভাবে গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইলে গুটলেথের (Code) সাহায্য গ্রহণ করা হয়। টেলিগ্রাম এবং কেবলগ্রাম গুটলেথের সাহায্য করিলে একমিকে যেমন গোপনীয়তা রক্ষা হয় অন্তদিকে তেমনি ব্যয়ও কম হয়। ইহাতে শব্দযোজনা এমনভাবে করা হয় যে এক একটি শব্দে একটি বাক্য প্রকাশ করিতে পারে। ইহার অসুবিধা এই যে গুটলেথ পাঠ করিতে অতিক্রম লোক ব্যতীত কেহ সংবাদের অর্থোদ্ধার করিতে পারে না। গুটলেথ প্রচার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় Bentle's ABC, ABC গুটলেথের

একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। মনে কর। ঘাটক কলিকাতা হইতে লণ্ডনে তারযোগে “There is an unfavourable change of market” এই সংবাদটি প্রেরণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাম না করিয়া গুললেখের সাহায্যে এই সংবাদ পাঠাইতে হইলে ‘Malchance’ এই কথাটি লিখিবে। কি করিয়া এই গুলটি বাহির করিল। ABC Code বহির সূচী (Index) হইতে ‘Market’ অধ্যায় বাহির করিয়া উহার মধ্য হইতে “There is an unfavourable change of market” এই বাক্যটি বাহির করিয়া দেখা গেল যে উহার গুললেখ Malchance লেখা আছে। সংবাদ আদানপ্রদানকারী একই Code ব্যবহার না করিলে এই প্রথায় সংবাদ আদানপ্রদান সম্ভব নহে।

ফোনোগ্রাম (Phonogram) : ঘরে বসিয়াই টেলিগ্রাম পাঠাইবার পদ্ধতি। টেলিফোনে ডাক বিভাগের সহিত যোগাযোগ করিয়া টেলিগ্রামে যাহা লিখিতে হইবে তাহা জানাইলেই; ডাক বিভাগ হইতে তারযোগে সেই ফোনোগ্রাম সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। তাব বিভাগকে তারের মাণ্ডলের অতিরিক্ত কিছু মাণ্ডল দিতে হইলেও এই প্রথায় সময়ের সংক্ষেপ হয় এবং লোক না পাঠাইয়াও টেলিগ্রাম করা চলে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ডাকবিভাগ : ডাক বিভাগের সাহায্যেই অধিকাংশ সংবাদ আদানপ্রদান করা হয়। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, কেবলগ্রাম ইত্যাদি সকলই ডাক বিভাগের মারফত আদানপ্রদান হয়। আবার অর্থের আদানপ্রদানও ডাক বিভাগের মারফত হইতে পারে।

চিঠিপত্র পোষ্টকার্ড এবং খামে পাঠান যায়। চিঠি যদি জরুরী বি দেওয়ার জরুরী বিলি উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় তাহা হইলে চিঠির গায়ে ‘Express Delivery’ ছাপ দিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় মাণ্ডল ব্যতীতও অতিরিক্ত মাণ্ডলের স্ট্যাম্প দিতে হয়।

আবার তারও (Telegram) সাধারণ (Ordinary) অথবা জরুরী হইতে পারে। জরুরী তারের মাণ্ডল সাধারণ তারের মাণ্ডলের তুলনায় বেশী।

ডাকযোগে অর্থ লেনদেন হয় মনি-অর্ডার (Money Order) অথবা পোষ্টাল অর্ডারের মাধ্যমে।

চিঠিপত্র রেজিস্ট্রীকৃত হইলে চিঠির উপর (Registered) লিখিতে হয়। যদি প্রাপকের রসিদ পাইতে হয় তাহা হইলে Registered with Acknowledgement Due (Regd. with A/D) ছাপ দিতে হয়।

ডাকযোগে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে মাল পাঠান যায়। উহাকে বলে পার্সেলে বা প্যাকেটে পাঠান। পার্সেলে বা প্যাকেটে পাঠাইতে, হইলে শ্রব্যাটি ডাক করিয়া মোড়ক করিতে হয়। পার্সেল বিলি দেওয়ার পর মূল্য দেওয়া হইলে

উহাকে বলে মূল্য দেয় পার্সেল (Value Payable Parcel)—সংক্ষিপ্ত লিখন V. P. P.।

বাণিজ্যিক পত্রলিখন: ব্যবসায় বাণিজ্যে পত্রলিখনেব গুরুত্ব কেহই অস্বীকার কবিতে পারে না। ব্যবসায় কোনদিনহ এক সন্ধীর্ণ গণ্ডীব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পবিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের পবিধিও দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। আজ ছোটবড় সকল ব্যবসায়ীই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায় করিতেছে। তাই কি অন্তর্দেশীয় কি বহির্দেশীয় সকল প্রকার ব্যবসায়ের পত্রলিখনেব প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

পত্রাদির মাধ্যমেই ব্যবসায়ী তাহার বক্তব্য ও মনের ভাব অল্পাল্প ব্যবসায়ীদের জ্ঞাত কবিয়া থাকে। পত্রাদির মাধ্যমেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন হয়।

বাণিজ্যিক পত্র সর্বদাই সাধারণ ব্যক্তিগত পত্র হইতে পৃথক। বাণিজ্যে সময়ের গুরুত্ব খুবই অধিক। অথবা লক্ষী পত্র লিখিয়া নিজের ও অপরের সময় লইলে সর্বদা ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য সফল হয় না। ব্যক্তিগত পত্রে যাহা কিছুই লিখা যায়, কিন্তু বাণিজ্যিক পত্র অতি দীর্ঘ হইলে খুব ব্যস্ত কর্মচারীব পক্ষে তাহা হয়ত বিবক্তির কারণই হয়। আবার বাণিজ্যিক পত্রে বিষয়বস্তু গুছাইয়া পরিষ্কারভাবে না লিখিতে পাবিলেও আশাশুঙ্ক ফল পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বাণিজ্যিক পত্র নিজেই এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত। বাণিজ্যিক পত্রের নিজস্ব কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। উহাই নীচে আলোচনা করা হইল।

স্পষ্টতা: বক্তব্য বিষয় পবিষ্কারভাবে বুঝাইবার উপর পত্রের উদ্দেশ্য সাধন নির্ভর কবে। বিষয়বস্তু জটিলভাবে প্রকাশ করা হইলে পত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। স্বার্থ-বোধক শব্দাদির প্রয়োগ সর্বদাই বর্জন করিতে হয়। বিষয়বস্তুর অর্থ বুঝিতে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকাই উচিত। তবে স্পষ্টতাবজায় রাখিতে কোনরূপ অপ্রিয় শব্দাদি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

প্রাসঙ্গিকতা: চিঠিপত্র লিখিবার সময় সর্বদা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ পরিহার করা উচিত। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পত্রপ্রাপকের বিবক্তির উত্থেক করা উচিত নহে। ব্যবসায়ের লেনদেনের সহিত সম্পর্কহীন বিষয়ের অবতারণা করিলে যেমন পত্র লেখকের সময় নষ্ট হয় তেমনি পত্রপ্রাপকেরও সময় অপচয় করা হয়।

সংক্ষিপ্ততা: পত্র কখনও খুব দীর্ঘ হওয়া উচিত নহে। সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস বর্জন করা উচিত। উহাতে ব্যবসায়ের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। আলস্য বিষয়টি গুছাইয়া অল্প কথায় প্রকাশ করিতে পারিলেই পত্র লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। তবে সংক্ষেপ

করিতে গিয়া কোনও প্রকার স্বার্থবোধক শব্দের প্রয়োগ হয় কিনা কিংবা মূল বিষয়বস্তু বাম পড়িল কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সৌজন্য : সৌজন্যের অভাবে ব্যবসায়ী সম্ভাব্য সুনাম নষ্ট করিতে পারে।
সৌজন্য সুনামের অভাব ঘটিলে ব্যবসায়িক সম্বন্ধও ছিন্ন হইতে পারে। সৌজন্যের অভাবে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় ইহা কোন ব্যবসায়ীই চাহে না। সৌজন্য না থাকিলে সে পত্র কখনও স্তূপাঠ্য হয় না।

উপরি-লিখিত বিষয় কয়টির উপর লক্ষ্য রাখিয়া পত্ররচনায় প্রবৃত্ত হইবে। পত্র লেখক পত্র লিখিবার কালে যদি মনে করিতে পারে যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সহিত মৌখিক আলোচনা করিতেছে তাহা হইলে পত্র লেখা খুব সহজ হয়। অনাবশ্যক কথাও বর্জন করা সম্ভব হয়। পত্র লেখকের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পত্রই তাহার মনের পরিচায়ক। সুতরাং পত্র পাঠ করিয়া মনে যে রূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহার উপরই পত্র লেখার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে কি ব্যর্থ হইবে তাহা নির্ভর করে।

বাণিজ্যিক পত্রের আবার কয়েকটি গঠন বৈশিষ্ট্য আছে। পত্র লিখিবার কালে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পত্রটি দেখিতে সুন্দর হওয়া উচিত। পত্র পাঠ করিলে পাঠকের মনে লেখকের সেই সৌন্দর্যবোধের অভাব ধরা পড়িলে অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ক্রিয়া হয়। বাহা হউক বর্তমান যুগে হস্তলিপির সৌন্দর্যের উপর কোনই গুরুত্ব আরোপ করা হয় না কারণ, হাতে পত্র লিখা এখন বিরল। টাইপ করিয়া পত্র লিখাই বর্তমান রীতি। বাণিজ্যিক পত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

১। **শিরোনাম :** পত্র লেখকের নাম-ঠিকানা চিঠির উপরিভাগে থাকা উচিত। উহাতে পত্র লেখকের টেলিফোন নম্বর, কোনও প্রকার শিরোনাম টেলিগ্রাম ঠিকানা ইত্যাদি থাকিলে তাহাও লিখিতে হয়।

২। **প্রাপকের নাম ও ঠিকানা :** পত্রের বাহিরে লেফাপার উপর প্রাপকের নাম-ঠিকানা না থাকিলে পত্র বিলি দিতে অসুবিধা হয়। পত্রের অভ্যন্তরেও পত্র প্রাপকের নাম, ঠিকানা দেওয়া একান্ত সম্ভব। ইহা পত্রের বাম দিকে লিখিতে হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাপক ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান সেই অল্পসারে নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীমতী, শ্রীমুক্ত ইত্যাদি লেখা হয়। অংশীদারী কারবারে অথবা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্বে **মেসার্স (Messrs সংক্ষেপে M/s)** লিখা হয়।

৩। **তারিখ :** পত্রের উপরিভাগে ডান দিকে তারিখ লিখিতে হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তারিখ উল্লেখের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোন বিষয়ের তারিখ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বাহাতে কোনও আলোচনা উপস্থিত না হয় উক্তই তারিখ পরিষ্কারভাবে লিখিতে হয়।

৪। সম্বোধন : ইংরেজীতে অবশ্য বেনীম ভাগ ক্ষেত্রেই 'Dear Sir' লিখিয়া সম্বোধন করা হয়। বাংলায় 'উহা' প্রয়োগ হয় না। বাংলায় কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে মহাশয় কথাটি প্রয়োগ হয়। কোন প্রতিষ্ঠানকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতে হইলে ইংরেজীতে 'Dear Sirs' কথাটি লেখা হয়; বাংলায় বেনীম ভাগ ক্ষেত্রে 'নিবেদন' অথবা 'সবিনয় নিবেদন' কথাটি প্রয়োগ করা হয়; ইংরেজীতে কোনও গণ্যমান্ত ব্যক্তিকে 'Dear Sir' না লিখিয়া কেবলমাত্র 'Sir' লেখা হয় তেমনি বাংলায় কোনও গণ্যমান্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে 'মান্যবরেয়' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

বিষয়বস্তু : ইহার পর বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করিতে হয়। বিষয়বস্তুকে যদি কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক প্যারায় (Paragraph) লিখিতে হয়। কোনও পত্রে দ্রব্যের মূল্য এবং বিষয়বস্তু মূল্য শোধের উপায় জানিতে চাহিলে মূল্য একটি প্যারায় এবং মূল্যশোধের উপায় আরেকটি প্যারায় লিখিতে হয়। এই অংশই সম্পূর্ণ পত্রের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। হিত্তরাং ইহাব বিজ্ঞাস এবং লিখন ভঙ্গিমার উপরই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে।

উপসংহার : উপসংহারে কোনও প্রকার মন্তব্য থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে সমাপ্তি সন্তাষণ থাকিবেই। উপসংহারে অগ্রিম ধন্যবাদ (Thanks in anticipation); সর্ববিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দান উপসংহার (Assuring you of our best services) এবিধ, উক্তি থাকে। উপসংহারে সন্তাষণে অনেকক্ষেত্রেই I have the honour to remain, yours faithfully অথবা yours truly লেখা হয়। বাংলায় ভবদীয়, নিবেদক, বিনীত, এবিধ সন্তাষণ করা হয়।

স্বাক্ষর : পত্র সমাপ্তির পর স্বাক্ষর কবিতে হয়। স্বাক্ষরকারী কোনও কর্মচারী হইলে তাহার পদের (Designation) উল্লেখ করিতে হয়—যেমন ম্যানেজার; সেক্রেটারী (Secretary) ইত্যাদি। একক মালিকানায মালিক স্বাক্ষর নিজে সহি করিলে কিছু লিখিতে হয় না। কিন্তু অংশীদারী কারবারে একজন অংশীদার অপর সকল অংশীদারের পক্ষে সহি করিলে সহকারক, অমুক ব্যবসায়ের পক্ষে, (For & on behalf of) এই কথা লিখিতে হয়; অনেক ক্ষেত্রে 'Pro' কথাটি ব্যবহার হয়। যেমন J. N. Dhar—Pro. Dhar & Bros. বোধ কারবারী প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার বলে সহি করিলেও সহির নীচে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যেমন বি. সি. বসু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এলিট প্রেস লিঃ, কলিকাতা-১০।

কয়েকখানি বাণিজ্যিক পত্রের নমুনা :

১। প্রচার পত্রের নমুনা (Specimen of a Circular Letter)

নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ক্রেতা সংগ্রহের আশায় সম্ভাব্য ক্রেতা এবং ব্যবসায়ের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবগতির জ্ঞাত এবং বাণিজ্যিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার আশায় যে পত্র লেখা হয় তাহাকেই প্রচার পত্র (Circular Letter) বলে।

জে. এন. রায় কমিশন ব্যবসায়ী

৩৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রাট

কলিকাতা-১২

মেসার্স পেন ব্রোকার্স এণ্ড কোং লিঃ

তারিখ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৬১

১২ নং আশুতোষ মুখার্জি রোড্,

কলিকাতা-২৫

সবিনয় নিবেদন,

বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা মহানগরীতে আমদানি-রপ্তানি কমিশন ব্যবসায়ী হিসাবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছি।

মেসার্স বিড়লা এণ্ড ব্রাদার্স, ব্যবসায়ের সহিত প্রায় ১০ বৎসর কাল সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

প্রাচ্য মহাদেশের যে কোন দ্রব্যই আমি সরবরাহ করিতে পারি। আমার ব্যবসায়ের সহিত জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের রপ্তানি ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

সর্বদাই প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য বাজারে সর্বাধিক অল্পকূল মূল্যে সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

আপনাদের অহুসদ্ধান পত্র পাইলে বাধিত হইব। ইতি—

ভবদীয়

জে. এন. রায়

প্রচার পত্রের উত্তর

পেন ব্রোকার্স এণ্ড কোং লিঃ

প্রসিদ্ধ কলম, পেন্সিল, ষ্টেশনারী বিক্রেতা

১২ নং আশুতোষ মুখার্জি রোড্

শ্রী জে. এন. রায়

কলিকাতা-২৫

৩৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রাট

তারিখ ৭ই মে, ১৯৬১

কলিকাতা-১২

মহাশয়,

আপনার ৩০শে এপ্রিল তারিখের প্রচার পত্র পাইলাম। আমাদের বহু ক্রেতা জাপানী পাইলট (Pilot) এবং সোয়ান (Swan) কলম সম্বন্ধে অহুসদ্ধান করেন। ভবিষ্যতে উক্ত কলমের প্রয়োজন হইলে আপনাদের স্মরণ করিব।

ইতিমধ্যে, আপনার ব্যবসায়ের একখানা মূল্য তালিকা পাঠাইলে বাধিত হইব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি যে আমরা সাধারণত, আমাদের পাইকারী ক্রেতাকে ৩ মাসের ঋণে দ্রব্য বিক্রয় করি এবং আপনার নিকট হইতেও আমরা অল্পরূপ সুযোগ আশা করি। নমস্কারান্তে ইতি—

এস. সি. সেনগুপ্ত
ব্যবস্থাপক পরিচালক
পেন ব্রোকার্স এণ্ড কোং লিঃ

২। আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান

গোপনীয়

পলসন এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ মাখন বিক্রেতা

ম্যানেজার
নিউ ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিঃ
৩নং জম্মুর মন্ডুর রোড
দিল্লী-৭

৩নং হুগ মার্কেট
কলিকাতা-১৪
তারিখ ৩রা জুন, ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

ক্যাডেটস এণ্ড ব্রাদার্স, ৩৩নং জাহাঙ্গীর রোড, দিল্লী-১ মাখন ব্যবসায়ী সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানিতে প্রয়াসী হইয়া আপনাদের নিকট পত্র লিখিতেছি।

এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে যে কোনও সময়ে ৫০০০ টাকার মাল ধারে বিক্রয় করা সমীচীন হইবে কি না সে বিষয়ে অগ্রহণপূর্বক অবহিত করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আপনাদের মতামত সর্বদা গোপন রাখা হইবে এ-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

প্রয়োজন বোধে অল্পরূপ সেবা দিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

নিবেদক
এস. মোহম্মদ
পলসন এণ্ড সন্স পক্ষে

৩। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উত্তর :

গোপনীয়

৩নং জম্মুর মন্ডুর রোড, দিল্লী
৭ই জুন, ১৯৬১

মহাশয়,

আপনার ৩রা জুন, ১৯৬১ তারিখের পত্রে লিখিত মেসার্স ক্যাডেটস ব্রাদার্স আমাদের সহিত গত ১০ বৎসর যাবত সাফল্যের সহিত মাখনের

ব্যবসায় করিতেছে। ব্যবসায়ের মালিক বিড়তিভূষণ রায় অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অধ্যবসায়ী।

এই প্রতিষ্ঠানটি গত ১০ বৎসর যাবত আমাদের সহিত কাজ কারবার করিতেছে। এ যাবত কাল লেনদেন সম্পর্কে তাহাদের সহিত কোন গোলমাল ঘটে নাই। তাহাদের ক্রয় অধিকাংশ সময়েই নগদানে হইলেও, তাহাদের যে ধারে ক্রয়ের স্বযোগ দেওয়া হয় নাই তাহা নহে। প্রতিবারেই ধারের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ধার শোধ করিয়াছে। আমরা ৭০০০ টাকা পর্যন্ত ধারে লেনদেন করার স্বযোগ দিয়াছি এবং তাহাতে অল্পশোচনার কোনও কারণ ঘটে নাই।

আমাদের জ্ঞান বিশ্বাসমতে উপরি-উক্ত সংবাদ প্রদান করিলাম। কোনও অধিক লেনদেনজনিত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম। নমস্কারান্তে ইতি—
ম্যানেজার

৪। ঋণ প্রদান করার পূর্বে ঋণ গ্রহণকারীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান :

গোপনীয়

শ্রামাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স

ব্যাঙ্কার্স এণ্ড ব্রোকার্স

মেসার্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কার্স

৭৫নং ম্যারিন স্ট্রীট

কলিকাতা-৩৩

১০১নং মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৭

১০ই অক্টোবর, ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

ক্ষেত্র মোহন রায় এবং বহু বিহারী রায়, রায় এণ্ড সন্স নামে ৭০নং ক্রী স্ট্রীট, কলিকাতা-১ টিকানায় একটি অংশীদারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সহিত আপনাদের বহুদিন যাবত লেনদেন চলিতেছে বলিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছে এবং আপনাদের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লিখিয়াছে।

রায় এণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠানটি সম্ভ্রুতি ১০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য একটি চুক্তি পত্র সম্পাদন করিতে চাহেন। আমাদের নিকট ঋণ গ্রহণের জন্য এই প্রথমই আবেদন জানাইয়াছেন।

আমাদের একজন কর্মচারী উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করিয়াছেন। আপাত দৃষ্টিতে ব্যবসায়টির ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ

আছে বলিয়া মনে হয় না, এইরূপ অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ব্যবসায়টির সাফল্য অনেকাংশে সূচু পরিচালনার উপর নির্ভর করে একথাও তিনি বলিয়াছেন।

উক্ত রায় এও সঙ্গ প্রতিষ্ঠানটিকে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদ হারে ১০০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা সম্ভব হইবে কিনা এ বিষয়ে আপনাদের মতামত পাইলে যথেষ্ট বাধিত হইব।

ঋণের চুক্তি আগামী ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং আপনাদের উত্তর ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে পাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

ঋণ পরিশোধের কোনও প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার আপনাদের নিকট হইতে দাবি করিতেছি না।

আপনাদের মতামত সর্বদা গোপন রাখা হইবে। আপনাদের অনুরূপ কোন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। নমস্কারান্তে ইতি—

শ্রীমার্চান্দ দাস এও সঙ্গ পক্ষে

রামাকান্ত দাস অংশীদার

৫। ৪নং পত্রের উত্তরের নমুনা

গোপনীয়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক

শ্রীমার্চান্দ দাস এও সঙ্গ

ব্যাঙ্কস এও ব্রোকাস

১০১নং মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা—৭

৭৫নং ম্যারিন ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৩৩

২২শে অক্টোবর, ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ১০ই অক্টোবর, ১৯৬১ তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি।

এ পত্রে বর্ণিত রায় এও সঙ্গ আমাদের একজন অতি পুরাতন মকেল। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রী ষ্ট্রীট এলাকায় প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন। ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদারই সং, পরিষদী এবং ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি আমাদের নিকট হইতে ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াই আরম্ভ করে। দুই বৎসরের মধ্যেই আসল ও সুদ পরিশোধ করিয়া দেয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই আপনাদের পক্ষে উল্লিখিত ১০০০০ টাকা ঋণ করিতে চাহে। আপনাদের নিকট আবেদন জানাইবার পূর্বে আমাদের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিল। যদি আমাদের নিজেদের অহুবিধা না থাকিত তাহা হইলে আমরা উক্ত ঋণপ্রদান করিতে পরাজুখ হইতাম না।

বিশেষভাবে অহুসঙ্কান করিলে জানিতে পারিবে যে ব্যবসায়ের সম্পদ ব্যতীত উহার অংশীদার ক্ষেত্রমোহন রায় ও বহুবাহারী রায় উভয়েরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি যে কারখানাটি জামানত রাখিতে ইচ্ছুক উহার মূল্যও প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

আমাদের জানিত সংবাদই আপনাদের দিলাম। নমস্কারান্তে ইতি—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কস্ পক্ষে

রতনমণি নন্দর

অংশীদার

৬। ৫নং পত্রে ৪নং পত্রের উত্তর রায় এণ্ড সন্সের অহুফুলে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উত্তর যদি প্রতিকূল হয়, তাহার একখানি নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

গোপালীন্দ্র

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কস্

শ্রীমচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
ব্যাঙ্কস্ এণ্ড ব্রোকার্স
১০১ নং মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭

৭৫ নং ম্যারিন স্ট্রীট
কলিকাতা—৩৩
২২ শে অক্টোবর, ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ১০ই অক্টোবর তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে রায় এণ্ড সন্স, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে আমরা উক্ত রত পোষণ করিতে পারিতেছি না। ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে এবং অযোগ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রায় এণ্ড সন্স বাজারে হুনাম অর্জন করিতে পারে নাই।

ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে ব্যবসায়টি ১৯৫০ সালে একবার দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার জন্য আবেদন জানাইয়াছিল। কিন্তু পাওনাদারদের সহিত রক্ষা করায় দেউলিয়া ঘোষিত হয় নাই।

ব্যবসায়ের মালিক ক্ষেত্রমোহন রায় এবং বহুবাহারী রায় দুই ভাই। তাহাদের পৈত্রিক বাটি ৫০০০ টাকা দেনার দায়ের বন্ধক আছে। ব্যবসায়ের সম্পদও যথেষ্ট নহে। ১০০০০ টাকা ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ঐ প্রতিষ্ঠানের আছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় প্রসারিত করিয়া বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে সকল সংবাদ প্রদান করিলাম। এখন সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋণ প্রদান কর্তব্য কিনা স্থির করিবেন। নমস্কারান্তে ইতি—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাংকস পক্ষে
রতনমণি নন্দর
অংশীদার

৭নং পত্র : কর্মচারী নিয়োগ করিবার পূর্বে আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ।

কটিনেন্টাল কর্পোরেশন লি:

গোপনীয়

মেসার্স আর. কে. ডি. লি:
৩৩নং হেষ্টিংস স্ট্রীট
কলিকাতা—১

৩নং ক্লাইভ রো,
বোম্বাই—১
৩রা নভেম্বর, ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একজন হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের উত্তরে ৭নং ম্যাকটন স্ট্রীট, বোম্বাই-১ নিবাসী শ্রী শ্রীনিবাস জিপ্রাঠী উক্ত পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন জানাইয়াছেন এবং তাহার কর্মদক্ষতা, সততা, পরিশ্রমশীলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অমূল্যসন্ধান করিবার জন্য আপনাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬ বৎসর কার্য করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

আমরা একজন পরিশ্রমী, সংগঠন শক্তি সম্পন্ন, দক্ষ এবং সং হিসাবরক্ষক নিয়োগ করিতে চাহি। নবাগতকে সম্পূর্ণ হিসাব রক্ষণ বিভাগটির ব্যবস্থাপনার ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে উক্ত বিভাগে ৬ জন কারণিক (Clerk) আছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে কারণিকের সংখ্যা ১০ জনে উঠিবে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং অদন্তন কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়া কার্য করানর ক্ষমতা নবাগতের থাকা আবশ্যক।

এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া শ্রী শ্রীনিবাস ত্রিপাঠীকে হিসাব রক্ষক পদের যোগ্য বলিয়া মনে করেন কিনা এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত জানিতে পারিলে বাধিত হইব।

হিসাবরক্ষকের পদটি একমাসাধিক কাল শূন্য আছে। আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্বেই উক্তপদের লোক নির্বাচন করিতে হইবে। সম্বর উত্তর দানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। আপনাদের মতামত সর্বদাই গোপন রাখা হইবে। নমস্কারান্তে ইতি—

রামকিঙ্কর লোদ
-ম্যানেজার
কন্টিনেন্টাল কর্পোরেশন লি:

৮নং পত্র। ৭নং পত্রের উত্তর : প্রার্থীর অস্থূল

আর. কে. ডি. লি:

গোপনীয়

মেসার্স কন্টিনেন্টাল কর্পোরেশন লি:

৩নং ক্লাইভ রো

বোম্বাই—১

৩৩নং হেষ্টিংস স্ট্রীট

কলিকাতা-১

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ৩রা নভেম্বর, ১৯৬১ তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে শ্রী শ্রীনিবাস ত্রিপাঠী আমাদের কার্যালয়ে ১৯৫২ সাল হইতে একাদিক্রমে প্রায় ৬ বৎসর কার্য করিয়াছেন।

শ্রীত্রিপাঠীর যোগ্যতা, সততা এবং পরিশ্রমশীলতায় আমরা অত্যন্ত প্রীত ছিলাম। তিনি বোম্বাই-এ একটি নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাব রক্ষক (Chief Accountant) পদে নিয়োগ পত্র পাইয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। বিশেষত, বোম্বাই-এ তাহার পৈত্রিক বাসভবন থাকায় নূতন কার্যে তাহার আকর্ষণ অধিক ছিল। দুর্ভাগ্যবশত বোম্বাই-এর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অকৃতকার্য হওয়ায়ই শ্রীত্রিপাঠী আজ বেকার।

এখানে উল্লেখ কর্তব্য প্রয়োজন যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় নূতন কোনও কর্তব্যরী নিয়োগ করা সম্ভব নহে, নতুবা আমরা সানন্দে তাহাকে পুনরায় আমাদের সহিত যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতাম।

উপসংহারে লিখিতে পারি যে শ্রীজিপাঠীর মত একজন বিচক্ষণ, সংগঠনশক্তি সম্পন্ন কর্মচারী পাইলে যে কোনও ব্যবসায়ী ধস্তা বলিয়া মনে করিবে। তাহার অমায়িক ব্যক্তিত্বে তাহার উৎকর্ষিত কর্মচারী এবং সহকর্মী সকলে সর্বদাই প্রীত ছিলেন। নমস্কারান্তে ইতি—

আর. কে. ডি. লি: পক্ষে
শ্রীরবিশঙ্কর বর্মণ
ম্যানেজার

৯নং পত্র: ব্যবসায় স্থাপনেচ্ছু বন্ধুকে পরিচয় পত্র দান।

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

৩৮নং নাস্তিক রোড
কলিকাতা-৩
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

শ্রীনাগাহিতো চং ফু

৩৫ নাগাসাকি, নর্থ

জাপান

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ ভট্ট আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের প্রায় ১০ বৎসরের সম্পর্ক আছে।

শ্রীভট্ট 'ভ্যারোণ্ডা' জাতীয় একপ্রকার শীতবস্ত্র উৎপাদন করিতেছেন। তাহার কারখানায় তৈয়ারী 'ভ্যারোণ্ডা' শীতবস্ত্র ভারতবর্ষে সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছে। তিনি জাপানে ঐ দ্রব্য (শীতবস্ত্রাদি) বিক্রয় করিবার জন্ত নিজেই জাপানের গুরুত্বপূর্ণ সহরসমূহ পরিভ্রমণ করিবেন।

জাপানে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন এমনতর সহদয় ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাদের সহিতই আমাদের পরিচয় আছে। বিশেষতঃ শীতবস্ত্র ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আপনাদের স্থান সর্বোচ্চ। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস যে আপনার নিকট হইতে শ্রীভট্ট তাহার ব্যবসায় সাফল্যের জন্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাইবেন।

শ্রীভট্টকে যে কোনও প্রকার সাহায্য দানকে ব্যক্তিগত ধণ বলিয়াই আমরা স্বীকার করিব। সুযোগ পাইলে অল্পরূপ কোন সাহায্য দিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করিব। নমস্কারান্তে—

বিনীত

এন. এন. ফ্রেণ্ড

ম্যানেজার

(ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং লি:)

১০মং পত্র। গতি-প্রত্যয় 'পত্র (Circular Letter of Credit) মঞ্জুর করিয়া বিদেশস্থ ব্যাঙ্ক অথবা কোনও ব্যবসায়ীর নিকট পত্রের নমুনা।

গতি-প্রত্যয় পত্র (Circular Letter of Credit) : বিদেশে গমনকালে বিদেশে যাহাতে আবশ্যকীয় অর্থের অভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য গতি-প্রত্যয় পত্রের প্রচলন। নিজ দেশের মুদ্রা বিদেশে বৈধ মুদ্রা নহে। আবার বৈদেশিক মুদ্রাও এককালীন সঙ্গে লইয়া চলাফেরা করার প্রয়োজন হয় না। যদি গতি-প্রত্যয় পত্রের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে কোনও ব্যাঙ্কের নিকট অথবা বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করে এমন কোনও ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিলে সেই ব্যাঙ্ক বিদেশস্থ উহার প্রতিনিধির নিকট সেই দেশীয় মুদ্রায় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয়। একই ব্যাঙ্ক বহুদেশ ভ্রমণ করিতে হইলে প্রতি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা গতি-প্রত্যয় পত্র দ্বারা দূরীভূত হয়।

এনং ক্লাইভ রোড

কলিকাতা-১

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯

ভ্রমহোদয়গণ,

গতি-প্রত্যয় পত্রবাহক শ্রীযুক্ত স্বধীর মুখার্জি মহাশয়ের স্বাক্ষরের নমুনা নীচে দিলাম। তাহাকে অনুধর্ম ৫০,০০০ টাকা প্রদান করিলে উহা আমরা শোধ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। তাহাকে ঋণ ১৩৮৭ গতি-প্রত্যয় পত্র দেওয়া হইল। উহার পিছনে আপনারা কত টাকা দেন তাহা লিখিয়া আপনাদের প্রাপ্য অর্থের জন্য আমাদের উপর হণ্ডি কাটিবেন। গতি-প্রত্যয় পত্রের মিয়াদ ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ পর্যন্ত। ধন্যবাদ লইবেন। ইতি—

আপনাদের বিশ্বস্ত
ঘটক এণ্ড কোং পক্ষে
হরিপদ ঘটক

মেসার্স কনডোন এণ্ড কোং, লণ্ডন।

মেসার্স ক্রাফ্ট এণ্ড কোং, নিউইয়র্ক।

মেসার্স পেনালটি এণ্ড কোং, হংকং

সহি—স্বধীর মুখার্জি।

১১মং পত্র। জব্য সরবরাহের নির্দেশ।

রায় এণ্ড সন্স কিলিগ্‌স্ কোং লিঃ

১৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৪

তারিখ ৫ই অক্টোবর, ১৯৬০

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং.

১০নং হরিহর শেঠ রোড

বোম্বাই।

উদ্রমহোদয়গণ,

নমস্কারান্তে নিবেদন এই, আমাদের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে জব্য সরবরাহের নির্দেশ মত যে জব্য পাঠাইয়াছেন উহা বখা সময়েই পাইয়াছি। উহার মধ্যে আকাশী রং-এর যে ১০ খানি শীতবস্ত্র পাঠাইয়াছেন উহার রং খুবই ফিকে বলিয়া খরিদারগণ পছন্দ করেন না। এবারে আমাদের পুনরায় নিয়লিখিত জব্য সম্বরই রেলযোগে পাঠাইবেন। মাল বাহাতে আগামী ১৫ই তারিখের মধ্যে হাওড়া রেল গুদামে পৌছায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

এবারে যে আকাশী রং-এর শীতবস্ত্র পাঠাইবেন উহার রং একটু গাঢ় হইবে।

১০০ খানি ৫ হাত সাদা শীতবস্ত্র।

১০০ খানি ৭ হাত আকাশী রং-এর শীতবস্ত্র (একটু গাঢ় রং)

২০০ খানি ৪ হাত বাদামী রং-এর চওড়া পাড় স্কার্ফ।

পূর্বের মতই জব্য প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে চেকে মূল্য পরিশোধ করা হইবে।
নমস্কার ইতি—

রায় কিলিগ্‌স্ এণ্ড কোং লিঃ

পক্ষে

জীবতোষ রায়

ম্যানেজার

১২নং পত্র। মাল সরবরাহ (১০নং পত্রের উত্তর)

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

২ই অক্টোবর, ১৯৬০

বোম্বাই

রায় কিলিপস্ এণ্ড কোং লি:

সমীপেষ্

মহোদয়গণ,

অন্ত আপনাদের ৫।১০।৬০ তারিখের পত্রের মর্মান্বয়ী নিম্নলিখিত দ্রব্য রেলযোগে পাঠান হইল। রেল রসিদ নং এ।১৩৬১ তারিখ ৯।১০।৬০ এই সঙ্গে যুক্ত। পুনরায় আপনাদের নিকট হইতে দ্রব্য সরবরাহের নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

দ্রব্যের বিবরণ :

৫ হাত ১০০ খানি সাদা শীতবস্ত্র।

৬ হাত ১০০ „ আকাশী (গাঢ়) রং শীতবস্ত্র।

৪ হাত ২০০ „ বাদামী চওড়া পাড় স্কার্ফ।

নমস্কারান্তে,

বিনীত

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং পক্ষে

নগধর রায়

ম্যানেজার

যোজন্য: রেল রসিদ নং এ।১৩৬১

১৩নং পত্র : দ্রব্য সরবরাহে অপরগতা

রায় এণ্ড ব্রাদার্স এণ্ড কোং

তারিখ ২ই অক্টোবর, ১৯৬০

বোম্বাই

রায় কিলিপস্ এণ্ড কোং লি:

কলিকাতা

সমীপেষ্

মহোদয়গণ,

অতীত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনাদের ৫ই অক্টোবর, ১৯৬০ তারিখের নির্দেশিত দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিলাম না। গত দুই মাস যাবত

বিদ্যায় সরবরাহের অসুবিধার জন্য উৎপাদন এত কমিয়া গিয়াছে যে মজুত মাল মোটেই নাই। যদি অসুবিধা হয় তাহা হইলে আগামী ১৫ই নভেম্বর তারিখের মধ্যে সকল দ্রব্যই পাঠাইতে পারি। এবিষয়ে আপনাদের মতামত সম্বন্ধে পাইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। আপনাদের মত গ্রাহকের নির্দেশমত কার্য করিতে না পারায় কত দুঃখিত তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। নমস্কার লইবেন। ইতি—

রায় ব্রাদার্স পক্ষে
নগধর রায়
ম্যানেজার

১৪নং পত্র : দ্রব্যের প্রাপ্তি স্বীকার ও মূল্য প্রদান

রায় ফিলিপস এণ্ড কোং লি:
১০নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট
কলিকাতা-১৪

৩০ শে অক্টোবর, ১৯৬০

বায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং
বোম্বাই
সমীপেয়

মহোদয়গণ,

আপনাদের ২ই অক্টোবর, ১৯৬০ তারিখের প্রেরিত মাল হাণ্ডা ওয়াশ হইতে বিলি গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সঙ্গে আপনাদের ৪৩নং বিলের বাবদ প্রাপ্য ৫০০০ টাকা মূল্যের একখানি চেক (নং ৫/এ ৩০০২ তারিখ ৩০।১০।৬০ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের উপর) যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। চেকের প্রাপ্তিস্বীকার পাইলে বাধিত হইব।

তৎপরতার সহিত মাল সরবরাহ করার জন্য ধন্যবাদ। নমস্কারান্তে

বিনীত—

বোম্বাই : ইউনাইটেড কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্কের উপর লিখিত
চেক নং ৫/এ ৩০০২ তারিখ ৩০।১০।৬০।

রায় ফিলিপস এণ্ড কোং লি: পক্ষে
জীবতোষ রায়
ম্যানেজার

১৫নং পত্র : অবৈধ প্রাপ্তি স্বীকার

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

বোম্বাই

তারিখ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬০

রায় কলিপস্ এণ্ড কোং লিঃ

সমীপে

ভবনহোদয়গণ,

আপনারা ৫/এ ৩০০২নং চেকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আরও পূর্বে প্রাপ্তি স্বীকার পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অকরী কার্বে আমেরাবাদ যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে গতকাল মাত্র এখানে আসিয়াছি। আশা করি প্রাপ্তি স্বীকারে গোণ হইল বলিয়া অপরাধ লইবেন না।

ধন্যবাদ লইবেন। ইতি—

বিনীত

নগধর রায়, ম্যানেজার

পক্ষে

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৬নং পত্র : বাল সম্বন্ধে অভিযোগ।

রায় ফিলিপস্ এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬০

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

বোম্বাই

সমীপে

মহোদয়গণ,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনারা আমাদের ৫ই অক্টোবর তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী যে বাল পাঠাইয়াছেন উহার মধ্যে ৫ বাসি লামা শিশু এবং ১০ বাসি বাদামী কাক টুটা। উহা কেন্দ্রত পাঠান হইল। নিবেদন ইতি—

বিনীত

রায় কলিপস্ এণ্ড কোং লিঃ

পক্ষে

জীবন্তেন রায়

ম্যানেজার

১৭নং পত্র: মাল সম্বন্ধে অভিযোগ পত্রের উত্তর।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

বোম্বাই

তারিখ ২৫ শে নভেম্বর, ১৯৬০

রায় এণ্ড ফিলিপ্‌স কোং লি:

কলিকাতা

সমীপেষু

মহোদয়বৃন্দ,

আপনাদের ১৫ই নভেম্বর তারিখের পত্র পাইলাম। অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে আমাদের সমস্ত বিভাগের একটির জন্তই কয়েকখানি টুটা শীতবস্ত্র পাঠান হইয়াছিল। আমরা অল্প তারিখে পুনরায়, ১০ খানি বাদামী ডার্ক ও ৫ খানি সাদা শীতবস্ত্র পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন। যাহাতে সমস্ত মাল পান তাহাব জন্তই রেলযোগে মূল না পাঠাইয়া ডাকযোগে পাঠান হইল।

অনিচ্ছাকৃত, অসুবিধার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনীত

রায় এণ্ড ব্রাদার্স কোং পক্ষে

নগধর রায়,

ম্যানেজার

Exercises

1. Describe the functions of the different departments of a modern factory. Is there any necessity of departmentalisation of a factory?

একটি আধুনিক কারখানার বিভিন্ন বিভাগের কার্য আলোচনা কর। কারখানা বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

2. Give an idea of the organisation of a modern office.

একটি আধুনিক অফিসের সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

3. What are the different means of communication in a modern office?

একটি আধুনিক ব্যবসায়ের অফিসে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

4. Mention some of the equipments and labour saving devices used in office.

অফিসে ব্যবহৃত করেকট সরঞ্জাম এবং শ্রমসঞ্চর পদ্ধতির উল্লেখ কর । "

5. What fuctions are performed by post offices in Trade ?

ব্যবসায় বাণিজ্যে ডাক বিভাগ কি কার্য করে ?

6. What is meant by 'filing' ? What are its importance ?

নথীকরণ বলিতে কি বুঝা যায় ? উহার আবশ্যিকতা কি ?

7. Explain, Pre'cis writing and Office Notes.

ব্যাখ্যা লিখ : সারসর্ম লিখন এবং অফিস নোট ।

8. What are the importance of commercial correspondence in Business ?

ব্যবসারে বাণিজ্যিক পত্রলিখনের গুরুত্ব লব্ধে আলোচনা কর ।

9. Write a letter to a businessman in Bombay asking information about the financial condition of another businessman in Bombay ?

বোম্বাই-এর একজন ব্যবসায়ীর আর্থিক অবস্থা লব্ধে অস্থলকান করিয়া বোম্বাই-এর অপর একজন ব্যবসায়ীর নিকট একখানি পত্র লিখ ।

10. Write a letter to a businessman requesting him to supply certain woolen goods.

একজন ব্যবসায়ীকে কিছু পশমবস্ত্র সরবরাহ দেওয়ার নির্দেশ দিয়া একখানি পত্র লিখ ।

দ্বাদশ অধ্যায় বৈদেশিক বাণিজ্য* (Foreign Trade)

বহু প্রাচীনকাল হইতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মঙ্গলকাব্য মনসা মঙ্গলের চাঁদ সওদাগর, সায় সওদাগরের গল্প তোমরা অনেকেই পড়িয়াছ। সওদাগর কথাটি এখনও ব্যবসায়ীকে বুঝাইতে ব্যবহার হয়। সওদা অর্থ দ্রব্য; দ্রব্যের আদান প্রদান ঋহারা করেন তাঁহারা ই সওদাগর। অনেক সময়ে লক্ষ্য করিবে, বুঝেরা এখনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক বাণিজ্য সওদাগরী প্রতিষ্ঠান বলিয়া থাকেন। তবে সওদাগরী কার্য কথাটি তখন বর্তমানকালের আমদানি রপ্তানি বুঝাইতে ব্যবহার হইত। চাঁদ সওদাগর দক্ষিণ পাটনে সওদা করিতে গিয়া সমুদ্রবক্ষে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে মনে হয় তখনকার যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যে কত বড় ঝুঁকি ছিল। বর্তমান সিংহল অঞ্চলকে বুঝাইতেই দক্ষিণ পাটন কথাটি প্রয়োগ হইয়াছিল, একথা অনেক গবেষক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জীবন বিপন্ন করিয়াও বিদেশের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করার নজির কেবলমাত্র মনসামঙ্গল কাব্যেই পাওয়া যায় না। সকল মঙ্গলকাব্য পড়িলেই দেখিবে যে তখনকার যুগেও বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। ভারতের নানা

স্থান হইতে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার ফলে একথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে এককালে ভারতের বহির্বাণিজ্য খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশের সপ্তগ্রাম এবং তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) একদা যে বিরাট বন্দর ছিল তাহা সেখানকার ভৃগুডঙ্ঘ নৌকা, বজরা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ হইতে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হইয়াছে। এই সকল বন্দর বঙ্গোপসাগরের কুলসংলগ্ন ছিল বলিয়াই বহির্বাণিজ্য তখন এত প্রসার লাভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, বাণিজ্য যখন দেশাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার বাহিরের দেশের সহিত বাণিজ্য করা হয় তখন তাহাকে বলে বৈদেশিক বাণিজ্য। বাণিজ্য অর্থে আর্থিক সম্পদ আদান প্রদান বুঝায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্য বলিতে বিদেশ হইতে দ্রব্য আনয়ন এবং বিদেশে দ্রব্য প্রেরণ বুঝায়। যখন বিদেশে দ্রব্য প্রেরণ করা হয় তখন তাহাকে বলে রপ্তানি আর যখন বিদেশ হইতে দেশাভ্যন্তরে দ্রব্য আনয়ন করা হয় তখন তাহাকে বলে আমদানি। তাহা হইলে আমদানি রপ্তানিকেই বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

* বৈদেশিক ব্যবসায় ও বৈদেশিক বাণিজ্য একই অর্থে প্রয়োগ হয়। তবে বৈদেশিক বাণিজ্য কথাটি বৈদেশিক ব্যবসায় হইতে ক্রটিময়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণ (Causes of foreign trade) :

বাণিজ্যের কারণ সহজ কথায় বলিলে বলিতে হয় যে দেশে দ্রব্য উৎপাদন করিতে না পারিলে বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। মনে কর, ভারতবর্ষ বর্তমানে খাতি দ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। তাই খাতি দ্রব্যের অভাব মিটাইতে বিদেশ হইতে খাতি দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য শোধ

করিবে কি প্রকারে? মনে কর, কানাডা হইতে গম আমদানি করিবে। সেই দেশে যদি আমদানিমূল্য পরিমাণ কোনও

দ্রব্য রপ্তানি করা যায় তাহা হইলেই আমদানির মূল্য পরিশোধ হয়। সুতরাং কানাডায় যে দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে, যাহা ভারতবর্ষ মিটাইতে পারে, সেই দ্রব্য সেখানে রপ্তানি করিতে পারিলেই গমের মূল্য শোধ হয়। বাস্তব ক্ষেত্রেও এই ভাবেই চলিতে থাকে। প্রত্যেক দেশই দ্রব্য রপ্তানি করিয়া আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য শোধ করে। তবে সব সময়ই যে রপ্তানিমূল্য আমদানিমূল্যের সমান

হইবে তাহা নহে। তবে প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করে যাহাজে আমদানিমূল্য রপ্তানিমূল্য দ্বারা শোধ করা যায়। এই কারণেই বৈদেশিক বাণিজ্যকে 'দ্রব্য বিনিময় বাণিজ্য' বলা হয় (Foreign trade is Barter trade)। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

এ ত গেল সরাসরি অভাব পূরণের ব্যবস্থা। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, দেশে কোনও দ্রব্য উৎপাদনের স্বযোগ আছে, অথচ সেই দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠে, যে দ্রব্য দেশাভ্যন্তরে উৎপাদনের স্বযোগ আছে সে দ্রব্যও বিদেশ হইতে আমদানি হয় কেন?

ব্যবসায় বাণিজ্যের গোড়ার কথায় বলা হইয়াছে যে বর্তমান যুগের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বহুল উৎপাদন ব্যবস্থা (System of large-scale production) বলা হয়। বহুল উৎপাদনের মূল কথা শ্রমবিভাগ (Division of Labour)। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক বিশেষজ্ঞতা (specialisation) লাভ করে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতা

এই দুইটি কারণেই বৈদেশিক বাণিজ্যের অস্তিত্ব।

শ্রমবিভাগের ফলে শিল্পে বহুল উৎপাদন হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে। যে দেশের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সে দেশ উৎপাদন করিতে থাকিলে যে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন হইবে তাহার উপায় হইবে কি? ধরা যাউক, গ্রেটব্রিটেনের ল্যাক্সাশায়রের কাপড়ের কলে যে স্বতী দ্রব্য উৎপাদন হয় উহা

গ্রেটব্রিটেনের লোকদের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী। যদি সেই অতিরিক্ত দ্রব্য অন্যত্র বিক্রয়ের স্বযোগ না পায় তাহা হইলে শিল্পের উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পের উৎপাদন

কমানোর অর্থ গ্রেটব্রিটেনের কাপড়ের কলের শ্রমিকের বেকার হওয়া। ইহা কোন দেশই চাহে না যে উৎপাদন কমাইবার কলে দেশের শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে।

কাজে কাজেই প্রত্যেক দেশই বিদেশে বাজারের অন্বেষণ করে যেখানে উচ্চ দ্রব্য

বিক্রয় করা যাইতে পারে। গ্রেটব্রিটেন যে সময়ে শিল্পে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই সেই দেশ আবার পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ফলে সেই সকল উপনিবেশে নিজ দেশের শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করার সুযোগ

ভৌগোলিক বিশেষ-
করণ ও বৈদেশিক
বাণিজ্য

পাইয়াছিল। অল্প দেশের বেলাতেও একথা প্রযোজ্য যে শ্রমবিভাগের ফলে বহুল উৎপাদনের ফলে বিদেশী বাজারের সন্ধান এবং বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আঞ্চলিক

ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতাও (Territorial or Geographical Division of Labour) বৈদেশিক বাণিজ্যের অনিবার্য কারণ। জার্মানীর শ্রমিক লৌহ ইস্পাত দ্রব্যে এতই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে যে জার্মানীতে শ্রমিক যে সময়ের মধ্যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ লৌহ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে, অল্প দেশের শ্রমিক সেই একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে তাহার তুলনায় অধিক সময় লইবে। ফলে জার্মানী যে মূল্যে লৌহ ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার তুলনায় অনেক অধিক মূল্য লাগিবে অল্প কোনও দেশে (মনে কর ভারতবর্ষে) সেই লৌহ ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে লৌহ ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া জার্মানী হইতে সেই দ্রব্য আমদানি করিলে অনেক কম মূল্যে পণ্ডিয়া যাইবে।

আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞতার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আর্থিক সম্পদ উৎপাদনে প্রকৃতিরও (Nature) যে এক বিশেষ দান আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদনে প্রকৃতির (Nature) দান কত সহায়ক তাহা তোমরা জান। ধরা যাউক, ভারতবর্ষে পাট উৎপাদনের উপযুক্ত জলবায়ু বিद्यমান, কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অথবা গ্রেটব্রিটেনের জলবায়ু পাট উৎপাদনের পক্ষে মোটেই অসুকল নহে। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই ভারতবর্ষ পাট উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা (specialisation) অর্জন করিয়াছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা গ্রেটব্রিটেন পাট উৎপাদনে আদৌ সক্ষম নহে। এই প্রাকৃতিক কারণেই ভারতের কৃষক যত দক্ষতার সহিত পাট উৎপাদন করিতে পারে পৃথিবীর অল্প কোনও দেশের শ্রমিকই পাট উৎপাদনে সে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে নাই। কাজে কাজেই ভারতবর্ষ পাট উৎপাদন করিতেছে এবং পাট বিদেশে রপ্তানি করিতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করা হইবে কিংবা নিজ দেশেই সেই দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। কোনও দ্রব্য নিজ দেশে উৎপাদন করা লাভজনক অথবা বিদেশ হইতে সেই দ্রব্য আমদানি করা লাভজনক তাহা দেশে

দ্রব্য উৎপাদন সম্ভা হইবে কিংবা বিদেশ হইতে সেই দ্রব্য আমদানি আপেক্ষিক সুযোগ করা সম্ভা হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবে। যদি দেখা যায় যে নিজ দেশে দ্রব্য উৎপাদন করার চেয়ে বিদেশ হইতে সেই দ্রব্য আমদানি করিলে মূল্য কম হইবে তাহা হইলে বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানি করাই সম্ভব। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্য সম্ভা হইবে তাহার কারণ সেই দ্রব্য উৎপাদনে তুলনায় সেই দেশের অধিক

সুযোগ। অল্পরূপভাবে অল্প কোন দ্রব্য হয়ত নিজ দেশে উৎপাদন করা সম্ভব। তাহা হইলে যে দ্রব্য নিজ দেশে উৎপাদনের সুযোগ অধিক, সেই দ্রব্য উৎপাদনে সর্বশক্তি ব্যয় করাই সম্ভব। আর অল্প দেশকে উহার যে দ্রব্য উৎপাদনে অধিক সুযোগ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সর্বশক্তি ব্যয় করার সুযোগ দেওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ, নিজ দেশ একটি দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুক এবং অপর দেশটি অপর একটি দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুক। ফলে দুই দেশে দুইটি দ্রব্য সর্বাধিক কম মূল্যে উৎপাদন হইতে পারিবে। উৎপাদনে পারস্পরিক সুবিধাকেই 'আপেক্ষিক সুযোগ' (Comparative Advantages) বলা হয়। আপেক্ষিক সুযোগ প্রতিফলিত হয় উৎপাদন ব্যয়ে। তাহা হইলে যে দেশের যে দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুযোগ থাকিবে, সেই দেশে সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও কম হইবে। সুতরাং যে দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয় কম সেই দ্রব্য উৎপাদন করিয়া, যে দ্রব্য অল্পতর কম ব্যয়ে উৎপাদন হয়, সেই দেশ হইতে আমদানি করা লাভজনক। তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কারণ আপেক্ষিক সুযোগ অর্থাৎ আপেক্ষিক উৎপাদন ব্যয় (Comparative Advantages অর্থাৎ Comparative Costs)।

ভারতবর্ষ চিনি উৎপাদন করে আবার পাট উৎপাদন করে। মনে কর, প্রতি কুইন্টেল চিনি উৎপাদনে ভারতের ব্যয় ৩ টাকা এবং প্রতি কুইন্টেল পাট উৎপাদনের ব্যয় ৫ টাকা। আবার পাকিস্তানও চিনি ও পাট উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করে। পাকিস্তানের উৎপাদন ব্যয় প্রতি কুইন্টেল চিনি ৫ টাকা এবং প্রতি কুইন্টেল পাট ৩ টাকা।

তাহা হইলে উভয় দেশে এক কুইন্টেল পাট ও ১ কুইন্টেল চিনির আপেক্ষিক সুযোগ ও উৎপাদন ব্যয় ১৬ টাকা। কিন্তু যদি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র চিনি

উৎপাদন করে তাহা হইলে ২ কুইন্টেল চিনির উৎপাদন ব্যয় ৬ টাকা এবং পাকিস্তান যদি কেবল পাট উৎপাদন করে তাহা হইলে ২ কুইন্টেল পাটের উৎপাদন ব্যয় ৬ টাকা। মোট ২ কুইন্টেল পাট ও ২ কুইন্টেল চিনির উৎপাদন ব্যয় ১২ টাকা। তাহা হইলে ভারত চিনি উৎপাদনে এবং পাকিস্তান পাট উৎপাদনে বিশেষিকরণ (specialise) করিলে দুই দেশের পক্ষে ৪ টাকা লাভ হয়। আবার ভারতের প্রয়োজনীয় পাট পাকিস্তান হইতে আমদানি করিলে প্রতি কুইন্টেল ৩ টাকা দরে পাইতে পারে এবং পাকিস্তান যদি ভারত হইতে চিনি আমদানি করে তাহা হইলে প্রতি কুইন্টেল চিনি ৩ টাকা দরে পাইতে পারে। ফলে উভয় দেশেরই দুই টাকা করিয়া লাভ হয়। অবশ্য দুই টাকা হইতে ষৎসামান্য পরিবরণ ব্যয় বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলেও উভয় দেশেরই আমদানিতে লাভ থাকে।

উপরের উদাহরণটি হইতে একথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভারতের পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিতে হইলে পরিবর্তে তাহাকে কিছু দিতে হইবে এবং পাকিস্তানকে ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমদানি করিতে হইলে পরিবর্তে কোন দ্রব্য দিতে হইবে। ভারতবর্ষ সেই দ্রব্যই দিতে পারে যাহা উৎপাদনে তাহার আপেক্ষিক সুযোগ আছে আর পাকিস্তান সেই দ্রব্য দিবে যাহাতে তাহার আপেক্ষিক সুযোগ আছে। অথবা একথা বলিলেই বোধ হয় ভাল হয় যে ভারতবর্ষ সেই দ্রব্য আমদানি

করিবে বাহাতে তাহার আপেক্ষিক অল্পবিধা বেশী এবং পাকিস্তান সেই দ্রব্য আমদানি করিবে বাহাতে তাহার আপেক্ষিক অল্পবিধা বেশী। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে দ্রব্যের আদান, প্রদান অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি চলিতে পারে।

পৃথিবীতে কোন দেশই নাই যাহার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক অল্পবিধা সমান—বিশেষত, মালুয়ের চাহিদা যখন সর্বগ্রাসী। তাই আমদানি রপ্তানি না থাকিলে কোনও দেশেরই সম্পূর্ণ চাহিদা মিটান সম্ভব নহে।

অবাধ বাণিজ্য কিংবা সংরক্ষিত বাণিজ্য (Free Trade or Protection) : অবাধ বাণিজ্য বলিতে সেই বাণিজ্য বুঝায় যাহাতে আমদানি রপ্তানিতে কোনও বাধানিষেধ থাকে না। দেশের চাহিদামুযায়ী যে কোনও দেশ হইতে যে কোনও দ্রব্য আমদানি এবং যে কোনও দেশে যে কোনও দ্রব্য রপ্তানিকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রবর্তক আদম্‌ স্মিথ (Adam Smith)।

অবাধ বাণিজ্যের ফলে যে দেশে যে দ্রব্যের অভাব সে দেশ সে দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। আবার যে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অধিক সে দেশও উৎকৃষ্ট উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করিয়া নিজ দেশের অভাব মিটাইতে পারে। ব্যবসায়-গণও ইহাই চায় যে সহজে এবং বিনা বাধায় বিদেশ হইতে যত অবাধ বাণিজ্যে দেশের দ্রব্যের চাহিদা মিটান সম্ভব অধিক দ্রব্য আমদানি করা যায় এবং পরিবর্তে বিদেশে যত অধিক দ্রব্য রপ্তানি করা যায় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু প্রশ্ন

হইতেছে যে আমদানিমূল্য রপ্তানিমূল্যের সমান না হইলে সে অবস্থায় কি হইবে? মনে কর, ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে দ্রব্যসমূহ আমদানি করিল উহার মূল্য ১০০০০ টাকা আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে যে দ্রব্যসমূহ আমদানি করিয়াছে উহার মূল্য ৮০০০ টাকা। তাহা হইলে ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ২০০০ টাকা দিতে বাধ্য। ঐ ২০০০ টাকা পরিশোধের কি উপায়? ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ২০০০ টাকা মূল্যের আরও দ্রব্য লইতে অল্পরোধ করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে আর দ্রব্য লইতে রাজী নহে। তাহা হইলে? ভারতবর্ষ আমেরিকাকে বলিতে পারে যে ভারতের ২০০০ টাকা গ্রহণ করুক। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের টাকা আইনামুগ্ধ মুদ্রা নহে। কাজেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২০০০ টাকা মূল্যের এমন দ্রব্য চাহিবে বাহা দ্বারা আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উহার প্রয়োজনীয় অল্প কোন দ্রব্য, মনে কর, কিউবা হইতে আমদানি করিতে পারে। যে দ্রব্য লইতে কোন দেশ কখনই অরাজী নহে উহা হইল স্বর্ণ। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যে যখন আমদানিমূল্য রপ্তানিমূল্যের অধিক হয় তখন বাটতি পূরণ করিতে হয় স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া। আমদানিমূল্য অপেক্ষা রপ্তানিমূল্য অধিক হইলে রপ্তানিকারক দেশ-বিদেশ হইতে স্বর্ণ-আগম হয়।

আমদানিমূল্য অপেক্ষা রপ্তানিমূল্য অধিক হইলে উভয়ের ব্যবধানকে বলে
অনুকূল বাণিজ্য উদ্ভূত (Favourable Balance of Trade)।
বাণিজ্য উদ্ভূত

আর আমদানিমূল্য রপ্তানিমূল্য হইতে অধিক হইলে উভয়ের
ব্যবধানকে বলে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ভূত (Unfavourable Balance of Trade)।

এই কারণেই গ্রেটব্রিটেনে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তন
করিয়া বিদেশ হইতে বাহাতে দেশে স্বর্ণ-আগম হয় তাহার চেষ্টা করা হয়। অনুকূল
বাণিজ্য উদ্ভূত হইলেই দেশে স্বর্ণ-আগম হইতে পারে। তাই গ্রেটব্রিটেনের লক্ষ্য ছিল
বণিকবাদ

অনুকূল বাণিজ্য উদ্ভূত রক্ষা করা। এই অর্থনৈতিক মতবাদকে
বলা হয় বণিকবাদ (Mercantilism)। আর যাহারা এই
নীতিতে বিশ্বাস করেন তাহাদের বলা হয় বণিকবাদী (Mercantilist)। বণিকবাদ
বেশ কিছুদিন স্বচ্ছভাবে কার্য করিতে লাগিল। বিশেষত গ্রেটব্রিটেন বণিকবাদের পূর্ণ
ফলভোগ করিয়াছে। কারণ গ্রেটব্রিটেনের পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ ছিল এবং সেই
উপনিবেশগুলিতে ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিত এবং ঐ সকল দেশ হইতে
শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করিত।

যাহা হউক, অবাধ বাণিজ্যের ফলে যে সকল দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ভূত
অর্থনৈতিক সচেতনতা: (Unfavourable Balance of Trade) তাহাদের পক্ষে দেশ
হইতে মূল্যবান সম্পদ স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হইত। ধীরে ধীরে
উপনিবেশগুলিতেও অর্থনৈতিক সচেতনতা ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিল। ফলে এই
সকল দেশে অবাধ বাণিজ্য বন্ধ করিবার জ্ঞাত আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহার ফলে
উপনিবেশগুলির জনমত দুইভাগে ভাগ হইল। একদল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী
আর দ্বিতীয় দল সংরক্ষণের (Protection) পক্ষপাতী।

যাহারা সংরক্ষণের (Protection) পক্ষপাতী তাহাদের মতে প্রথমত প্রত্যেক
দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ অল্প
দেশের উপর কোনও দ্রব্যের জ্ঞাত নির্ভরশীল থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির সময়ে
সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি সেই দেশ হইতে দ্রব্য আমদানি সম্ভব নাও হইতে পারে।

আবার কোনও দ্রব্য উৎপাদন যদি অল্প দেশের আমদানির উপর
নির্ভর করে এবং কোনও কারণে যদি সেই দেশ রপ্তানি না করে তাহা হইলে সেই
দ্রব্য উৎপাদন ব্যাহত হইবে। ফলে সেই শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা
অর্থনৈতিক ভারসাম্য দেখা দিবে এবং উহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়াইয়া
পড়িবে। ইহা কোন দেশের সরকারের পক্ষেই কাম্য নহে।

সুতরাং শিল্প সংরক্ষণ করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা প্রয়োজন।
এই যুক্তিকে বলা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (Argument for Self-sufficiency)।

দ্বিতীয়ত, যে সকল দেশের শিল্প অপেক্ষাকৃত নূতন সেই সকল দেশের শিল্পজাত
দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হইবে অধিক। সুতরাং তাহাদের
পক্ষে শিল্পোন্নত দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায়
শিথিল
আড়িয়া উঠা সম্ভব নয়, ; কারণ শিল্পোন্নত দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়

ভুলনায় কম। সুতরাং শিল্পে অনগ্রসর দেশের শিল্পকে 'শিশুশিল্প' বলা হয় এবং উহাদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই যুক্তিকে বলে 'শিশুশিল্প যুক্তি' (Argument for Infant Industry)।

তৃতীয়ত, বাণিজ্য উদ্ভূত প্রতিকূল হইলে দেশের অর্থ দেশের বাহিরে বদশে অর্থ বন্ধ। চলিয়া যায়। সুতরাং যাহাতে দেশের অর্থ দেশে রাখা যায় তাহার জন্তই শিল্পকে সংরক্ষণ দিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখা প্রয়োজন। কারণ যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যায় সেই অল্পপাতেই দেশ গরীব হইয়া পড়ে। এই যুক্তিকে বলা হয় 'দেশে অর্থ রাখার যুক্তি' (Argument for keeping money at home)।

চতুর্থত, শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া হইলে শিল্পের বহুমুখী প্রসার সম্ভব হয়। বহুমুখী শিল্প প্রসার সংরক্ষণের আওতায় অল্পমত শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে। এই যুক্তিকে বলা হয় 'বহুমুখী শিল্পায়নের যুক্তি' (Argument for Diversification of Industries)।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি (Object and method of Protection) :

সংরক্ষণের যুক্তিসমূহ হইতেই একথা বুঝা যায় যে সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হরণ করা। জাপানী কাপড় যদি প্রতি গজ ভারতবর্ষে ৩ টাকা দরে বিক্রয় করা হয় আর ভারতের কলে তৈয়ারী সেই একই কাপড় যদি ৫ টাকা দরে বিক্রয় হয় তাহা হইলে জাপানী কাপড়ের সহিত প্রতি-
সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশান্তরবে যোগিতায় ভারতীয় কলে তৈয়ারী কাপড় আটটিতে পারে প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং যদি জাপানী শিল্পে তৈয়ারী কাপড়ের উপর

এমন ভাবে কর বসান হয় যাহাতে জাপানী কাপড় ভারতের বাজারে ভারতের কলে তৈয়ারী কাপড় অপেক্ষা অধিক মূল্য হয় তাহা হইলে কেহই ভারতীয় কাপড় না কিনিয়া জাপানী কাপড় কিনিবে না। যদি জাপানী কাপড়ের উপর প্রতি গজে ৩ টাকা হারে আমদানি শুল্ক বসান হয় তাহা হইলে জাপানী কাপড়ের মূল্য হইবে প্রতি গজ ৬ টাকা। কারণ শুল্কের ৩ টাকাও মূল্যের সহিত যোগ হইবে। সংরক্ষণের উদ্দেশ্য তখনই সফল হইবে যখন সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য আমদানি বন্ধ হইবে। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমদানির উপর যে কর বসান হয় তাহাকে 'সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক' (Protective Import Duty) বলে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান হইলে সে শুল্ক সবক্ষেত্রেই সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক হয় না। রাজস্ব আদায়ের জন্তও আমদানি শুল্ক বসান হয়। সেক্ষেত্রে আমদানি শুল্কের হার এত উচ্চ হয় না যাহাতে

আমদানি শুল্ক সর্বদা আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য নিজ দেশের শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক হয়। এই প্রকার আমদানি শুল্ককে 'রাজস্ব আমদানি শুল্ক' (Revenue Import Duty) বলা হয়। স্নেহ

কর, ভারত সরকারের রাজস্ব বাড়াইবার প্রয়োজন। আমদানি শুল্কোচ না করিয়াও ভারত সরকার আমদানি শুল্ক বসাইয়া রাজস্ব আদায় করিতে পারে। এক্ষেত্রে

উপরের উদাহরণে যে জাপানী কাপড়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যদি প্রতি গজে ১ টাকা হারে আমদানি শুদ্ধ বসান হয় তাহাতে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হরণ করা হইল না, অথচ সরকারের রাজস্ব আয়ের পথ হইল। স্বরণ রাখিতে হইবে যে রাজস্ব আমদানি শুদ্ধ যত অধিক কার্যকরী হইবে সংরক্ষণ ততই নিষ্ফল হইবে। কারণ রাজস্ব আমদানি শুদ্ধ অধিক আয় হওয়ার অর্থ অধিক আমদানি।

শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার একটি পন্থা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সংরক্ষণ দিতে হইলে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর আমদানি শুদ্ধ উচ্চহারে বসান, বাহাতে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য স্বদেশী অল্পরূপ দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক হয়।

দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র আমদানি শুদ্ধ বসাইয়া শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় না। সরকার অনেক সময়ে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ বরাদ্দ (Quota) করিয়া দেয়।

ফলে যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করার অধিকার দেওয়া হয় বরাদ্দ ও সংরক্ষণ

তাহার অধিক পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা যায় না। অনেক সময়ে একরূপ নির্দেশও দেওয়া হয় যে শিল্পে যে দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হইবে উহার এক স্থির অল্পপাত, মনে কর, শতকরা ৫০ ভাগ দেশীয় কাঁচামাল হইবে।

তৃতীয়ত, আমদানি শুদ্ধ না বসাইয়া বিদেশী দ্রব্য নিজে দেশের বাজার হইতে হটাইবার জন্য শিল্পকে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ব্যবসায়ীর যে লোকসান হয় উহা সবকাব সাহায্য হিসাবে দান

করে। এই নীতিকে বলা হয় সরকারের আর্থিক সহায়তা সরকারী সহায়তা

(Subsidy)। জাপানী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় যদি ভারতীয় কাপড় ২ টাকায় বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় অথচ ব্যবসায়ী উহা ৫ টাকার কমে বিক্রয় করিতে পারে না, তাহা হইলে প্রতি গজে ভারতীয় ব্যবসায়ী ৩ টাকা করিয়া লোকসান বহন করিতে বাধ্য হয়। আর্থিক সহায়তা (Subsidy) নিয়মে সরকারকে প্রতি গজে ৩ টাকা করিয়া সহায়তা দিতে হইবে।

সংরক্ষণের বোঝা (Burden of Protection) : সংরক্ষণমূলক আমদানি শুদ্ধেব তার বহন করে সন্তোগকারী (Consumer)। কারণ সংরক্ষণমূলক আমদানি শুদ্ধের ফলেই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য শুদ্ধ দেয় আমদানিকারক (Importer)। কিন্তু আমদানিকারক যখন সেই দ্রব্য বিক্রয় করে তখন ক্রেতার

নিকট হইতে উহা আদায় করে; কারণ আমদানিকারক

বিক্রয়কালে দ্রব্যের মূল মূল্যের সহিত আমদানি শুদ্ধ যোগ করিয়া থাকে। নচেৎ সেই শুদ্ধ তাহাকেই বহন করিতে হয়। এই কারণেই সন্তোগকারী কখনই আমদানি শুদ্ধের পক্ষপাতী নহে। কারণ আমদানি শুদ্ধ না থাকিলে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য থাকিলে সন্তোগকারী কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্য সংরক্ষণপন্থীর (Protagonist of Protection) যুক্তি এই যে ভবিষ্যৎ কালে দেশের আর্থিক উন্নতির পথ সহজ করার উদ্দেশ্যেই বর্তমানের দ্বৈত আমদানি শুদ্ধের ভার বহন করিয়া থাকে।

বাণিজ্য শুল্ক ও অন্তঃশুল্ক বা উৎপাদন শুল্ক (Customs and Excise Duty) : বাণিজ্য শুল্ক (Customs Duty) বলিতে আমদানি রপ্তানির উপর

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক যে শুল্ক বসান হয় তাহাকে বুঝায়। অর্থাৎ, আমদানির উপরে যে শুল্ক বসান হয় তাহাকে আমদানি শুল্ক (Import Duty) বলে ; আর রপ্তানির উপর শুল্ককে রপ্তানি শুল্ক (Export Duty) বলে।

আমদানির উপর শুল্ক বসাইবার উদ্দেশ্য উপরে আলোচনা করা হইল। রপ্তানি শুল্ক বসান হইলে যে দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান হয় বিদেশের বাজারে উহার মূল্য বাড়ে। ফলে রপ্তানি সংকোচ হয়। রপ্তানি সংকোচ হইলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থারগমেরও সংকোচ ঘটে। ইহা যদিও কোন সরকারেরই অভিপ্রেত নহে তথাপি অনেক সময়ে সরকার রপ্তানি শুল্ক বসাইতে বাধ্য হয়।

প্রধানত তিনটি কারণে রপ্তানি শুল্ক বসান হয়। প্রথমত, রপ্তানি দ্রব্যে যদি রপ্তানিকারক দেশের একচেটিয়া কারবার (monopoly) হয় তাহা হইলে সরকার

রাজস্ব আদায়েব জগু রপ্তানি শুল্ক বসাইতে পারে। প্রাক্ একচেটিয়া কারবার ও রপ্তানি শুল্ক স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষের পাট উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার ছিল, তাই তখন পাটের উপর উচ্চ হারে রপ্তানি শুল্ক বসান হইত।

দ্বিতীয়ত, রপ্তানি দ্রব্য যদি দেশের রক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক হয় (Strategic Materials) তাহা হইলেও সরকার রপ্তানি শুল্ক বসাইতে বাধ্য হয়, যাহাতে অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিদেশে চালান না হয়। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের পাট যাহাতে বিদেশে চলিয়া না যায় তজ্জগুও উচ্চ হারে রপ্তানি শুল্ক বসান হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, দেশের ঐতিহ্য বহনকারী কোনও প্রাচীন ও অতি দুর্লভ বস্তুনি মাস্তুল দ্রব্য (Antique) যাহাতে দেশের বাহিরে না যায় তাহার জগু কেবলমাত্র রপ্তানি শুল্কই বসান হয় না, সেই দ্রব্যের রপ্তানিই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

রপ্তানি শুল্ক বসাইতে কোন দেশের সরকারই ইচ্ছা করে না। কারণ রপ্তানি শুল্ক বসাইবার অর্থ বিদেশী শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া। মনে কর, ভারতবর্ষ চামড়াজাত দ্রব্যের

উপর রপ্তানি শুল্ক বসাইল। কিন্তু চামড়াজাত দ্রব্যে ভারতবর্ষের একচেটিয়া অধিকার (Monopoly Right) নাই। ফলে যে দেশে ভারতের চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি হইবে সেই দেশে ভারতীয় চামড়াজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী হইবে।

যে হারে রপ্তানি শুল্ক বসান হইবে, রপ্তানিকারক দেশে সেই হারেই রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে। সুতরাং বিদেশী কোনও রাষ্ট্রে সেই রাষ্ট্রের সরকার আমদানি শুল্ক বসাইলে সংরক্ষণের যে ফল পাইত সেই ফল রপ্তানি শুল্ক হইতেই পাইল।

অন্তঃশুল্ক অথবা উৎপাদন শুল্ক (Excise Duty) : নিজ দেশের শিল্পে

উৎপাদিত দ্রব্যের উপর যদি দেশীয় সরকার কর বা শুল্ক বসায় তবে তাহাকে বলে অন্তঃশুল্ক বা উৎপাদন শুল্ক। যেমন, কাপড়, চিনি, কাগজ, দিয়ারশুই প্রভৃতি যাহা ভারতবর্ষে উৎপাদন হয় তাহার উপরও

অন্তঃশুল্ক

ভারত সরকার শুদ্ধ বসাইয়া থাকে। উহাকেই অন্তঃশুদ্ধ বা উৎপাদন শুদ্ধ (Excise duty) বলে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আবগারী শুদ্ধ ব্রহ্মাইতে Excise Duty কথাটির প্রয়োগ হয়। তবে আবগারী শুদ্ধ ও অন্তঃশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আবগারী শুদ্ধ বসান হয় মাদক দ্রব্যের উপর—যেমন মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ, তামাক ইত্যাদি। আর অন্তঃশুদ্ধ বসান হয় অগ্ন্যাত্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উপর। আবগারী শুদ্ধ নাগরিকের স্বাস্থ্যের জন্য মাদক দ্রব্যের সন্তোষ (Consumption) কমাইবার জন্য প্রয়োগ হয়। কিন্তু অন্তঃশুদ্ধ বসান হয় নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর। অন্তঃশুদ্ধ পরোক্ষ করের একটি (Indirect Tax) প্রধান উদাহরণ। আবগারী শুদ্ধ বসায় রাজ্য সরকার (State Government) আর অন্তঃশুদ্ধ বসায় কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government)।

বাণিজ্য শুদ্ধ ও অন্তঃশুদ্ধের প্রকার (Different kinds of Customs and Excise Duty): আমদানি রপ্তানি শুদ্ধ ও অন্তঃশুদ্ধ উভয়ই দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রথম, মূল্যানুসার (Advalorem), দ্বিতীয়, পরিমাণানুসার (Specific)।

মূল্যানুসার শুদ্ধ (Advalorem Duty): কোন দ্রব্যের মূল্যের শতকরা হারে যদি শুদ্ধ বসান হয় তবে তাহাকে মূল্যানুসার শুদ্ধ (Advalorem Duty) বলে। যেমন ভারতে গ্রেটব্রিটেন হইতে যে মোটর গাড়ী আমদানি করা হয়, যদি প্রতি মোটর গাড়ীর উপর মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা হারে আমদানি শুদ্ধ দিতে হয় তবে উহা মূল্যানুসার আমদানি শুদ্ধ। কিন্তু মূল্য নিরপেক্ষ প্রতি মোটর গাড়ীর উপর যদি ১৫০০ টাকা আমদানি শুদ্ধ দিতে হয় তাহা হইলে উহা হইবে পরিমাণানুসার আমদানি শুদ্ধ। অর্থাৎ, মূল্যানুসার শুদ্ধে মূল্যের উপর শুদ্ধ হিসাব করা হয় আর পরিমাণানুসার শুদ্ধে প্রতিটি এককের উপর শুদ্ধের হিসাব করা হয়।

অন্তঃশুদ্ধ বা উৎপাদন শুদ্ধও অল্পরূপভাবে মূল্যানুসার এবং পরিমাণানুসার হইতে পারে। ভারতে তৈয়ারী কাপড়ের উপর যদি প্রতি টাকায় ৫ নয়া পয়সা হিসাবে শুদ্ধ বসান হয় তাহা হইলে বলা হইবে শতকরা ৫ টাকা মূল্যানুসার অন্তঃশুদ্ধ (5% Advalorem Excise Duty) কিন্তু যদি প্রতি গজ কাপড়ের উপর ৫ নয়া পয়সা হিসাবে কর বসান হয় তাহা হইলে উহাকে বলা হইবে পরিমাণানুসার অন্তঃশুদ্ধ (Specific Excise Duty)।

বাণিজ্য শুদ্ধ আদায় (Collection of Customs Duty): রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজে মাল পুতি হইলে জাহাজের অধ্যক্ষকে কি কি মাল বিদেশে বহন করার জন্য জাহাজে তোলা হইল তাহার বিশদ বিবরণ শুদ্ধ বাণিজ্য শুদ্ধ আদায় অফিসে দাখিল করিতে হয়। অল্পরূপভাবে প্রত্যেক রপ্তানিকারককেও কি কি দ্রব্য তিনি রপ্তানি করিলেন তাহার বিশদ বিবরণ শুদ্ধ অফিসে দাখিল করিতে হয়। যে প্রপত্রে উক্ত বিবরণ দাখিল করিতে হয় তাহাকে বলে শুদ্ধ

প্রবিষ্টি (Customs Entries)। শুদ্ধ প্রাধিকার উক্ত বিবরণ দৃষ্টে যে রপ্তানি
 শ্রবের উপর শুদ্ধ আদায় করিতে হইবে, সেই শ্রব প্রেরকের
 শুদ্ধ প্রবিষ্টি নিকট হইতে রপ্তানি শুদ্ধ আদায় করে। কিন্তু কোনও শ্রব
 পুনরপ্তানির জন্য আনয়ন করা হইলে এবং সেই শ্রবের উপর আমদানি শুদ্ধ
 দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা পুনরপ্তানিকালে রপ্তানি শুদ্ধ দিতে হয় না। আবার
 কোনও শ্রবের উপর অন্তঃশুদ্ধ আদায় দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা রপ্তানি করা হইলেও
 অন্তঃশুদ্ধ দিতে হয় না। এই স্বযোগ লইতে হইলে রপ্তানিকারককে একটি
 ঘোষণাপত্রে সহি করিতে হয়। বিবরণ পত্রে মালের যে বিবরণ দেওয়া হয়
 শুদ্ধ কর্তৃপক্ষকে উহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। সেইজন্য জেটি সরকার
 নিজেই ঐ বিবরণপত্রটি পূরণ করিয়া দেন।

আমদানি শুদ্ধ আদায়ের বেলায়ও আমদানিকারককে অহরূপভাবে প্রবিষ্টি
 ঘোষণার উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন মালবাহী জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে পর
 ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের অধ্যক্ষকে একটি বিবরণ দিতে হয়।
 জাহাজের বিবৃতি উহাতে জাহাজের নাম, অধ্যক্ষের নাম, খালানী ও লস্কর সংখ্যা,
 কত ওজনের জাহাজ, জাহাজে বহিত সমস্ত মালের বিবরণ, কোন্ কোন্ বন্দর হইতে
 মাল বোঝাই করা হইয়াছে, মালগ্রাপকের (আমদানিকারকের) নাম ঠিকানা
 ইত্যাদি সকল শুধ্য থাকে। উহাকে বলে জাহাজের বিবৃতি (Ship's Report)।

জাহাজের অধ্যক্ষ যেমন বিবৃতি দেন অহরূপভাবে প্রত্যেক আমদানিকারককেও
 একখানি করিয়া বিবৃতি দিতে হয়। উহাতে তিনি যে মাল ঐ জাহাজে আমদানি
 করিয়াছেন তাহার পরিমাণ, ওজন, কোন্ দেশ হইতে আমদানি
 করা হইল, উহা স্বদেশে ব্যবহারের জন্য কিংবা পুনরপ্তানির জন্য,
 মাল শুদ্ধাবীন কিনা ইত্যাদি তথ্য থাকে। উহাকে বলে
 প্রবিষ্টি (Entry)। শুদ্ধ কর্তৃপক্ষ দুইখানি বিবৃতির সহিত মিলাইয়া উভয়ের বিবৃতি
 মিলিলেই মাল খালাসের নির্দেশ দিতে পারে। তবে খালাসের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে
 শুদ্ধ অফিস হইতে শুদ্ধ আদায় করিবে অবশ্য যদি আমদানিকৃত শ্রব শুদ্ধাবীন হয়।

আমদানি শুদ্ধ আদায়ের জন্য শুদ্ধ অফিস যে দলিলের সাহায্য গ্রহণ করে উহা
 হইতেছে বাণিজ্যদূতের চালান (Consular Invoice)। প্রায় প্রত্যেক দেশেরই
 প্রতিনিধি বিদেশে থাকেন। সেই প্রতিনিধির অস্তিত্ব কর্তব্যের মধ্যে যে দেশে
 তাহার অফিস সেই দেশে নিজ দেশের বাণিজ্য স্বার্থ (Trade
 Interest) রক্ষা করা একটি। যখন কোনও শ্রব বিদেশ হইতে
 আমদানি করা হয় তখন রপ্তানিকারকের দেশে আমদানিকারী দেশের যে প্রতিনিধি
 থাকেন তাহার নিকট হইতে মালের প্রমাণপত্র (Certificate) না পাইলে মাল
 খালাস করিতে দেয় না। বাণিজ্যদূত পৃথক করিয়া কোনও প্রমাণপত্র দেন না।
 রপ্তানিকারক মাল প্রেরণের চালান এবং আবশ্যক হইলে মালও বাণিজ্যদূতের
 কাৰ্যালয়ে উপস্থিত করেন। বাণিজ্যদূত চালানে বর্ণিত মালের সত্যতা প্রমাণ করিয়া
 ঐ চালানেই সহি করিয়া দেন। এইজন্য ঐ প্রকার চালানকে বাণিজ্যদূতের চালান

(Consular Invoice) বলে। চালানে মালের যে মূল্য দেখান হয় উহা বিনা মাণ্ডলে জাহাজে অথবা নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত বিনা মাণ্ডলে (Free on Board-সংক্ষিপ্ত ভাষায় F. O. B.) মূল্য দেখান হয় এবং জাহাজের মাণ্ডল পৃথকভাবে দেখান হয়। বাণিজ্যদূতের চালানে দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য বাণিজ্যদূত কর্তৃক প্রমাণিত বলিয়া ঐ চালানদুট্টেই আমদানি শুদ্ধ আদায় করা হয়। অনেক রাষ্ট্রেই এই নিয়ম বলবৎ আছে যে বাণিজ্যদূত কর্তৃক প্রমাণিত চালান (Consular Invoice) দাখিল করিতে না পারিলে রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আমদানিকৃত মাল নামাইতে দেওয়া হয় না।

নিম্ন দেশে মাল পৌঁছিলে আমদানিকারক যদি আমদানি শুদ্ধ দিতে অপারগ হন তাহা হইলে তিনি শুদ্ধাধীন পণ্যাগারের (Bonded Warehouse) সাহায্য লইতে পারেন।

যে গুদামঘরের (পণ্যাগার) মালিক সরকারের সহিত এমন চুক্তিবদ্ধ থাকেন যে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর দেয়-শুদ্ধ আদায় সাপেক্ষ তিনি সেই দ্রব্য তাহার পণ্যাগারে রাখিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমদানি শুদ্ধ আদায়ের রসিদ না দেখাইতে পারিবেন ততক্ষণ মাল খালাস দিবেন না তাহাকেই শুদ্ধাধীন পণ্যাগার (Bonded Warehouse) বলে।

শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে মাল রাখা হইলে পণ্যাগারের মালিক যাবৎকাল আমদানি শুদ্ধ আদায় না হইবে তাবৎকাল আমদানিকৃত মাল সেই পণ্যাগারে রাখিবেন। অবশ্য সেজন্য আমদানিকারককে শুদ্ধাধীন পণ্যাগারের মালিককে মাণ্ডল দিতে হইবে। শুদ্ধাধীন পণ্যাগারের মালিক সরকারের সহিত এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকেন বলিয়াই শুদ্ধ অফিস হইতে আমদানিকারক শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে মাল তুলিলে শুদ্ধ প্রাধিকারের কোনও আপত্তি থাকে না। শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে রাখিলেও আমদানিকারক মালের গুণন করণ, গুণবিভাগ করণ (Grading), নমুনা করণ (Sampling) ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে দ্রব্য থাকা কালে দ্রব্য বিক্রয় পর্যন্তও করিতে পারেন। তবে বিক্রয় মাত্র একটি সর্তেই হইবে যে ক্রেতা শুদ্ধাধীন পণ্যাগার হইতে মাল নেওয়ার পূর্বে আমদানি শুদ্ধ আদায় দিবেন। সুতরাং আমদানিকারকের পক্ষে শুদ্ধাধীন পণ্যাগার অনেক উপকারদায়ক। কারণ আমদানিকারককে যে কোনও পণ্যাগারে মাল রাখিতে হইলেই তাহাকে মাণ্ডল দিতে হইত কিন্তু তাহার পূর্বে আমদানি শুদ্ধ পরিশোধ করিতে হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে আমদানি শুদ্ধ বাবদ দেয় অর্থ নিজে বহন না করিয়া এবং অথবা মূলধন আটকাইয়া না রাখিয়া পারিলেন, কারণ আমদানি শুদ্ধ ক্রেতাই শোধ করিতেছেন। আবার ইচ্ছা করিলে আমদানিকারক আনুপাতিক আমদানি শুদ্ধ শোধ করিয়া শুদ্ধাধীন পণ্যাগার হইতে মালের আংশিক বিলিও (Partial Delivery) লইতে পারেন। মনে কর, আমদানি শুদ্ধ যদি ৫০০০ টাকা দিতে হয় এবং তিনি যদি ১২৫০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি আমদানিকৃত মালের এক-চতুর্থাংশের বিলি লইতে পারেন।

আদায়ীকৃত শুদ্ধ ফেরত (Drawback is Refund of Duty already paid) : আমদানি শুদ্ধ পরিশোধ করা হইলে অথবা অন্তঃশুদ্ধ আদায় দেওয়া হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে শুদ্ধ ফেরত পাওয়া যায়।

আমদানিকারক শুদ্ধাধীন কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া তাহার যে অংশ পুনরায় বিদেশে রপ্তানি করে সেই রপ্তানি দ্রব্যের উপর যে আমদানি শুদ্ধ দেওয়া হইয়াছে উহা ফেরত পাইয়া থাকে। আবার আমদানিকৃত কাঁচামাল যদি শুদ্ধাধীন হয় এবং সেই কাঁচামাল হইতে যে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য যদি রপ্তানি করা হয় তাহা হইলেও আমদানিকৃত কাঁচামালের যে অংশ শিল্পজাত রপ্তানির জন্য ব্যবহার হইয়াছে তাহার উপর প্রদত্ত আমদানি শুদ্ধও ফেরত পাওয়া যায়। ইহাকে ফেরত বাণিজ্য শুদ্ধ (Customs Drawback) বলে।

আবার অন্তঃশুদ্ধও ফেরত পাওয়া যায়। দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বাহার উপর অন্তঃশুদ্ধ আদায় দেওয়া হইয়াছে উহা যদি রপ্তানি করা হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্যের উপর প্রদত্ত অন্তঃশুদ্ধ ফেরত দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় ফেরত অন্তঃশুদ্ধ (Excise Drawback)।

আদায়ীকৃত শুদ্ধ ফেরত দেওয়ার কারণ এই যে শুদ্ধ রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের সহিত যোগ হইয়া বিদেশের বাজারে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং ফলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান কষ্ট হয়। সুতরাং যাহাতে শুদ্ধ প্রয়োগের ফলে রপ্তানি হ্রাস পাইয়া বৈদেশিক মুদ্রা আসে অশ্রুবিধা না হয় সেইজন্যই ফেরত শুদ্ধের (Drawback) ব্যবস্থা।

ফেরত শুদ্ধের উদাহরণ : ফেরত আমদানি শুদ্ধ (Customs Drawback)-মনে কর, ভারতবর্ষ তিব্বত হইতে পশম আমদানি করে। পশমের উপর পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা হিসাবে আমদানি শুদ্ধ দেওয়া হইয়াছে। মোট ১০০০ পাউণ্ড উল আমদানি হইয়াছে, এবং ১০০০ টাকা আমদানি শুদ্ধ দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতে ২০০ পাউণ্ড পশম সিংহলে পুনরপ্তানি করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে যদি ঐ ২০০ পাউণ্ডের উপর আদায়ীকৃত আমদানি শুদ্ধ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে সিংহলের বাজারে ঐ পশমের মূল্য ১ টাকা বেশী হইবে। ফলে সিংহল ভারতের নিকট হইতে পশম আমদানি করিবে না। অথবা মনে কর, তিব্বত হইতে আমদানিকৃত পশম হইতে পশম দ্রব্য উৎপন্ন হইল এবং সেই পশম-বস্ত্রাদি সিংহলে রপ্তানি হইল। যদি আমদানি শুদ্ধ (পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা) ফেরত দেওয়া না হয় তাহা

হইলে প্রতি পাউণ্ড পশম হইতে যে পশম-বস্ত্র উৎপাদন হইবে আমদানি রপ্তানি শুদ্ধ তাহার মূল্য ১ টাকা করিয়া বাড়িয়া যাইবে। সেক্ষেত্রেও ফেরতের উদাহরণ

বাহিরের বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ধ্বংস হয়। এই কারণেই আমদানি শুদ্ধাধীন কোনও দ্রব্য আমদানি করিয়া সেই দ্রব্যই পুনরপ্তানি করিলে অথবা সেই দ্রব্য হইতে উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিলে সেই

রপ্তানির উপর আমদানিকৃত শুদ্ধ ফেরত পাইয়া থাকে। তাহা হইলে ২০০ পাউণ্ড পশমের উপর প্রদত্ত ২০০ টাকা আমদানি শুদ্ধ ভারতের ব্যবসায়ী শুদ্ধ অফিস হইতে ফেরত পাইবে।

অল্পরূপভাবেই অন্তঃশুদ্ধ ফেরত পাওয়া যায়। মনে কর, একটি কাপড়ের কলে ২৫০০০ গজ সূতীবস্ত্র উৎপাদন হইল। গজ প্রতি ৫ নয়া পয়সা অন্তঃশুদ্ধ বা উৎপাদন শুদ্ধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ২৫০০০ গজ সূতীবস্ত্র হইতে ১০০০০ গজ সূতীবস্ত্র কেনিয়ায়

অন্তঃশুদ্ধ ফেরতের
উদাহরণ

(Kenya) রপ্তানি করা হইয়াছে। যদি ঐ ১০০০০ গজ সূতী বস্ত্রের উপর আদায়ীকৃত অন্তঃশুদ্ধ ফেরত দেওয়া না হয় তাহা হইলে কেনিয়ায় (Kenya) ভারতীয় সূতীবস্ত্রের মূল্য গজ প্রতি

৫ নয়া পয়সা বাড়িয়া গেল। ফলে ভারত হইতে কেনিয়ায় সূতীবস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেলে কেনিয়া হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানি করিতে ভারতবর্ষের অসুবিধা হইবে। সুতরাং ব্যবসায়ী ২৫০০০ গজ সূতীবস্ত্রের মধ্যে ১০০০০ গজ সূতীবস্ত্রের উপর গজ প্রতি ৫ নয়া পয়সা হিসাবে অন্তঃশুদ্ধ ফেরত পাইবে।

আমদানি শুদ্ধ এবং অন্তঃশুদ্ধ ফেরত পাইতে হইলে রপ্তানিকারককে একটি বিবৃতি দিতে হয়। ঐ বিবৃতিকে বলে শুদ্ধ ফেরত ঘোষণা (Debenture)। ঐ বিবৃতিতে রপ্তানিকারককে ঘোষণা করিতে হয় যে শুদ্ধাধীন দ্রব্য শুদ্ধ ফেরত ঘোষণাপত্র বিদেশে রপ্তানি করা হইল। শুদ্ধ অফিস হইতে "রপ্তানিকারকের বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া একখানি প্রমাণপত্র (Certificate) দিয়া থাকে। ঐ প্রমাণপত্রের বলেই রপ্তানিকারক শুদ্ধ ফেরত লয়। উহাকে বলে মাগুল ফেরতের প্রমাণপত্র।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদি শুদ্ধাধীন আমদানি দ্রব্য শুদ্ধাধীন পণ্যগারে রাখা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশে রপ্তানি হয় তাহা হইলে সেই দ্রব্যের উপর আদৌ শুদ্ধ আদায় দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে কয়েকটি স্বাধীন বা অবাধ বন্দর (Free Port) আছে যেখানে বিনা শুদ্ধে যে কোন দ্রব্য স্বাধীন বন্দর আমদানি করা যায়। সেই সকল বন্দরে আমদানিকৃত দ্রব্য বিনা বাধায় নামাইয়া বিক্রয় করা যায় অথবা অল্প রপ্তানি করা যায় এবং সেই রপ্তানি দ্রব্যের উপর কোন শুদ্ধ দেওয়া অথবা ফেরত লওয়ার প্রসঙ্গ উঠে না। অবাধ বন্দরের সংখ্যা খুবই কম। হংকং (Hongkong), কোপেনহেগেন (Copenhagen) অবাধ বন্দরের উদাহরণ।

বিদেশে সস্তায় মাল বিক্রয় (Dumping) : বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেক সময়ে দেখা যায় যে, স্বদেশে কোনও দ্রব্যের উৎপাদন খুবই অধিক হইলে অথবা বিদেশের বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly) প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে বিক্রয়মূল্যের কম মূল্যে বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। উহাকেই বলা হয় বিদেশে সস্তায় মাল বিক্রয় (Dumping)। বিক্রয়মূল্যের কম মূল্যে বিদেশে বিক্রয় করিলে ব্যবসায়ীর যে ক্ষতি হয় উহা স্বদেশের সন্তোগকারীদের (Home

Consumers) নিকট হইতে আদায় হয়। ইহাতে একই দ্রব্যের মূল্য স্বদেশে উচ্চ, বিদেশে সস্তা। সস্তায় মাল বিক্রয়ের (Dumping) চেষ্টা অধিক হয় মন্দা বাজারে (Period of Depression)। কারণ মন্দা বাজারে দ্রব্যের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা থাকে কম।

একটি উদাহরণ সাহায্যে বিদেশে সস্তায় মাল বিক্রয়ের (Dumping) পদ্ধতি বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। মনে কর, জাপান পাইলট (Pilot) মার্ক ফাউন্টেন পেন ভারতবর্ষে সস্তায় বিক্রয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করিবে। জাপানে উহার বিক্রয়মূল্য ১৫ টাকা। ভারতবর্ষের বাজারে ঐ কলমের একচেটিয়া অধিকার লাভ করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ঐ দ্রব্য ৫ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহা হইলে প্রতিটি কলমে ১০ টাকা করিয়া ব্যবসায়ীকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। সেই লোকসান প্রকৃতপক্ষে জাপানবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে। অর্থাৎ, জাপানে ঐ কলমের মূল্য হইবে হয়ত ২৫ টাকা।

কোনও দেশের সরকারই উপরি-উক্ত উপায়ে নিজ দেশে বিদেশী ব্যবসায়ী একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করিবে তাহা বরদাস্ত করিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানি দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসান হয়। আমদানি শুল্কের হার সাধারণত যে দেশ সস্তায় দ্রব্য বিক্রয়ের পন্থা গ্রহণ করে সেই দেশে দ্রব্যটির চলতি মূল্য এবং নিজ দেশে যে মূল্যে বিক্রয় করা হয় উভয়ের ব্যবধানের সমান হয়। অর্থাৎ, জাপানে যদি ২৫ টাকা মূল্য হয় এবং ভারতে যদি ১০ টাকায় বিক্রয় হয় তাহা হইলে আমদানি শুল্ক হইবে ২৫—১০=১৫ টাকা। এই প্রকার আমদানি শুল্কে বলা হয় ‘বিদেশে কম মূল্যে দ্রব্য চালান বিরোধী কর’ (Anti-Dumping Duty)।

সমকারী কর বা প্রতিবন্ধক (Countervailing Duty) : আমদানি শুল্ক আরোপ করার ফলে বিদেশী মালের দাম বাড়িয়া যায় এবং দেশের বাজারে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান কষ্ট হয় ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে কর না বসাইয়া যদি রাজস্ব আদায়ের জন্ত শুল্ক (Revenue Duty) বসান হয় তাহা হইলে বিদেশী দ্রব্যের দাম এবং দেশী দ্রব্যের দাম যাহাতে একই হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ, বিদেশী মালকে দেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার দেওয়া হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে বিদেশী মালের উপর যে আমদানি শুল্ক বসান হয় তাহার ফলে যাহাতে দেশী মালের তুলনায় বিদেশী মালের দাম না বাড়ে

সেজন্ত দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর কর বসান হয়। মনে কর, জাপান হইতে যে কাপড় আমদানি করা হইবে উহার উপর প্রতি গজে ৫ নয়া পয়সা হারে আমদানি শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু ভারতে তৈয়ারী অতরূপ দ্রব্যের উপরও যদি ৫ নয়া পয়সা হারে শুল্ক বসান হয় তাহা হইলে উহাকে সমকারী কর বা প্রতিবন্ধক (Countervailing Duty) বলে। ইহার ফলে

বিদেশী এবং দেশী দ্রব্যের কেহই কোন আপেক্ষিক স্বার্থ পায় না অর্থাৎ, অবাধ বাণিজ্যের নীতিই অনুসরণ করা হয়। ভারতবর্ষে ১৮৯৪ সালে

স্বতীব্যবসায় উপর প্রতিকর অন্তঃকৃত (Countervailing Excise Duty) বসান হইয়াছিল। প্রতিকর আবার আমদানি শুদ্ধ হইতে পারে। স্বদেশের শিল্প জব্যের মূল্য বিদেশী জব্যের মূল্যের বেশী হইলে দেশের বাজারে বাহাতে উভয় জব্যের মূল্য সমান হয় তাহার জন্য উভয় দেশের মূল্যের ব্যবধান পরিমিত আমদানি শুদ্ধ বসান হয়। উহাতেও বিদেশী শিল্প প্রতিযোগিতা করিতে পারে। ভারতবর্ষে জাভা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানিকৃত চিনির উপর এইভাবে প্রতিকর বা সমকারী আমদানি শুদ্ধ (Countervailing Import Duty) বসান হইয়াছিল।

বাণিজ্য উদ্ভূত ও আদান প্রদান সমতা (Balance of Trade and Balance of Payments) : বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের আমদানির মূল্য ও রপ্তানি মূল্যের ব্যবধানকে বাণিজ্য উদ্ভূত বলা হয়। কিন্তু বাণিজ্য উদ্ভূত হইতে কোনও দেশ ঋণী কিংবা পাওনাদার তাহা প্রকৃত পক্ষে স্থির করা যায় না। অমূল্য বাণিজ্য উদ্ভূত কারণ বাণিজ্য উদ্ভূত (Balance of Trade) আমদানি মূল্য ও রপ্তানি মূল্য হইতে পাওয়া যায়। যেমন ভারতবর্ষ হইতে চা, চামড়া, কাপড়, চিনি ইত্যাদি রপ্তানি হইল আর ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি, খাত্তশস্ত্র ইত্যাদি আমদানি হইল। রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের ব্যবধানই বাণিজ্য উদ্ভূত। দেশে যত দ্রব্য আমদানি হয় এবং দেশ হইতে যত দ্রব্য বিদেশে চালান হয় উহার হিসাব শুদ্ধ অফিসে থাকে। শুদ্ধ অফিসের হিসাব হইতেই দেশের বাণিজ্য উদ্ভূত অমূল্য প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ভূত (Favourable) কিংবা প্রতিকূল (Unfavourable) তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেশের আমদানি রপ্তানিকে বলা হয় দৃশ্য বৈদেশিক বাণিজ্য (Visible Foreign Trade)। ভারতবর্ষ হইতে ১৯৫৯ সালে ৬২৬ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে আর ভারতে ৮৬৯ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। সুতরাং ভারতের ২৪৩ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ভূত (Unfavourable Balance of Trade)।

কিন্তু উহাই কি ভারতের মোট দেনা? ভারতের মোট দেনা উহার অনেক বেশী। তাহার কারণ এই যে দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি ব্যতীত প্রত্যেক দেশেরই অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানি (Invisible Exports and Invisible Imports) থাকে। শুদ্ধ অফিসে যে আমদানি রপ্তানির মূল্যের হিসাব হয় না উহাই অদৃশ্য আমদানি রপ্তানি। অথচ অদৃশ্য আমদানির জন্য বিদেশীয়দের অর্থ প্রদান করিতে হয় এবং অদৃশ্য রপ্তানির জন্য বিদেশীয়দের নিকট হইতে অর্থ পাওনা হয়।

তোমরা জান যে ভারতবর্ষে বহু বৈদেশিক কর্মচারী আছেন যাহাদের বেতন ভারত সরকার অথবা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বহন করিতে হয়। যেমন দুর্গাপুর লৌহ ইস্পাত কারখানায় যে সকল বৃটিশ কর্মচারী আছেন তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণই কি তাহারা ভারতবর্ষে ব্যয় করেন? করেন না—আরেক একাংশ তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য বৃটেনে পাঠাইতে হয়। যদি প্রতি

বৎসর ৫ কোটি টাকা এই বাবদে গ্রেট ব্রুটেনে পাঠাইতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে ৫ কোটি টাকা মূল্যের অর্থ বিদেশে চলিয়া গেল। এই ৫ কোটি টাকা মূল্যের অর্থ বাহিরে যাওয়া আর ৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য ব্রুটেন হইতে আমদানি করায় মধ্যে পার্থক্য কি? ৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করিলেও দেশ হইতে অর্থ বাহিরে যাইবে আর ব্রুটেনের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের অংশ ব্রুটেনে পাঠাইলেও ভারত হইতেই অর্থ ব্রুটেনে গেল। সুতরাং নীট ফল ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রুটেনের নিকট ৫ কোটি টাকা ঋণী। অল্পরূপভাবে ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে কোটি কোটি টাকা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত (Development Plans) ঋণ করিতেছে সেই ঋণের উপর ভারতবর্ষকে যে ক্ষুদ্র দিতে হয় তাহাও বিদেশে চলিয়া যাইবে। এক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ ঋণী। এই প্রকার নানাবিধ ব্যয় রহিয়াছে যাহার জন্ত দেশ দৃশ্যত কোন সম্পদ পায় না কিন্তু দেশ হইতে বিদেশে অর্থ চালান হয়। উহাকেই বলা হয় অদৃশ্য আমদানি।

• অদৃশ্য আমদানির মতই অদৃশ্য রপ্তানি আছে। ভারতবর্ষের নিকট বাহ্য অদৃশ্য আমদানি (Invisible Imports) যে সকল দেশের নিকট হইতে উপকার পাওয়ার জন্ত অদৃশ্য আমদানির মূল্য পরিশোধ করিতে হয় সেই সকল অদৃশ্য রপ্তানি দেশের পক্ষে উহাই অদৃশ্য রপ্তানি। সুতরাং অদৃশ্য আমদানি রপ্তানি যে সকল উপাদান লইয়া গঠিত উহা বিদেশীয়দের নিকট হইতে সেবা গ্রহণের মূল্য (Price for services); নিজ দেশে বিদেশীয়গণ ব্যবসায় করিলে সেই ব্যবসায় হইতে লাভ, বিদেশী ঋণের সুদ; বিদেশীয়গণ পরিভ্রমণে আসিলে বা বিদেশে পরিভ্রমণে গেলে উহার বাবদ যে ব্যয় হয়, বিদেশে ছাত্রছাত্রীগণের পঠনের ব্যয় ইত্যাদি।

সুতরাং কোনও দেশ ঋণী (Debtor) কিংবা পাওনাদার (Creditor) তাহা স্থির হইবে দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানি রপ্তানি সংতুলন হইলে (Balance)। এইজন্যই দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানি আমদানির ফলে কোনও দেশের ঋণ বা পাওনা সাব্যস্ত হইলে উহাকে বলে আদান প্রদান সমতা (Balance of Payments)। আদান প্রদান সমতা বাণিজ্য উদ্ভূত (Balance of Trade) ও আদান প্রদান সমতা (Balance of Payments) দ্বন্ধিতে নিম্নোক্ত দুইটি সমীকরণ সাহায্য করিবে।

বাণিজ্য উদ্ভূত = (দৃশ্য আমদানি—দৃশ্য রপ্তানি)।
(Balance of Trade) = (Visible Imports—Visible Exports)
আদান প্রদান সমতা = (দৃশ্য আমদানি+অদৃশ্য আমদানি)—
(দৃশ্য রপ্তানি+অদৃশ্য রপ্তানি)
(Balance of Payments) = (Visible Imports+Invisible Imports)—
(Visible Exports+Invisible Exports)।

দৃশ্য আমদানির মূল্য দৃশ্য রপ্তানি মূল্যের কম হইলে অমঙ্গল বাণিজ্য উদ্ভূত (Favourable Balance of Trade) আর দৃশ্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা দৃশ্য

রপ্তানির মূল্য অধিক হইলে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ভূত (Unfavourable
অমুকূল আদান প্রদান সমতা) মোট মূল্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট আমদানির
প্রতিকূল আদান প্রদান সমতা (Unfavourable Balance of
Payments) আর কম হইলে অমুকূল আদান প্রদান সমতা
(Favourable Balance of Payments)।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে দ্বিতীয়
মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্য উদ্ভূত ছিল অমুকূল কিন্তু আদান প্রদান
সমতা ছিল প্রতিকূল। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের বাণিজ্য উদ্ভূত এবং আদান
প্রদান সমতা উভয়ই প্রতিকূল।

ভারত বিভাগের ফলে খাণ্ডশস্ত্র, শিল্প কঁচামালের ঘাটতি পূরণ করার জন্ত;
উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করার জন্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আমদানি বাড়িয়া গিয়াছে।
কলে প্রাক-যুদ্ধ কালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে যে স্থযোগ ছিল তাহা
আদান প্রদান সমতার
উদাহরণ অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে। তবে স্বথের বিষয়, ভারতবর্ষ এখন
আর কেবল কঁচামালই রপ্তানি করে না ভারত এখন শিল্প
প্রযুক্তি রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সূতীবস্ত্র, লোহা-লকড়, চিনি, চামড়ার
প্রভৃতি ইত্যাদি ভারতের প্রধান শিল্প রপ্তানি।

Exercises

1. What are the chief arguments in favour of (a) Free Trade ; (b) Protection ?

(ক) অবাধ বাণিজ্য ও (খ) সংরক্ষণের বিশেষ যুক্তি কি ?

2. Distinguish between (a) Customs and Excise duties ,
(b) Advalorem and Specific duties ;
(c) Protective and Revenue duties.

পার্থক্য নির্দেশ কর : (ক) বাণিজ্য শুল্ক ও অন্তঃশুল্ক ;
(খ) মূল্যানুসার ও পরিমাণানুসার শুল্ক ;
(গ) সংরক্ষণ শুল্ক ও রাজস্ব শুল্ক।

3. What is meant by Invisible Trade ? Give examples.

অদৃষ্ট বাণিজ্য কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

4. Distinguish between Balance of Trade and Balance of Payments.

বাণিজ্য উদ্ভূত ও আদান প্রদান সমতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

5. Explain Bonded Warehouse. What are its uses ?

শুল্কবান্ধ গণ্যাগার কি ? উহার আবশ্যিকতা কি ?

6. What is 'Drawback' ? How does Drawback work in connection with Customs Duties and Excise Duties ?

কেন্দ্র শুল্ক কি ? কেন্দ্র শুল্ক কি পদ্ধতিতে কার্যকরী করা যায় ?

7. What is understood by Comparative Cost ? Give Example.

আপেক্ষিক ব্যয় বলিতে কি বুঝায় ? উদাহরণ দাও।

8. What is Countervailing Duties ? Give Example.

পক্ষকারী কর কাকে বলে ? উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

অন্বোদশ অধ্যায়

রপ্তানি এবং আমদানি

(Exporting and Importing)

রপ্তানি ব্যবসায় (Exporting) : বাজার সমীক্ষা (Market Research)—

কোনও উৎপাদক বিদেশের বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য মধ্যগ বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সাহায্য লইতে পারে কিংবা নিজ প্রচেষ্টায়ও বিদেশে দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা কবিতে পারে। মধ্যগগণের সাহায্যে বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করার সুবিধা এই যে মধ্যগগণ বাজারের অবস্থা সমীক্ষা করিয়া রপ্তানিকারক কোন বাজার সমীক্ষা দ্রব্য রপ্তানি করিবে তাহা জানাইয়া দেয়। কিন্তু নিজ প্রচেষ্টায় বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে বিদেশে বাজারের (অর্থাৎ চাহিদা ও ঘোগানের) অবস্থা সমীক্ষা করিতে হয়। উহাকেই বলা হয় বাজার সমীক্ষা (Market Research)। কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলায়ই যে বাজার সমীক্ষার প্রয়োজন তাহা নহে, স্বদেশের বাজারের অবস্থাও সমীক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

বাজার সমীক্ষার প্রায় প্রত্যেক দেশের সরকারই দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা পছন্দ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন ভারত সরকারের ব্যবসায় (Trade) পত্রিকাষ ভারতবর্ষের ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যায়। অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য দপ্তর হইতেও আবশ্যিকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্য-দূতের কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে, কিংবা নিজ দেশের ব্যাকের বিদেশস্থ শাখা অফিসসমূহের মাধ্যমে উহার মতে বিদেশের বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিববাহল করিতে পারে। বণিক সভা (Chamber of Commerce) বা বাণিজ্য সমিতির মাধ্যমেও বিদেশের বাজারের অবস্থা জানিতে পারা যায়; নতুবা, বণিক সভা বিদেশে প্রতিনিধি পাঠাইয়া বিদেশের বাজারের অবস্থা সমীক্ষা করা যায়।

বিদেশের বাজারের অবস্থা সমীক্ষা (Research) করার প্রয়োজনীয়তা দিন দিনই

অধিকতর হইতেছে। কারণ বিদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, বাজার সমীক্ষার শিল্পোন্নতির অবস্থা ইত্যাদি জানা না থাকিলে কোনও রপ্তানি-প্রয়োজনীয়তা কারকই সাফল্যের সহিত রপ্তানি বাণিজ্য করিতে পারে না। যেমন-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ভারী পশম বস্ত্রের চাহিদা খুবই কম। পশম বস্ত্র উৎপাদক ভৌগোলিক ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের অবস্থা না জানিয়াই যদি উৎপাদন করিতে থাকে অর্থনৈতিক অবস্থা তাহা হইলে তাহার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অধিক হওয়াই পর্যবেক্ষণ সম্ভাবনা। তেমনি মনে কর, যে দেশে বিদ্যুৎ সঞ্চয়ন ব্যবস্থাই নাই, সেই দেশের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা অর্থের অপব্যয়। এমনও হইতে পারে যে, যে-কোন রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে কৈদার হইয়া সেই দ্রব্য

দেশে রপ্তানি হইবে, সেই দেশে সস্তায় পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রেও উৎপাদনের ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হইবে যদি বাজারের অবস্থা সঠিক জানা না যায়।

বাজার সমীক্ষায় দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এবং আয়ের মান বিশদভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান (Standard of living) খুবই নিম্নে (low) এবং যে দেশের শ্রমিক ও চাকুরিয়াদের বেতনের মানও খুব নীচু

সে দেশে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে কোনও মূল্যবান সম্পদ তৈয়ার করার স্বার্থকতা কোথায়? যে দেশের সাধারণ শ্রমিকের মাসিক আয়, মনে কর, ২০ টাকা, সেই দেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্বল্পমূল্যের মোটরগাড়ী তৈয়ার হইলেও কি তাহা বিক্রয়ের সম্ভাবনা খুব অধিক? আয়কর বিভাগের পরিসংখ্যান হইতে দেশের আয়ের মানের (Standard of wages) আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং আয়ের অনুপাতে কি প্রকার দ্রব্যের চাহিদা হইতে পারে তাহা জানা যায়।

বাজার সমীক্ষায় দেশের জনসাধারণের রুচির (fashion) উপর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী যে দ্রব্যের চাহিদা হইতে পারে, হনলুলুর (Honolulu) জনসাধারণের একই প্রকারের রুচি না-ও হইতে পারে। সুতরাং হনলুলুতে (Honolulu) দ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে সেই দেশের সাধারণের রুচির জ্ঞান থাকা কর্তব্য। রুচি সন্ধক্ষে জানিতে হইলে অনেক সময়ে বিদেশের সাধারণের মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রশ্নাবলী (Questionnaire) পাঠান হইতে পারে। উহাতে কি দ্রব্য তিনি পছন্দ করেন, কেন পছন্দ করেন, কোন্ কারবারীর উৎপাদিত দ্রব্য তিনি পছন্দ করেন, কেন বিশেষ কারবারীর উৎপাদিত দ্রব্য পছন্দ করেন ইত্যাদি বিষয় থাকে। উহা দ্বারা মোটামুটি সাধারণের রুচি সন্ধক্ষে ধারণা করা যায়।

বিদেশের বাজারে নগদান বিক্রয়ের প্রাধান্য কিংবা ধারে বিক্রয়ের প্রাধান্য তাহা দ্বারাও বিদেশে রপ্তানির সুঁকি কম কি বেশী তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোনও দ্রব্য (যেমন যন্ত্রপাতি) বিদেশে রপ্তানি হইলে সে দেশে যন্ত্রপাতির অংশ (Spare Parts) প্রয়োজন হইলে কিভাবে সরবরাহ করা যায়, অথবা বিক্রয়ের পর যন্ত্রপাতির মেরামত আবশ্যক হইলে তাহার কি ব্যবস্থা হইতে পারে ইত্যাদিও বিবেচনা করা উচিত। যেমন Gestetner প্রতিলিপি মুদ্রণযন্ত্রের (Duplicating machine বা Cyclostyling machine) কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা অকেজো হইলে উহা অথ কোনও কোম্পানী তৈয়ার করিতে পারে না। সুতরাং (Gestetner Cyclostyling Machine) বিক্রয়ের প্রচেষ্টার সঙ্গে বিক্রয়ের পর ক্রেতাদের সেবা দেওয়ার (after sales service) ব্যবস্থা করার প্রশ্নও জড়িত।

যে দেশে রপ্তানি করা হইবে সেই দেশের আইন সন্ধক্ষেও রপ্তানিকারকের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষে বৈদেশী ভাগ সহরে যে সকল গাড়ী চলাচল করে উহা দক্ষিণ হস্তে চালান (Right Hand Drive) হয়। কিন্তু ইউরোপের বৈদেশী ভাগ

সহরেই বাম হস্তে চালান (Left Hand Drive) নিয়ম। যদি ভারতবর্ষের মোটর চালান নিয়ম জানা না থাকে আর ভারতবর্ষে বাম হস্তে চালান চলতি আইন সম্বন্ধে মোটর গাড়ী বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করা হয় সে প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার ওয়াকিবহাল সম্ভাবনা খুবই কম। আবার আমদানিকারকের দেশের বাণিজ্যিক আইনকানুন জানা না থাকিলেও ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন কষ্টকর। মনে কর, কোনও দ্রব্য আমদানিতে নিষেধ আছে, কিংবা কোনও দ্রব্যের উপর খুব উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসানো আছে, সেই প্রকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়া বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় লাভ করা খুবই কষ্টকর।

উপরিলিখিত সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ বাজার সমীক্ষা করিয়া রপ্তানিকারক যদি মনে করে যে বিদেশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করিলে সাফল্য লাভ হইতে পারে

তাহা হইলে রপ্তানিকারককে বিজ্ঞাপনের (Advertisement) বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। সর্বদাই সম্ভাব্য আমদানিকারকের দেশের পত্রিকায় এবং ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। মূল্য, পরিমাণ ইত্যাদিও সেই দেশের ভাষায় প্রচার করিতে হয়। ভারতের বাজারের জ্ঞাত বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বিভিন্ন রাজ্যের ভাষায় (বাংলা দেশে বাংলা ভাষায়, তামিলনাড়ে তামিল ভাষায়, উড়িষ্যায় উড়িয়া ভাষায়, উত্তরপ্রদেশে হিন্দী ভাষায়) এবং মূল্য টাকা পয়সায় দেওয়া উচিত। সহজ বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

রপ্তানি পদ্ধতি (Procedure of Exporting) : রপ্তানির প্রথম ধাপ মাল প্রেরণের নির্দেশ (Order)। আমদানিকারক রপ্তানিকারকের নিকট মাল প্রেরণের নির্দেশ দিলেই রপ্তানিকারক মাল পাঠাইতে পারে। মাল প্রেরণের নির্দেশকে ইংরাজীতে Indent বা Order বলে।

মাল প্রেরণের নির্দেশে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকে তাহা হইতেছে—(১) মালের নাম; (২) কি মূল্য অথবা কি গুণবিশিষ্ট (যেমন ১০ টাকার মূল্যের, কিংবা প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইত্যাদি); (৩) পরিমাণ; (৪) বহনের চুক্তি, সমান্তল, অথবা সমান্তলবিহীন, বীমাকৃত কিংবা অবীমাকৃত; (৫) কোন্ জাহাজে পাঠান হইবে তাহার নাম; (৬) কোন্ তারিখের মধ্যে মাল পৌঁছান প্রয়োজন; (৭) মালের উপর কিরূপ 'মার্ক' (Mark) দেওয়া হইবে; (৮) কিভাবে প্যাকিং করা হইবে; (৯) মালের উপর কিভাবে নম্বর দেওয়া হইবে; (১০) মূল্য পরিশোধ কি প্রকার হইবে তাহার উল্লেখ; (১১) কোথায় মাল খালাস দেওয়া হইবে। মাল সরবরাহের প্রত্যেকটি নির্দেশপত্র (Order বা Indent) পৃথক পৃথক নম্বর থাকিবে। নিম্নে উৎপাদনকারীকে সরাসরি মাল সরবরাহের নির্দেশপত্রের একখানা নমুনা দেওয়া হইল। ২২নং পৃষ্ঠা দেখ।

নিম্নের উদাহরণটিতে মালের উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক একই প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রপ্তানিকারকের আমদানিকারকের নির্দেশমত মাল পাঠাইতে কোন সম্বন্ধ নাই। এইবারে রপ্তানিকারক মাল 'প্যাক' (Pack) করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরের সরবরাহ নির্দেশ (Order)

অর্ডারের নম্বর :

Indent No. B/306.

13, Raja S. C. Mullick Road
Calcutta-32

West Bengal, India

24th August, 1961.

Messrs Turnbull & Co., Ltd.

Hell Street

London, W. C. I.

Dear Sirs,

Kindly ship on our account the undermentioned goods or as many of them as possible.

Payment : Draw 1 month after sight, D/A (Documents against Acceptance), through the Bank of India, Ltd., Calcutta.

Ship : By S. S. Jalausha.

Delivery : By 15th June, 1961 ; C. I. F. (Cost, Insurance and Freight), Calcutta.

Mark :

	R	N	S	
CA	L	C	UT	TA

Number : To commence from 301.

Packing : Inside Wooden Box · Outer Cover : Sack Cloth.

Yours faithfully,

Raghabendra Nath Sarma,

for and on behalf of

R. N. Sarma & Co.

Quantity or Number	Description of Goods	Quality or Price	Remarks
5 Doz.	Grass Mowers	Quality-A	
6 "	Harvesters	Quality-B	
7 "	Spades	Do	
8 "	Tractors	Do	

মূল্যের উল্লেখ নাই কিন্তু কিভাবে মালের মূল্য শোধ হইবে তাহার উল্লেখ আছে। স্বতন্ত্রাং ধরিয়া লইতে হইবে মালের মূল্য রপ্তানিকারকের মূল্য-তালিকাদৃষ্টে তৈয়ার

হইবে এবং যে তারিখে মাল চালান দেওয়া হইবে সেই দিনের আমদানিকারকের মূল্যের বিনিময় দ্বারাই মূল্য প্রদান হইবে। রপ্তানিকারকের নির্দেশ

সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে প্যাকিং (মোড়ক) এমনভাবে করা হয় যাহাতে অনেক দিন সমুদ্রপথে চলার জন্যও কোনপ্রকার ক্ষতি না হয়। মোড়ক করা সম্বন্ধে আমদানিকারকের বিশেষ কোন নির্দেশ থাকিলে তাহা পালন করিতে হয়। মোড়কের উপরে আমদানিকারকের নির্দেশমত মার্ক বা দাগ দিতে হয়। মার্ক বা দাগও যাহাতে উঠিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ জাহাজ হইতে মাল নামাইবার সময় যদি দাগ বিনির্দেশ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে একের মাল অপরের লইবার সম্ভাবনা থাকে।

মাল মোড়ক অথবা প্যাকিং করিয়া যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হয়। জাহাজী ব্যবসায়ী জাহাজ কোন্ তারিখে, কোন্ বন্দর হইতে কোন্ জাহাজে মালপ্রেরণ পথে টকান্ দিকে রওনা হইবে; পথে কোন্ কোন্ বন্দরে নোঙর করিবে ইত্যাদি সাধারণের এবং ব্যবসায়ীদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়া থাকে। উহাকে বলা হয় জাহাজী তালিকা (Shipping List)। জাহাজী তালিকাদৃষ্টে

কোন পথে কোন্ জাহাজে পাঠাইলে সহজে এবং সস্তার আমদানি-জাহাজী প্রতিষ্ঠানের কারকের নিকট মাল পৌছিবে তাহা স্থির করিয়া পরিবহনের সহিত ব্যবস্থা

ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন্ জাহাজে মাল পাঠান হইবে উহা স্থির করিয়া সেই জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মালপ্রেরণ চিঠি (Shipping Note) সংগ্রহ করিবে। মালপ্রেরণ চিঠায় (Shipping Note) মালের বিবরণ দিয়া জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। জাহাজী প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকারকে জানাইয়া দেয় কোন্ তারিখে জাহাজে মাল তোলার জন্য পোতাঙ্গণে (Dock) জমা করিতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখে পোতাঙ্গণে মাল উপস্থিত করা না হইলে জাহাজী প্রতিষ্ঠান সেই মাল না লইয়াই জাহাজের পাল তুলিবে। পোতাঙ্গণে মাল উপস্থিত করা হইলে পোত প্রাধিকারের কার্যালয় হইতে মাল ওজন করা হইলে ওজন চিঠি বা প্রত্যায়ণ চিঠি (Weight Note) পাইয়া থাকে। কিন্তু যদি মাল জাহাজে তোলা সাপেক্ষ কোনও গুদামঘরে রাখা হয় তাহা হইলে গুদামঘরের মালিক অথবা কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও মালপ্রাপ্তির রসিদ দিয়া থাকে। অনেক সময় জলপথে অল্প কোনও স্থান হইতে বা বজরায় মাল আনিয়া সরাসরি জাহাজে তোলা হইলে জাহাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও একখানা রসিদ দেন। উহাকে বলে

জাহাজী মালের রসিদ (Mates Receipt)। এই রসিদে জাহাজী মালের রসিদ মালের বিবরণ, ওজন এবং জাহাজের কত অংশ অধিকার করিবে উহা থাকে। উহার প্রয়োজন হয় জাহাজের মালিকের পক্ষে রহন মালিক (freight) হিসাব করিতে।

জাহাজী মালের রসিদের নমুনা
(**Specimen of a Mate's Receipt**)

Vagabond Shipping Co., Ltd.			
Port of Calcutta.		10th June, 1961	
Received in apparent good order and condition on board the Steamship 'Idle' for delivery at Saturn subject to the conditions of Bill of Lading of this line.			
Marks	Quantity	Goods	Remarks
J K 1-3	3 Bales	Said to Contain Jute	
Active			
Name of Shippers : Swindlers & Co., Ltd. Officer-in-charge.			

ইতিমধ্যে বণ্টানিকাবককে জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে **বহনপত্র (Bill of Lading)** সংগ্রহ করিতে হয়। সরাসরি জাহাজী প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থিত না হইয়া উহার প্রতিনিধির (Agents) মাধ্যমেও বহনপত্র সংগ্রহ করা যায়।

বহনপত্রে মাল বহন করার সর্ব লেখা থাকে। কিন্তু জাহাজের নাম, কোন্ বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িবে, কোন্ বন্দর ইহার শেষ গন্তব্যস্থল, চালানী মালের প্রাপকের (Consignee) নাম, ঠিকানা, মালের বিবরণ, ওজন, স্থান পরিমিতি (Measurements) ; মালের সংখ্যা (বাক্স, পেটি বা মোড়কের সংখ্যা), মালের উপরের মার্ক, ইত্যাদি ঘর শূণ্য থাকে। শূণ্য স্থানগুলি বণ্টানিকারককে পূরণ করিতে হয়। উহা পূরণ করিয়া পুনরায় বহনপত্র জাহাজী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে দাখিল করিতে হয়। উপরে যে প্রত্যাশন চিঠা অথবা জাহাজী মালের রসিদের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে অথবা মালিককে ফেরত দিতে হয় এবং উহার পরিবর্তে জাহাজের মালিক অথবা জাহাজী প্রতিষ্ঠানের অধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারী **বহনপত্র (Bill of Lading)** সহি করিয়া বণ্টানিকারককে দিয়া থাকে।

মালের মোড়ক অথবা বাক্সে কোনও প্রকার জট থাকিলে জাহাজী প্রতিষ্ঠান অথবা জাহাজের মালিক যে বহনপত্র (Bill of Lading) দেয় উহাতে 'দুর্ভ' (Foul or Dirty) কথাটি লিখিয়া দেয়। বহনপত্রে 'দুর্ভ' (Foul or Dirty) কথাটি লেখা থাকিলে জাহাজী প্রতিষ্ঠানের মালের অবস্থা সন্দেহে কোনও দাবি থাকে না। আর যদি মালের মোড়ক বা প্যাকিংএ কোনও দোষজট না থাকে তাহা হইলে বহনপত্র নির্দোষ (Clean) বলিয়া দেওয়া হয়। মাল জাহাজে তোলার পর যে বহনপত্র পাওয়া যায় তাহাকে বলা

হয় 'জাহাজে মাল বহনপত্র' (On Board Bill of Lading), কিন্তু জাহাজে তোলা সাপেক্ষে যে বহনপত্র পাওয়া যায় তাহাকে বলে 'মালতোলা সাপেক্ষে বহনপত্র' (Received for shipment bill)। রপ্তানিকারকের পক্ষে নির্দোষ (Clean) এবং 'জাহাজে মাল বহনপত্র' (On Board Bill of Lading) লওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে গন্তব্যস্থলে জাহাজ পৌঁছিলে পর মাল প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছিতে অল্প কোনও পরিবহনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। মনে কর, কলিকাতা পোতাঙ্গণে মাল নামাইবার পর আবার রেল যোগে মাল প্রাপকের ববাবব বহনপত্র (Consignee) ঘরে পাঠাইতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি জাহাজ হইতে মাল নামাইবার পর পুনরায় রেল যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থাও জাহাজী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জাহাজী প্রতিষ্ঠান যে বহনপত্র দিবে উহাকে বরাবর বহনপত্র (Through Bill of Lading) বলা হয়।

মাল বহন কবার মাসুল (Freight) মালের মূল্য, ওজন অথবা স্থান অধিকার যে কোনও একটির উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা হয়। তবে সাধারণত যে উপায়ে মাসুল ঠাঠা জাহাজের মালিকের অথবা জাহাজী প্রতিষ্ঠানের অস্থকুলে হয় সেই উপায়েই মাসুল স্থির করা হয়। জাহাজের মালিক মাসুল বাবদ রপ্তানিকারককে কত দিতে হইবে তাহা দর্শাইয়া যে চিঠা (Note) দেয় তাহাকে মাসুল চিঠা (Freight Note) বলে।

রপ্তানিকারক যদি মালের মূল্য, বীমা ও মাসুল (Cost, Insurance and Freight—abbreviated C I F.) বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে মাল বীমা করিয়া সামুদ্রিক বীমা বা নৌ-বীমাপত্র গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যদি মূল্যবেদনে (Quotation) বীমার উল্লেখ নাও থাকে এবং আমদানিকারক যদি বীমা করার নির্দেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলেও রপ্তানিকারককে মাল বীমা করিতে হয়।

রপ্তানিকৃত দ্রব্যের বিশদ বিবরণ শুদ্ধ কার্যালয়ে দাখিল করিতে হয়। যদি রপ্তানিকৃত দ্রব্য শুদ্ধাধীন হয় সে-ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে রপ্তানি অনুজ্ঞাপত্র (License) লইতে হয়। শুদ্ধাধীন রপ্তানি দ্রব্যের বেলায় যে প্রপত্রে মালের বিবরণ দাখিল করিতে হয় উহাকে মালপ্রেরণ (Shipping Bill) বলে। কেরত শুদ্ধ (Drawback) আদায় করিতে জাহাজী বিলের প্রয়োজন। কিন্তু রপ্তানি দ্রব্য যদি শুদ্ধাধীন না হয় তাহা হইলে কেবল মাসুল কেরত প্রমাণপত্র মাল প্রেরণ বিমির্দেশ (Shipping Specification) প্রপত্রেই মালের বিবরণ দিতে হয়। রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর শুদ্ধ কেরত আদায় করিতে হইলে রপ্তানিকালেই মাসুল কেরতের প্রমাণপত্র (Debenture Certificate) লইতে হয়।

রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের নিকট মোট তিনটি দলিল পাঠাইতে হয়—
চালানপত্র (Invoice), বহনপত্র (Bill of Lading) এবং বীমাপত্র (Insurance
চালান, বহনপত্র ও Policy)। বহনপত্র ও বীমাপত্র পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।
বীমাপত্র চালানপত্রও একপ্রকার বিল। উহাতে মালের বিশদ বিবরণ,
মার্ক, মূল্য, সংখ্যা বা পরিমাণ ইত্যাদি থাকে। আমদানিকারক
চালানপত্র পাইলে বুঝিতে পারেন রপ্তানিকারকের নিকট তিনি কত ঋণী, অর্থাৎ
রপ্তানিকারককে তাহার কত দিতে হইবে। আমদানিকারক চালানের সহিত মাল
সরবরাহের নির্দেশপত্র মিলাইয়া দেখেন যে সকল মাল তাহার নির্দেশ অমুসারে
পাঠানো হইয়াছে কিনা। চালানের নমুনা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

বহনপত্রের প্রয়োজনীয়তা (Use of Bill of Lading) : জাহাজে মাল
তোলা হইলে অথবা জাহাজে তোলার জন্য মাল জাহাজী প্রতিষ্ঠানের হেপাজত করিলে
বহনপত্রের আবশ্যকতা জাহাজের মালিক যে রসিদ দেয় তাহাই যে বহনপত্র তাহা পূর্বে
উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং বহনপত্রের প্রথম উপকারিতা
জাহাজী প্রতিষ্ঠানের মালগ্রাপ্তির স্বীকৃতি (Acknowledgement)। দ্বিতীয়ত,
বহনপত্র দ্বারাই আমদানিকারকের মালে মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ হয়। বহনপত্র
আমদানি-কারকের দেশে শুদ্ধ অফিসে জমা না দিলে মাল খালাস পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, কি সর্তে জাহাজের মালিক মাল বহন করিতে সম্মত হইয়াছে সেই
সর্তসমূহও বহনপত্রে থাকে। সুতরাং বহনপত্র মাল বহনের চুক্তিপত্র (contract)।

বীমাপত্র (Insurance Policy) : বীমাপত্র না পাইলে আমদানিকারক

বীমাপত্রের

প্রয়োজনীয়তা

মালের কোনও ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে না।

সুতরাং বীমাপত্র দ্বারা আমদানিকারক প্রয়োজন হইলে ক্ষতিপূরণ
দাবি করিতে পারে।

উপরিলিখিত তিনখানি দলিল অপরিহার্য—চালানপত্র, বহনপত্র ও বীমাপত্র।
কিন্তু এতদ্ব্যতীতও অনেক দেশের আমদানি আইনে বাণিজ্য-দূতের চালান না হইলে
দেশের সীমানার মধ্যে মাল নামাইতে দেয় না ; সে সকল দেশে
বাণিজ্য-দূতের চালান কোনও দ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে রপ্তানিকারককে বাণিজ্য-
দূতের চালান সংগ্রহ করিতে হয়। **বাণিজ্য-দূতের চালান (Consular Invoice)**
কিভাবে পাওয়া যায় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রয়োজন হইলে
চালান, বহনপত্র ও বীমাপত্রের সহিত বাণিজ্য-দূতের চালানও যুক্ত করিয়া দিতে হয়।

আবার অনেক দেশে আমদানি শুদ্ধ সকল দেশের আমদানির উপর সমহারে
প্রয়োগ করা হয় না। কোন কোন দেশের আমদানি দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে
আমদানি শুদ্ধ বসান হয় আবার কোন কোন দেশের দ্রব্যের উপর
কম আমদানি শুদ্ধ বসান হয়। এই প্রকার আমদানি শুদ্ধকে
প্রভেদমূলক আমদানি শুদ্ধ (Discriminating অথবা

পক্ষপাতমূলক

আমদানি শুদ্ধ

Preferential Import Duty) বলে। সুতরাং কোন দেশে প্রকৃতই দ্রব্য
উৎপাদন হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিলে আমদানি শুদ্ধ কি হারে আদায় হইবে

তাহা বুঝা যায় না। ১৯৩২ সালে অটোয়া সম্মেলনে (Ottawa Conference) তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া স্থির করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল আমদানি করা হইলে, দ্রব্য আমদানি শুদ্ধাধীন হইলে, শুদ্ধ আদায় করা চলিবে। কিন্তু একই দ্রব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বহির্ভূত কোনও দেশ হইতে আমদানি করা হইলে যে হারে আমদানি শুদ্ধ আদায় করা হইবে তাহার চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কম হারে শুদ্ধ আদায় করা হইবে। ইহাকেই বলা হয় সাম্রাজ্য পক্ষপাত (Imperial Preference)। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলিতে এখন কোনও বস্তু নাই, তথাপি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে অনেক রাষ্ট্র এখনও পূর্ব প্রথা মানিয়া চলিতেছে। সুতরাং, মনে কর, ফরাসী দেশ হইতে রেশম বস্ত্র আমদানি করা হয়। তাহার উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে আমদানি শুদ্ধ আদায় করা হয়। গ্রেট ব্রিটেন হইতেও রেশম বস্ত্র আমদানি করা হয়। উহা উপর শতকরা ১০ টাকা হিসাবে আমদানি শুদ্ধ আদায় করা হয়। কোনও ব্যবসায়ী যদি ফরাসী হইতে গ্রেট ব্রিটেনে রেশম বস্ত্র রপ্তানি করে এবং গ্রেট ব্রিটেনের কোনও বন্দর হইতে যদি সেই রেশম বস্ত্র ভাবতবর্ষে পাঠান হয় তাহা হইলে কি শতকরা ১০ টাকা হিসাবে আমদানি শুদ্ধ আদায় হইবে, না শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে আমদানি শুদ্ধ আদায় হইবে? বলিতে পার যে রেশম দ্রব্য ত বস্ত্র ত গ্রেট ব্রিটেনের একটি বন্দর হইতে ভারতের একটি বন্দরে আসিয়াছে। কিন্তু বস্ত্র ত প্রকৃত তৈয়ার হইয়াছে ফরাসী দেশে। ফরাসী দেশের কোনও দ্রব্যের উপর ত সাম্রাজ্য পক্ষপাত নীতি প্রয়োগ হইবে না। সুতরাং ভারতবর্ষে কোন দ্রব্য রপ্তানি করিতে হইলে একথানা উদ্ভবপত্র বা প্রভবলেখ (Certificate of Origin) পাঠাইতে হয়। প্রভবলেখ কোন দেশে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণ করে। প্রভবলেখ উপস্থিত করিতে না পারিলে পক্ষপাতমূলক আমদানি শুদ্ধের স্বযোগ গ্রহণ কবিত্তে পারে না। সুতরাং রপ্তানিকারককে চালান, বহনপত্র, বাণিপত্র ও বাণিজ্য-দূতের চালানের সহিত প্রভবলেখও পাঠাইতে হয়।

উদ্ভবপত্র বা
প্রভবলেখ

প্রভবলেখ (Certificate of Origin) বাণিজ্যদূত (রপ্তানিকারকের দেশে আমদানিকারকের দেশের প্রতিনিধি), অথবা বণিকসভার (Chamber of Commerce) সচিব (Secretary) দিতে পারেন। সুতরাং রপ্তানিকারককে প্রভবলেখও সংগ্রহ করিতে হয়।

রপ্তানি পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার (Summary of Export Procedure) :

- (১) আমদানিকারকের অঙ্গসন্ধানের উত্তরে মূল্য উল্লেখ বা মূল্য বেদন (Quotation)।
- (২) আমদানিকারকের নিকট হইতে মাল পাঠাইবার নির্দেশ গ্রহণ। (৩) আমদানিকারকের নির্দেশমত মাল সংগ্রহ ও মোড়ককরণ। (৪) জাহাজী প্রতিষ্ঠানের সহিত জাহাজে মাল পাঠাইবার ব্যবস্থাকরণ। (৫) জাহাজে মাল পাঠাইবার আনুষ্ঠানিক কার্য সম্পাদন—বেসন, গুজর চিঠি, মাল প্রেরণ চিঠি সংগ্রহ। (৬) জাহাজে মাল ডোকার পছন্দ অবলম্বন। (৭) বহনপত্র

বীমাপত্র, বাণিজ্য-দুতের চালান, প্রভবলেখ সংগ্রহ। (৮) চালান তৈয়ার এবং আমদানিকারকের নিকট চালানসহ ৭নং দফায় লিখিত দলিল পত্রাদি প্রেরণ।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা বুঝিতে পারিতেছে যে রপ্তানি বাণিজ্যে রপ্তানিকারকের যথেষ্ট ঝামেলা ভোগ করিতে হয়। নিয়ের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিবে যে রপ্তানিকারক ঝামেলার অধিকাংশই অন্তের উপর অপসারণ করিতে পারেন, অবশ্য সেজন্য তাহাকে কিছু ব্যয় বহন করিতে হইবে। শুষ্ক পদ্ধতি ও আমদানি রপ্তানির আইনকানুনের জ্ঞান রপ্তানিকারকের না-ও থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের ঝামেলা আরও বাড়িয়া যায়। এই সকল কারণে বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্যে বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ মধ্যগদের (Specialist Middlemen) আবির্ভাব হইয়াছে। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়া তাহারা দেশের রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের কিতাবে সাহায্য করিয়া থাকেন, উহাই নীচে আলোচনা করা হইল।

রপ্তানিকারক সরাসরি আমদানিকারকের নিকট হইতে মাল সরবরাহের নির্দেশ (Indent) গ্রহণ না করিয়া আমদানিকারকের দেশে প্রতিনিধি (Agent) বা অভিকর্তা নিয়োগ করিতে পারেন। অভিকর্তা আমদানিকারকের দেশের বাজারের অবস্থা সমীক্ষা করিয়া রপ্তানিকারককে কি দ্রব্য পাঠাইলে বিক্রয়ের সুযোগ হইতে পারে তাহা জানান। রপ্তানিকারক অভিকর্তার নির্দেশ অনুসারে তাহার নিকট মাল প্রেরণ করিলে অভিকর্তা রপ্তানিকারকের পক্ষে আমদানিকারকের দেশে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন।

আবার আমদানিকারক নিজেও রপ্তানিকারকের দেশের কোনও ব্যবসায়ীকে আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন। আমদানিকারক তখন

রপ্তানি বাণিজ্যে রপ্তানিকারকের নিকট মাল সরবরাহের নির্দেশ দেন না—নির্দেশ আমদানিকারকের দেন তাহার প্রতিনিধিকে। প্রতিনিধিকে যে মাল প্রেরণের নির্দেশ প্রতিনিধি দেওয়া হয়, উহাতে যদি কোন উৎপাদকের দ্রব্য, কত মূল্য—এই

সকল উপদেশ দেওয়া থাকে তবে সেই নির্দেশকে বলা হয় স্থির সংভূতিপত্র (Closed Indent)। কিন্তু কেবলমাত্র মালের নাম উল্লেখ করিয়া কি

পরিমাণ আমদানি করিতে চাহেন তাহাই মাত্র জানান এবং প্রতিনিধিকে মাল বাছিয়া লওয়ার এবং মূল্য স্থির করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে সেই প্রকার নির্দেশকে মুক্ত সংভূতিপত্র (Open Indent) বলা হয়। আমদানিকারক রপ্তানিকারকের দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলে মাল পাঠাইবার সমস্ত দায়িত্ব প্রতিনিধির। অবশ্য তাহাকেও উপরের সকল পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

রপ্তানিকারক মাল প্রেরণ সংক্রান্ত সকল কর্তব্য কর্মের জন্য দালাল নিযুক্ত করিতে পারেন। যেমন জাহাজী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া জাহাজে স্থান সংগ্রহ করার জন্য জাহাজী দালালের

(Shipping Broker) সাহায্য লইতে পারেন। জাহাজী দালালের হাতেই মাল মোড়ক করা, মাল জাহাজে তোলা ইত্যাদি সকলই ছাড়িয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি ঐ কার্য সম্পাদনে অশারণ হন তাহা হইলে মাল মোড়ককরণ, জাহাজে পাঠাইবার

ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্ত পৃথকভাবে দালাল নিযুক্ত করিতে পারেন। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মধ্যগদের মধ্যে একদল আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা রপ্তানি ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহাদের বলে বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ী (Export Merchants) আর যাহারা আমদানি ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের বলে আমদানি ব্যবসায়ী (Import Merchants)। তবে কোন ব্যবসায়ীই মাত্র রপ্তানি অথবা আমদানি ব্যবসায় করেন না। প্রায় প্রত্যেকেই আমদানি ও রপ্তানি উভয়বিধ ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন। রপ্তানি ব্যবসায়ী (Export Merchants) দেশের উৎপাদকের ও বিদেশের আমদানিকারকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। রপ্তানি বিষয়ে করণীয় কর্তব্য রপ্তানিকারকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীই করিয়া থাকেন।

উৎপাদকের পক্ষে বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীর সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহার কার্য বিশেষজ্ঞের উপকাৰিতা অনেক সহজ হয়। প্রথমত, রপ্তানি ব্যবসায়ী রপ্তানি ব্যবসায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকে বলিয়া বিদেশের বাজার সমীক্ষা বাজার সমীক্ষা কার্য (Market Research) তিনিই করেন। দ্বিতীয়ত, মাল প্রেরণের জন্ত শুদ্ধ সম্বন্ধীয় কর্তব্যাবলী সকলই উৎপাদকের পক্ষে রপ্তানি ব্যবসায়ী করিয়া থাকেন। তৃতীয়ত, রপ্তানি ব্যবসায়ী সরাসরি উৎপাদকের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিয়া নিজ নামে বিদেশের আমদানিকারকের সহিত ব্যবসায় করেন। ফলে উৎপাদনকারীকে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য আদায়ের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। অথবা ধারে বিক্রয় করিলেও বিক্রয়মূল্য আদায় করিতে অসুবিধা হয় না। এই সকল কারণে প্রায় প্রত্যেক উৎপাদকই বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীর সহিত যোগসূত্র স্থাপন করেন। বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীই তখন রপ্তানিকারক।

আমদানি পদ্ধতি (Procedure of Import) : আমদানির পদ্ধতিও অনেকটা রপ্তানি পদ্ধতির অনুরূপ। আমদানিকারকে প্রথমত রপ্তানিকারী দেশের উৎপাদকের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতে হয়। যেহেতু আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ বাণিজ্যে পরিণত হইয়াছে সে কারণে আমদানিকারক বিশেষজ্ঞ রপ্তানি ব্যবসায়ীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন।

কোনও দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে আমদানিকারক প্রথমেই প্রস্তাবিত আমদানি দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যদি তিনি আমদানি করা হ্রি করেন তাহা হইলে রপ্তানি বিশেষজ্ঞের নিকট মাল সংগ্রহ করিতে এবং মাল পাঠাইতে নির্দেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু কেবলমাত্র দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া মাল পছন্দ করার এবং মূল্য হ্রি করার দায়িত্ব রপ্তানিকারী দেশে রপ্তানি ব্যবসায়ীর হাতে ছাড়িয়া দেন তবে তিনি মুক্ত সংক্ৰতিপত্র (Open Indent) পাঠাইবেন। রপ্তানিকারক সংক্ৰতিপত্র অনুসারে মাল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

এবং মাল সংগ্রহ হইলে রপ্তানি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মাল রপ্তানির ব্যবস্থা করিবেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খুব কম দেশেই আমদানি অবাধ (free)। যদি আমদানিকারকের দেশে কোনও দ্রব্য আমদানি সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে সংভূতিপত্র (Indent) পাঠাইবার পূর্বেই সরকারের আমদানির অনুজ্ঞাপত্র নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র (License) সংগ্রহ করিতে হয়। অনুজ্ঞাপত্র মাল খালাস করিবার সময় শুদ্ধ অফিসে উপস্থিত করিতে হয়। অনুজ্ঞাপত্র বাণিজ্য দপ্তর হইতে দেওয়া হয়।

আমদানি বাণিজ্য অবাধ না থাকিলে আরও একটি প্রশ্ন উঠে। উহা হইতেছে, সরকারের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রার অনুমতি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বৈদেশিক বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ মুদ্রার বিনিময় হারের সমতা রক্ষা করার জগুই সরকারের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের অনুমতি প্রয়োজন। যদিও বৈদেশিক মুদ্রা নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিভাগ হইতেই করা হয় কিন্তু উহার ব্যবস্থাপনার ভার থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে।

দেশের অর্থ বাহাতে অবস্থিত পথে ব্যয়িত না হয়—অর্থাৎ সরকার অনুমোদিত দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাহাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না হয় তজ্জগুই সরকারের দ্বিবিধ বিধি নিষেধ। তবে প্রত্যেক দ্রব্যের বেলায়ই যে পূর্বেই বৈদেশিক মুদ্রা মুক্ত সাধারণ অনুজ্ঞা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা নহে। যে সমস্ত দ্রব্য মুক্ত সাধারণ অনুজ্ঞা দ্বারা (Open General License বা O. G. L.) সংবন্ধিত উহা আমদানি করিতে সরকারের পৃথক অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের আমদানি মুক্ত সাধারণ অনুজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত নহে সে প্রকার কোনও দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে প্রত্যেকটি আমদানির জগু পৃথক পৃথক অনুজ্ঞা (License) গ্রহণ করিতে হয়। ভারত সরকার বৎসরে দুইবার মুক্ত সাধারণ অনুজ্ঞার অন্তর্গত এবং তৎকালিক (Adhoc) অনুজ্ঞা দ্বারা সংরক্ষিত দ্রব্যের তালিকা প্রকাশ করেন।

সংভূতিপত্র অনুমোদন হইলে মাল বন্দরে না পৌঁছিলে আমদানিকারকের আর কোন কর্তব্য নাই। রপ্তানিকারকের নিকট হইতে চালান (Invoice), বহনপত্র (Bill of Lading), বীমাপত্র (Insurance Policy), বাণিজ্য দূতের চালান (Consular Invoice), প্রভবলিপি (Certificate of Origin), ইত্যাদি পাইলেই আমদানিকারকে মাল খালাস করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মাল খালাস করিতে হইলে নিয়লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমত, জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে জাহাজের অধ্যক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে একখানি বিবরণ দিতে হয় (১১ পৃঃ দেখ) এবং আমদানিকারকেও একখানি বিবরণ (১১ পৃঃ দেখ) দিতে হয়। এই দুইখানি বিবরণপত্রের সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ প্রাধিকার জাহাজী বিবৃতি উভয় বিবরণের মধ্যে অনৈক্য না পাইলে মাল খালাসের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু যদি মাল শুদ্ধাধীন বলিয়া আমদানিকারক ঘোষণা করেন তবে

তাহাকে যে প্রবিষ্টি (Entry) দাখিল করিতে হয় উহাকে **জাহাজ হইতে দেশে ভোগ প্রবিষ্টি (Entry for home use ex ship)** বলে। সে-ক্ষেত্রে হয় আমদানিকারককে তৎক্ষণাৎ আমদানি শুদ্ধ আদায় দিতে হয় অথবা কোন শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে মাল রাখিতে হয়। শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে মাল রাখা হইলে যে প্রমাণপত্র (Warehouse Warrant) বা প্রতিভূ বলে। প্রতিভূ পিছন সহি করিয়া হস্তান্তরযোগ্য। প্রতিভূ পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করা হইলে স্বত্ত্বগ্রহীতা (Endorsee) শুদ্ধাধীন পণ্যাগার হইতে মাল খালাস লইতে পারে। তবে মাল খালাসের পূর্বে তাহাকে আমদানি শুদ্ধ পরিশোধ করিতে হয়।

কিন্তু আমদানিকৃত দ্রব্য যদি শুদ্ধবিহীন (Free of Duty) হয় তাহা হইলে শুদ্ধবিহীন আমদানি জাহাজের অধ্যক্ষের বিবৃতির সহিত আমদানিকারকের প্রবিষ্টি বিবৃতির মিল হইলেই মাল খালাসের আদেশ দেওয়া হয়।

পোতাঙ্গণ মাশুল আমদানিকারককে তখন **পোতাঙ্গণ মাশুল (Dock Duty)**, **মাল ওজননের মাশুল (Weighment dues)**, **বন্দর কমিশনারের মাশুল (Port Commission charges)** ইত্যাদি পরিশোধ করিতে হয়।

আমদানিকারক যদি নিজে সবাসরি দ্রব্য আমদানি করেন তাহা হইলে শুদ্ধ অফিস সঞ্চায়ী সকল কর্তব্য তাঁহাকেই সম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু আমদানিকারক ইচ্ছা করিলে বিশেষজ্ঞ আমদানিকারকের (Specialist Importer) সাহায্যে মাল আমদানির ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাধারণত, পাইকারই আমদানি করেন এবং নিজে আমদানি না করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে আমদানি করেন। সে-ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীই আমদানিকারক। বিশেষজ্ঞ আমদানি ব্যবসায়ী পাইকারের পক্ষে আমদানির সকল কামেলা গ্রহণ করেন। তিনি পাইকারের পক্ষে বিদেশের বাজারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে দ্রব্য যেথায় সস্তায় পাওয়া যায় সেখান হইতে ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। জাহাজ হইতে মাল নামাইবার ও গুদামজাত করার ব্যবস্থা করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারক নিজ দেশের পাইকারকে ধারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন।

আমদানিকারক ও পাইকার যদি একই ব্যক্তি হন তাহা হইলে নিজে মাল খালাস করার দায়িত্ব না লইয়া মাল খালাসী দালাল (Clearing Agent) নিযুক্ত করিতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে প্রথমেই বহনপত্র মাল খালাসী দালালের অস্থূল পিছন সহি করিয়া দিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানিকারকের রপ্তানিকারককে আদিষ্ট (or order) বহনপত্র দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ, বহনপত্রে কেবলমাত্র আমদানিকারকের নাম উল্লেখ না করিয়া আমদানিকারকের নামের পরে 'Or Order' কথাটি বোগ করিয়া দিতে হয়। বিশেষজ্ঞ আমদানিকারকের মাল খালাস সঞ্চায়ী শুদ্ধ কার্যালয়ের সকল পদ্ধতি লক্ষ্যে বিশেষ জ্ঞান থাকে বলিয়া পাইকার ইহাদেরই সাহায্য গ্রহণ করেন।

আমদানি পদ্ধতির সারসর্ম (Summary of Import Procedure) :

১। সরকারের নিকট হইতে অনুমতিপত্র (License) গ্রহণ ।

২। আবশ্যক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা ।

আমদানি পদ্ধতির

৩। বহনপত্র, চালান, বীমাপত্র, ইত্যাদি পাওয়া গেলে

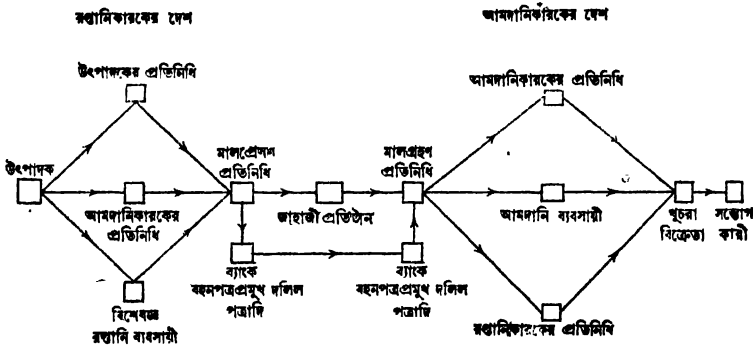
সারসর্ম

শুল্ক কার্যালয়ে প্রবেশি দাখিল করা ।

৪। শুদ্ধাধীন দ্রব্য হইলে আমদানি শুল্ক আদায় দেওয়া, আমদানি শুল্ক আদায় দিতে না পারিলে শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে মাল রাখার ব্যবস্থা করা । শুদ্ধাধীন পণ্যাগারে মাল পাঠাইবার পূর্বে পোতাশ্রম মাণ্ডল ইত্যাদি পরিশোধ করা ।

৫। শুদ্ধবিহীন মাল হইলে পোতাশ্রম মাণ্ডলাদি পরিশোধ করা ।

উপরের আলোচনা হইতে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন চিত্র সাহায্যে দেখান হইল :



Exercises

1. What is Market Research ? What information are usually obtained from Market Research ? Is it useful ?

বাজার সমীক্ষা কি ? বাজার সমীক্ষার কি সংবাদ সংগ্রহ করা হয় ? উহার আবশ্যিকতা আছে কি ?

2. What are the different ways of receiving Orders (Indents) by a Manufacturer for exporting ?

উৎপাদক কি কি বিভিন্ন উপায়ে রপ্তানির নির্দেশ বা সংজ্ঞা পায় ?

3. Describe the functions of the middlemen connected with export.

রপ্তানি ব্যবসারে মধ্যগণের কার্যের বিবরণ দাও ।

4. What services are rendered by Export Merchants to the manufactures ?

রপ্তানি ব্যবসারী উৎপাদককে কি কি সাহায্য দেয় ?

5. What are the uses of (a) Consular Invoice ; (b) Certificate of Origin ; (c) Bill of Lading ?

চালান, উত্তরণপত্র বা প্রত্যবেশ এবং বহনপত্রের কাহ কি ?

6. Give an outline of the procedure to be adopted by an exporter for exporting goods.

কোন দ্রব্যের রপ্তানি পদ্ধতি আলোচনা কর ।

7. What procedure must be followed by an importer for importing goods ?

• আমদানিকারক আমদানি করিতে কি পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন ?

8. Explain : (a) Open Indent ; (b) Entry for home use ; (c) Weight Note ; (d) Dirty Bill of Lading ; (e) Mate's Receipt.

ব্যাখ্যা কর : (ক) মুক্ত সংজ্ঞা ; (খ) দেশে ব্যবহারের প্রমাণ ; (গ) প্রত্যাহার বা ওজন চিঠি ; (ঘ) দুষ্ট বহনপত্র ; (ঙ) জাহাজী মালের রসিদ ।

চতুর্দশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য আদানপ্রদান

(Payment in Foreign Trade)

বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ না পাইলে দ্রব্য রপ্তানি করিতে অনিচ্ছুক হয়। কারণ রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক উভয়ের ব্যবসাস্থলেব মধ্যে হাজার হাজার মাইল বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবধান থাকিতে পারে। আবার আমদানিকারকও মালের মূল্য অগ্রিম দিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে কারণ রপ্তানিকারক যে দ্রব্যের মূল্য অগ্রিম পাইলেই মাল পাঠাইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার আমদানিকারকের দেশে এবং রপ্তানিকারকের দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা থাকার ফলে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে গ্রহণীয় হয় না।

দেশের সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রপ্তানিকারক আমদানিকারকের আর্থিক অবস্থা জানিয়া লইতে পারে। যদি জানা যায় যে আমদানিকারকের আর্থিক

সচ্ছল এবং বাজারে সুনাম আছে তাহা হইলে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের সরাসরি আমদানিকারকের নিকট মাল পাঠাইতে পারে। আমদানিকারক মাল পাইয়া রপ্তানিকারককে মালের মূল্য পরিশোধ করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে মূল্য আদায়ের জন্ত যে সময় রপ্তানিকারককে অপেক্ষা করিতে হইবে সেই সময়ের জন্ত রপ্তানিকারকের মূলধন আটক থাকে।

নগদান অর্থ পাইলে সেই অর্থ ব্যাংকে রাখিলে যে সুদ পাওয়া বাইত তাহা হইতেও রপ্তানিকারক বঞ্চিত হন। যদি কোনও কারণে মালের খালাস লইয়া দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ না করে তাহা হইলে রপ্তানিকারককে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বিদেশের আইন আদালতের অবস্থা সঘনো রপ্তানিকারকের কোন অভিজ্ঞতা থাকা আশা করা যায় না। আবার আইন আদালতের সাহায্যে মূল্য আদায় করা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাধ্য।

দ্বিতীয় উপায় রপ্তানিকারক গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে রপ্তানিকারক যখন মাল পাঠান তখন মালের সঙ্গে একখানা ছড়ি বা বিনিময়পত্র (Bill of Exchange)

স্বীকৃত করিয়া দিতে পারেন। হুতি বা বিনিময়পত্রখানি আমদানিকারক সাকরণ (Accept) করিলে উহা আবার রপ্তানিকারকের নিকট ফেরত আসে। তখন রপ্তানিকারক ইচ্ছা করিলে সেই হুতিখানা ডাঙ্কাইয়া অর্থের সংস্থান করিতে পারেন।

কিন্তু হুতি বা বিনিময়পত্র (Bill of Exchange) সাকরণ (Accept) হইয়াছে বলিয়াই যে সেই হুতির মূল্য আমদানিকারক শোধ করিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। যদি ইতিমধ্যে হুতি ডাঙ্কাইয়া (Discount) অর্থের সংস্থান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঋণদাতাকে পুনরায় হুতির মূল্য ফেরত দিতে হয়। এই পদ্ধতিতে রপ্তানি মূল্য আদায়ও যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। আর যদি হুতি ডাঙ্কান না হয় তাহা হইলে হুতির মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে মূল্য আদায় হইবে। উহাও সময়সাপেক্ষ এবং ঝুঁকিবহুল।

রপ্তানিকারক অবশ্য ব্যাংকের সাহায্য গ্রহণ করিলে নিশ্চিত হইতে পারেন যে আমদানিকারক মাল খালাস করিবার পূর্বে হয় বিনিময়পত্রের মূল্য পরিশোধ করিবেন অথবা বিনিময়পত্র সাকরণ করিবেন। সে-ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে বহনপত্র (Bill of Lading) প্রমুখ দলিল ও বিনিময়পত্র বা হুতি (Bill of Exchange) তাহার ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ব্যাংকের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিবেন।

আদায়সাপেক্ষ হুতি ব্যাংক ঐ সকল দলিল তখন আমদানিকারকের দেশে উহার পরিচিত কোনও ব্যাংকের নিকট পাঠাইয়া দিবে। যদি বহনপত্র ইত্যাদি দলিল হুতি মূল্য আদায়সাপেক্ষ দেয় (Documents against Payment) হয় তাহা হইলে আমদানিকারক হুতির মূল্য পরিশোধ করিলেই মালের স্বত্বপ্রমাণক দলিল (বহনপত্র ইত্যাদি) পাইতে পারে। কিন্তু দলিল যদি হুতি সাকরণ-সাকরণসাপেক্ষ হুতি সাপেক্ষ (Documents against Acceptance) হয় তাহা হইলে হুতি সাকরণ করিলেই আমদানিকারক বহনপত্র ইত্যাদি লইতে পারে।

হুতি সাকরণ করিলেই যখন উহার মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা নাই তখন রপ্তানিকারক দাবি করিতে পারে যে হুতির মূল্য পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া কোনও ব্যক্তি বা ব্যাংক যদি জামিন হয় তাহা হইলেই দলিলসমূহ দেওয়া হইবে। এইরূপ

ক্ষেত্রে আমদানিকারক তাহার নিজস্ব ব্যাংককে হুতি সাকরণ করিতে অনুরোধ করিবে। ব্যাংকের যদি মক্কেলের (অর্থাৎ আমদানিকারকের) আর্থিক অবস্থার উপর আস্থা থাকে তাহা হইলে ব্যাংক হুতি সাকরণ করিবে। কারণ ব্যাংক হুতি সাকরণ করিলে হুতির মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু মক্কেলের আর্থিক অবস্থার উপর ব্যাংকের আস্থা না থাকিলে ব্যাংক দাবি করিবে যে হুতির মূল্য পরিশোধিত অর্থ ব্যাংকে জমা দেওয়া হউক।

রপ্তানিকারক আমদানিকারকের দেশে হুতি না পাঠাইয়াও পারেন। আমদানিকারক রপ্তানিকারকের দেশের কোনও ব্যাংকের সহিত একরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন যে আমদানিকারকের পক্ষে সেই ব্যাংক হুতি সাকরণ করিবে। হুতি সাকরণকারী ব্যাংক ব্যবসায় বর্তমানে যথেষ্ট প্রসার লাভ করায় আমদানিকারক এই ব্যবস্থা

লইতে পারেন। ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত হওিকে ব্যাংকের হণ্ডি বা বিনিময়পত্র ব্যাংকের হণ্ডি (Bank Bill) বলে। রপ্তানিকারকও এই প্রকার হণ্ডি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে না কারণ ব্যাংকের হণ্ডি ভাঙ্গাইবার খরচ কম এবং হণ্ডির মূল্য আমদানিকারক পরিশোধ না করিলে রপ্তানিকারকের দেশের ব্যাংকই শোধ করিতে বাধ্য থাকে।

যদি রপ্তানিকারক আদায়সাপেক্ষ দলিল হণ্ডি (Documents against Payment Bill) লিখিয়া থাকেন এবং রপ্তানিকারকের দেশের কোন ব্যাংক উহা সাকরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে বাহাতে হণ্ডির মূল্য শোধ না করিয়া আমদানিকারক দলিলাদি না পায় তাহার জন্য আবশ্যকীয় সকল পন্থা ব্যাংক অবলম্বন করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানিকারক হণ্ডির মূল্য শোধ করিতে না পারিলে ব্যাংক বণ্টানিকারককে হণ্ডির মূল্য শোধ করিতে পারে; যদি ব্যাংক মনে কবে যে আমদানিকৃত মাল বিক্রয় করিতে আমদানিকারকের কোনও অস্ববিধা হইবে না এবং মাল বিক্রয় করিয়া আমদানিকারক হণ্ডির মূল্য পরিশোধ করিবে। যদি ব্যাংক রপ্তানিকারককে হণ্ডির মূল্য শোধ করে, তাহা হইলে আমদানিকারকের নিকট হইতে আমদানিকৃত মালে অগ্রাধিকার (Lien) রাখিয়া এবং মাফবিক্রয় করার অধিকার গ্রহণ করিয়া বিশ্বস্ততা প্রমাণক (Trust Receipt) দাবি করিবে। যদি আমদানিকারকের নিকট হইতে এই প্রকার কোন প্রতিভূ গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে বণ্টানিকারকের পক্ষে ব্যাংক মাল গুদামজাত করিয়া রাখিবে এবং মাল সম্বন্ধে কি কর্তব্য সেজন্য রপ্তানিকারকের নির্দেশেব অপেক্ষা করিবে।

ইহাতেও মালের মূল্য আদায় করিতে রপ্তানিকারককে অনেক সময় অপেক্ষা করিতে হয়। বাহাতে এই প্রকার গোণ না হয় সেজন্য ব্যাংকেব মারকতে যে সকল দলিল পাঠান হয় রপ্তানিকারক উহার সহিত একথানা রেহননামা রেহননামা বা বন্ধকপত্র (Letter of Hypothecation) দিয়া দেয়। আমদানিকারক হণ্ডির মূল্য শোধ না করিলে অথবা তাহার ব্যাংক হণ্ডিব মূল্য পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হইলে ব্যাংক রেহননামা বা বন্ধকপত্রের (Letter of Hypothecation) বলে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহার ব্যয় কাটিয়া রাখিয়া রপ্তানিকারককে অর্থ পাঠাইয়া থাকে। রপ্তানিকারক ব্যাংকের অস্থকূলে রেহননামা সম্পাদন করিয়া দিয়া ব্যাংকের নিকট হইতে হণ্ডি ভাঙ্গাইতেও (Discount) পারে। যদি আমদানিকারক মাল পৌছিলে মূল্য পরিশোধ না করে তাহা হইলে ব্যাংক রেহননামার বলে মাল বিক্রয় করিতে পারে এবং হণ্ডির মূল্য আদায় করিতে পারে।

এত সব অস্ববিধা এবং ঝুঁকির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমানে আমদানিকারক রপ্তানিকারকের দেশের কোনও ব্যাংকের সহিত রপ্তানিকারকের অস্থকূলে প্রত্যয়পত্র (Letter of credit) স্থলিবার ব্যবস্থা করে। প্রত্যয়পত্র ব্যাংক প্রত্যয়পত্র দিলে হণ্ডি ব্যাংকের নামেই লিখিত হইবে এবং মালের মালিকানাও প্রাপক দলিল ব্যাংকের নামেই তৈয়ার করিতে হইবে।

যদি বহনপত্রাদি দলিল ব্যাংকের নামে তৈয়ার করিতে অস্বীকার হয় তাহা হইলে বহনপত্র ব্যাংকের নামে পিছন সহি করিয়া দিতে হয় ; এবং আমদানিকারককে ব্যাংকের অস্থূলে রেহননামা (Letter of Hypothecation) সম্পাদন করিয়া দিতে হয়। বহনপত্র ও রেহননামার মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকৃত জবোর উপর নিঃস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যদি আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ না করে তাহা হইলে বহনপত্র ও রেহননামার সাহায্যে ব্যাংক মাল বিক্রয় করিয়া রপ্তানিকারকের পাওনা শোধ করে।

যখন প্রত্যয়পত্রের ব্যবস্থা হয় তখন যে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র (Letter of credit) খোলে, সেই ব্যাংক রপ্তানিকারককে জানাইয়া দেয় যে তাহার অস্থূলে প্রত্যয়-
প্রত্যয়ী পত্রী ঋণ পত্র খোলা হইল। প্রত্যয়পত্র খুলিলে ব্যাংক রপ্তানি-
কারককে বহনপত্র (Bill of Lading), চালান এবং অন্যান্য দলিল হস্তির সহিত ব্যাংকের হাতে সমর্পণ করা হয়। হস্তি ব্যাংকের নামেই লেখা হয়। যদি হস্তি তলবমাত্র দেয় বা দর্শনী হস্তি (Bill payable at sight) হয় তাহা হইলে রপ্তানিকারক দলিল ও হস্তি উপস্থাপিত করিলেই তলবমাত্র দেয় হস্তি মূল্য পাইয়া থাকে। কিন্তু মুদ্ধতী হস্তি (Payable after acceptance on a fixed date) হইলে নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংক হস্তির মূল্য পরিশোধ করে। এইপ্রকার হস্তি ইচ্ছা করিলে রপ্তানিকারক কম মূল্যে সঙ্গে সঙ্গেই ভান্ডাইতে পারে। প্রত্যয়পত্রের সাহায্যে আমদানিকারক ব্যাংকের নিকট হইতে যে ঋণ লয় উহাকে প্রত্যয় পত্রী ঋণ (Documentary credit) বলা হয়। প্রত্যয় পত্রী ঋণ সংগ্রহ করিতে আমদানিকারককে ঋণ দানের জন্য ব্যাংককে দস্তুর (Commission) দিতে হয়।

প্রত্যয়পত্র (Letter of credit) অর্থাৎ প্রত্যয় পত্রী ঋণ (Documentary credit) যদি প্রতিহার (Revoke) বা নাকচ করা যায় তাহা হইলে সেই প্রত্যয়-
প্রত্যয়পত্র পত্রকে বা প্রত্যয় পত্রী ঋণকে প্রতিহার্য ঋণপত্র (Revocable letter of credit) বলে। কিন্তু যদি প্রত্যয়পত্র এক নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত ৬ মাস) মধ্যে নাকচ বা প্রতিহার করা না যায় তাহা হইলে সেই প্রত্যয়পত্রকে অপ্ৰতিসংহার্য প্রত্যয়-
প্রতিহার্য পত্র (Irrevocable or Confirmed letter of credit) বলে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রপ্তানিকারক রপ্তানি মূল্য আদায় করিবার জন্য নিম্নলিখিত যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারে।

রপ্তানি মূল্য আদায়
পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার

১। আমদানিকারকের উপর সরাসরি হস্তি কাটিয়া হস্তির মিয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

২। হস্তি আমদানিকারীর দেশের কোনও ব্যাংকের নিকট পাঠান এবং আমদানিকারক হস্তির মূল্য শোধ করিয়া অথবা হস্তি সাক্ষর করিয়া মালের স্বত্ব প্রমাণক দলিল লইতে পারে।

৩। আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র (Letter of credit) সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন এবং প্রত্যয়পত্রের বলে ব্যাংকের নিকট হইতে বিনা অল্পবিধায় মূল্য আদায় করিতে পারে।

এই তিনটি উপায় ব্যতীত চতুর্থ উপায় হইতেছে যে আমদানিকারক রপ্তানিকারকের দেশের কোনও ব্যাংককে বিনিময়পত্র বা হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে বা ক্রয় করিয়া লইতে অস্বরোধ করেন। এরূপক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সমস্ত দলিল সমেত হুণ্ডি ব্যাংকের নিকট উপস্থাপিত করিলে ব্যাংক হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া মঙ্কেলেব পক্ষে দেয় (Discount)। আমদানিকারক মালের অধিকার পাওয়ার পূর্বে আমদানিকারককে হুণ্ডির মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। যদি কোনও কারণে আমদানিকারক হুণ্ডির মূল্য শোধ করিতে না পারে তাহা হইলে রপ্তানিকারকের নিকট হইতে ব্যাংক হুণ্ডির সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিতে পারে।

তবে অধুনা অজ্ঞাত বীমার মত অনেক দেশেই রপ্তানি মূল্য আদায়ের ঝুঁকিও বীমা করা যায়। যদি আমদানিকারক কোনও কারণে আমদানি রপ্তানি মূল্য বীমা মূল্য পরিশোধ না করে তাহা হইলে বীমা প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই বীমা রাষ্ট্রীয় সংস্থার হাতে। দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটির সুপারিশ অনুসারে (Second Export Promotion Committee) ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার Export Risks Insurance Corporation of India প্রতিষ্ঠা করিয়া রপ্তানি মূল্য আদায়ের ঝুঁকি বীমা করার সুযোগ দিয়াছেন।

তবে বর্তমানে হুণ্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন মিটাইবার পথ সহজ হওয়ায় ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থ প্রেরণ করার আবশ্যক হয় না। হুণ্ডি ক্রয় করিয়াই আমদানির মূল্য শোধ করা হয়। মনে কর, কলিকাতার রপ্তান লগুনের রবার্টের নিকট হইতে ১০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। রপ্তান রবার্টকে যে হুণ্ডি সাকরণ করিয়া দিয়াছে উহা লগুনে শোধ হইবে। এক দেশ হইতে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ না আবার লগুনের উইলিয়মস্ কলিকাতায় বন্ধিমের নিকট হইতে ১০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। উইলিয়মস্ বন্ধিমকে যে হুণ্ডি দিয়াছে উহা কলিকাতায় পরিশোধ হইবে। নিকাপী ঘরের ব্যবস্থার মতই এই দুইখানি হুণ্ডির মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা হইতে পারে।

এই নিয়মে রবার্ট লগুনে উইলিয়মসের নিকট হইতে ১০০০ টাকা আদায় লইবে এবং বন্ধির কলিকাতাতে রপ্তানের নিকট হইতে ১০০০ টাকা আদায় লইবে। উভয় দেশের মধ্যে নগদান অর্থ প্রেরণের কোন প্রয়োজনই উঠে না। উইলিয়মস্ রপ্তানের হুণ্ডিখানা কিনিয়া লইবে এবং

কিন্তু যদি কখন কাহাকেও বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় তাহা হইলেও নগদ অর্থ পাঠান হয় না। বিনিময় ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকের হিসাবে জমা খরচ করিয়া দেনা পাওনা মিটান হয়। মনে কর, উপরের উদাহরণটিতে রঞ্জনের পক্ষে হুণ্ডি ক্রয় করিয়া রবার্টের পাওনা এবং উইলিয়মসের পক্ষে হুণ্ডি ক্রয় করিয়া বকিমের দেনা শোধ করা সম্ভব হইল না। সে-ক্ষেত্রে উভয়কেই নগদ অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে।

রঞ্জন কলিকাতায়, মনে কর, ইষ্টার্ণ ব্যাংকে ১০০০ টাকা জমা দিল এবং ব্যাংককে নির্দেশ দিল যে ঐ অর্থ লগুনে রবার্টকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। ইষ্টার্ণ ব্যাংক উহার লগুনস্থ শাখা অফিস অথবা প্রতিনিধি ব্যাংককে জানাইয়া দিবে যে রবার্টকে বেন ঐ অর্থ দেওয়া হয়। লগুনের শাখা অফিস অথবা প্রতিনিধি ব্যাংক তখন রবার্টের নামে ১০০০ টাকা পাওনা (Credit) করিবে এবং রবার্টকে সংবাদ দিবে। রবার্ট যে কোনও সময়ই ঐ ১০০০ টাকা তুলিয়া লইতে পারে। অল্পরূপভাবে উইলিয়মস্ লগুনস্থ কোনও ব্যাংকে ১০০০ টাকা জমা দিলে সেই ব্যাংকের প্রতিনিধি কলিকাতায় বন্ধিমকে ১০০০ টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করিবে। এই উপায়ে উভয় দেশের মধ্যে নগদ ভর্তুকি প্রেরণ না করিয়াও উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের দেনা পাওনা শোধ হয়।

আমদানিকারক বা স্থানীয় যদি এই উপায়ে দ্রুত অর্থ প্রেরণ করিতে চাহে তাহা হইলে ভারবোণে প্রেরণ বা ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (Telegraphic Transfer or Cable Transfer সংক্ষিপ্ত লিখন T. T.) ব্যবস্থা করিতে পারে। সে-ক্ষেত্রে ব্যাংক ভারবোণে বিদেশস্থ প্রতিনিধি ব্যাংককে পাওনাদারকে অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দিবে। কিন্তু যদি লম্বার অর্থ প্রেরণের 'ডাকবোণে প্রেরণ' আবশ্যিক না হয় তাহা হইলে 'ডাকবোণে প্রেরণের' (Mail Transfer সংক্ষিপ্ত লিখন M. T.) ব্যবস্থা করিবে। ডাকবোণে প্রেরণ লম্বা বটে

কিন্তু রপ্তানিকারক বা পাওনাদারদের অর্থ পাইতে বিলম্ব হয়। তারমোখে প্রেরণে সম্ভব অর্থ প্রেরণ করা যায় বটে কিন্তু উহা ব্যয়সাধ্য।

বিনিময় হার (Exchange rate) : আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্যে মুদ্রার বিনিময় হার স্থিরীকরণের প্রদত্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে ভারতবর্ষের মুদ্রায় ইংলণ্ডের কয়টি মুদ্রা ক্রয় করিতে পারা যায় তাহা স্থির করা প্রয়োজন ; কারণ ভারতবর্ষের মানমুদ্রা টাকা ত আর ইংলণ্ডে বৈধমুদ্রা (Legal Tender) নহে। অতএব ইংলণ্ডে কয়টি মুদ্রার সমান ভারতীয় মুদ্রা তাহা স্থির না হইলে ইংলণ্ডের আমদানি-কারকই বা কিভাবে ভারতের রপ্তানিকারককে মূল্য শোধ

বিনিময় হাব কি ? করিবে ? এই কারণে মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করা প্রয়োজন।

নিজ দেশের মুদ্রা অপার দেশের কয়টি মুদ্রার সমান সেই হারকেই বিনিময় হার বলে। নিজ নিজ দেশ মুদ্রার বিনিময় স্থির করে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একতরফা বিনিময় হার নির্ধারণ সম্ভব নয় বলিয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (International Monetary Fund) সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মুদ্রা বিনিময় হার ঐ তহবিল স্থির করিয়া দেয়। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে সরকারী বিনিময় হার :

১ টাকা = ১ শি. ৬ পে. ; আর ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিনিময় হার ১ পা. = ২৮০ ডলার।

এখন প্রশ্ন ঐ বিনিময় হাব কিভাবে স্থির হয় ? থেয়াল-খুসীমতই কি যখন তখন মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন করা যায় ? যায় না বলিয়াই বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিচার বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন।

(১) **টাকশালী দর (Mint Par of Exchange) :** যখন দুইটি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা একই ধাতুর (Metal) উপর প্রতিষ্ঠিত তখন পারস্পরিক মুদ্রার ধাতুর পরিমাণ (Metallic contents) দ্বারাই বিনিময় হার স্থির করা হয়। মনে কর, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাই স্বর্ণ মান (Gold Standard)। সুতরাং ভারতের একটি মুদ্রায় যে পরিমাণ স্বর্ণ থাকিবে সেই পরিমাণ স্বর্ণ ইংলণ্ডের যে কয়টি মুদ্রায় পাওয়া যাইবে তাহা দ্বারাই উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার স্থির করা হইবে।

ভারতবর্ষের একটি মুদ্রায় যদি ৫ গ্রেণ স্বর্ণ থাকে আর ইংলণ্ডের একটি মুদ্রায় (পাউন্ড) যদি ৭৫ গ্রেণ স্বর্ণ থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হার ১৫ টাকা সমান ১ পাউন্ড।

১ টাকা = ৫ গ্রেণ স্বর্ণ।

১ পাউন্ড পাউন্ড = ৭৫ গ্রেণ স্বর্ণ।

তাহা হইলে ১ টাকায় ৫ গ্রেণ স্বর্ণ থাকিলে ৭৫ গ্রেণ স্বর্ণের একটি মুদ্রা পাইতে হইলে ১৫ টাকা দিতে হইবে।

উদাহরণ

৫ : ১ :: ৭৫ : ?

২৫২৫ = ১৫ টাকা।

যুক্তরাং ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিনিময় হার ১৫ টাকা = ১ ষ্টার্লিং, অর্থাৎ ১ টাকা সমান $\frac{১}{১৫}$ = ১ শি. ৪ পে.। এই ব্যবস্থায় বিনিময় হারকে বলে টাকশালী দর (Mint Par of Exchange)। টাকশালী দর বলার কারণ এই যে মূল্যায় নিহিত ধাতুর পরিমাণের উপরই মূল্যের বিনিময় হার নির্ভর করে। মূল্যায় ধাতুর পরিমাণ কমিয়া গেলেও উহার আন্বিক মূল্য একই থাকে। সেইজন্য যে ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধাতুর মূল্য বাড়িয়া গেলে মূল্যায় ধাতুর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হাইতে পারে। ফলে মূল্যের বিনিময় হার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যদি ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং একটি মূল্যায় ৫ গ্রেণের বদলে ৪ গ্রেণ স্বর্ণ থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডের মূল্যায় স্বর্ণনিহিত (Gold Contents) একই থাকে তাহা হইলে বিনিময় হার হইবে ৪ : ১ :: ৭৫ : ? $= \frac{৭৫}{৪} = ১৮.৭৫$ টা.; অর্থাৎ ১৮ টা. ৭৫ ন. প. = ১ পাউণ্ড। অর্থাৎ, ১ টাকা = ১ শি. ০৮ পে.।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে স্বর্ণ মান পরিহার করা হইয়াছে। এখন আর কোন দেশের মূল্য ব্যবস্থা স্বর্ণ মানে প্রতিষ্ঠিত নহে। তবে আন্তর্জাতিক মূল্য তহবিলের (International Monetary Fund) সদস্য দেশ-গুলির মূল্য ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণ মান (International Gold Standard) বলা হয়। দেশের স্বর্ণের মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া আন্তর্জাতিক মূল্য তহবিল যে বিনিময় হার স্থির করে উহা ঐ তহবিলের সদস্য দেশগুলির উপরই প্রযোজ্য।

(২) স্বর্ণ আগম নির্গম দর (Specie Points or Gold Points) : স্বর্ণ আগম নির্গম দর বিনিময় হার স্থির করে না কিন্তু আমদানি মূল্য হুণ্ডি দ্বারা পরিশোধ করা হইবে কিংবা স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া পরিশোধ করা হইবে তাহা স্বর্ণ আগম নির্গম দ্বারা স্থির হয়। পূর্বে হুণ্ডি ক্রয় করিয়া আমদানি স্বর্ণ আগম নির্গম বিলু মূল্য শোধ করার পদ্ধতি আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ করিতেছি যে হুণ্ডি ক্রয় করিয়া আমদানি মূল্য পরিশোধ করা যায়। মনে কর, ভারতবর্ষ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিনিময় হার ১ ডলার সমান ৪ টাকা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনও রপ্তানিকারকের নিকট ভারতের কোনও আমদানিকারক ৪০০০ টাকা অথবা ১০০০ ডলার ধারে। এখন ভারতের আমদানিকারক ৪০০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া আমদানি মূল্য শোধ করিবে কিংবা ১০০০ ডলার মূল্যের হুণ্ডি ক্রয় করিয়া শোধ করিবে তাহা হুণ্ডি ক্রয় করিয়া শোধ করিলে সম্ভ্য হইবে কিংবা স্বর্ণ পাঠাইলে সম্ভ্য হইবে তাহার উপর নির্ভর করিবে। যদি ৪০০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ আমেরিকাতে পাঠাইতে ১০০ টাকা মাশুল ইত্যাদি ব্যয় হয় তাহা হইলে আমদানি মূল্য পরিশোধ করিতে ৪১০০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু যদি ১০০০ ডলার মূল্যের বিনিময়পত্র ৪১০০ টাকার কম মূল্যে ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে ভারতের আমদানিকারক তাহাই করিবে। কিন্তু যদি ১০০০ ডলার মূল্যের বিনিময়পত্র ৪১০০ টাকার বেশী মূল্যে ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে স্বর্ণ রপ্তানি করিবে। যে দরে বিনিময়পত্র কিনিলে আমদানিকারকের

পক্ষে স্বর্ণ রপ্তানি না করিয়া বিনিময়পত্র ক্রয় করিয়া আমদানি মূল্য শোধ করা সম্ভা
উদাহরণ সেই দরকে বলে স্বর্ণ আগম বিন্দু (Gold Import Point) ।
আর যে দরে বিনিময়পত্র কিনিলে স্বর্ণ রপ্তানি সম্ভা হইবে
সেই দরকে বলা হয় স্বর্ণ নিগম বিন্দু (Gold Export Point) । সুতরাং
বিনিময়পত্র ক্রয় বিক্রয় মূল্যের উপরই স্বর্ণ আগম নিগম বিন্দু নির্ভর করে । বিনিময়-
পত্রের মূল্য স্বর্ণ আগম ও স্বর্ণ নিগম বিন্দু মধ্যে ঘুরিতে থাকে । বিনিময়পত্রের
মূল্য চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে । কোনও দেশের আমদানি রপ্তানি
অপেক্ষা অধিক হইলে বিদেশী বিনিময়পত্রের মূল্য সেই দেশে বাড়িবে কারণ বিনিময়-
পত্রের চাহিদা বাড়িবে, বিপরীত অবস্থায় কমিবে ।

(৩) ক্রয়শক্তি-সমতা (Purchasing Power Parity) : অধিকাংশ
দেশেব মূল্য ব্যবস্থাই অপবিবর্তনীয় কাগজী মূল্য (Inconvertible Paper
Currency) প্রতিষ্ঠিত । এইরূপ অবস্থায় উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার
চাক্ষুশালী দরে স্থির হইতে পারে না । সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে বিনিময় হার
স্থির করার উপায় হিসাবে দেশের মূল্যের ক্রয়ক্ষমতাকে মান
ক্রয়শক্তি সমতা ও (Standard) গণ্য করা হয় । একই দ্রব্য দুই দেশের নিজ নিজ
বিনিময় হার কয়টি মূল্যে ক্রয় করা যায়, উহার অল্পপাভই দুই দেশের মধ্যে
মূল্যের বিনিময় হার । এই তত্ত্বের প্রবর্তক সুইডেনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ গাস্টাভ
ক্যাসেল (Gustav Cassel) ।

ভাবতবর্ষে এক কুইন্টেল গম ক্রয় করিতে ১০ টাকা প্রয়োজন ; কানাডায় এক
কুইন্টেল গম ক্রয় করিতে ২ কানাডা ডলার প্রয়োজন । তাহা হইলে উভয় দেশের
মধ্যে বিনিময় হার ১ কানাডা ডলার = ৫ টাকা । (২ ডলার = ১০ টাকা অর্থাৎ,
১ ডলার = ৫ টাকা) ।

লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে এই ব্যবস্থায় বিনিময় হার মূল্যের ক্রয়ক্ষমতার উপর
নির্ভর করে । মূল্যের ক্রয়ক্ষমতা যদি কোনও দেশে বাড়িয়া যায় অর্থাৎ দ্রব্যের
মূল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে সেই দেশের কম মূল্য দ্বারা তুলনায় বিদেশী মূল্য অধিক
পাওয়া যাইবে । যদি কানাডায় এক কুইন্টেল গমের মূল্য ২ ডলার স্থলে ১ ডলার
হয় তাহা হইলে ভারতের সহিত বিনিময় হার হইবে ১ ডলার =
উদাহরণ ১০ টাকা । ১ ডলার = ১০ × ৫ = ৫০ টাকা । অর্থাৎ বিনিময়
হার ভারতের প্রতিকূল । সুতরাং ক্রয়শক্তি সমতা নীতিতে দেশের মূল্যস্তরের উপর
বিনিময় হার নির্ভর করে ।

এই নীতির আর একটি অঙ্গবিধা এই যে, প্রত্যেক দেশের সূচক সংখ্যা (Index
Number) লইয়া একটি আন্তর্জাতিক মূল্য সূচক সংখ্যা (International Price
Index Number) তৈয়ার না করিলে বিনিময় হার স্থির করা কষ্টকর । আন্তর্জাতিক
মূল্য সূচক সংখ্যা তৈয়ার করাও খুবই দুষ্কর কার্য । সুতরাং এই তত্ত্ব বাস্তবক্ষেত্রে
প্রযোজ্য নহে ।

(৪) মুদ্রার চাহিদা ও বোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory of rate of Exchange) :

মুদ্রার চাহিদা ও বোগান তত্ত্বে বিনিময় হার সাধারণ জ্রব্যের মতই চাহিদা ও বোগানের অবস্থার উপর নির্ভর করে। চাহিদা বাড়িলে মূল্য বাড়ে, চাহিদা কমিলে মূল্য কমে। মুদ্রার চাহিদা আমদানি রপ্তানির উপর নির্ভর করে। যদি কোনও দেশের আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সেই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অধিক, আর রপ্তানি মূল্য আমদানি মূল্য হইতে অধিক হইলে সেই দেশের মুদ্রার চাহিদা বিদেশে অধিক অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও বোগান মুদ্রার চাহিদা স্বল্প। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িলে মূল্যও বাড়িবে; আর বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কম হইলে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য কমিবে। বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য বাড়িলে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে হইলে পূর্বের তুলনায় নিজ দেশের মুদ্রা অধিক দিতে হইবে। আর চাহিদা কম হইলে একই পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিলে পূর্বের তুলনায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে।

উদাহরণস্বরূপ মনে কর, ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের জ্রব্য আমদানি করিয়াছে আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৪০০ কোটি ডলার মূল্যের জ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে। ফলে ভাবতবর্ষে ১০০ কোটি ডলারের চাহিদা বেশী। এ-ক্ষেত্রে যদি দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ১ ডলার=৪ টাকা হয়, তাহা হইলে ডলাবের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১ ডলারের অঙ্ক ৪ টাকার অধিক মূল্য দিতে হইবে। মনে কর, ৪ টাকা ২৫ ন. প. দিতে হইবে। আবার যদি ভারতের রপ্তানির পরিমাণ আমদানি হইতে অধিক হয় তাহা হইলে ডলারের মূল্য কমিবে; অর্থাৎ ৪ টাকায় ১ ডলারের অধিক পাওয়া যাইবে।

বিনিময় হারের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক (Relationship between exchange rate and foreign Trade) :

উপরের আলোচনা হইতে একথা পরিষ্কার হইবে যে বিনিময় হার দেশের আমদানি রপ্তানি অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোনও কারণে মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হইলে দেশের

বিনিময় হারের সঙ্গে আমদানি রপ্তানির অবস্থাও পরিবর্তন হয়। ভারতের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বিনিময় হার ১ টাকা=১ শি. ৬ পে.। কিন্তু বিনিময় হার পরিবর্তন হইয়া ১ টাকা=১ শি. ৮ পে. হইল। ফলে গ্রেট ব্রিটেনে ভারতের জ্রব্যের চাহিদা কমিবে। কারণ গ্রেট ব্রিটেন পূর্বে ১ টাকা মূল্যের জ্রব্য ১ শি. ৬ পে. কিনিতে পারিত, কিন্তু নূতন বিনিময় হারে গ্রেট ব্রিটেনকে ১ টাকার জ্রব্যের অঙ্ক ১ শি. ৮ পে. দিতে হইবে। সুতরাং

গ্রেট ব্রিটেন ভারত হইতে আমদানি সঙ্কোচ করিবে। উদাহরণ কিন্তু যদি বিনিময় হার ১ টাকা=১ শি. ৫ পে. হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডে ভারতের জ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে। কারণ পূর্বে ১ টাকার জ্রব্য কিনিতে দিতে হইত ১ শি. ৬ পে.-এ, কিন্তু বর্তমানে দিতে হইবে ১ শি. ৫ পে.।

‘ হুতরাং মুদ্রার মূল্য কমাইলে রপ্তানি বাড়ে আর বাড়াইলে আমদানি বাড়ে। ভারতবর্ষ রপ্তানি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছিল। মুদ্রার মূল্য হ্রাস করাকে Devaluation of Currency বলে। বাণিজ্য আদানপ্রদান সমতা প্রতিষ্ঠা হইলে মুদ্রা বিনিময় হার কমাইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া অল্পকূল বাণিজ্য উদ্দেশ্যে পৌছানর চেষ্টা করা হয়।

বিনিময়পত্রের বিভিন্ন প্রকার মূল্য : বিনিময়পত্রের মিয়াদ এবং দেশান্তরে বিনিময়পত্রের মূল্য অর্থ আদানপ্রদানের সুবিধা অসুবিধার উপর বিনিময়পত্র ক্রয় বিক্রয়ের দর নির্ভর করে।

(১) **তারযোগে প্রেরণ দর (Telegraphic transfer অথবা Cable transfer) :** পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তারযোগে তারযোগে প্রেরণ মূল্য অর্থ প্রেরণ ব্যয়সাধ্য বটে কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থ আদানপ্রদান হয়। যদি বিনিময়পত্রের মূল্য তারযোগে পরিশোধযোগ্য হয় তাহা হইলে সেই বিনিময়পত্রের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ, এই প্রকার বিনিময়পত্র ভাঙ্গাইতে হইলে ভান্সানি দিতে হয় খুব কম।

(২) **দর্শনী দর (Sight Rate) :** দর্শনী হুণ্ডিব মিয়াদ দর্শনান্তর ৩ দিন। হুতরাং হুণ্ডিগ্রাহক (Acceptor) হুণ্ডির মূল্য পরিশোধ দর্শনী হুণ্ডিব মূল্য করিতে ৩ দিনের সময় পায় বলিয়া তারযোগে প্রেরণ দর হুণ্ডির চেয়ে ইহার মূল্য কিছু কম। ইহাতে তারযোগে প্রেরণ দর হুণ্ডি হইতে ভান্সানি মূল্য (Discount) কিছু বেশী দিতে হয়।

(৩) **অল্পমিয়াদী দর (Short Rate) :** যে সকল হুণ্ডির মিয়াদ ১০ দিনের অনূর্ধ্ব উহাকে অল্পমিয়াদী হুণ্ডি বলে। উহার মূল্য দর্শনী হুণ্ডির অপেক্ষাও কম। অর্থাৎ, হুণ্ডি ভাঙ্গাইলে দর্শনী হুণ্ডি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বাট্টা বা ভান্সানি দিতে হয়।

(৪) **দীর্ঘমিয়াদী দর (Long Rate) :** যে সকল হুণ্ডির মিয়াদকাল দর্শনান্তর ২০ দিন উহাকে দীর্ঘমিয়াদী হুণ্ডি বলে। উহার দর সর্বাপেক্ষা কম। অর্থাৎ, সেইরূপ হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে হইলে বাট্টা বা ভান্সানি সর্বাপেক্ষা অধিক দিতে হয়।

(৫) **আংশিক হার দর (Tel quel rate) :** আংশিক হার দরে যে হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় হয় উহার বাট্টা বা ভান্সানি দর অল্পমিয়াদীও নহে আবার দীর্ঘমিয়াদীও নহে। অল্পমিয়াদী বাট্টার হার ৩ মাস মিয়াদের হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার দর। আর দীর্ঘমিয়াদী বাট্টার হার ৯ মাস মিয়াদের হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার দর। কোনও হুণ্ডি যদি অল্পমিয়াদীও না হয় অথবা দীর্ঘমিয়াদীও না হয় তাহা হইলে সেই হুণ্ডি ক্রয়ের ক্ষত্রেই আংশিক হারের প্রয়োগ করা হয়। কোনও বিনিময়পত্রের মিয়াদ ৬ মাস কিংবা

৪ মাস অতিবাহিত হওয়ায় পর হুণ্ডির মালিক সেই হুণ্ডি বিক্রয় করিতে চাহিলে বাট্টা কি হারে স্থির করা হইবে। ২ মাসের বাট্টার হার স্বল্পমিয়াদী নহে আবার দীর্ঘমিয়াদীও নহে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত উভয় পক্ষের মধ্যে দর কষাকষি করিয়া বাট্টার হার স্থির করা হয়। তবে দর কষাকষি হইলেও বাট্টার হার কখনও স্বদের হারের বেশী হয় না। সুতরাং চলতি স্বদের হারে বিনিময়পত্র ক্রয় বিক্রয় করিলে উহাকে বলে আংশিক হার দর।

(৬) অগ্রিম চুক্তি দর (**Forward contract rate**) : যে দিনে রপ্তানিকারক দ্রব্য রপ্তানি করিবে এবং যে দিনে আমদানিকারক দ্রব্য পাইবে, দুই দিনের মধ্যে বিনিময় হার পরিবর্তন হইলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। যাহাতে অন্তর্বর্তীকালে বিনিময়হার পরিবর্তনের ফলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক কাহারও ক্ষতি না হয় সেজন্য আমদানি রপ্তানি চুক্তির সংগে সংগে কি বিনিময় হারে আমদানি মূল্য পরিশোধ করা হইবে তাহা আমদানিকারক রপ্তানিকারকের সহিত অগ্রিম চুক্তি করিয়া স্থির করিতে পারে। অগ্রিম চুক্তি বিনিময় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই (**Exchange bank**) সম্পাদিত হয়। এইরূপ চুক্তি দ্বারা বিনিময় হার স্থির করা হইলে উহাকে অগ্রিম চুক্তি দর (**Forward contract rate**) বলে।

(৭) হুণ্ডি আদায়ী দর (**Bill Collection Rate**) : রপ্তানিকারক আমদানিকারকের দেশে হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র পাঠাইলে যে হারে বিনিময়পত্রের মূল্য আদায় হইবে উহাকেই হুণ্ডি আদায়ী দর বলে। অগ্রিম চুক্তি দরে রপ্তানি মূল্য শোধ হওয়ার চুক্তি না থাকিলে যে তারিখে হুণ্ডি মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে সেই তারিখে বাজারের অবস্থা অনুযায়ী যে বিনিময় হার স্থির হয় সেই হারেই হুণ্ডি আদায় করা হয়। উহাই হুণ্ডি আদায়ী দর (**Bill collection rate**)।

অন্তর্গণন কারবার (**Arbitrage Operation**) : বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত থাকিলেও একই সময়ে দুই বাজারে বিনিময় হারের পার্থক্য দেখা যায়। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিনিময় হার ১ টাকা = ১ শি. ৬ পে.। কিন্তু কোনও দিনে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হয়ত ১ টাকায় ১ শি. ৭ পে. কিনিতে পারা যায়, আবার সেই সময়েই ইংলণ্ডের বাজারে হয়ত ১ টাকার মূল্য ১ শি. ৬ ½ পে.। এইভাবে মুদ্রার বিনিময় হার নিতাই পরিবর্তন হয়। বিনিময় হার যে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে সে-কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং বাজারের সাধারণ পণ্যের মতই মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের অবস্থা পরিবর্তন হয় এবং উহার কলাকল মুদ্রার বিনিময় হারে প্রতিফলিত হয়। পণ্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া যেমন ব্যবসায়ী লাভ করিতে পারে; বৈদেশিক

মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়াও ব্যবসায়ী লাভ করিতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের কারবারকে অন্তর্পন (Arbitrage) কারবার বলে। ইহাতে একই সময়ে একাধিক বাজারে মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করা হয়। তারযোগে-প্রেরণ দ্বারা মূল্য আদান-প্রদান হয়। উপরে দেখান হইয়াছে একই সময়ে দুই দেশের মুদ্রা দুই বাজারে দুই দরে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। অন্তর্পন ব্যবসায়ী বিনিময় হারের তারতম্যের সুযোগ পাইতে পারে। তবে এই প্রকার ব্যবসায় খুব সতর্কতার সহিত করিতে হয়। অধুনা অন্তর্পনের পরিধি অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছে, কারণ মুদ্রা স্থানান্তরকরণ এখন আর অবাধ নহে; সরকার নিয়ন্ত্রিত।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। তিনটি দেশের মুদ্রায় ব্যবসায় করা হইবে। ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের এবং আমেরিকার। মনে করা যাউক, মুদ্রা বিনিময় হার, ১ টাকা = ১ শি. ৬ পে. ; ১ ষ্টার্লিং = ৪ ডলার এবং ১ ডলার = ৫ টাকা। কিন্তু কোনও একদিনে :

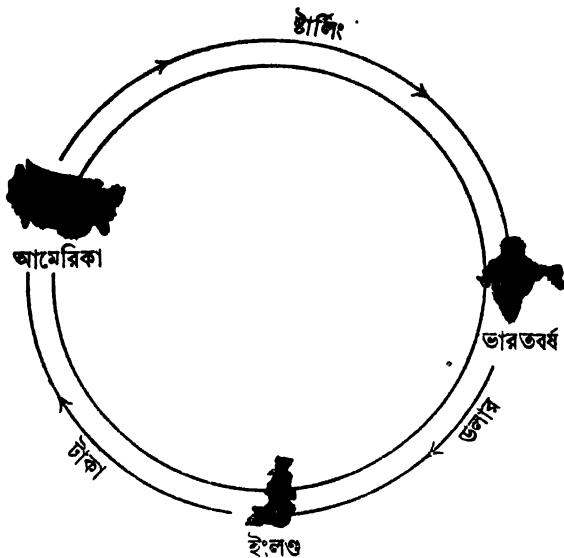
ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার	{	৫ টাকা = ১ ডলার ২০ সেন্ট, এবং
বাজার দর		১ টাকা = ১ শি. ৫ পে.

ইংলণ্ডে বৈদেশিক মুদ্রার	{	১ ষ্টার্লিং = ৩ ডলার ৮০ সেন্ট, এবং
বাজার দর		১ শি. ৫ পে. = ১ টাকা

আমেরিকায় বৈদেশিক মুদ্রার	{	১ ডলার = ৪ টাকা ৮০ ন. প., এবং
বাজার দর		৪ ডলার = ১ পা. ৪ শি.

উপরের উদাহরণটিকে লক্ষ্য করিবে যে ভারতবর্ষের মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে ডলার সস্তা এবং ষ্টার্লিং-এর মূল্য বেশী; ইংলণ্ডের বাজারে টাকা সস্তা এবং ডলারের মূল্য বেশী এবং আমেরিকার বাজারে টাকার মূল্য বেশী এবং ষ্টার্লিং সস্তা। যদি কোন ব্যবসায়ী একই সময়ে তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বাজারে মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাকে ভারতে ডলার ক্রয় করিয়া (কারণ এখানে উহা সস্তা) - তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রয় করিতে পারে, আবার ইংলণ্ডের বাজারে টাকা ক্রয় করিয়া আমেরিকার বাজারে বিক্রয় করিতে পারে; এবং আমেরিকার বাজারে ষ্টার্লিং ক্রয় করিয়া ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। একই সময়ে ক্রয় বিক্রয় করিতে না পারিলে হয়ত ব্যবসায়ী লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে।

নিম্নের চিত্র দুইটির সাহায্যে অন্তর্গমন পদ্ধতি দেখান হইল



বাজার	সস্তায় ক্রয়	লাভে বিক্রয়
ভারতবর্ষ	ডলার	টাকিং
ইংলণ্ড	টাকা	ডলার
আমেরিকা	টাকিং	টাকা

চেক, বিনিময়পত্র এবং প্রত্যর্থপত্র (Cheque, Bill of Exchange and Promissory notes) : দেশে প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীতও কতিপয় দলিল আছে যাহা টাকার মতই ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ পাওনাদারের দেনা শোধ করিতে ব্যবহার করা যায়। চেকের এবং বিনিময়পত্রের কার্য পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চেকদাতার উপর অথবা বিনিময়পত্র সাক্ষরকারীর (Acceptor) উপর বিশ্বাস থাকিলে চেক অথবা বিনিময়পত্র দ্বারা লেনদেন সহজ একথা তোমরা দেখিয়াছ। আরও একপ্রকার দলিল চেক এবং বিনিময়পত্রের মতই লেনদেনে গ্রহণ করা হয় এবং উহাও দাতার আর্থিক সম্বলতার উপর আস্থা থাকিলেই গ্রহণ করা হয়। উহাকে দলিল প্রত্যর্থপত্র (Promissory notes)।

বিনিময়পত্রের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

“Bill of Exchange is an unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand, or at a fixed or determinable future time, a certain sum of money

to or to the order of a specified person or to the bearer.” অর্থাৎ বিনিময়পত্র একপ্রকার দলিল বাহাতে এক

বিনিময়পত্র

ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক ব্যক্তির উপর ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট দিনে অথবা সময়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার অপ্রতিবন্ধ বা বিনাসর্ত লিখিত নির্দেশ থাকে।

Bill of Exchange

Rs. 1000 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 40px;">Stamp</div>	50, Pool Street Calcutta-3 West Bengal India. 1st November, 1961 Three months after sight pay to the order of R. N. Mitra the sum of Rupees One Thousand value received. M. C. Ghosh Bristol Rondon (Drawer)
---	---

এই বিনিময়পত্রের খসড়া পাওনাদার (Creditor) দেনাদারের (Debtor) নিকট পাঠাইবেন। দেনাদার উহা সাকরণ না করিলে কার্যকরী হয় না। তাই তিনি উহা সাকরণ (Accept) কবিয়া পাওনাদারের নিকট পাঠাইবেন। সাকরণ হওয়ার পর বিনিময়পত্র নিম্নরূপ হইবে।

Rs. 1000 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 40px;">Stamp</div>	50, Pool Street Calcutta-3 West Bengal India. <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">Accepted (4) M. C. Ghosh</div> </div>	(1) & (4) sight pay to the order of (6) Rupees One Thousand (2) Rondon (Drawer)
(5) Three months after (7) R. N. Mitra the sum of value received (3) M. C. Ghosh Calcutta		

উপরের বিনিময়পত্রখানি লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে উহাতে নিম্নলিখিত সর্ভস্বই রহিয়াছে। (সর্ভস্বনি ১, ২, ৩ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হইল।)

১। বিনা সর্ত বা অপ্রতিবন্ধ নির্দেশ—কোনও 'যদি এবং কিন্তু' (if or but) থাকিবে না।

২। এক ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তির উপর নির্দেশ দিবে (2 and 3)। এখানে Rondon (2); M. C. Ghosh (3) কে নির্দেশ দিতেছে। Rondon বিনিময়পত্র কর্তা (Drawer) এবং M. C. Ghosh হুণ্ডিগ্রহীতা (Acceptor or Drawer)।

৩। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিনিময়পত্রের অর্থ দিতে হইবে। এ-ক্ষেত্রে R.N. Mitra (7) অথবা তাহার আদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করার নির্দেশ আছে।

৪। নির্দিষ্ট তারিখে (5) বিনিময়পত্রের মূল্য শোধ করিতে হইবে। দর্শনাস্তর ৩ মাস। (অবশ্য ৩ দিন রেয়াতকাল বা অমুগ্রহ দিবস (Days of Grace) পাওয়া যাইবে।) নির্দিষ্ট তারিখ বলিতে, নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে পরিশোধ্য সে কথাও বুঝায়। যেমন যদি বলা হয় after death of P. K. Sen Pay... তাহা হইলেও উহা আইন-সিদ্ধ, কারণ পি. কে. সেন একদিন মরিবেনই কিন্তু যদি লেখা হয় after a son has been born to P. K. Sen...; তাহা হইলে উহা আইনসিদ্ধ নহে কারণ পি. কে. সেনের পুত্র জন্মিতে পারে, না-ও জন্মিতে পারে। সুতরাং ঘটনার নিশ্চয়তা নাই।

৫। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (6) প্রদান করিতে হইবে। এ-ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা।

বিনিময়পত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bill of Exchange) :

- ১। বিনিময়পত্র অবশ্য স্বীকৃত (Accepted) হইতে হইবে।
বৈশিষ্ট্য
২। ইহা একখানি ত্রিপক্ষীয় দলিল। তিনটি দল—হুণ্ডিকারক (Drawer), হুণ্ডিগ্রাহক (Acceptor) এবং প্রাপক (Payee)। ৩। বিনিময়পত্র পিছন সহি করিয়া হস্তান্তরযোগ্য (Negotiable by endorsement)।

চেক ও বিনিময়পত্র (Cheque and Bill of Exchange) :

বিনিময়পত্র বলা হয় কারণ ইহাও বিনিময়যোগ্য (Transferable)। তবে চেকে আদেশ দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের উপর এবং চেকের অর্থ-তলব মাত্রই দেয়। "A Cheque is a Bill of Exchange drawn on a banker, payable on demand."

চেকও ত্রিপক্ষীয়। চেকদাতা, চেকগ্রহীতা অর্থাৎ চেকের অর্থপ্রাপক (Payee) এবং ব্যাঙ্ক—যাহার উপর অর্থ প্রদানের আদেশ থাকে। চেক, বিনিময়পত্রের মত গৃহীত হইতে হয় না তবে চেকে পিছন সহি (endorsement) করিয়া হস্তান্তর যোগ্য। চেক বাহক (Bearer) চেক হইতে পারে কিংবা আদিষ্ট (order) চেকও হইতে পারে। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, চেক দেওয়া হয় দেনাদার কর্তৃক।

পাওনাদারকে কিন্তু বিনিময়পত্র লেখা হয় পাওনাদার কর্তৃক। চেকের আদেশ সর্বদাই ব্যাঙ্কের উপর থাকে। চেকের উপর কোনও স্ট্যাম্প দরকার হয় না।

Cheque

5. 4. 61	5th April, 1961
No. A 500306	UNITED BANK OF INDIA LTD.
Payee :	College Street Branch.
R. N. Mitra	No. A 500306
value, Rs 300.	Pay R. N. Mitra or bearer/order Rupees
	Three Hundred only.
	M. C. Ghose
	Rs. 300.00

বিনিময়পত্র ও প্রত্যর্থপত্র (Bill of Exchange and Promissory Note) : ব্যাঙ্কের কার্খাঙ্গী আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশের ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা বা ১০০ টাকা মূল্যের নোটকে সরকারের প্রত্যর্থপত্র (Promissory Note) বলে, কারণ উহাতে সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকে যে নোটে বর্ণিত অর্থ (মুদ্রা) তলবমাত্র ফেরত দেওয়া হইবে। অল্পরূপভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যবসায়ী ধারে ক্রয় করিতে পারে অথবা ধার করিতে পারে। যখন ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়া ধারে ক্রয় করা হয় অথবা ধার গ্রহণ করা হয় তখন তাহাকে বলে প্রত্যর্থপত্র। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রত্যর্থপত্র (Promissory Note) বলিতে ধারে লেনদেনের জন্ত যে প্রত্যর্থপত্র দেওয়া হয় তাহাকেই বুঝায়। উহার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

Promissory Note

Stamp	Rs. 1000	30, Woodburn Park Calcutta-1. 5th May, 1961
Three months after date I promise to pay Tarapada Chakraborty or order the sum of Rupees One Thousand for value received.		
Santilal Mukherjee		

উপরের প্রত্যর্থপত্রখানা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে বিনিময়পত্র ও প্রত্যর্থপত্রের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। বিনিময়পত্রের মতই কোন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট

ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার উল্লেখ থাকে প্রত্যর্থপত্রে। কিন্তু বিনিময়পত্রে তিন পক্ষ থাকে কিন্তু প্রত্যর্থপত্রে দেনাদার (এক্ষেত্রে শান্তিলাল মুখার্জি) পাওনাদারকে (এক্ষেত্রে তারাপদ চক্রবর্তীকে) নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয় মাত্র। সুতরাং প্রত্যর্থপত্রে দুই পক্ষ থাকে। বিনিময়পত্রের মত প্রত্যর্থপত্র সাকরণ করার (Accept) প্রয়োজন হয় না। বিনিময়পত্রের অন্টাগ সকল সর্বই প্রত্যর্থপত্রে বিদ্যমান। ইহাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাহার কোন আদিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার অপ্রতিবন্ধ (Unconditional) নির্দেশ থাকিলেও উহা প্রতিশ্রুতি মাত্র।

বিনিময়পত্রের মত প্রত্যর্থপত্রও পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করা যায়। বিনিময়পত্র লেখকের (Drawer) দায় গোণ। অর্থাৎ বিনিময়পত্র ভান্কাইয়া অর্থ সংস্থান করা হইলেও হণ্ডি সাকরণকারী (Acceptor) অর্থ শোধ না করিলেই তাহার হণ্ডির অর্থ শোধ করার দায়িত্ব জন্মে কিন্তু প্রত্যর্থপত্রে দাতার (Maker) মুখ্য দায়িত্ব কারণ তিনিই মূল্য শোধের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। যদি গ্রহীতা প্রত্যর্থপত্রের বদলে ধার লইয়া থাকে তবে তাহার দায়িত্ব গোণ অর্থাৎ প্রত্যর্থপত্র দাতা শোধ না করিলে তাহার দায় জন্মায়।

বিনিময়পত্রের প্রকার (Different Kinds of Bill of Exchange) :
আমরা বিনিময়পত্র সম্বন্ধে আলোচনা বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি মূল্য পরিশোধের উপায় হিসাবেই বিবেচনা করিয়াছি। নিজ নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও বিনিময়পত্র বা হণ্ডির আদানপ্রদান করিয়া ব্যবসায় চলে। একই দেশের অধিবাসী দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে লেনদেনের ফলে যে বিনিময়পত্র তৈয়ার হয় উহাকে বলে অন্তর্দেশীয় বিনিময়পত্র (Inland Bill of Exchange)। অন্তর্দেশীয় বিনিময়পত্রের মূল্য দেশাভ্যন্তরেই পরিশোধ করিতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্ভূত বিনিময়পত্রের (Foreign Bill of Exchange) সহিত অন্তর্দেশীয় বিনিময়পত্রের অণ্ড কোন পার্থক্য নাই।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে কোন আর্থিক লেনদেন হয় না, অথচ বিনিময়পত্র তৈয়ার হয়। মনে কর, তুমি একজন ব্যবসায়ী এবং তোমার উপযোজক বা হুপারিশী হণ্ডি বন্ধু কান্তিপ্রসাদ একজন ব্যবসায়ী। তোমার বন্ধু কান্তিপ্রসাদ তোমার নিকট ২০০০ টাকা ধার চাহিলেন। তোমার নিকট নগদ অর্থ নাই, অথচ তোমার বন্ধুকে সাহায্য করার ইচ্ছা তোমার আছে। তুমি তাহাকে বলিতে পার আমার ত ভাই অর্থ নাই; তুমি বরং আমার উপর একখানা বিনিময়পত্র লিখ, আমি উহা সাকরণ (Accept) করি, তুমি উহা (বাট্টা দিয়া) ভান্কাইয়া অর্থ লও। তিনি উহাতেই রাজী হইলেন এবং তোমার উপর ২০০০ টাকার জ্ঞাত বিনিময়পত্র লিখিলেন। তুমি উহা সাকরণ করিয়া তাহার নিকট ফেরত পাঠাইলেই তিনি উহা ভান্কাইয়া অর্থের সংস্থান করিলেন।

এই প্রকারে বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যতীত, কোন ব্যবসায়ীর অস্থরোধে কোনও বিনিময়পত্র তৈয়ার হইলে সেই বিনিময়পত্রকে স্থপারিশী অথবা উপযোজক হণ্ডি বিনিময়পত্র (Accommodation Bill) বলে।

ঋণ স্বীকার (I. O. U.): অনেক সময় শুনিয়া থাকিবে যে একজন অপয় একজনকে I. O. U. দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। ইহা বস্তুত কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিল নহে। ইহা ভান্ধাইয়া ঋণ গ্রহণ করা যায় না। ইহা কোন পাওনা-দারকে হস্তান্তর করিয়া দেনা শোধ করা যায় না। ইহা কেবল-
* ঋণ স্বীকার মাত্র ঋণ স্বীকার। দেনাদার পাওনাদারের ঋণ স্বীকার করিয়া যে 'রসিদ' দেয় উহাকে ঋণ স্বীকার বলা যায়। নীচে I. O. U. এর নমুনা দেওয়া হইল। ইহা I owe you এর সংক্ষিপ্ত লিখন।

5th July, 1961

I owe you Rupees Three Hundred only.

Sudhir Dutta

To,

Sri Jyotirmoy Bhar

Calcutta

লক্ষ্য করিলে দেখিবে উহা কবে, কোথায়, কাহাকে প্রদত্ত হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। উহাতে 'I owe you Rupees Three Hundred only' লেখার পর 'and promise to pay 2 months after date' জুড়িয়া দিলেই উহা প্রত্যর্থপত্রে (Promissory Note) পরিণত হয়।

বিনিময়পত্রের ব্যবহার (Use of Bill of Exchange): বিনিময়পত্র সাকরণ হওয়ার পর পাওনাদারের হাতে আসিলে তিনি উহা নানাভাবে ব্যবহার করিতে পারেন।
শীকৃত বিনিময়পত্রের ব্যবহার প্রথমত, তিনি মিয়াদ কাল পর্যন্ত বিনিময়পত্র নিজের হাতে রাখিয়া দিতে পারেন। মিয়াদ অস্তে বিনিময়পত্রের অর্থ আদায় করিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে যেমন দেনাদারের নিকট হইতে পাওনা বাবদ বিনিময়পত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার নিজের পাওনাদারকে পাওনা শোধ করিবার জন্ত পিছন সহি করিয়া হস্তান্তর করিতে পারেন। অবশ্য যদি তাহার পাওনাদার ঐ বিনিময়পত্র গ্রহণ করেন।
উল্লেখ করা নিম্নপ্রয়োজন যে পাওনাদার যদি ঐ বিনিময়পত্র ভান্ধাইয়া অর্থ লইয়া থাকেন কিন্তু যদি নির্দিষ্ট দিনে বিনিময়পত্রগ্রাহক (Acceptor) অর্থ পরিশোধ

না করেন তাহা হইলে পাওনাদার তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিবেন।

তৃতীয়ত, বিনিময়পত্রের অধিকারী যদি অর্থের প্রয়োজন বোধ করেন তবে তিনি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বাট্টা দিয়া ভান্ডাইয়া লইতে পারেন। বাট্টা দিয়া ভান্ডাইলে অবশ্য নগদান বিনিময়পত্রের মূল্য হইতে কিঞ্চিৎ কম অর্থ পাইবে।

ভান্ডাইয়া ধার লওয়া

কারণ বিনিময়পত্র ভান্ডানকারী বাট্টার মূল্য বিনিময়পত্রের মূল্য হইতে বাদ কাটিয়া বাকী অর্থ দিবে। মনে কর তুমি রামের নিকট হইতে ৪ মাস মিয়াদে ৬০০ টাকার একখানা বিনিময়পত্র পাইয়াছ। ঐ বিনিময়পত্রখানা ভান্ডাইয়া তুমি অর্থের সংস্থান করিতে চাহ। তোমার ব্যাঙ্কের নিকট ঐ বিনিময়পত্র উপস্থিত করিলে ব্যাঙ্ক বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে বাট্টা বা স্বদ দাবী করিল। তুমি তাহা

$$\text{হইলে নগদ পাইবে } ৬০০ - \left(\frac{৫}{১০০} \times \frac{৪}{১২} \times ৬০০ \right) = ৬০০ - ১০$$

বাট্টার হার

$$= ৫২০। \text{ প্রাপ্ত করিতে পার তুমি } ১০ \text{ টাকা কম পাইয়া বিনিময়-}$$

পত্র ব্যাঙ্কে দিলে কেন। তুমিত বিনিময়পত্রের পরিবর্তে ঋণ গ্রহণ করিলে। স্বতরাং ঋণের স্বদ ব্যাঙ্ক কাটিয়া রাখিল। বিনিময়পত্রের উপর যে বাট্টা গ্রহণ করা হয় উহা প্রকৃত বাট্টা (True Discount) নহে। উহাকে বলা হয় ব্যাঙ্কের বাট্টা (Banker's Discount)। যে বিনিময়পত্র ভান্ডান হইল উহাতে যদিও শতকরা ৫ টাকা হারে স্বদ লওয়া হইয়াছে তথাপি যিনি বিনিময়পত্র ভান্ডাইলেন তিনি শতকরা ৫ টাকার অধিক স্বদ দিয়াছেন। কারণ তিনি পাইয়াছেন ৫২০ টাকা। ৫২০ টাকা পাইতে তাহাকে ১০ টাকা স্বদ দিতে হইয়াছে। স্বতরাং স্বদের হার বার্ষিক শতকরা ৫.০৮।

৪ মাসে ৫২০ টাকার স্বদ ১০ টাকা

১ বৎসরে ১০০ ,, ,, ?

৩

$$\frac{১৮}{৫২৮} \times \frac{১২}{৪} \times ১০০ = \frac{৩০০}{৫২} = ৫.০৮$$

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈদেশিক বিনিময়পত্র অনাদৃত (Dishonoured) হইলে বিনিময়পত্রের নিয়মাত্মসার স্বত্ববানের (অর্থাৎ যিনি বিনিময়পত্রের মূল্য আদায়ের জন্য উপস্থিত করেন) অবশ্যই লেখ্য প্রামাণিকের কার্যালয়ে (Notary Public) বিনিময়পত্র নিকরাই (Noting) করিতে হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে দর উল্লেখ (Quotation in Foreign Trade) :

দর উল্লেখ যে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তিতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে বিক্রেতার নিকট দ্রব্যের দর জ্ঞানিতে চাহেন। বিক্রেতা দর উল্লেখ করিলে যদি তাহা ক্রেতা গ্রহণ

করেন তাহা হইলেই দ্রব্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দর উল্লেখ কালে কি দর উল্লেখ হারে বাট্টা দেওয়া হইবে, কবে মালখালাস দিতে পারিবে ইত্যাদির উল্লেখও থাকে। উপরন্তু, বিক্রেতার ঘর হইতে ক্রেতার ঘরে মাল বহন করার ব্যয় কে বহন করিবে, অথবা মাল বহন করার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে এই সকল বিষয়ের উল্লেখও দর উল্লেখ পত্রে (Quotation) জ্ঞাপন করিতে হয়।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের দর উল্লেখের উদাহরণ দেওয়া হইল :

১০০ টাকা বহন মাণ্ডুল এইরূপে দর উল্লেখ করা হইলে ক্রেতাকে বুঝিতে
 \ পরিশোধ (Rs. 100 Carr. হইবে, মালের দরের মধ্যে ১০০ টাকা মাল বহন
 Pd.) করার ব্যয় এবং উহা দরের মধ্যে ধরা হইয়াছে।
 সুতরাং ক্রেতা দর গ্রহণ করিলে, বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে মাল বিলি দিবে এবং উহার বাবদ ক্রেতাকে আর অতিরিক্ত কোন ব্যয় বহন করিতে হইবে না।

মাণ্ডুল দেয় Carriage এই ক্ষেত্রে মালের দরে বহন মাণ্ডুল ধরা হয়
 Forward (Carr. frd.) অথবা নাই এবং বহন মাণ্ডুল ক্রেতাকে বহন করিতে হয়।
 Carriage Extra (Carr. Ext.)

Free Alongside Ship
 F. A. S.

জাহাজ পর্যন্ত মাল পৌঁছাইবার ব্যয় যদি দরের মধ্যে ধরা হয় তাহা হইলে তাহাকে বুঝায়। জাহাজে মাল তুলিতে অগাধ ব্যয় ক্রেতাকে বহন করিতে হয়। জাহাজ যদি জেটিতে ভিড়িতে পারে তাহা হইলে উহাতে Free Alongside Quayও বুঝায়। কিন্তু জাহাজ জেটিতে ভিড়িতে না পারিয়া হয়ত মাঝ দরিয়ায় রহিল, সে-ক্ষেত্রে জেটি হইতে নৌকায় বা বজরায় মাল জাহাজের পাশে নিবার ব্যয় ক্রেতাতে বহন করিকে হয়—যদি Free Alongside Ship না লিখিয়া Free Alongside Quay লেখা হয়।

Free on Rail
 (F. O. R.) অথবা
 Free on Wagon
 (F. O. W.)

মাল জাহাজে না পাঠাইয়া রেল গাড়ীতে পাঠাইতে হইলে রেল গাড়ীতে মাল তুলিয়া দেওয়ার সমস্ত ব্যয় যদি বিক্রেতা বহন করে তবে F. O. R. দর উল্লেখ করে। ইহাকে Free on Wagon (F. O. W.) দরও বলে।

Free on Board
 (F. O. B.)

যদি জাহাজে মাল পাঠান হয় এবং জাহাজে মাল তুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় বিক্রেতাকে বহন করিতে হয়, সেই দরকে Free on Board (F. O. B.) অথবা Free on Ship

Free on Ship
 (F. O. S.)

(F. O. S.) দর বলে।

Cost, Insurance, Freight
(C. I. F.)

এই প্রকার দর উল্লেখ করিলে বীমার চাঁদা এবং জাহাজের মাণ্ডল বিক্রেতা বহন করে। কিন্তু যদি বীমার চাঁদা ক্রেতাকে বহন করিতে হয় তাহা হইলে সে দরকে বলা হয় Cost and Freight (C. F.)। আবার যদি ক্রেতাকে বহন মাণ্ডল দিতে হয় তাহা হইলে দর হইবে Cost and Insurance (C. I.)।

Ex. Works অথবা

Ex. Warehouse

ইহাতে গুদাম ঘর হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছাইবার সকল ব্যয়ই ক্রেতাকে বহন করিতে হয়।

Loco

ইহাও Ex. Works এর অধরূপ। তবে মাল যদি বিক্রেতার নিজ গুদামে না থাকে তাহা হইলে যে স্থান হইতে মাল খালাস দেওয়া হইবে সেই স্থান হইতে ক্রেতার ঘরে পৌছিতে সমস্ত ব্যয়ই ক্রেতাকে বহন করিতে হয়।

Franco অথবা

Rendu অথবা

Free Delivery

বিক্রেতা ক্রেতার ঘরে মাল পৌছাইয়া দিবার সমস্ত ব্যয়ই যদি বহন করে এবং সে-ক্ষেত্রে সে দ্রব্যের যে দর উল্লেখ করিবে তাহা বুঝাইতে ইহার ব্যবহার করা হয়।

Exercises

1. What are the difficulties connected with payment in foreign trade as contrasted with home trade.

অন্তর্বাণিজ্যের তুলনায় বহির্বাণিজ্যের মূল্য আদানপ্রদানে কি কি অসুবিধা?

2. What functions are performed by Foreign Bill of Exchange?

বৈদেশিক বিনিময়পত্র বা হুজি কি কায সম্পাদন করে?

3. How does a bank granting Letter of Credit safeguards itself against non-payment of dues by an impoter?

আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ না করিলে প্রত্যয়ী ঋণ বা প্রত্যয়পত্র দাতা ব্যাঙ্ক কিতাবে ঝুঁকি সংরক্ষিত করে?

4. What is a letter of Credit? Is it necessary?

প্রত্যয়পত্র কি? ইহার আবশ্যিকতা কি?

5. What is the difference between a D/A Bill and a D/P Bill?

আদায় সাপেক্ষ হুজি এবং সাধারণ সাপেক্ষ হুজির মধ্যে পার্থক্য কি?

6. Explain : (a) Revocable letter of Credit : (b) Irrevocable letter of Credit : (c) Letter of Hypothecation.

ব্যাখ্যা কর : (ক) প্রত্যাহার্য প্রত্যয়পত্র; (খ) অপরিহার্য প্রত্যয়পত্র; (গ) রেহনদান।

7. How can debts between two countries be settled without payment of money? How can funds be transferred from one country to another?

দুই দেশের মধ্যে অর্থ প্রেরণ না করিয়াও দেনাপাওনা কি উপায়ে পরিশোধ হইতে পারে? এক দেশ হইতে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণের উপায় কি?

8. Write short notes on : (a) Forward contract ; (b) Specie point ; (c) Mint par of Exchange ; (d) Arbitrage operation ; (e) Accommodation Bill ; (f) I.O.U..

সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) অগ্রিম চুক্তি ; (খ) স্বর্ণ বিন্দু ; (গ) টাকশালা দর ; (ঘ) অন্তর্গমন কাবাব ; (ঙ) সুপারিশ বা উপযোজক হুতি ; (চ) ঋণস্বীকাব ।

9. What is the difference between a Cheque and a Bill of Exchange?

চেক এবং হুতির মধ্যে পার্থক্য কি?

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাজার

(Market)

খুব ভোরে বিছানা হইতে উঠিবার আগেই হয়ত শুনিতে পাও, তোমার দাদা বলিতেছেন—মা, টাকা দাও, বাজারে যাই। বাজার হইতে ফিরিলে দেখিবে যে দাদা মাছ, তরকারি ইত্যাদি নিয়া আসিলেন। অমনি বুঝিলে যে বাজারে আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। তোমার নিজের বাগানের যে তরকারি উৎপন্ন হয় তাহা তুমি কেন না ; কারণ তাহার অভাব তোমার নাই। কিন্তু তুমি যদি অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তরিতরকারি উৎপাদন কর এবং ফসল যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? ইহা নিশ্চয়ই ফেলিয়া বাজারের সংজ্ঞা

দিবে না। এমত জায়গার খোঁজ করিবে যেখানে তোমার দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ক্রেতা অপেক্ষা করিতেছে। হয় নিজেই উহা লইয়া সেই জায়গায় বাইবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবে নচেৎ এমন কোন লোকের সন্ধান করিবে যে তোমাকে দ্রব্যের মূল্য দিয়া দ্রব্য বা মাল গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ যে যে-স্থানে মাল ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকেই বাজার (Market) বলে।

আদিম যুগেও বাজারের অস্তিত্ব ছিল। মানুষ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে বলিয়াই বাজারের প্রয়োজন। উৎপাদনের বিশেষজ্ঞতার মত বিলি ব্যবস্থারও (Distribution) বিশেষীকরণ দেখা যায়। এই কারণেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন হইলে উহার চাহিদা তৈয়ার করা অথবা চাহিদা মত সরবরাহ

করার জন্য বাজারের প্রয়োজন। যে জায়গায় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় উহাকেই সাধারণ ভাষায় আমরা বাজার (market) বলিয়া থাকি। গ্রামাঞ্চলে দেখিবে, বাজার ও বিনিময় সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে দূর-দূরান্ত হইতে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা এক স্থানে জড় হয় এবং দ্রব্যের বিনিময় (exchange) হয়। ঐ দিনগুলিকে বলে হাটবার (market days)। হাটবার ব্যতীত তোমার যদি মাছের আবশ্যক হয় তাহা হইলে গ্রাম হইতে মাছ সংগ্রহ করা কষ্ট। এই কারণেই সাধারণত দেখিবে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বাজারের দিনে (পরবর্তী বাজার দিন পর্যন্ত) আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া রাখেন। সুতরাং বাজার বলিতে এমন জায়গাকে বুঝায় যেখানে বহু লোকের সমাগম হয়। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা যে জায়গায় সমবেত হইয়া দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে সেই জায়গাকে বাজার (market) বলে। মাস্তুষের চাহিদা যতই বাড়ে এবং উৎপাদনে যতই বিশেষজ্ঞতা লাভ করা হয় বাজারের প্রয়োজনও তত বাড়ে।

কোনও একটি বাজারে ঢুকিলে দেখিতে পাইবে যে বাজারে এক অংশ জুড়িয়া সমস্ত তরিতরকারি ব্যবসায়ী বসিয়া আছে, আর এক অংশে মৎস্য ব্যবসায়ী, তৃতীয় অংশে ফল ব্যবসায়ী ইত্যাদি ভাবে বাজারটিকে কতিপয় অংশে ভাগ করা হইয়াছে। এই ভাবেই কতিপয় বিশেষ বাজারের সৃষ্টি হইয়াছে। একই বাজারে সকল দ্রব্য বা মাল কেনার সুযোগ হয়ত তুমি পাইবে না। মনে কর তোমার বাজারের ভাগ

বাড়ীতে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করা হইয়াছে। মাছ ক্রয় করিবার জন্য হাওড়া বাজারে; তরিতরকারি ক্রয় করিবার জন্য সোনারপুর; মাংস ক্রয় করিবার জন্য হগ বাজার, ডিম ক্রয় করিবার জন্য শিয়ালদহ বাজারে ইত্যাদি নানা দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য নানা বাজারে পাঠাইলে। কারণ তুমি জান যে তোমার চাহিদা প্রচুর এবং কোনও একটি বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া সম্ভব নহে। আবার হয়ত একই বাজার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যের সংস্থান হইলেও উপরি-উক্ত প্রকার বিশেষ বাজার হইতে মাল সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। কারণ ঐ বিশেষ বাজারসমূহে একই জায়গায় একই দ্রব্য বহু প্রকারের পাওয়া যায় বলিয়া চাহিদা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। যেহেতু এক একটি বাজার এক এক বিশেষ দ্রব্যে বিশেষীকরণ করিয়াছে; সেই হেতু দ্রব্যের নাম অনুসারে বাজারের নাম যেমন—মাছের বাজার; মাংসের বাজার ইত্যাদি। আবার যেহেতু একই দ্রব্যে বিশেষীকরণ হইয়াছে সেই হেতুই একই দ্রব্য বহু পরিমাণে বিক্রয় করার রীতি। অর্থাৎ ঐ বাজারকে বলা হয় পাইকারী (wholesale) বাজার। এক সের মাছ কিনিতে হইলে হয়ত তোমার পাড়ার বাজারেই যাইবে কিন্তু ১০ মণ

মাছ কিনিতে হইলে যাইবে শিয়ালদহ বাজারে বা হাওড়া বাজারে। সুতরাং চাহিদা ও যোগান অনুসারে বাজারকে ভাগ করা যায়। যেখানে খুচরা (অল্প পরিমাণ) দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে বলে খুচরা বাজার (Retail market) আর যেখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে বলে পাইকারী বাজার

(wholesale market)। খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকারী ব্যবসায়ীর কর্তব্য পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখিবে যে দ্রব্যের উপস্থিতি নাই, চাহিদা ও যোগানের অবস্থা বিবৃত করিতে বাজার কথাটির প্রয়োগ হয়। 'মাছের বাজার চড়া; চাউলের বাজার সস্তা ইত্যাদি। ইহাতে কি বুঝিলে? মাছের বাজার চড়া বলিতে বুঝিলে যে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ এত কম যে মাছের দাম খুব উচ্চ। তেমনি চাউলের বাজার সস্তা বলিতে চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্য এবং ফলে মূল্য হ্রাস ইহাই বুঝায়। অর্থনীতিবিশারদগণ বাজার (market) বলিতে

এমন কোন জায়গাকে বুঝেন না যেখানে দ্রব্য সমবেত করা হয় ব্যাপক বাজার

এবং দ্রব্যের আদানপ্রদান হয়। তাহারা বাজার বলিতে এমন জায়গাকে বুঝিয়া থাকেন যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমবেত হইয়া দ্রব্যের যোগান ও চাহিদা অনুসারে কাগজে পত্রে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া থাকেন। সেই প্রকার বাজারকে ব্যাপক (extensive) বাজার বলা হয়। বস্তুত এখানে ব্যাপক বাজারের কার্যই আলোচনা করার উদ্দেশ্য।

ব্যাপক বাজারে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয় গুণাবলী (Qualities of goods for an extensive market) : যে দ্রব্যের চাহিদা

ব্যাপক নহে, সেই দ্রব্যের ব্যাপক বাজার থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্যাপক বাজারে সেই সমুদয় দ্রব্যই ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে, যাহার চাহিদা খুবই অধিক এবং বহু অংশ জুড়িয়া ব্যাপ্ত। আমেরিকা

হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা (Long staple cotton), পৃথিবীর নানা দেশে আমদানি করা হয়। সুতরাং ঐ দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা আছে; এবং উহার বাজার ব্যাপক (extensive)।

দ্বিতীয়ত, যে দ্রব্য বহুদিন গুণ হানি না ঘটাইয়াও রাখা যায় উহার বাজারই ব্যাপক হইতে পারে। পচনশীল দ্রব্যের বাজার খুবই সংকুচিত।

পাট, তুলা, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি বহুদিন রাখিলেও নষ্ট হইবার দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ বা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম। কাজেই ঐ দ্রব্যসমূহের

চাহিদা ও বাজার খুবই ব্যাপক। অধুনা অবশ্য তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রসারের ফলে সকল দ্রব্যই বহুদিন রাখা যায়, এবং প্রত্যেক দ্রব্যের বাজারও দিন দিন ব্যাপক হইতেছে, তথাপি তাপ-নিয়ন্ত্রিত স্থানে রক্ষিত দ্রব্যের গুণ হানি (deterioration of quality) ঘটে বলিয়া ব্যাপক বাজার তৈয়ার সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। 'মাছ তাপ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখিলে নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে মাছের বাজার তুলা বা পাটের বাজারের মত ব্যাপক নহে।

তৃতীয়ত, যেমন দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক না হইলে সেই

ব্যাপক সরবরাহ দ্রব্যের বাজার ব্যাপক হইতে পারে না, তেমনি কোনও দ্রব্যের সরবরাহ যদি খুবই সীমাবদ্ধ হয় তাহা হইলেও উহার বাজার ব্যাপক হইতে

পারে না। যেমন খুব পুরাতন দ্রব্যের (Antiques and curiosities) সরবরাহ এতই সীমাবদ্ধ যে ইহার বাজার কখনও ব্যাপক হইতে পারে না।

চতুর্থত, বাজারের চাহিদা এবং যোগানের অবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষে জানিবার সুযোগ থাকিলে ব্যাপক বাজার গঠন হইতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অল্প তারিখে তুলার চাহিদা কি প্রকার এবং সেখানে তুলার সরবরাহের চাহিদা ও যোগানের অবস্থাই বা কিরূপ ইচ্ছা করিলেই ভারতবর্ষের সকল ব্যবসায়ী জানিতে পারে। তার যোগে সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই বাজার ব্যাপক হইতে পারিয়াছে।

পঞ্চমত, পরিবহণ ব্যবস্থা যদি উন্নত না হয় তাহা হইলেও ব্যাপক বাজার গঠন হইতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এবং আমেরিকাতে প্রচুর সরবরাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্য আদানপ্রদানের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলেও বাজার সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠত, দ্রব্য এমন আকারের হইবে না যাহা বহন করিতে অসুবিধা হয়। ইট একদেশ হইতে অপর কোন দেশে বহন করা খুব কষ্ট সাধ্য না হইলেও মূল্যের অল্পপাতে বহন ব্যয় এত অধিক যে এক দেশ হইতে অল্প দেশে এমনকি এক জিলা হইতে অল্প জিলায় ইটের আদানপ্রদান বড় হয় না। সুতরাং যে দ্রব্য এক জায়গা হইতে অল্প কোন জায়গায় বহন করা যায় অথচ বহন ব্যয় ও দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে এক সুসম্বন্ধ সম্পর্ক থাকে সেই দ্রব্যেরই ব্যাপক বাজার হইতে পারে।

সপ্তমত, দ্রব্যের গুণের সমভাবাপন্নতা থাকা দরকার। যে সকল দ্রব্য নামেই ক্রয় বিক্রয় হয় ক্রেতা উহা কখনও দেখিতে পায় না এবং বিক্রেতাও দেখাইতে পারে না। যেমন কাঁচা মালের বাজারে (Produce Exchange) যদি গম বা তুলা কিনিতে হয় তাহা হইলে—ধর জলন্ধর তুলা ১নং বলিলেই, উহার গুণাগুণ ক্রেতা-বিক্রেতা বুঝিতে পারে। কিন্তু জলন্ধর তুলা ১নং এর সকল গাঁট যদি একগুণ বিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে আর ঐ নামে বিক্রয় হইতে পারে না।

অষ্টমত, যদি দ্রব্যের নমুনা দৃষ্টে ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি হয় তাহা হইলে যে দ্রব্যের নমুনাকরণ (sampling) সম্ভব নহে সে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে না। উপরের উদাহরণটিতে তুলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উহার নমুনা দৃষ্টে ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা আছে কিন্তু গরু, ঘোড়া, গাধা, মহিষ ক্রয় বিক্রয় কি নমুনা দৃষ্টে সম্ভব? একটি ভাল গরুর নমুনা দেখাইয়া ৫০টি গরু বিক্রয়ের চুক্তি হইল, উহার মধ্যে দুইটি খোঁড়া, তিনটি অন্ধ হওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং ব্যাপক বাজার এমন দ্রব্যের হয় যাহার নমুনাকরণ সম্ভব এবং নমুনা দৃষ্টে ক্রয়বিক্রয় হইলে দ্রব্যের সমভাবাপন্নতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

ব্যাপক বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of an extensive market) : উপরের আলোচনা হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে দ্রব্য যদি পচনশীল হয়, এবং বহনযোগ্য, নমুনাকরণযোগ্য ও সমভাপন না হয় তাহা হইলে সে দ্রব্যের মূল্যের ব্যবধান কম বাজার ব্যাপক হইতে পারে না। এই গুণ না থাকিলে সেই দ্রব্যের ব্যবহার হয় 'স্থানীয়' (Local)। বাজার ব্যাপকতর হইলে একস্থান হইতে অন্য স্থানের মধ্যে মূল্যের ব্যবধান কম হয়।

দ্বিতীয়ত, বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলে অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা ও প্রচুর চাহিদা ও যোগানের সংখ্যক বিক্রেতা থাকিলে বাজারে যে দর হয় উহাতে চাহিদা ও পূরণ প্রতিফলন যোগানের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়।

তৃতীয়ত, একই দ্রব্য বাজারে দুইজন ক্রেতার নিকট দুই মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে না। কারণ যে মূল্য বাজারে স্থির হইবে উহা চাহিদা এবং যোগানের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে স্থির হয়। অবশ্য দুই বাজারের মধ্যে একই বাজারে এবং একই মূল্যে দূরত্ব থাকিলে যে একই দ্রব্যের মূল্য দুই বাজারে দুই রকম হইবে না তাহা নহে। কারণ এক জায়গায় দ্রব্য সস্তা হইলেও যোগানে যাতায়াত বাবদ ব্যয় এবং পরিবহনের মূল্য যোগ করিলে দ্রব্যের মূল্য আর সস্তা থাকে না।

বর্তমানে একথা বলা যায় যে পরিবহন ব্যয় এবং সময়ের ব্যবধান বাদ দিলে বাজার তার ও বেতার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকিলেও দ্রব্যের মূল্য প্রায় একই। ব্যবহার ফলে মূল্যের কারণ তার এবং বেতার ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে প্রতিদেশের সমতা বাজারের অবস্থাই অজ্ঞাত দেশ জানিতে পারে।

বাজারের বিভিন্ন প্রকার (Different kinds of market) : বাজারে যে দ্রব্য বা পণ্য বিক্রয় হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া বাজারকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য মানুষের আশু অভাব মিটাইতে সমর্থ, সেই বাজারের ভাগ সকল দ্রব্যের বাজারকে বলে পণ্যের বাজার। দ্বিতীয়ত, ষ্টক বাজার। ষ্টক বাজারে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়বিক্রয় হয়।

পণ্যের বাজারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) কাঁচামালের বাজার এবং (২) কাঁচামালের বাজার উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার। কাঁচামালের বাজারে সাধারণত, ও উৎপন্ন সামগ্রীর তুলা, পাট, গম, শণ, রবার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। আর বাজার উৎপন্ন সামগ্রীর বাজারে চা, কফি ইত্যাদি যাহা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয় না উহা বিক্রয় হয়।

ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অনুসারেও বাজারকে ভাগ করা হয়। তবে উহা পণ্যের বেলায়ই প্রযোজ্য, শেয়ার বা ষ্টকের বেলায় নহে। এমন বাজার আছে যেখানে কোনও দ্রব্যের এক কিলোগ্রাম কিনিতে চাহিলে পাওয়া যাইবে না কারণ সেখানে বিক্রয়ের ন্যূনতম পরিমাণ হয়ত এক কুইন্টেল। আবার এমন বাজারও আছে—যেমন গ্রামাঞ্চলে, কোনও বাজারে হয়ত

পাইকারী বাজার ও
খুচরা বাজার

১ কুইন্টেল আলুর সংস্থান হওয়া কষ্টকর। কারণ সেখানের ক্ষেতা হয়ত ৫০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রামের অধিক ক্রয়ই করে না। যে বাজারে কোনও দ্রব্য সরাসরি সন্তোষকারী (Consumer) ক্রয় করার সুযোগ পায় না তাহাকে বলে পাইকারী বাজার আর যে বাজারে সন্তোষকারীকে দ্রব্য সরবরাহ করাই রীতি তাহাকে বলে খুচরা বাজার। সুতরাং পণ্যের বাজারের আবার দুইটি ভাগ হইতে পারে—পাইকারী বাজার ও খুচরা বাজার।

ষ্টকের বাজার (Stock Exchange) : সাধারণ যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের মূল্য ফেরত দেওয়া হয় না একথা আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশোধনীয় পূর্বাধিকার অংশপত্র বা শেয়ারের মূল্যই যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ফেরৎ দিতে পারে। কিন্তু শেয়ার বা অংশপত্রের মালিক ইচ্ছা করিলে শেয়ার বা ষ্টকের বাজার অংশপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ রূপান্তর করিতে পারে। যৌথ কারবারী আইনে শেয়ার বা অংশপত্র হস্তান্তরযোগ্য (Transferable)। হস্তান্তরগ্রহীতাকে (Transferee) অবশ্যই কারবারের পঞ্জীতে নিজের নামে অংশপত্র হস্তান্তর পঞ্জী করা হইতে হয়।

যে বাজারে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ষ্টক বাজার (Stock Exchange) বলে। Exchange কথাটি market এর সমার্থবোধক। ষ্টক বাজারে কেবল যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অংশপত্রই বিক্রয় হয় না, অধিকন্তু সরকারী ঋণপত্র (Government Securities); ষ্টকের বাজারে শেয়ার পত্র ঋণপত্র ক্রয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র (Bond) ক্রয়বিক্রয় হয়। বিক্রয় হয় অংশপত্র বা শেয়ার, ঋণপত্র যদি কোনও ব্যক্তি ঘরোয়া ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তাহাকে কিন্তু ষ্টকের বাজার বলা হয় না, কারণ বাজারের প্রথম সর্ত বহু ক্ষেত্রে এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে। তাহা ঘরোয়া (Private) ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

ষ্টক বা শেয়ার বাজার একটি সমিতি বা যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। যেমন কলিকাতার ষ্টক বাজার (Calcutta Stock Exchange) একটি সমিতি কর্তৃক পরিচালিত। তবে সাধারণ যৌথ কারবারী বা অংশীদারী কারবারের মত এই সমিতি নিজ নামে শেয়ার বা ষ্টক ক্রয় বিক্রয় করে না। ষ্টক বাজারের কার্য যাহাতে ষ্টক বাজারের গঠন সুপরিকল্পিতভাবে চলে তাহার জন্মই সমিতি গঠন। সমিতির সদস্যগণই মাত্র ষ্টকের বাজারে ষ্টক বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে। অবশ্য প্রত্যেক সদস্যেরই প্রতিনিধি থাকে। সুতরাং সদস্য এবং প্রতিনিধিগণই ষ্টকের বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে। এমনকি ষ্টকের বাজারের মধ্যে সদস্য ও তাহাদের প্রতিনিধি ব্যতীত কাহারও প্রবেশাধিকার পর্যন্ত থাকে না। যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ষ্টক বাজারের সদস্য হইতে পারে, কিন্তু প্রভূত অর্থ না থাকিলে ষ্টক বাজারের সদস্য হওয়ার অধিকার সমিতি দেয় না কারণ সদস্য হওয়ার অধিকার লাভ করিতে হইলে মোটা টাকা জমা রাখিতে হয়।

শেয়ার বাজারের কাজ (Functions of Stock Exchange) : শেয়ার বা অংশপত্রের আন্বিক মূল্য (Nominal Value or Face Value) এবং বাজার দরের শেয়ারের আন্বিক (Market Value) মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। মোট মূলধনকে মূল্য ও বাজার মূল্য অংশপত্রের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে অংশপত্র বা শেয়ারের আন্বিক এক নহে মূল্য পাওয়া যায়। যদি একটি ষোথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন হয় দশ হাজার টাকা এবং উহা যদি একশত অংশপত্র বা শেয়ার বিক্রয় করিয়া আন্বিক মূল্য ও আদায় করা হয় তাহা হইলে প্রতি অংশপত্রের আন্বিক মূল্য বাজার দর ১০০ টাকা। কিন্তু উহার বাজার দর আন্বিক মূল্য হইতে বেশী হইতে পারে, কমও হইতে পারে। কম হইবে কিংবা বেশী হইবে তাহা ক্রেতার অংশপত্র ক্রয়ের আগ্রহ এবং বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে দরে বাজারে বিক্রয়ের বা ক্রয়ের চুক্তি হয় উহাই বাজার দর।

একটি ষোথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ১০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। এক বৎসর পরে ঐ কারবার ২৫০০ টাকা লাভ করিয়াছে। তাহা হইলে কারবারের মূলধন ২৫০০ বৃদ্ধি হইয়াছে। মুনাফা যদি সম্পূর্ণই বিলি করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রতিথানি শেয়ারের আন্বিক মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ মুনাফা পায়। তাহা হইলে প্রতি একশত টাকা আন্বিক মূল্য শেয়ারের প্রকৃত মূল্য হয় ১২৫ টাকা। এই অংশপত্র বা শেয়ারের মালিক যদি অংশপত্রখানি বিক্রয় করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি অন্তত ১২৫ টাকা পাইতে আশা করিবেন। কারণ বর্তমানে উহার মূল্য ১২৫ টাকা (১০,০০০ মূলধন + মুনাফা ২৫০০ ; মোট মূলধন মূল্য ১২,৫০০ টাকা ; অংশপত্রের সংখ্যা ১০০। সুতরাং প্রতি শেয়ারের মূল্য $12500 \div 100 = 125$)। এখন সম্ভাব্য ক্রেতা ঐ অংশপত্রের মূল্য ১০০ টাকায় কিনিতে রাজী, ১২৫ টাকায় কিনিতে রাজী ; কিংবা ৫০০ টাকায় কিনিতে রাজী তাহা ঐ অংশপত্র হইতে কত মুনাফা আয় করিতে পারিবেন সেই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিবে। মনে কর এক ব্যক্তি ঐরূপ একখানা শেয়ার ২০০ টাকায় ক্রয় করিলেন। এ বৎসরও কারবার শতকরা ২৫ টাকা হারে মুনাফা বণ্টন করিল। কারবার শতকরা ২৫ টাকা হারে মুনাফা বণ্টন করিলেও ক্রেতা কিন্তু মাত্র শতকরা ১২½ টাকা হারে মুনাফা পাইয়াছেন। কারণ কারবার মুনাফা বণ্টন করিয়াছে মোট মূলধনের উপর অথবা অংশপত্রের আন্বিক মূল্য হিসাবে, অর্থাৎ প্রতি অংশপত্র ১০০ টাকা মূল্যের উপর, কারবার প্রতি অংশপত্র বাবদ ১০০ টাকা পাইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ শেয়ারখানা ২০০ টাকায় কিনিলেন তিনি ২০০ টাকায় বিনিয়োগ করিয়া ২৫ টাকা আয় করিলেন, অর্থাৎ প্রতি একশত টাকায় ১২½ টাকা। সুতরাং ক্রেতা অংশপত্রের যে মূল্য দিতে ইচ্ছুক তাহা যে মূল্যে অংশপত্র ক্রয় করিবে তাহার উহার সম্ভাব্য মুনাফা দ্বারা স্থির হয়।

যদি ক্রেতা মনে করেন যে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিলে সে বিনিয়োগে হুঁকি বেশী, অর্থাৎ মুনাফা আয় হইতেও পারে নাও হইতে পারে অথবা শেয়ারের

মূল্য বাবদ যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে সেই অর্থই নষ্ট হইবে তাহা হইলে ক্রেতা শেয়ারের বাজার দর কম মূল্য দিতে রাজী হইবে। এবং বর্তমান মালিক যদি মর্নে পবিবর্তনের কারণ করেন যে ঐ অংশপত্রখানি বিক্রয় করিয়া অন্ত অংশপত্রে ১। ঝুঁকির পরিমাণ বিনিয়োগ করিলে লাভ কম হইলেও ঝুঁকি কম হইবে তবে ২। মুনাফা হয়ত তিনি উহা বিক্রয় করিতে চাহিবেন। সুতরাং অংশপত্র বা শেয়ারের বাজার দর সম্ভাব্য মুনাফা এবং ঝুঁকি দুইটি কারণে উঠানামা করে।

যে সকল অংশপত্র বা শেয়ারে খুব উচ্চ হারে না হইলেও নিয়মিত মুনাফা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় সেই অংশপত্রের মূল্যের অল্পপাতে যে অংশপত্রের উপর কোনও বৎসর উচ্চহারে, কোনও বৎসর মোটেই না। এইরূপ অনিশ্চিত মুনাফা পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য হইবে কম। সুতরাং সম্ভাব্য ক্রেতা অর্থাৎ বিনিয়োগকারী এমন অংশপত্র বা শেয়ার, ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিতে চাহিবেন সর্বসমান অংশপত্র বা ঋণপত্র যাহাতে ঝুঁকি খুবই কম। সেই প্রকার অংশপত্র বা শেয়ারকে প্রথম শ্রেণীর বা সর্বসমান (Giltedged) বলা হয়। সরকারী প্রত্যয়পত্রে বা ঋণপত্রে বিনিয়োগে ঝুঁকি নাই বলিয়া উহাকে Giltedged বা সর্বসমান (সর্বোত্তম) বিনিয়োগ বলে।

কোনও বিনিয়োগেচ্ছা ব্যক্তি নিজে অংশপত্র বা শেয়ার ক্রয় করার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে অযোগ্য অংশপত্র ক্রয় করার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কারণ নিজে সকল যৌথ কারবারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকিলে কোন অংশপত্রে বিনিয়োগে ঝুঁকি বেশী বা কম, কোন অংশপত্রের উপর মুনাফার হার মোটামুটি স্থির ইত্যাদি বুঝিতে পারেন না। ফলে বিক্রেতা তাহার অংশপত্র বা শেয়ার খুব প্রথম শ্রেণীর বলিয়া ক্রেতাকে বুঝাইলে ক্রেতা সেই অংশপত্র ক্রয় করিয়া পরে দেখিলেন যে অযোগ্য অংশপত্রে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই কারণেই বিশেষজ্ঞ শেয়ারপত্র ব্যবসায়ী ঘরোয়া ব্যবস্থায় শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়ে ঝুঁকি খুব বেশী বলিয়া শেয়ার বা অংশপত্র বাজারের দালালের (Broker) মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করা সঙ্গত। শেয়ার বাজারের দালাল শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞতা লাভ করে বলিয়া, সম্ভাব্য ক্রেতাকে কোন অংশপত্রে বিনিয়োগ করিলে ঝুঁকি কম, সে বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন। তেমনি বিক্রেতাকেও কোন শেয়ার কখন বিক্রয় করা সঙ্গত কিংবা ধরিয়া রাখা প্রয়োজন সে বিষয়েও পরামর্শ দিতে পারেন।

কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন হইলে সেই কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অংশপত্র শেয়ার বাজারে লিঙ্কিত হইলে সহজে ক্রয় বিক্রয়ের তালিকাভুক্ত শেয়ারপত্র সুবিধা হয়। কারণ নূতন কারবারের ভবিষ্যত কি প্রকার সে সম্বন্ধেও শেয়ার দালালগণ মোটামুটি নিতুলভাবে অনুমান করিতে পারেন। এই কারণে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে মূলধনের সংস্থানও শেয়ার বাজারের মাধ্যমে সহজ হয়।

প্রয়োজন অহুযায়ী কারবারী প্রতিষ্ঠানে মূলধনের সংস্থান না হইলে অর্থনৈতিক কার্য ব্যাহত হয়। কারণ প্রয়োজন মত মূলধনের সংস্থান না হইলে উৎপাদনের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপাদনের গতি অপ্রতিহত না থাকিলে দেশে মুদ্রা নিয়োগ মূল্যস্তরের উঠানামা হয়। মূল্যস্তরের উঠানামা খুব বেশী হইলে জনসাধারণ অনেক সময়েই অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। মূল্য পরিবর্তনের ফলে দেশে আর্থিক মন্দাবস্থা অথবা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের সুযোগ দিয়া এবং মুদ্রা নিয়োগের সুযোগ দিয়া শেয়ার বাজার দেশের অর্থনীতিতে সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

সরকারী কার্যের পরিধি দিন দিন বাড়িয়া যাওয়ার ফলে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারের আয় হইতে ঐ সমুদয় কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে। শাসন পরিচালনার জন্ত যে ব্যয় হয় উহাকে সবকারী ঋণপত্র বলে রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure) এবং উন্নয়ন পরি-কল্পনার জন্ত যে ব্যয় হয় উহাকে বলে মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure)। রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure) রাজস্ব আয় (Revenue Income) অর্থাৎ কর দ্বারাই মিটাইতে হয়। কিন্তু মূলধনী ব্যয় ঋণ গ্রহণ করিয়াই করিতে হয়। সুতরাং সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের সুযোগও শেয়ার বা ষ্টক বাজার দিয়া থাকে।

উপরের আলোচনায় শেয়ার বাজারের কার্যের মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া হইল। উহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল।

১। শেয়ার বাজার থাকার ফলে শেয়ার বা অংশপত্র সহজে ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে।

২। শেয়ার বাজারে লেনদেন (ক্রয়বিক্রয়) সাধারণ্যে হয় বলিয়া, বিনিয়োগকারী লেনদেনের সততা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

৩। বিনিয়োগের উপযোগী মূলধনের মুদ্রা প্রয়োগও শেয়ার বাজারের মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ দেশের সঞ্চয় যেভাবে বিনিয়োগ করিলে দেশের শেয়ার বাজারেব সর্বাধিক উপকার হয়, তাহার আভাস শেয়ার বাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ শেয়ার বাজারের ব্যবস্থাপক ও দালাল) দিতে পারেন।

৪। অহুৎপাদক উপায়ে অর্থাৎ স্বর্ণপিণ্ড অথবা জমিজমায় বিনিয়োগ না হইয়া সঞ্চয় যাহাতে শিল্পে প্রয়োগ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও শেয়ার বাজার করিয়া থাকে। ফলে শিল্পোন্নতির পথ সহজ হয়।

৫। শেয়ার বাজারের উপস্থিতির ফলে দেশে যেমন সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়ে তেমনি সেই সঞ্চয় বিনিয়োগের ফলে দেশে আর্থিক কার্যকলাপ বাড়ে। শেয়ার বাজার থাকার জন্তই বিনিয়োগকারী প্রয়োজনমত শেয়ার বা অংশপত্রে নিয়োজিত অর্থ নগদান অর্থে পরিণত করিতে পারেন।

৬। শেয়ার বাজারে লিষ্টিভুক্ত (Listed) অংশপত্র বিলিকারী বোধ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সমস্ত তথ্য শেয়ার বাজারের পরিচালকমণ্ডলীর নিকট দাখিল করিতে হয়।

ঐ সমস্ত তথ্যে কারবারের আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এই কারণে সর্বদাই শেয়ার বাজারে লিঙ্কিত রোখ কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা সূত্রেভাবে হয়।

শেয়ার বাজার নানাভাবে বিনিয়োগকারীকে সাহায্য করে।^১ প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালগণ বিনিয়োগকারীদের উপদেশ দেয়। তথাপি শেয়ার বাজারের মাধ্যমে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করা হইলে দালাল (Broker) কখনই এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না যে বিনিয়োগকারী মুনাফা পাইবেই। তবে শেয়ার বাজারের দালাল তাহার মস্তকের স্বার্থ রক্ষার জ্ঞাত ঘটাসম্ভব সতর্কতার সহিত বিচার বিবেচনা করিয়া

কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করিলে ঝুঁকি কম সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়া থাকে।

শেয়ার বা অংশপত্রে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার জ্ঞাত অবস্থিত লোককে শেয়ার বাজারের সদস্য এবং দালাল হিসাবে কার্য করিতে দেওয়া হয় না এবং খুব সতর্কতার সহিত সদস্য গ্রহণ করা হয়।

শেয়ার বাজারে লেনদেন (Transactions in Stock Exchange) : শেয়ার বাজারে লেনদেন দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমত, বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের ইচ্ছা যদি প্রকৃতই হয় সেই ক্ষেত্রে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়বিক্রয় হইলে উহাকে প্রকৃত লেনদেন (Genuine Transaction) বলা হয়। কিন্তু দ্বুঃখের বিষয়, শেয়ার বাজারে লেনদেন সর্বদাই যে প্রকৃত তাহা নহে।

শেয়ার বাজারে কার্য করিতেছে বলিলেই আমাদের মনে সাধারণত দুইটি কথা উদয় হয়। শেয়ার বাজারের কথা বলিলেই মনে হয় যে সেখানে কেনাবেচা করিতে পারিলেই রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাইবে (Getting rich overnight)। আবার একথাও মনে জাগে যে শেয়ার বাজারে কেনাবেচা ভাগ্য লইয়া খেলা (Gambling in stars)। এই কারণে শেয়ার বাজারে কেনাবেচার ফলে কাহারও ক্ষতি হইলে আমাদের মনে সহানুভূতি না জাগিয়া ভাগ্য বিড়ম্বিত লোকের উপর রাগই হয় বেশী।

দ্বিতীয়ত, শেয়ার বাজারে যাহারা কেনা বেচা করে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সস্ত্রদায়ের লোকই বেশী। তাহারা শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করেন না। শেয়ার কেনা বেচার মাধ্যমে মুনাফা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহাদের বলা হয় ঝুঁকিদার (Speculator)।

ঝুঁকিদার প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিলে বিলি লয় না বা শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিলেও বিলি দেয় না। ইহারা যে মূল্যে শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করে উহাই পুনরায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করে এবং লাভ করে। তবে ইহারা যখন কোন প্রকৃত বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করে তখন প্রতিনিধির নির্দেশমত শেয়ারপত্র ক্রয় বা বিলি দিতে হয়।

ঝুঁকিদারদের কার্য নিম্নরূপ। একজন ঝুঁকিদার (Speculator) মনে করিলেন যে ভবিষ্যতে 'এ' কোং লি: অংশপত্রের চাহিদা খুবই বাড়িয়া যাইবে। তিনি মনে .

করিলেন যে অল্প যে মূল্যে ঐ কারবারের শেয়ার বিক্রয় হইতেছে ঐ মূল্যে ক্রয় করিতে পারিলে ভবিষ্যতে মূল্য বাড়িবে তখন বিক্রয় করিবেন এবং মুনাফা লইবেন। এই মুনাফাকে ইংরেজীতে বলে 'Turn' (দালালের ঝুঁকিদারের কার্য প্রাপ্য)। আবার যদি মনে করেন যে ভবিষ্যতে অংশপত্রের মূল্য কমিয়া যাইবে তাহা হইলে বর্তমানে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট দিনে আশানুরূপ মূল্য কমিলে বাজার হইতে অংশপত্র ক্রয় করিয়া শেয়ার বিলি দিবে এবং মুনাফা লইবে। ঝুঁকিদার যদি খুব সতর্কতার সহিত কেনা বেচা না করেন অথবা যদি বাজারের অবস্থা সূচুভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে অনেক সময়েই লোকসান স্বীকার করিয়া থাকেন।

ঝুঁকিদারের ক্রয়বিক্রয়ের একটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হইল। ঝুঁকিদার তাহার দালালকে 'এ' কোং লিঃ এর ১০ খানা শেয়ার প্রতিখানা ১০০ টাকা দরে ক্রয় করিবার নির্দেশ দিলেন। তাহার অল্পমান যে কিছুদিনের মধ্যে ঐ শেয়ারের মূল্য বাড়িয়া যাইবে। ঝুঁকিদারের দালাল ১০ খানি শেয়ার ১০০ টাকা দরে ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিলি লইবার পূর্বেই শেয়ারের মূল্য প্রতিখানি ১১০ টাকা হইল। ঝুঁকিদার তাহার দালালকে ঐ ১০ খানি শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। দালাল শেয়ার বিক্রয় করিলেন। ঝুঁকিদারের কোনই অর্থ ব্যয় করিতে হইল না কিন্তু একশত টাকা মুনাফা হইল। অবশ্য এই মুনাফা হইতে দালালের দস্তুরী ধরা যাউক ১০ টাকা বাদ দিলে তাহার নীট মুনাফা ৯০ টাকা। এই কারণেই অনেকে মনে করেন যে শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করিলে বিনা মূলধনেই ধনী হওয়া যায়।

আবার ঝুঁকিদার যদি মনে করেন যে ভবিষ্যতে শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য কমিয়া যাইবে তাহা হইলে তিনি দালালের সহিত অংশপত্র বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন। ঝুঁকিদার শেয়ার মনে করা যাউক যে ঝুঁকিদার মনে করিলেন যে অল্প ভবিষ্যতে বাজারের ক্রয়বিক্রয় 'এ' কোং লিঃ এর শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য কমিয়া যাইবে। ব্যবধান লইয়াই তিনি ঐ কারবারের ১০ খানি শেয়ার ১০০ টাকা দরে বিক্রয়ের কারবার করে চুক্তি করিলেন। নির্ধারিত দিবসের পূর্বে শেয়ারের দাম প্রতিখানি ৯০ টাকায় নামিল। ঝুঁকিদার এবারে দালালের সহিত শেয়ার ক্রয়ের চুক্তি করিলেন। এবং বিক্রয় মূল্য ১০০০ টাকা এবং ক্রয় মূল্য ৯০০ টাকার ব্যবধান, ১০০ টাকা হইতে দালালের দস্তুরী ১০ টাকা বাদ দিলে ৯০ টাকা নীট মুনাফা আয় করিলেন। এই প্রকার ক্রয়বিক্রয়কে ভবিষ্যৎ লেনদেন (Future Trading) বলে। শেয়ার বাজারে যে নগদান কাজ কারবার চলে না তাহা নহে। বরং নগদান কাজ কারবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যেহেতু দালালগণ নিজেরাই কারবার করেন এবং কেনাবেচা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তখন উপরে লিখিত উপায়ে কাগজে লেনদেনের মধ্যে সেই কাজ কারবার অধিক হয়। নগদান কাজ কারবারের অল্পপাত যে সকল শেয়ার বাজারে কম (যেমন কলিকাতা বাজারে) সেখানে ঝুঁকিদারী (Speculation) ফটকাবাজীতে (Gambling) পরিণত হয়।

শেয়ারবাজারে লেনদেনের সমাপ্তি (Settlement of transaction in Stock Exchange) : শেয়ার বাজারে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে লেনদেনের

শেয়ার বাজারের
হিসাবনিকাশ দিন.

হিসাব নিকাশ হয়। প্রথম দিনকে বলা হয় হর্জানা দিবস (Contango Day); দ্বিতীয় দিনকে বলে টিকেট দিবস (Ticket Day অথবা Name Day); তৃতীয় দিনকে বলে হিসাব

চূকাইবার দিন (Settlement Day)।

শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিতে হয় না। কেতা যদি মনে করেন যে হিসাব চূকাইবার দিনে তিনি শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়া শেয়ারের বিলি লইতে পারিবেন না তাহা হইলে তিনি লেনদেনটিকে পরবর্তী হিসাব নিকাশ দিন পর্যন্ত জের টানিতে পারেন। অবশ্য সেইজন্ত

হর্জানা

দালালকে পরবর্তী হিসাব দিবস পর্যন্তের সুদ দিতে হয়। শেয়ার ক্রয় করিয়া বিলি লইতে অপারগ হইয়া কেতা বিক্রেতাকে যে সুদ দেন উহাকে বলে হর্জানা (Contango)। সুতরাং প্রথম দিনে হর্জানা দিয়া পরবর্তী হিসাব নিকাশ দিবস পর্যন্ত লেনদেনের জের টানা হইবে কিনা তাহা স্থির হয় বলিয়া ঐ দিনকে বলে হর্জানা দিবস (Contango Day)।

অনুরূপভাবে শেয়ার বিক্রেতা দালাল যদি শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া মনে করেন যে হিসাব নিকাশ দিবসে শেয়ারের বিলি দিতে পারিবেন না তাহা হইলে পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা (Backwardation) দিয়া পরবর্তী দক্ষিণা হিসাব নিকাশ দিবস পর্যন্ত লেন দেনের জের টানিতে পারেন।

পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণাও হর্জানার মত শেয়ারের মূল্যের উপর দুই হিসাব দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের জন্ত সুদ।

দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় টিকেট বা নাম দিবস (Ticket Day)। এই দিনে দালালদের মধ্যে প্রকৃত চুক্তি সম্পাদিত হয়, যে ঝুঁকিদারের নামে দালাল শেয়ার-ক্রয়ের চুক্তি করিলেন, সেই ঝুঁকিদারের নাম, ঠিকানা, শেয়ার টিকেট দিবস

সংখ্যা, মূল্য ইত্যাদি লিখিয়া বিক্রেতা দালালের নিকট পাঠান।

বিক্রেতা দালাল তখন যে কারবারের শেয়ার বিক্রয় হইল সেই কারবারে নূতন কেতার (ঝুঁকিদারের) নাম পঞ্জীভূত করার ব্যবস্থা করেন। তাহার হিসাব বহিতে বিক্রয়ের সমস্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া ঐ চিরকুট পুনরায় কেতা দালালের নিকট ফেরত দেন এবং কেতার নিকট হইতে শেয়ারের মূল্য দাবী করেন এবং বিলি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

হিসাব চূকাইবার
দিন

তৃতীয় দিবসকে বলে হিসাব চূকাইবার দিন (Settlement Day)। এই দিনে অর্থ ও শেয়ার আদান প্রদান হয়।

হর্জানা দিয়া লেনদেন পরবর্তী হিসাব দিবস পর্যন্ত জের টানার সুযোগ ঝুঁকিদার-গণই গ্রহণ করেন। প্রকৃত বিনিয়োগকারী কখনও এই সুযোগ লন না। তিনি ক্রয়ের চুক্তি করিয়া বিলি দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনে শেয়ার বা অংশপত্র বিলি দিতে চাহেন।

শেয়ার বাজারে ঝুঁকিদারের প্রকার (Different Kinds of Speculators) : শেয়ার বাজারে ঝুঁকিদারদের কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

শেয়ার বাজারে একদল কারবারী আছেন যাহারা কৃত্রিম উপায়ে শেয়ারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করাইয়া মুনাফা অর্জন করিতে চাহেন। ইহাদের মধ্যে একদল আছেন যাহারা ভবিষ্যতে শেয়ারের মূল্য বাড়াইয়া, চড়া দামে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত কিনিয়াই যাইতে থাকেন। ভবিষ্যতে শেয়ারের মূল্য আশাহরূপ বৃদ্ধি পাইলে শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেন এবং বিক্রয় ও ক্রয়মূল্যের ব্যবধানই তাহার লাভ।

এই প্রকার ঝুঁকিদারীর কার্যের ফলে শেয়ারের বা অংশপত্রের মূল্য বাড়ে। কারণ ক্রমাগত ক্রয়ের চুক্তির ফলে অপ্রকৃত বা কৃত্রিম উপায়ে যোগানের তুলনায় চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়। এইজন্য ক্রমাগত শেয়ার ক্রয়ের চুক্তিকারীদের বলে তেজীওয়াল (Bulls)।

আবার যে সকল ঝুঁকিদার কারবারী ক্রমাগত শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া যান তাহাদের বলে মন্দীওয়াল (Bears)। মন্দীওয়াল বলার কারণ, ইহারা অপ্রকৃত বা কৃত্রিম উপায়ে শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বিক্রয়ের চুক্তি করেন এবং যখন শেয়ারের মূল্য আশাহরূপ হ্রাস পায় তখন ক্রয় করেন। ক্রমাগত বিক্রয়ের চুক্তির ফলে বাজারে অপ্রাকৃত যোগানাদিক্য মনে হয় এবং শেয়ারের মূল্য কমে।

এই প্রকার ঝুঁকিদারের কার্য লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে ইহারা প্রকৃতপক্ষে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সুযোগ লইতেই লেনদেন করেন। এইজন্য ইহাদের বলা হয় ফটকাবাজী। এবং অনেক সময়েই ফটকাবাজী এবং ঝুঁকিদারী ব্যবসায় Speculation কথাটি ধারা ব্যক্ত করা হয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রত্যেক তেজীওয়ালই সম্ভাব্য মন্দীওয়াল (Bulls are prospective bears)। কারণ তেজীওয়ালগণের যখন শেয়ার বিলি দিবার সময় উপস্থিত হয় অথবা আশাহরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইলে যখন বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন তখনও আবার অপ্রকৃত যোগানাদিক্য দেখা দেয়, ফলে শেয়ারের মূল্য কমিতে থাকে। এবং তাঁহারা ই শেয়ার বিক্রয়ের চুক্তি করিতে থাকেন অর্থাৎ Bear-এ পরিণত হন।

অনুরূপভাবে সকল মন্দীওয়ালই সম্ভাব্য তেজীওয়াল (Prospective Bulls) কারণ তাঁহারাও বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া নির্দিষ্ট দিবসে শেয়ার বা অংশপত্র বিলি দিতে হইলে পুনরায় শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং ফলে অপ্রকৃত বা কৃত্রিম চাহিদাধিক্য দেখা দেয় এবং শেয়ারের বা অংশপত্রের মূল্য বাড়িতে থাকে।

অপ্রকৃত বা কৃত্রিম উপায়ে তেজীওয়াল শেয়ার বাজারের অবস্থা তেজীভাবাপন্ন (Bullish) করিলে (অর্থাৎ অধিকাংশ দালাল বা কারবারীই যদি শেয়ার ক্রয় করিতে থাকেন) বলা হয় বাজার চালাকরণ (Rigging the market.)। আর মন্দীওয়ালগণ অপ্রকৃত যোগানের ভাব ফটি

করিয়া অপ্রকৃত উপায়ে বাজারকে মন্দীকরণ (Bearish) করিলে তাহাকে বলে (Banging the market)।

শেয়ার বাজারে তৃতীয় একপ্রকারের ঝুঁকিদার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে ফটকাবাজই বলা হয়। যাহারা নবগঠিত ঘোষণা কারবারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত পত্র (Prospectus) প্রকাশিত হইলেই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ অংশপত্র অনিয়মিত ব্যবসায়ী ক্রয় করিবার আবেদন জানান। এইভাবে নতুন ঘোষণা কারবারী প্রতিষ্ঠানের অংশপত্রের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করেন। পরে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী অংশপত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন। যেমন অপ্রকৃত উপায়ে শেয়ারের মূল্য বাড়ায় সেইরূপভাবে যখন তাহারা শেয়ার বিক্রয় করিতে থাকেন তখন শেয়ারের দাম কমিয়া যায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার কারবারী লোকমানের হাত হইতে নিজেদের রেহাই দিতে পারেন না। ইহাদের বলে অনিয়মিত ব্যবসায়ী (stag)।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রতি শেয়ার বাজারের কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি করিয়া পরিচালকমণ্ডলী থাকে। শেয়ার বাজারের কার্য পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের ভার পরিচালকমণ্ডলীর হাতে। পরিচালকমণ্ডলী যদি কোন শেয়ার দালালের কার্য অব্যাহতি বলিয়া মনে করেন তবে তাহাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করিতে পারেন অথবা কয়েক দিনের জন্য তাহাকে শেয়ার বাজার হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন। কোন শেয়ার দালাল যদি হর্জানা বা পশ্চাত মিটাইবার দক্ষিণা শেয়ার বাজার হইতে দিয়াও জের টানার সুযোগ লইতে না পারে তবে তাহাকে বহিষ্করণ অব্যাহতি বলিয়া ধরা হয় এবং তাহাকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। অবশ্য বহিষ্কার চিরদিনের জন্য নহে। এইভাবে বহিষ্করণকে বলা হয় Stammered। প্রত্যেক শেয়ার বাজারের মধ্যস্থলে একটি উঁচু বেদী থাকে। যখন কোন শেয়ার দালালের বিরুদ্ধে কোনও বিচারমূলক কার্য-গ্রহণ (Disciplinary action) করা হয় তখন ঐ উঁচু বেদীর উপরে দাঁড়াইয়া পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে একজন পরিচালক হাতুড়ি দ্বারা তিনটি বা দিয়া বিচারের রায় ঘোষণা করেন। যাহার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয় তাহাকে বলা হয় Stammered। এইরূপভাবে কোনও ব্যবসায়ী Stammered বলিয়া ঘোষিত হইলে তাহাকে বলা হয় Lame Duck।

পৃথিবীতে যে কয়টি শেয়ার বাজার আছে তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল লণ্ডন কলিকাতা এবং বোম্বাই শেয়ার বাজার।

প্রত্যেক শেয়ার বাজারের একটি করিয়া কার্য নির্বাহক বা পরিচালক মণ্ডলী থাকে। তাহাদের নির্দেশ এবং সমিতির উপবিধি (Articles শেয়ার বাজারের উপবিধি অথবা Byelaws) মানিয়া লইয়া দালালদের কার্য করিতে হয়। দালালগণই প্রকৃতপক্ষে সমিতির সদস্য। স্তরায় সমিতির সদস্য এবং তাহাদের প্রতিনিধি ব্যতীত কেহ শেয়ার বাজারে কারবার করিতে পারে না।

কলিকাতা শেয়ার বাজার একটি পঞ্জীভূত সমিতি (Registered Association)।

কলিকাতা শেয়ার
বাজার

ইহার বর্তমান নাম Calcutta Stock Exchange Association।

ইহার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০০। সদস্যদের মধ্য হইতে

১৬ জন এবং ভারত-সরকারের মনোনীত ৩ জন মোট ১৯ জন

সদস্য লইয়া ইহার কার্যকরী সমিতি গঠিত। কার্যকরী সমিতি Committee নামে পরিচিত।

সমিতির সদস্যগণই মাত্র শেয়ার বাজারে কেনা বেচা করিতে পারে। তবে প্রত্যেক সদস্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারে। প্রতিনিধিগণ সদস্যদের নামে শেয়ার বাজারে কেনা বেচা করিতে পারে। প্রত্যেক সদস্যকে একখানির অধিক শেয়ার দেওয়া হয় না। প্রতি শেয়ারের মূল্য বর্তমানে ২৫০ টাকা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শেয়ারের মূল্য আঙ্গিক মূল্যের অনেক গুণ। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সদস্যকে ২০,০০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা রাখিতে হয়। যে কয়জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে, প্রতি প্রতিনিধি বাবদ ৫০০ টাকা করিয়া প্রবেশ মূল্য (Entrance Fee) দিতে হয়।

কলিকাতা শেয়ার বাজারের সদস্যদের বলা হয় দালাল-কারবারী (Broker-dealer)। ইহার নিজেদের নামেই কারবার করিতে পারেন।

কিন্তু ইহাদের প্রতিনিধি নিজেদের নামে কারবার করিতে পারে না। তাহাদের দালাল-কারবারীর নামেই কারবার করিতে হয়।

বোম্বাই-এর শেয়ার বাজার কলিকাতার শেয়ার বাজারের মত পঞ্জীভূত ঘোষণা কারবারী প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা একটি সমিতি (Association) মাত্র। ইহারও একটি কার্য নির্বাহক সমিতি আছে। উহা Governing Body নামে পরিচিত। বর্তমান সভ্য সংখ্যা ৪৫১। প্রত্যেক সদস্যকে ২০,০০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা রাখিতে হয়। এবং প্রত্যেক সভ্যকে ৫ টাকা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়। প্রতিনিধি অথবা কেরাণীদের মাথাপিছু ৫ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ১ টাকা করিয়া সমিতির দাতব্য তহবিলে জমা দিতে হয়।

বোম্বাই শেয়ার বাজারেও দালাল-কারবারীই কারবার করিয়া থাকেন। তবে তাহাদের প্রতিনিধি ও কেরাণীগণও তাহাদের নামে (সদস্যদের নামে) কারবার করিতে পারে। কলিকাতা বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের নিষ্পত্তি (Settlement) নগদান ভিত্তিতেই বেশী হইয়া থাকে আর বোম্বাই শেয়ার বাজারে চুক্তির নিষ্পত্তির (Settlement) মিয়াদ ১ মাস। সুতরাং বোম্বাই-এর শেয়ার বাজারে ফটকাবাজীর সুযোগ অনেক বেশী।

লণ্ডনের শেয়ার বাজার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় এবং সুসংবদ্ধ। অস্ত্রান্ত্র প্রায় প্রত্যেক দেশের শেয়ার বাজারের নিয়ম কাছন লণ্ডনের শেয়ার বাজারের অনুরূপেই তৈয়ারী।

লণ্ডনের শেয়ার বাজারের সংগঠন একটি ক্লাবের মত। ইহা ঘোষণা কারবারী লণ্ডন শেয়ার বাজার আইনে পঞ্জীভূত প্রতিষ্ঠান নহে। ইহার সভ্য সংখ্যা ৪০০০।

লগুন শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য এই যে উহার সদস্যদের ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

এক দলকে বলা হয় দালাল (Broker); অ্যুরেক দলকে বলা হয় লগুন শেয়ার বাজারের একটি বৈশিষ্ট্য শেয়ারের আড়তদার (Jobber)। লগুন বাজারের দালাল তাহার মক্কেলের নির্দেশ মত ক্রয় বিক্রয় করে কিন্তু শেয়ারের আড়তদার সর্বদাই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ তাহারা সরাসরি নিজেদের নামে ক্রয় বিক্রয় করে। দালালদের ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সর্বদাই আড়তদারদের সহিত হইয়া থাকে। আড়তদার সর্বদাই অংশপত্র বা শেয়ার ক্রয় করিতে বা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে বলিয়া ফটকাবাজীর সম্ভাবনা অতি অল্প। এই কারণেই লগুনের শেয়ার বাজারে শেয়ার বা অংশপত্রের মূল্যের উঠা নামা খুব কম।

লগুনের শেয়ার বাজারে কোনও দালাল শেয়ার ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে আড়তদারের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি শেয়ার ক্রয় করিবেন কিংবা বিক্রয় করিবেন তাহা আড়তদারকে জানান না। আড়তদার ঐ কারণে কোন শেয়ারের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে দুইটি দর উল্লেখ করেন। উহার মধ্যে যেটি কম সেইটিতে তিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আর যেটি অধিক সেইটিতে তিনি বিক্রয় করিতে রাজী। তবে হু'য়ের ব্যবধান থাকে খুব কম। যদি কোন দালাল আড়তদারের নিকট টাটা শেয়ারের মূল্য জানিতে চাহেন তবে তিনি হয়ত বলিবেন ১ পাউণ্ড—১২ শি. অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিংএ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ১২ শি. ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। হু'য়ের ব্যবধান তাহার লাভ (Turn)। যদি দালাল ঐ মূল্যে রাজী হয় তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি চিঠা (Contract Note) তৈয়ার হইবে এবং দালাল উহা মক্কেলের নিকট পাঠাইবেন।

শেয়ার বাজারের অবস্থা : শেয়ার বাজারে কখনও কাজ কারবার খুব অধিক হয় আবার কখনও কাজ কারবারে মন্দা ভাব দেখা দেয়। শেয়ার বাজারে যখন ক্রেতাধিক্য দেখা দেয় তখন বাজারের অবস্থা হয় তেজীভাবাপন্ন (Bullish) আর যখন বিক্রেতাধিক্য দেখা দেয় তখন বাজারে মন্দাভাব (Bearish) দেখা দেয়।

শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা যখন মোটামুটি ভাল এবং শেয়ার বাজারের কারবারী বাণিজ্যের ভবিষ্যত আরও ভাল হইবে মনে করে তখন বাজার তেজীভাবাপন্ন হয়। কারণ শেয়ারে বিনিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা অধিক মনে হয় বলিয়া শেয়ার ক্রয়ের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতে শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা যদি

লাভের অসুস্থ মনে না হয় তাহা হইলে বাজারে বিক্রেতাধিক্য অর্থনৈতিক অবস্থা ও শেয়ার বাজার দেখা দেয়। অনেকের মনেই তখন শেয়ার ধরিয়া রাখিলে

ভবিষ্যতে লোকসান হইতে পারে মনে হয় বলিয়া বেশীর ভাগ লোকই শেয়ার বিক্রয় করিতে চাহে। ফলে চাহিদার তুলনীয় যোগান বাড়ে এবং শেয়ারের মূল্য কমিতে থাকে। শেয়ার বাজারের ঐ অবস্থাকে মন্দাভাব (Bearish) বলে।

শেয়ার বাজারের অবস্থা অনেকগুলি কারণে পরিবর্তন হইতে পারে। রাজনৈতিক অবস্থা যদি খুবই গোলযোগপূর্ণ হয় তাহা হইলে সাধারণত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়, ফলে শেয়ার বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়।

শেয়ার বাজারের অবস্থা পরিবর্তনের কাৰণ
বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কলিকাতা শেয়ার বাজারে দেখা দিয়াছিল মন্দাভাব। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক কার্যের প্রসার হইয়াছিল ফলে শেয়ার বাজারেও কার্যকলাপ বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ সকলেই মনে করিত যে শেয়ারে বিনিয়োগ করিলে বিনিয়োগের উপর উচ্চ লাভ পাওয়া যাইবে।

শেয়ার বাজারে ঝুঁকিদার কারবারী সর্বদাই শেয়ার গ্রহণ ও হস্তান্তরের জগু চুক্তি করে না। উপরে আলোচনা করা হইয়াছে যে অনেকেই ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া উভয়ের ব্যবধান হইতে লাভ করিতে চাহে। এই সকল কারবারীদের কার্য স্বল্প-মিয়াদী স্বদের হার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হয়। কারণ অনেকেই শেয়ার বাজারে কাজ কারবার করিতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেই সকল ঝুঁকিদার কারবারী ঋণ করিয়া শেয়ার বাজারে কারবার করিলে লাভ হইবে কিংবা অলুত্র ঋণে অর্থ খাটাইলে অধিক লাভ হইবে তাহা দ্বারা স্থির করিবে ঋণ করিয়া শেয়ার বাজারে কাজ কারবার করিবে কিনা। সুতরাং স্বদের হার যখন উচ্চ তখন কারবারী ধার করিয়া কারবার করিতে যথেষ্ট দ্বিধা করে। এই কারণে স্বদের হার যখন উচ্চ হয় তখন শেয়ার বাজারে কারবার কমিয়া যায়। স্বদের হার স্থির হয় ব্যাঙ্কের হার (Bank Rate) দ্বারা। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্কের হার (Rate) বাড়াইয়া তুলে হুলত মুদ্রা, তুলত মুদ্রা ও শেয়ার বাজার
মুদ্রা (Dear Money) নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে শেয়ার বাজারের গতি মন্দা হয়। কিন্তু সরকার যদি হুলত মুদ্রা (Cheap Money) নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে শেয়ার বাজারে কাজ কারবারের গতি দ্রুত হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের হারের উপরও শেয়ার বাজারের অবস্থা নির্ভর করে।

দ্রব্যের মূল্যস্তর যখন বাড়িয়া যায় তখন শেয়ার বাজারের কার্যকলাপও বাড়িয়া যায়। কারণ মূল্যস্তর বাড়িলে মুনাফার হারও বাড়ে। সুতরাং শেয়ার বা অংশ পত্রে বিনিয়োগের স্পৃহাও বাড়ে। কিন্তু মূল্যস্তর কমিয়া বাজারে মন্দা ভাব দেখা দিলে শেয়ার বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মূল্যস্তর ও শেয়ার বাজার
কেহই শেয়ার বা অংশপত্রে বিনিয়োগ করিয়া ঝুঁকি গ্রহণ করিতে চাহে না। এই কারণে মূল্যস্তর কমিয়া মন্দাভাব (Depression) দেখা দিলে শেয়ার বাজারে কেনা বেচাও কম হয়।

ষ্টক বাজার নিয়ন্ত্রণ (Control over Stock Exchange) : ষ্টক বাজারে লেনদেন সর্বদা নগদান নিষ্পত্তির ভিত্তিতে হয় না বলিয়া ফাটকাবাজী সম্ভাবনা অতি অধিক। কলিকাতা এবং বোম্বাই শেয়ার বাজারে যথেষ্ট ফাটকাবাজী

চলে। ফাটকাবাজারী ফলে বিনিয়োগকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং দেশের আর্থিক উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই কারণে ভারত সরকার ষ্টক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ জ্ঞাত ১৯৫৬ সালে The Securities Contracts (Regulation) Act পাস করিয়াছে। এই আইনটি ১৯৫৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে কার্যকরী হইয়াছে। এই আইনের বিশেষ ধারাসমূহ বর্ণনা করা গেল।

১। প্রত্যেক শেয়ার বাজার (Stock Exchange) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। অনুমোদনের জ্ঞাত সরকারের নিকট শেয়ার বাজারের উপবিধি দাখিল করিতে হয়। উপবিধি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে অনুমোদন পাওয়া যায়। অননুমোদিত (Unrecognised) শেয়ার বাজার শেয়ারের কাজ কারবার করিতে পারে না।

২। সরকার প্রত্যেক শেয়ার বাজার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। শেয়ার বাজারের কার্যে গলদ দেখা দিলে শেয়ার বাজারের কার্য স্থগিত রাখিয়া বাজার বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

৩। প্রত্যেক শেয়ার বাজারের কার্যনির্বাহক কমিটিতে সরকারের মনোনীত সদস্য থাকিবে।

৪। সরকারের নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তে শেয়ার বাজারের হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

শেয়ারের দর উল্লেখ (Quotation of Shares) : শেয়ার বাজারে প্রতি মুহূর্তেই শেয়ারের দর পরিবর্তন হইতে পারে। এই কারণেই বোধ হয় শেয়ার বাজারের কারবারিগণ বাক্য সংকোচ করে। বাক্য সংকোচ করিয়া শেয়ার বাজারের দর উল্লেখ কারবারের সময় বাড়াইবার জ্ঞাতই বোধ হয় ইহার কথার্থ্যায় সর্বদা সংক্ষিপ্তসার ব্যবহার করে। দ্বিতীয় কারণও হইতে পারে এই যে শেয়ার বাজারের কারবার বিশেষজ্ঞ কারবার। যাহাতে সাধারণের নিকট হইতে শেয়ার বাজারের কর্মপদ্ধতি আড়াল করিয়া রাখা যায় তাহার জ্ঞাতও শেয়ার কারবারিগণ অনেকটা গুঢ়লেখ (Code Language) ব্যবহার করে। দর উল্লেখকালে যে ভাবে দর বলা হয় তাহার কয়েকটি নীচে বর্ণনা করা গেল। সংক্ষিপ্ত লিখন বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইল।

১। **Ex Dividend (X. Div.)**—ইহার অর্থ লাভাংশ রহিত। মনে কর কোন কারবারী একটি ঘোষণা কারবারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয় করিল ১লা ডিসেম্বর। আর মাত্র একমাসের মধ্যেই কারবারটির হিসাব বৎসর সমাপ্ত হইবে। একমাস অপেক্ষা করিলেই শেয়ারের মালিক কারবারের লাভে অংশ গ্রহণ লাভাংশ রহিত করিতে পারে। কিন্তু লাভ লোকসান হিসাব খতিয়ানের পূর্বেই শেয়ার বিক্রয় করিলেও বিক্রেতা ঐ বৎসরের লাভাংশের অধিকার ছাড়িয়া নাও দিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রেতাকে যে মূল্য বলা হইবে উহা লাভাংশ রহিত।

অর্থাৎ শেয়ার ক্রেতা চলতি হিসাব বৎসরের জ্ঞাত লাভাংশ ঘোষণা করা হইলে উহা পাইবে না।

২। **Cum Dividend (C. Div.)**—লাভাংশ রহিতের বিপরীত। শেয়ার লভাংশ সহ বিক্রেতা যদি চলতি হিসাব বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে শেয়ার বিক্রয় করে এবং চলতি হিসাব বৎসরের মূন্সফার অংশ ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে যে দর উল্লেখ করিবে তাহাকে বলা হয় সলাভ।

৩। **Ex Rights**—নূতন বিলিহীন। অনেক বোঁধ কারবারী প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার নিয়ম থাকে যে কারবার যখন নূতন শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন নূতন বিলিবিহীন সংগ্রহ করিবে তখন চলতি শেয়ার মালিকদের আগে অংশপত্র বা শেয়ার ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। চলতি শেয়ার মালিকগণ যদি সে অধিকার ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলেই বাহিরের ক্রেতাদের শেয়ার দেওয়া হইবে। এই প্রকার কোন কারবারের শেয়ার বিক্রয়কালে বিক্রেতা যদি নূতন শেয়ারের অধিকার ক্রেতাকে ছাড়িয়া না দেয় তবে তাহাকে নূতন বিলিবিহীন বলা হয়। ইহাকে Ex Newও বলে।

৪। **Cum Rights**—নূতন বিলিসহ। ইহা Ex Rights এর বিপরীতার্থক। ইহাতে বিক্রেতা নূতন শেয়ার বিলি হইলে শেয়ার ক্রয়ের নূতন বিলিসহ অধিকার ছাড়িয়া দেয় অর্থাৎ ক্রেতাই সে অধিকার ভোগ করে। ইহাকে Cum Newও বলে।

৫। **Cross Transaction (C. T.)**—পান্টা লেন দেন। কোনও কারবারের শেয়ারের পরিবর্তে অল্প কোনও কারবারের শেয়ার গ্রহণের বা পান্টা লেন দেন হস্তান্তরের চুক্তি হইলে তাহাকে পান্টা লেন দেন বলে। দুই কারবারের শেয়ারের মূল্য এক না হইয়া পৃথক হইলে দুই শেয়ারের মূল্যের ব্যবধান নগদান পরিশোধ করিয়া হিসাব নিষ্পত্তি হয়।

৬। **Ready**—ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর নগদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি, অর্থাৎ নগদান অর্থ গ্রহণ করিয়া শেয়ার বিলি দেওয়ার চুক্তিকে বুঝাইতে ব্যবহার হয়।

৭। **Small Lots (S L.)**—Lot কথাটির অর্থ সংহতি বা লগু। কোনও একটি দ্রব্যকে কয়েক ভাগে ভাগ করিতে পারিলে প্রত্যেক অংশকে সংহতি বা লগু বলা হয়। ১০০০ খানা শেয়ারে একটি ষ্টক (Stock) করা হইল। ১০০০ খানা শেয়ারকে যদি ১০ ভাগে ভাগ করা যায় তাহা হইলে ঐ ষ্টক ১০ লগু সংহতি লগু ভাগ করা হইল। শেয়ার বাজারে নিম্নতম কত সংখ্যক শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করিতে পারা যায় তাহার উপরই সংহতি বা লগু ঠিক করা হয়। উপরের উদাহরণটিতে এক এক সংহতিতে ১০০ খানা শেয়ার থাকিবে। কিন্তু যদি কোনও ক্রেতা বা বিক্রেতা ১০০ খানার কম শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চাহে তাহা হইলে সেই প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের জ্ঞাত যে দর উল্লেখ করা হইবে তাহাকে লগু সংহতি বা লগু (Small Lot) বলা হইবে। তবে যে কয়খানা শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় করিতে

চাহে তাহা যদি লপ্তে বা সংহতিতে যে কয়খানা শেয়ার থাকে তাহার গুণিতক হয় তাহা হইলেই ক্ষুদ্র সংহতি বা লপ্ত বলা হয়। উপরের উদাহরণে ৫, ১৫, ২০, ২৫, ৫০ এক একটি ক্ষুদ্র লপ্ত হইবে।

৮। **Small Odd Lot (S. O. L.)**—ক্ষুদ্র ভান্ডন সংহতি বা লপ্ত। যে কয়খানা শেয়ার বিক্রয় করা হইবে উহা যদি লপ্তে শেয়ার সংখ্যার ক্ষুদ্র ভান্ডন সংগতি গুণিতক না হয় তাহা হইলে উহাকে ক্ষুদ্র ভান্ডন সংহতি বা লপ্ত বলে। উপরের উদাহরণে, ৭, ৯, ৩০, ৪০ ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র ভান্ডন লপ্ত হইবে।

৯। **Buyers**—বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বেশী হইলে উহা বুঝাইতে ‘খরিদদার’ কথাটি প্রয়োগ হয়।

১০। **Sellers**—বিক্রেতার আধিক্য বুঝাইতে ‘বিক্রতা’ কথাটি প্রয়োগ হয়।

শেয়ার বাজারের দর : দৈনিক সংবাদপত্রে শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, সোনা, রূপা ক্রয় বিক্রয় মূল্য প্রকাশিত হয়। নিম্নে ৩১শে অক্টোবর ১৯৬১, স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ৩০শে অক্টোবর ১৯৬১ তারিখের শেয়ার বাজারের কয়েকটি দর উদ্ধৃত করা হইল। উহা হইতে দিনের আরম্ভে শেয়ারের দাম, সমাপ্তিকালে শেয়ারের দাম এবং দিনের মধ্যে কিভাবে শেয়ারের দাম পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বুঝা যায়।

১। **কাপড়ের কলের শেয়ার :** জে, কে, রেয়ন—২০.১২; ১২.২৪; ১২.৮৭;

শেয়ার বাজারে
প্রকাশিত দর

১২.৮১; ২০ ইহাতে দিনের আরম্ভে প্রতি শেয়ার ২০.১২ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে, মধ্যে দাম পরিবর্তন হইয়া সমাপ্তি কালে ২০ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

২। **ঋণ পত্র :** ৩% (১৯৮৬) ৭২.৬০ (৭২.৫৫) ইহাতে ১৯৮৬ সালে পরিশোধনীয় শতকরা ৩ টাকা হারে সুদের ঋণ-পত্র আরম্ভকালীন দর ৭২.৬০ টাকা এবং সমাপ্তিকালীন দর ৭২.৫৫ টাকা।

৩। **পাটকলের শেয়ার :** ইণ্ডিয়া—১৫.২৫ (ছোট লপ্ত বা সংহতি), ১৫.৪৪, ১৫.৩৭ ইণ্ডিয়া পাটকলের শেয়ার ছোট লপ্তে ১৫.২৫ দরে লেনদেন হইয়াছে। নির্ধারিত লপ্তে ১৫.৪৪ প্রারম্ভিক দর, ১৫.৩৭ সমাপ্তি দর।

শেয়ারের দরের মত সোনা, রূপার বাজারও দৈনিক পরিবর্তন হইতে পারে। ১৯৬১, ২৮শে অক্টোবর কলিকাতার বাজার দর :

	প্রারম্ভিক দর	সমাপ্তি দর
সোনার পিণ্ড	১৪৪.৭৫ টাকা	১৪৫ টাকা
রূপার পিণ্ড চাদি ১০০ তোলা	২৪০.৭৪ টাকা	২৪১ „
সোনা প্রতি তোলা—নগদ লেনদেন	১২৩.৭৫ „	
অগ্রিম চুক্তি (forward)	১২৪.৬৫ „	
রূপা প্রতি তোলা—নগদ লেনদেন	২০৭.৩০ „	
অগ্রিম চুক্তি (forward)	২০৮.২০ „	

উৎপন্ন পণ্যের বাজার (Produce Exchange) : উৎপন্ন পণ্যের বাজার বলিতে যে বাজারে শিল্প ব্যবহার্য কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি পাইকারী হারে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে বুঝায়। উৎপন্ন পণ্যের বাজারে সাধারণত কৃষিজ কাঁচামালের লেনদেন হয়।

উৎপন্ন পণ্যের বাজারের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রথমত, এখানে পাইকারী ব্যতীত খুচরা বিক্রয় হয় না; দ্বিতীয়ত, কৃষিজ কাঁচামাল বা খাদ্য শস্য বাহা গুণানুসারে বিভাজন ও নমুনাকরণ সম্ভব উহাই উৎপন্ন পণ্যের বাজারে লেনদেন হয়।

উৎপন্ন পণ্যের বাজারের কারবারীদেরও ঝুঁকিদার কারবারী বলে। ইহারা যে ড্রবোর লেনদেন করে উহার মূল্য স্থিতিকরণে (Stabilisation) সাহায্য করে ভবিষ্যত চাহিদা এবং যোগানের অনুমানের উপরই ইহাদের লেনদেনের ভিত্তি স্থতরাং ঝুঁকি বহন করিয়া ইহারা উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করেন। তৃতীয়ত, ইহারা স্থানান্তর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেও সাহায্য করে।

আমেরিকার বাজারে কোনও ঝুঁকিদারী কারবার তুলা ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া প্রয়োজন হইলে সেই তুলা কলিকাতায় বাজারে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিতে পারে। ফলে উভয় দেশের মধ্যে মূল্যের পার্থক্যও কমিয়া যায়। আমেরিকা হইতে তুলা আমদানির চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্পপতি নিশ্চিন্ত মনে তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়া যাইতে পারেন।

উৎপন্ন পণ্যের বাজার কে দুইভাগে ভাগ করা হয়; নগদান এবং ভবিষ্যত (Futures)।

নগদান বাজারে কেনাবেচার চুক্তির পর নির্দিষ্ট দিনে নগদান অর্থ প্রদানের পরিবর্তে পণ্যের বিলিগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং নগদান বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা অধিক পরিমাণ ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ লইতে পারে। কতদিনের মধ্যে নগদান লেনদেনের পরিসমাপ্তি (Final settlement) হইবে তাহা বাজারের ব্যবস্থাপক সমিতি নিয়ম করিয়া স্থির করিয়া দেয়।

ভবিষ্যত বা ভাবী কেনাবেচার বাজারে (Futures) প্রকৃত পক্ষে ঝুঁকি বহনের কারবার হয়। ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট দিনে বিলি দিবার বা বিলি গ্রহণের চুক্তিতে যে কেনা বেচা হয় তাহাকে ভাবী কেনা বেচা বলে। তবে ভাবী কেনাবেচা বাজারের বৈশিষ্ট্য এই যে ক্রেতা পণ্যের বিলি লইবার জন্তই ক্রয় করে না অথবা বিক্রেতাও পণ্য বিলি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিক্রয় করে না। ইহার উদ্দেশ্য ভাবী বাজারে কেনা বেচার মূল্য দ্বারা ভবিষ্যতে পণ্যের কি দর হইবে তাহার ইঙ্গিত ভাবী কেনাবেচা দেওয়া। কোন ক্রেতা ভবিষ্যত বা ভাবী বাজারে (Futures)

কোন ড্রব্য ক্রয় করিলে বিক্রেতা কি মূল্যে ভবিষ্যতে পণ্য বিলি দিবে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। ক্রেতা ঐ মূল্য অনুসারে ভবিষ্যতে তাহার শিল্প ড্রবোর মূল্য স্থির করিতে পারে। ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত যদি কাঁচামালের মূল্য পরিবর্তন হয় তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে শিল্প ড্রবোর মূল্য পরিবর্তন হইলে

ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণেই ভাবী বাজারে বিক্রেতা মূল্য স্থিতিশীলতায় (Stabilisation) সাহায্য করিয়া থাকে। যদি কোন ময়দা উৎপাদক বুঝিতে পারে যে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে গমের কি মূল্য হইবে তাহা হইলে সে সেই সময়ে ময়দার কি মূল্য হইবে তাহা স্থির করিতে পারে।

ভাবী বাজারের বিক্রেতা এইভাবে ভবিষ্যতে মূল্য পরিবর্তন জনিত লোকসান বহনের ঝুঁকি নিয়া থাকে। ঝুঁকি বাহক লেনদেনের ঝুঁকি সম্পূর্ণ একাই বহন করে না। ঝুঁকি বণ্টন বা প্রসার করিয়া দেওয়াই ভবিষ্যত বাজারের মূল উদ্দেশ্য। একজন

ভবিষ্যত কেনা-বেচার লোকসান বন্ধের পথ
বিক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া যে ঝুঁকি বহন করিল উহাই আবার বাজারের অন্যান্য কারবারীদের মধ্যে ছড়াইয়া দেয় অর্থাৎ ঝুঁকি বাহক বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্যের জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে সেই দ্রব্যই হয়ত পুনরায় আর একজন ঝুঁকি বাহকের নিকট ক্রয় করিবে। দ্বিতীয় ঝুঁকি বাহক তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নিকট ঐ ঝুঁকি অপসারণ করিয়া নিজের ঝুঁকি কমাইয়া দেয়। এইভাবে মূল ঝুঁকি বাজারের কারবারীদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

ভবিষ্যৎ বা ভাবী কেনা বেচার চুক্তি (Futures) ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের বিলি দিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকে। যদি বলা হয় ‘মে আগম’ (May Futures) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মে মাসের কোন তারিখে মালের বিলি দিতে হইবে।

যদি কোনও ভবিষ্যত চুক্তিতে ‘মে রপ্তানি আগম’ (May Shipment Futures) বলা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মে মাসের কোনও সময় রপ্তানি দিবার জন্য চুক্তি করা হইল এবং ঐ সময় চুক্তির পরিসমাপ্তি হইবে।

ভাবী বাজারের কেনা বেচায় লোকসান বীমা (Hedging): Hedging কে ভাবী বাজারে কেনা বেচায় লোকসান বীমা (Insurance) বলা হয়। ভাবী কেনা বেচায় (futures) ক্রেতা এবং বিক্রেতার উভয়েরই লোকসান হইতে পারে। ৩ মাস পর বিলি দেওয়ার চুক্তিতে যে পণ্য বিক্রয় করা হইল উহার মূল্য যদি বাড়ে তাহা হইলে বিক্রেতার লোকসান হয়। তেমনি মূল্য কমিলে ক্রেতার লোকসান হয়। সুতরাং উভয় পক্ষেরই ভবিষ্যৎ লোকসান বন্ধ করার পথ ঠিক করিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। ব্যবসায়ীর উদ্ভাবনী শক্তি সে পথও বাহির করিয়াছে। ব্যবসায়ী একই সময়ে নগদান বাজারে (spot market) এবং ভাবী বাজারে (futures) বিপরীত লেনদেনের চুক্তি করিলেই ভবিষ্যৎ লোকসান এড়াইতে পারেন।

উদাহরণ
একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একজন কাপড়ের মিলের মালিক ৫০০ গাঁট তুলা ১০০ টাকা দরে ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন। যদি কোনও কারণে ৬ মাসের মধ্যে তুলার মূল্য কমিয়া ৮০ টাকায় নামে তাহা হইল সেই সময় কাপড়ের মূল্যও কমিয়া যাইবে। এবং কাপড়ের কলের মালিককে লোকসানে কাপড় বিক্রয় করিতে হইবে। এই লোকসানের হাত হইতে রেহাই

পাওয়ার জন্ত মিলের মালিক ভবিষ্যৎ বাজারে সম পরিমাণ দ্রব্য ৬ মাস পর ১০০ টাকা মূল্যে বিলি দিবার চুক্তি করিলেন। তাহা হইলে মিলের মালিকের নগদান বাজারে তুলা কিনিয়া কাপড় বিক্রয় করিয়া যে লোকসান হইল উহা ভবিষ্যৎ বাজারে বিক্রয়ের লাভ হইতে পূরণ হইতে পারে, কারণ ভবিষ্যতে যেদিন তুলা বিলি দেওয়ার সময় হইবে সেদিন ৮০ টাকা দরে বাজার হইতে কিনিয়া ১০০ টাকা দরে বিলি দিতে পারেন।

অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি ভবিষ্যতে দ্রব্যের মূল্য বাড়িবে মনে করেন তাহা হইলে চলতি মূল্যে বিক্রয়ের চুক্তিতে যে লোকসান হইবে উহা পূরণ করার জন্ত ভাবী ক্রয়ের (futures purchase) চুক্তি করিবেন। এবং প্রকৃতই যদি মূল্য বাড়ে তাহা হইলে বাড়তি মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান পূরণ করিবেন।

পণ্যের বাজারে লেনদেনের লোকসান বন্ধের উপায় (Hedging) নিম্নরূপ :

নগদান বাজারে (spot) ক্রয় এবং তৎক্ষণাৎ ভবিষ্যৎ বাজারে (futures) বিক্রয় ক্রেতা মূল্য কমিবে মনে করিলেই লোকসান বন্ধের পন্থা (Hedging) অবলম্বন করিবে আর বিক্রেতা মূল্য বাড়িবে মনে করিলেই লোকসান বন্ধের পন্থা (Hedging) গ্রহণ করিবে।

ঝুঁকির পরিমাণ কমান, মূল্যের স্থিতিশীলতা (stability of prices), এবং যোগানের নিশ্চয়তা (Certainty of supply) এই সমস্ত স্বযোগ ভাবী কেনা বেচা হইতে পাইলেও ভাবী কেনা বেচা (futures transaction) পণ্যের বাজারে ঝুঁকি-না বের কার্ণের ফল খুব সতর্কতার সহিত না করিলে ব্যবসায়ীর নিজেরও যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশী, সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপর্যয় আনিতেও ভাবী বাজার (futures market) যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে। একাধারে ঝুঁকি বাহক যেমন অর্থনৈতিক সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বানচাল করিতেও পারেন।

শস্যের বাজারের সহিত পণ্যের বাজারের পার্থক্য : শস্যের বাজারে শস্যের বাজার ও ষ্টক, শস্যের, সরকারী ঋণপত্র, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঋণ-পণ্যের বাজারেব পত্র ইত্যাদিই ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু পণ্যের বাজারে শিল্পের পার্থক্য ব্যবহারোপযোগী কাঁচামাল খাদ্য শস্য ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়।

শস্যের বাজারে তালিকাভুক্ত (listed) হইলে সকল প্রকার শস্যের, ষ্টকই ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে কিন্তু উৎপন্ন পণ্যের বাজারে সকল উৎপন্ন পণ্যই ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে না। যে সকল দ্রব্যের গুণাগুণায়ী নমুনাকরণ সম্ভব সেই সমস্ত দ্রব্য বা পণ্যই মাত্র পণ্যের বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে।

পণ্যের বাজার দর : শস্যের দর যেমন উঠানামা করে ; পণ্যের দরও তেমনই পণ্যের বাজারের উঠানামা করে। শস্যের দরের মতই পণ্যের দর নিয়মিত প্রকাশিত দর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ—

তৈলবীজ সরিষা—রাই (বড়) ১০১'১৪—১০১'৮১। অর্থাৎ, দর ১০১'১৪ এবং

১০১'৮১ মধ্যে উঠানামা করিয়া সমাপ্তিকালীন দর ছিল ১০১'৮১ টাকা প্রতি কুইন্টাল। (১ কুইন্টাল = ১০০ কিলোগ্রাম বা ২ মণ ২৭ সের।)

নিলাম বাজার (Auction) : নিলামদার (Auctioneer) কিভাবে নিলামে দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। নিলামদার নিজে ব্যবসায়ীর খুঁকি গ্রহণ করে না। অন্টার পক্ষে কেনা বেচা করে। তাহার বিক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পণ্যের বাজারে যেমন কতিপয় নির্দিষ্ট পণ্যের কাজকারবার হয়; নিলাম বাজার নিলাম বাজারেও তেমন নির্দিষ্ট দ্রব্য নিলামে বিক্রয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নিলাম বাজার আছে। যেমন—চা নিলাম বাজার, ফল নিলাম বাজার ইত্যাদি।

নিলাম বাজারেও পণ্যের বাজারের মত যে সকল দ্রব্যের গুণানুসারে নমুনা করণের এবং শ্রেণীবিভাগের সুবিধা আছে সেই সকল দ্রব্যেরই কারবার হয়। গুদামে মাল থাকা কালে উৎপাদক মালের নমুনা তৈয়ার করে। সেই নমুনা নিলাম বাজারে পাঠান হইলে সম্ভাব্য ক্রেতা নমুনা দেখিয়া পছন্দ করিলেই দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রয়াসী হয়।

নিলাম বাজারও এক বিশেষ বাজার (special market)। কলিকাতায় চা-এর একটি নিলাম বাজার আছে। ঐ বাজারে আসাম, নিলাম বাজার বিশেষ দার্জিলিং, ডুয়ার্দের সকল চা উৎপাদক চা-এর নমুনা পাঠাইয়া বাজার দেন। চা নিলাম বাজারের নির্বাহক সমিতি উৎপাদকের পক্ষে নমুনানুযায়ী চা বিক্রয় করেন। সম্ভাব্য ক্রেতা বা ক্রেয়চ্ছু ব্যক্তিগণ চা-এর নমুনার সহিত ইচ্ছা করিলে গুদামে রক্ষিত চা মিলাইয়া দেখিতে পারে।

চা-এর নিলামও সাধারণ নিলামে বিক্রয়ের মতই। ক্রেয়চ্ছু ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া দর হাঁকাহাঁকি করেন (Bid)। যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ দর হাঁকেন তাঁহার নিকটই বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়। কলিকাতায় চা নিলাম বাজার ক্যালকাটা টি ব্রোকাস' এসোসিয়েশন (Calcutta Tea Brokers Association)

কলিকাতা চা-এর নিলাম বাজার কর্তৃক পরিচালিত। নিলাম বিক্রয়ের কক্ষে প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার চা নিলামে বিক্রয় হয়। সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট চা বিক্রয় হইলেও ডাককারীকে সর্বদাই এক সর্বনিম্ন সংখ্যক পেটি ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত থাকিতে হয়। অর্থাৎ, ঐ সর্বনিম্ন পেটির সংখ্যাই নিলাম বাজারের একক (Unit)।

চা-এর নিলাম বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি নিষ্পত্তি (Settlement) মিয়াদ ১০ দিন। নিলামের দিন হইতে ১০ দিনের মধ্যে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করিয়া চা-এর বিলি লইতে হয়। মূল্য পরিশোধের শেষ দিনকে বলে Prompt Day। চা নমুনা দৃষ্টে ক্রয় বিক্রয় হয় বলিয়া চা সম্বন্ধে কোনও ক্রেতার অভিযোগ থাকিলে উহা ৬ দিনের মধ্যে নিলামকারী অর্থাৎ Calcutta Tea Brokers Associationকে জানাইতে হয়।

বিশেষ নিলাম বাজারে (Special Auction Market) ব্যবহার চাহিদা ব্যাপক না হইলে বিক্রয় করা যায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চা নিলাম বাজার লণ্ডন।

চা-এর মত মাছেরও নিলাম বাজার আছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ রেল স্টেশনের নিকটেই এই নিলাম বাজার আছে। সেখানে পাইকারগণ নিলামদারের মাধ্যমে নিলামে মাছ ক্রয় করে।

মেছুয়া বাজারে আছে ফলের নিলাম বাজার।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বিশেষ নিলাম বাজারে ((Special Auction Market) উৎপাদক মাল পাঠাইয়া দেয় না। নমুনা ও গুণের নামেই নিলামে ক্রয় বিক্রয় হয়।

নিলামকারী নিলামের সকল ব্যয় বহন করে। নিলামের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে দস্তুরি লইয়া নিলামদার কারবার করে। বিক্রয়মূল্য হইতে নিলামদারের দস্তুরি (Commission) এবং অগ্রাণু ব্যয় বাদ দিয়া উৎপাদককে মূল্য শোধ করা হয়।

Exercises

1. How does Stock Exchange serve Investors ?
বিনিয়োগকর্তাদের ষ্টক বাজার (শেয়ার বাজার) কিভাবে সাহায্য করে ?
2. What are the causes of fluctuations of market value of shares ?
শেয়ারের বাজার মূল্য উঠানামা করে কেন ?
3. How does a Bull gain by a rising market and Bear by a 'falling market' ?
বাজার দর বাড়িলে তেজীওয়াল ও দর কমিলে মন্দীওয়াল কিভাবে লাভ করে ?
4. Explain : (a) Jobbers turn ; (b) Rigging the market, (c) Banging the market, (d) Stag.
ব্যাখ্যা কর : (ক) দালালের লাভ, (খ) বাজার চালাকরণ, (গ) বাজার মন্দীকরণ, (ঘ) অনিয়মিত ব্যবসায়ী।
5. What are the conditions of an Extensive market for goods ?
কোনও ব্যবহার ব্যাপক বাজার হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যিক ?
6. What are the functions of speculators ?
সুঁকিবাহকের কার্যাবলী কি ?
7. Explain with an example the operation of Hedging.
'ভারী বাজারে কেনাবেচা লোকসান বন্ধের পদ্ধতি' উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।
8. What is understood by Commodity Exchange ? How does it differ from Stock Exchange ?
পণ্যের বাজার বলিতে কি বুঝ ? শেয়ার বাজারের সহিত ইহার পার্থক্য কি ?

ষোড়শ অধ্যায়

মাল গুদাম

(Warehouse)

ব্যবসায় বাণিজ্যের সহায়ক প্রতিষ্ঠানের বা অঙ্গের মধ্যে মাল গুদাম অন্তর্গত।
বহুল উৎপাদন প্রথার একটি স্বযোগ চাহিদা অল্পস্বার্থী যোগানের
মাল গুদাম ও সম্ভাব্যতা। শিল্পে উৎপাদন চাহিদা অল্পমান করিয়াই হয়
ব্যবসায়ের সহায়ক (Production in anticipation of demand)। সুতরাং
উৎপাদিত দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ব্যবসায়ের পক্ষে অপরিহার্য।

চাহিদানুসারে উৎপাদন সর্বদা সম্ভব হয় না। আমার অণ্ড এক কুইন্টেল চাউলের
প্রয়োজন হইল। কৃষকের বাড়ী গেলাম। কৃষককে বলিলাম, ভাই, এক কুইন্টেল
চাউল দাও। কৃষকের পক্ষে যদি গৃহে চাউল মজুত না থাকে, তাহা হইলে বলিতে
হইবে যে চাউল উৎপাদন হইতে ৬ মাস সময় লাগিবে। জমি চাষ করিব; বীজবপন
করিব, বীজ হইতে শস্য হইবে, শস্য পাকিবে, শস্য উত্তোলন করিব, ধান ছাটিয়া চাউল
তৈয়ার করিব, ততদিন তুমি অপেক্ষা কর। সুতরাং ৬ মাস অভুক্ত থাকিয়া বায়ুতৃক
না হইলে যখন বাঁচিয়া থাকা যায় না, তখন যতদিনে চাউল পাইতে পারিব, ততদিনে
আমার চিত্তাভ্যাস জমিতে সারের কার্য করিবে। আবার উৎপাদন করিব বলিলেই ত
আর কৃষক উৎপাদন করিতে পারে না কারণ জমি চাষ করিতে বর্ষার প্রয়োজন।
তাহা হইলে কি আমার মত মূর্খের বাঁচিয়া থাকার উপায় নাই?

কৃষক যদি জানে যে আমার মত লোকের চাউলের চাহিদা হইবে তাহা হইলে
সে যখন প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল থাকিবে তখন তাহার সাধ্যমত ধান, গম ইত্যাদি
উৎপাদন করিবে এবং সেই শস্য মজুত রাখিবে, যাহাতে আমার মত লোকের চাহিদা
দেখা দিলে আমার প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

এই সহজ উদাহরণটি হইতে একথা বুঝিতে পারিতেছি যে অনেক দ্রব্য আছে
যাহার উৎপাদন ঋতুগত (Seasonal) কিন্তু উহার সম্ভোগ
চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনে বৎসরের বার মাসই হয়। সুতরাং প্রয়োজন হয় উৎপাদিত দ্রব্য
মজুত রাখার যাহাতে যখনই দ্রব্যের চাহিদা হইবে তখনই
যোগান দেওয়া যায়।

আরেকটি উদাহরণ দিই। এমন দ্রব্য আছে যাহার উৎপাদন হয় সম্বৎসর।
কিন্তু সম্ভোগ বিশেষ ঋতুতেই সীমাবদ্ধ। শীতবস্ত্রাদি যে শিল্পে উৎপাদন হয় তাহা
বারমাসই উৎপাদন করিতে থাকে। ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় অঞ্চলে শীতবস্ত্রের সম্ভোগ শীত
ঋতুতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং শীতবস্ত্রাদি উৎপাদকের পক্ষেও সম্বৎসরের উৎপাদন মজুত
করিয়া রাখার স্বযোগ না থাকিলে মাহুষের শীতবস্ত্রাদির অভাব মোচন সম্ভব নহে।

আবার যদি দ্রব্য মজুত রাখার ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে বৎসরের যে সময়ে
উৎপাদন হয়, সেই সময়েই উৎপাদিত দ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে
চাহিদা-যোগান
সমর্থন ও গুদামঘর
হয়। ফলে চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হয় বলিয়া মূল্য
কমিয়া যায়।

মানুষ যে সমুদয় দ্রব্য সন্তোষ করে উহা সকলই তাহার নিজের প্রচেষ্টায় উৎপাদন
হয় না। যে কাগজে তুমি লিখিতেছ উহা হয়ত উৎপাদন হয় ম্যানিলাতে
(Manila)। ম্যানিলাতে দ্রব্য উৎপাদন হইল এবং তোমার হাতে আসিয়া
পৌছিল উহার অন্তর্বর্তী সময়ে কাগজ কোথায় ছিল? উৎপাদনকারীর নিকট,
উৎপাদনকারীর নিকট হইতে পাইকারের নিকট, পাইকারের নিকট হইতে খুচরা
বিক্রেতার কাছে এবং খুচরা বিক্রেতার নিকট হইতে তোমার হাতে। ম্যানিলার
উৎপাদনকারী কেবল তাহার প্রতিবেশীর জন্যই উৎপাদন করে নাই। সে ত উৎপাদন
করিয়া যাইতেছে। উৎপাদনের পর কতদিনে পাইকার ক্রয় করিবে, কতদিনে
পাইকার জাহাজে পাঠাইবে এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই ত উৎপাদক উৎপাদন
কবে। সুতরাং উৎপাদন করিয়া যদি অল্প সময়ে বিক্রয় করার অন্তর্বর্তীকালে দ্রব্য
মজুত রাখা ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে কোন উৎপাদনই সম্ভব নহে।

ব্যবসায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করার অল্প কারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানজনিত
অস্থবিধা দূরীকরণ, (অর্থাৎ উৎপাদন ও সন্তোষের অন্তর্বর্তীকালীন দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ);
স্থানের ব্যবধানজনিত অস্থবিধা দূরীকরণ (কারণ বাংলাদেশ গম
উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া কি বাঙ্গালী রুটি খাইবে না)
সময় উপযোগ ও স্থান
উপযোগ গঠন
গুদামঘর
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায় এবং অর্থনীতিতে প্রথমটিকে
বলে সময় উপযোগ (Time Utility) তৈয়ার এবং দ্বিতীয়টিকে
বলে স্থান উপযোগ (Place Utility) তৈয়ার করণ। সময় উপযোগ ও স্থান
উপযোগ তৈয়ার দ্রব্য মজুত করার স্বযোগ থাকিলেই হইতে পারে, নচেৎ নহে।

উপরের সহজ উদাহরণ দুইটি বিশদভাবে আলোচনা করিলে মাল মজুতের কার্য
বৃদ্ধিতে পারা যায়। গুছাইয়া লিখিলে নিম্নরূপ দাঁড়াইবে।

প্রথমত, চাহিদা অল্পভূত হইলেই যোগান সম্ভব। অর্থাৎ, উৎপাদন ও সন্তোষের
মধ্যে সময়ের ব্যবধানজনিত অস্থবিধা মোচন।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর নানাস্থানে যে উৎপাদন চলিতেছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই
গুদামঘরের কার্যের সন্তোষের স্ববিধা। অর্থাৎ, উৎপাদনস্থল ও সন্তোষস্থলের
সংক্ষিপ্তসার
ব্যবধান ঘুচিয়া যায়, অবশ্য যদি যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা
থাকে, উহা অন্তর আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয়ত, মজুতকরণের স্ববিধা আছে বলিয়াই বৎসরের প্রায় সব সময়ে একই
মূল্যে দ্রব্যের সন্তোষ সম্ভব হয়। অর্থাৎ, দ্রব্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা মজুতকরণের
স্ববিধার উপরই নির্ভর করে।

চতুর্থত, বহুল উৎপাদনের স্বযোগ গ্রহণ কখনই মজুতকরণের অস্থপস্থিতিতে ভোগ
করা যায় না।

পঞ্চমত, মজুত ব্যবস্থা থাকার জন্তই খুচরা ব্যবসায়ী মজুত ঘর হইতে দ্রব্যাদি দেখিয়া গুনিয়া লওয়ার সুযোগ পায়।

যে সুরক্ষিত ঘরে বা কোঠায় মাল মজুত করা হয় তাহাকেই গুদাম ঘর বলে। এইরূপ সুরক্ষিত স্থান যদি না থাকে তাহা হইলে উৎপাদনকারী অগ্রিম উৎপাদন করিত না অথবা আমদানিকারকও অগ্রিম আমদানি করিত না, এবং ফলে চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনও সম্ভব হইত না। এই কারণেই বহুল উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে মজুতকরণের উপায়ও উন্নতিলাভ করিতেছে।

গুদামঘরের প্রকার (Different kinds of Warehouse) : গুদাম ঘরের মালিকানা ব্যবস্থা অনুযায়ী গুদামঘরকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাহাদের নিজেদের গুদাম ঘর আছে। যেমন বড় বড় শিল্প-মালিক প্রায় প্রত্যেকেই কারখানার কাছাকাছি কোথাও গুদামঘর আছে।

বিভিন্ন প্রকারে
গুদামঘর
এই সকল গুদাম ঘরের মালিক শিল্প-মালিকগণ নিজেরাই। ইহাতে নিজ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য ব্যতীত দ্রব্য মজুত করণের সুযোগ দেওয়া হয় না। ঘরোয়া প্রচেষ্টায় গুদাম ঘরের ব্যবস্থা ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও শিল্প-মালিকগণকে উৎপাদিত দ্রব্যের আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ঘরোয়া প্রচেষ্টায় বৃহদাকার গুদামঘর করিতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মালগুদামের ব্যবসায় দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। ইহাও ঘরোয়া ব্যবস্থা বটে তবে বিশেষ শিল্পের প্রয়োজনের জন্তই এই প্রকার গুদাম ঘর ভাড়া দিয়া আয় করা ই বৃহদাকার গুদামঘর প্রতিষ্ঠানের (Warehousing Concerns) কার্য। জাহাজী কোম্পানী; রেল কোম্পানী, এবং অগাধ পরিবহণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকলই ঘরোয়া গুদামঘর (Private Warehouse)। রেল কোম্পানী জাতীয়করণের ফলে, ভারতবর্ষের রেল গুদামকে আর ঘরোয়া গুদাম বলা সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয়ত, সরকারী প্রচেষ্টায়ও মাল গুদামের উন্নতি ও প্রসার হইতেছে। সরকারী ব্যয়ে গঠিত এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে যে গুদামঘরসমূহ কার্য করে তাহাদের সরকারী গুদাম ঘর বলে। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে সরকারী গুদামঘর প্রয়োজনের তুলনায়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, গুদামঘরের এতই অভাব যে গ্রামীণ ঋণ অনুসন্ধান কমিটি (Rural Credit Enquiry Committee) এবং সর্বভারতীয় গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা (জরিপ) কমিটির (All-India Rural Credit Survey Committee) সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার ৩৫০টি বড় গুদাম তৈয়ারীর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য পরিকল্পনা এখনও কার্যকরী হয় নাই, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ে এবং তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশন (Central Warehousing Corporation) এবং প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য গুদাম কর্পোরেশন (State Warehousing Corporation) গঠিত হইয়াছে।

গ্রামীণ আর্থিক সমস্যা এবং ঋণ সমস্যা মোচনের একটি পন্থা উভয়কমিটিই সুপারিশ করিয়াছেন, গ্রামাঞ্চলে গুদামের ব্যবস্থা করা। গুদামজাত করার সুবিধা থাকে না বলিয়া গ্রামের কৃষককুল শস্ত উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে সকল শস্ত কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া

দেয় এবং পরে চাহিদানুযায়ী আবার সেই শস্তই অধিক মূল্যে ক্রয় করে। আবার গ্রামাঞ্চলে ঋণের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, জমিজমা বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করা। কারণ কৃষক উৎপাদিত

শস্ত বিক্রয় করিয়া দেওয়ার ফলে ঋণের প্রয়োজন হইলে জমিজমা ব্যতীত আর কিছুই বন্ধক দিতে পারে না। শিল্প-মালিকগণ যেমন গুদামজাত দ্রব্যের জামানতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ সে সুযোগ পায় না। এই কারণে ছোট ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে শাখা অফিস খুলিতেছে উহার প্রত্যেকটি শাখা অফিসের সঙ্গে একটি গুদামঘরের ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে অল্প মাগুলে গ্রামের কৃষকগণ গুদাম ঘরে উৎপাদিত দ্রব্য মজুত রাখিতে পারে। এই সকল গুদাম প্রতিষ্ঠানকে সরকারী গুদাম প্রতিষ্ঠান বলে। যে কেহই ভাড়া দিলে এইপ্রকার গুদামে মাল গুদামজাত করিতে পারে।

তৃতীয়ত, অনেক সমবায়-সমিতিও গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য গুদামের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সকল গুদামঘরকে বলে সমবায় গুদামঘর (Co-operative Warehouse)।

চতুর্থত, সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া অনেক ব্যবসায়ী গুদামঘরে মাল মজুত রাখার ব্যবসায় করে। ইহারা আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর শুদ্ধ প্রদান না করিয়া দ্রব্য মজুত রাখিতে পারে। ইহাকে কুন্ডাধীন গুদামঘর (Bonded Warehouse) বলে।

গুদামঘরের সুবিধা (Advantages of Warehouse): প্রথমত, বৃহদাকার ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রচুর মাল মজুতের প্রয়োজন। সুতরাং নিজের গুদাম না থাকিলেও গুদাম ভাড়া করিয়া প্রচুর মাল মজুত করার সুযোগ পায় বলিয়া ব্যবসায়ের ব্যাঘাত হয় না।

দ্বিতীয়ত, গুদামঘরের মালিক অথবা ব্যবস্থাপক গুদামে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রক্ষিত মাল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অল্প মাগুলের পরিবর্তে ব্যবসায়িগণ গ্রহণা এবং মালের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারেন।

তৃতীয়ত, যাহারা গুদাম ঘরের ব্যবসায় করে, অর্থাৎ যাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেই গুদাম ঘর তৈয়ারী করে না তাহারা মাল মজুতকরণ ব্যতীতও ব্যবসায়ীকে অগ্ন্যাত সাহায্য দিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক জাহাজী ব্যবসায়ীর গুদামঘর ও অগ্ন্যাত নিজেই গুদামঘর থাকে। মন্ডলের মাল জাহাজে তোলা, জাহাজ হইতে নামাইয়া গুদামে তোলার ব্যবস্থা সমস্তই ঐ কারবারী প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকে। অল্পরূপ সাহায্য রেল প্রতিষ্ঠানসমূহও দিয়া থাকে।

চতুর্থত, ব্যবসায়ী উৎপাদন স্থলের নিকটেই মাল মজুত না করিয়া সন্তো-
কারীদের সহজে মাল সরবরাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সন্তো-
গ-স্থলের নিকটবর্তী স্থলে মাল মজুত করার সুযোগ লইতে পারে। ইহাতে
সস্তার মাল সরবরাহ করা ব্যতীত, অল্প ব্যয়ে মাল সরবরাহ
দেওয়াও সম্ভব হয়।

পঞ্চমত, গুদামজাত দ্রব্য বিক্রয় করিলে ক্রেতার ঘরে মাল পৌঁছাইয়া না দিয়া
ক্রেতাকে গুদামের রসিদ পিছন সহি দ্বারা মালের স্বত্বার্পণ করিয়াই
মাল বিলি দেওয়া যায়। ক্রেতাকেও যখন মাল গুদামজাত
করিতেই হইবে তখন সেও গুদামে রক্ষিত মালের আংশিক
বিলি গ্রহণ করিতে পারে।

ষষ্ঠত, আমদানিকারক গুদামধীন দ্রব্য আমদানি করিয়া আমদানি শুদ্ধ পরিশোধ
করিতে অপারগ হইলে গুদামধীন গুদামঘরে (Bonded Warehouse) রাখিতে
পারে। অথচ গুদাম ঘরে থাকা কালে ক্রেতার সন্ধান করিতে
পারে। গুদামধীন গুদামে মাল রাখিয়া মাল বিক্রয়োপযোগী
করার জ্ঞাত গুণ বিভাজন ও নমুনাকরণ, সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন
করিতে পারে। আবার একই দ্রব্য যদি পুনরুৎপাদন করা হয় আর যদি গুদামধীন
গুদামঘরে রাখা হয় তাহা হইলে আদৌ শুদ্ধ না দিয়াও পারে। অবশ্য গুদামধীন
দ্রব্য পুনরুৎপাদন হইলে, রপ্তানির উপর আমদানি শুদ্ধ ফেরত পাওয়া যায়
(Drawback দেখ)। তাহা হইলেও অনর্থক অর্থ আটক রাখার প্রয়োজন হয়
না, আর আদায়ের অসুবিধা ভোগ করিতেও হয় না।

সপ্তমত, যে ব্যবসায়ী পুনরুৎপাদনের ব্যবসায় করে তাহার পক্ষে আমদানিকৃত মাল
জাহাজ হইতে নামাইয়া নিজের ব্যবসায় স্থলে বহন এবং পুনরায়
জাহাজ ঘাটে আনয়ন, এই কামেলা হইতেও নিষ্কৃতি পায়।
জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া পুনরায় জাহাজে তোলা পর্যন্ত গুদামঘরে রাখিয়া দিল।
এই সুযোগও জাহাজের গুদামঘরসমূহ হইতে পাওয়া যায়। জাহাজ হইতে মাল
নামান হইলে যতদিন পুনরায় রপ্তানির জ্ঞাত জাহাজে স্থানের সংস্থান করিতে না পারে
ততদিন বন্দরের গুদামঘরে মাল রাখিতে পারে।

Exercises

1. Enumerate the services rendered by a Warehouse.
গুদামঘরের কাৰ্য বর্ণনা কর।
2. What are the advantages of a Warehouse ?
গুদামঘরের উপকারিতা কি ?
3. What is a Bonded Warehouse ? How does it help importer ?
গুদামধীন পণ্যাগার কি ? ইহা আমদানিকারককে কিভাবে সাহায্য করে ?

সপ্তদশ অধ্যায়

বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় উদ্যোগ

(Advertisement and Salesmanship)

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিজ্ঞাপনের যুগ (Age of advertisement and Publicity)। একটি প্রবাদ আছে যে একটি মিথ্যা ১০০ বার পুনরাবৃত্তি কর এবং উহা সত্য

হইবে (Repeat a lie hundred times and it will become a truth)। প্রবাদ বাক্যটির অর্থ এই যে মিথ্যাও যদি বার বার বিজ্ঞাপন ও প্রচারের যুগ

সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া ঘোষণা কর তাহা হইলে মিথ্যাও মানুষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা হইতেই বুঝিতে পার যে যদি কোন বিষয় মানুষের মনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে উহা বার বার প্রচার করা আবশ্যক। প্রচার অর্থে বিজ্ঞাপন (Advertisement) কথাটি প্রয়োগ হয়।

বর্তমান যুগে উৎপাদন ব্যবস্থা এমন যে, সম্ভোগকারীর চাহিদামুসারে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন হয় না। উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সেই দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করে। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ, উপকারিতা, ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া মানুষের মনে সেই দ্রব্যের অসুমান নির্ভর উৎপাদন ও বিজ্ঞাপন চাহিদা সৃষ্টি করে। বহুল উৎপাদন প্রথায় বিজ্ঞাপনের

প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। কারণ উৎপাদক ও সম্ভোগকারীর মধ্যে সর্বদা সরাসরি যোগসূত্র থাকে না। উৎপাদনকারী উৎপাদন করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্ভোগকারীর সহিত যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে।

মুঠ ব্যবসায় বাণিজ্যের অর্থাৎ উৎপাদন বণ্টনের জন্তু সহায়ক অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপন কথাটি পূর্বে প্রচার এবং চাহিদা তৈয়ার করিবার অর্থে ব্যবহার হইত না। তখন বিজ্ঞাপন সাধারণকে সতর্ক (warning) করার জন্তু প্রয়োগ হইত। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বর্তমানে সাধারণকে কোনও দ্রব্যের দিকে আকৃষ্ট করা অর্থে ব্যবহার হইলেও সতর্কতামূলক বিজ্ঞাপন বা প্রচার যে নাই তাহা নহে। এখনও দেখিতে পাই যে প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে লিখিত থাকে 'নকল হইতে সাবধান' (Beware of imitation)। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য 'আকর্ষণ করা'।

বিজ্ঞাপন বা প্রচার যে কেবলমাত্র উৎপাদকই বা বিক্রেতাই করেন তাহা নহে সম্ভোগকারীও বিজ্ঞাপন বা প্রচারের সাহায্য গ্রহণ করেন। চাকুরী খালি (Situation Vacant) বা চাকুরীপ্রার্থী (Situation wanted) উভয়ই অভাবের প্রচার। চাকুরী

খালির বিজ্ঞাপন দ্বারা চাকুরী গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির নিকট হইতে অভাবের বিজ্ঞাপন আবেদন (offer) গ্রহণ করা হয় আর চাকুরীপ্রার্থীর বিজ্ঞাপন দ্বারা চাকুরী প্রার্থীর নিজেই অভাব প্রচার করিয়া তাহার সেবা (Services) গ্রহণ

করার মত লোকের সন্ধান করা হয়। এইরূপ ভাবে দেখা যায়, বাড়ী ভাড়া চাই (House wanted) আবার বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় (House to let) সবই বিজ্ঞাপন (Advertisement)। এই সকল বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রে খুব অধিক নহে। কারণ ইহা দ্বারা দ্রব্য উৎপাদনে এবং বণ্টনে সাহায্য খুব কমই হয়।

কিন্তু এমত চাহিদা বা অভাবের বিজ্ঞাপন আছে যাহাতে অর্থ-
 দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নৈতিক কার্যের প্রসার হয়। যেমন কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে কলিকাতা নগরীর সকল বস্তি উচ্ছেদ করিয়া বাসোপযোগী দালান তৈয়ার করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আবশ্যকীয় ইট, বালি, চূণ, সুরকী ইত্যাদি ক্রয় করিবার জ্ঞাত বিজ্ঞাপন দিল। ফলে ঐ সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল। যোগানদারগণও যোগান দিবার জ্ঞাত আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। ফলে অর্থনৈতিক কার্যের প্রসার হইতে লাগিল। এই প্রকার চাহিদায় বিজ্ঞাপন দ্বারা সরবরাহকারীদের নিকট হইতে মূল্যবেদন (Tender) আহ্বান করা হয়। বিজ্ঞাপনের ফলে দ্রব্যের মূল্য সাময়িকভাবে বাড়িতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই প্রকার বিজ্ঞাপনের ফলাফল বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য (Objects of advertisement): উপরের আলোচনা হইতে বিজ্ঞাপনের যে একটি উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা হইতেছে বাজারে চাহিদা তৈয়ার করা (Creating demand)। কোনও দ্রব্য সবে উৎপাদিত হইয়াছে, উহার উপকারিতা এবং ব্যবহার সাধারণে জানে না। এ-ক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয় তাহা হইলে জনসাধারণ সে দ্রব্যের অস্তিত্ব, উপকারিতা ইত্যাদি অবহিত হইতে পারে না। সুতরাং উৎপাদক যে

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে উৎপাদন করিয়াছে সে উদ্দেশ্য মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। মনে কর রাশিয়া যে ৫০ মেগাটন বোমা উৎপাদন করিয়াছে উহা যদি বাজারে সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হইত তাহা হইলে প্রচার ব্যতীত জনসাধারণ কি করিয়া জানিতে পারিত?

গুণাগুণ জ্ঞাপন জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে এই দ্রব্যটি তাহার কাজে লাগিতে পারে—অর্থাৎ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে তখনই সেই দ্রব্যের গুণাগুণ জানিবার আগ্রহ হয়। কাজে কাজেই উৎপাদকের পক্ষে বা বিক্রেতার পক্ষে প্রথমেই প্রয়োজন বিজ্ঞাপন দেওয়া। সম্ভাব্য ক্রেতাকে ক্রয়ের জ্ঞাত উদ্বুদ্ধ করাই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা পরায়ণ (Competitive)। উৎপাদক-গণের মধ্যে এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন।

কারণ একই উদ্দেশ্য সাধন করিতে একাধিক দ্রব্য যখন উৎপাদন চাহিদা নষ্ট

হয় তখন সেই দ্রব্যসমূহের যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয় তাহা হইলে বিক্রেতা অথবা উৎপাদক কেহই বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। মনে কর, তুমি নিয়মিত হরলিক্স (Horlicks) ব্যবহার কর কিন্তু বাজারে, হরলিক্সের অনুরূপ গুণসম্পন্ন ওভালটিনও (Ovaltine) বাহির হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে হরলিক্সের

চেয়ে ওভলটিন ভাল ; কিংবা ওভলটিনের চেয়ে হরলিক্‌স্ ভাল তাহা কি প্রকারে বুঝা যায় ? উভয়ই প্রতিযোগিতায় অপরের দ্রব্যের তুলনায় নিজের দ্রব্য অধিক বিক্রয় করিতে প্রয়াসী। সুতরাং উভয়ের পক্ষেই বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা আকর্ষণ করা প্রয়োজন। অবশ্য একথা বলিতে পার যে বিজ্ঞাপনের ফলে কতিপয় লোক হরলিক্‌স্‌র সম্ভোগ কমাইল এবং কতিপয় লোক ওভলটিনের সম্ভোগ বাড়াইল। ফলে হরলিক্‌স্‌ হইতে চাহিদা ওভলটিনে অপসারণ হইল। মোটের উপর চাহিদা বাড়িল না। সাময়িকভাবে ইহা সত্য হইলেও বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মোটের উপর চাহিদা বাড়ান। সুতরাং উভয়ই বিজ্ঞাপন দিতে থাকিবে এবং উভয়ই চাহিদা বাড়াইতে চেষ্টা করিবে।

তৃতীয়ত, একবার দ্রব্যের চাহিদা তৈয়ার হইলেও সে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন না দিলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্রব্যের অস্তিত্ব বাহ্যতে সাধারণ ভুলিয়া না যায় তাহার জ্ঞানই বিজ্ঞাপন দেওয়া। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনের ফলে সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া ‘আমি আছি, আমাকে ভুলিও না’। (I exist, forget me not)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুদ্ধের সময়ে কতিপয় দ্রব্যের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কমিয়া গেলেও উৎপাদক বা বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিত। উদ্দেশ্য এই যে ‘আমি মরি নাই, যে কোনও সময়ই আবির্ভাব হইতে পারি’। সাধারণের মধ্যে যদি ঐ দ্রব্যের সন্ধান থাকে, তাহা হইলে সম্ভোগকারী কিছুদিন ঐ দ্রব্যের ভোগ হইতে বিবত থাকিতে পারে কারণ সে জানে যে কোন সময়েই ঐ দ্রব্যের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং কোনও দ্রব্যের চাহিদা হইলে সে চাহিদা বাহ্যতে অন্তর্হিত না হয়, তাহার জ্ঞানও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

চতুর্থত, সূপ্ত চাহিদাকে (Potential Demand) জাগানও বিজ্ঞাপনের কার্য। প্রত্যেক মানুষই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত কার্য করে। এমন কোনও একটি পিল (Pill) তৈয়ার হয় যে একটি পিল (Pill) মুখে পুরিয়া দিলেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আর ক্ষুধার উদ্বেগ হইবে না, সে রকম একটি দ্রব্যের চাহিদা নাই এমন লোক বিরল। সকলেই মনে করিতে পারে যে ঐ প্রকার একটি দ্রব্য পাওয়া গেলে রান্নাবান্নার পরিশ্রম, বাজার করার ঝামেলা ইত্যাদি নানাপ্রকার ঝামেলা হইতে লোক রেহাই পায়। সুতরাং ধরিয়া লইলাম যে এই প্রকার একটি দ্রব্যের সূপ্ত চাহিদা (Potential Demand) সকলের মনে আছে। মনে কর, একজন উৎপাদক এইরূপ একটি বডি (Pill) তৈয়ার করিল। যদি উৎপাদক ঐ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন না দেয় তাহা হইলে সাধারণের মনে যে সূপ্ত চাহিদা রহিয়াছে তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে কি প্রকারে ? সুতরাং সূপ্ত চাহিদা জাগ্রত করাও বিজ্ঞাপনের কার্য।

বিজ্ঞাপনের সাফল্য (Success of Advertisement) : একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্থনৈতিক কাঠামো যদি প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা যদি স্বরোয়া উদ্যোগে (Private Enterprise) হয় তাহা হইলেই দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত বিজ্ঞাপনের

প্রয়োজন অধিক হয়। এই কারণেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের প্রাধান্য এত অধিক।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় যে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নাই তাহা নহে। মনে কর জীবন বীমা ব্যবসায় ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তথাপি উহার বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়। কারণ জীবন বীমা এমন একটি দ্রব্য নহে যাহা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগিবে। জীবন বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে যাহারা সচেতন তাহারা অবশ্য বিজ্ঞাপন না দিলেও সন্ধান করিয়া লইবেন, কি ভাবে জীবনবীমা করা যায়। আবার রেলপথও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব, রেলভ্রমণও অপরিহার্য নহে। রেল ভ্রমণ বাড়িলে রাষ্ট্রের আয় অধিক হয়। সে জন্ত দেখিতে পাওয়া যায় বৎসরের কোন কোন সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ চলাচল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যাত্রীদের নানাবিধ সুবিধার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব থাকে তবে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন কমিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে খাদ্য দ্রব্যের (চাউল ইত্যাদি) বিলি ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত (State controlled)। সংভাগ (Rationing) প্রথার মাধ্যমে বিলির সমাবস্থা (Equality) বজায় রাখা হইত। তখন কোন চাউল বা আটা ব্যবসায়ীর কোনও বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু চাউলের বিলি ব্যবস্থা যখন আবার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল অমনি দেখিতে পাও পশুপতি দাস এও সন্ধান আগরওয়ালা এও ব্রাদার্স ইত্যাদি বড় বড় ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিতেছেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে ব্যবসায় প্রত্যাযোগিতা থাকিলেই ব্যবসায়ী টিকিয়া থাকার জন্ত বিজ্ঞাপনের পন্থা অবলম্বন করেন। অথবা এই কথাই বলা বোধ হয় সম্ভব যে সম্ভোগকারীর যতক্ষণ দ্রব্য সম্ভোগ করিবার স্বাধীনতা থাকে ততক্ষণই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের ফলে যদি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কার্যকরী হয় না। অনেকেই মনে করে যে বিজ্ঞাপনের জন্ত যে ব্যয় করা হয় সে ব্যয় মুখ্যত সম্ভোগকারীই বহন করে। একথা উৎপাদন মূল্য বাড়িলে সর্বত্র মিথ্যা অথবা সর্বতোভাবে সত্য একথা বলা চলে না। বিজ্ঞাপন সফল হয় না ইহা আংশিক সত্য। তবে যে দ্রব্য ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় নীতিতে (Law of Increasing Cost) উৎপাদন হয় সেই দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অফলপ্রসূ হয়। কারণ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় নিয়মে (Law of Increasing Cost) দ্রব্য উৎপাদনের ফলে সম্ভোগকারীর চাহিদা সত্যই কমিয়া যায়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সফল পাওয়া যায় না।

দ্রব্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয় নিয়মে (Law of Diminishing Cost) উৎপাদন হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয় ধরিলেও দ্রব্যের মূল্য বাড়ে না। আবার ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয় নিয়মে উৎপাদন হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের পড়তা কম পড়ে।

হুতরাং বিক্রয় কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই বিজ্ঞাপনের ফলে যে বিক্রয় মূল্য বাড়ে ইহা সর্বদা সত্য নহে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন (Selection of the Medium of Advertisement) : বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হইলে উৎপাদক অথবা বিক্রেতা কি প্রকারে বা উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম উদ্দেশ্য ফলবতী হইবে তাহা স্থির করিয়া থাকে। যে উপায় অবলম্বন করিয়া দ্রব্যের অস্তিত্ব, গুণাগুণ, ব্যবহারের উপকারিতা ইত্যাদি সাধারণের গোচরে আনয়ন করা হয় তাহাকেই বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বলা হয়।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কি হইবে তাহা স্থির করার পূর্বে বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ উৎপাদক অথবা বিক্রেতাকে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়।

প্রথমত, যে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে সেই দ্রব্যের চাহিদা সার্বজনিক চাহিদা অনুযায়ী কিংবা বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা স্থির করিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যম বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, যে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই সম্প্রদায়ের নিকট কোন মাধ্যমটি সহজে গ্রহণীয়, তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন।*

তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপন হইতে যে ফল আশা করা যায় তাহার তুলনায় বিজ্ঞাপনের ব্যয় কম হইবে কিংবা বেশী হইবে তাহার উপরও বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন করা নির্ভর করিবে।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম (Media of Advertisement) : উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থায় (Production and Distribution) মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর (Middle-man) সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে বিজ্ঞাপনের জটিলতা ততই অধিক হইতেছে। বর্তমানে এই জটিলতার জন্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নির্বাচন, উপায় নির্বাচন, বিজ্ঞাপন তৈয়ারী ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হইতেছে। বিজ্ঞাপন এ যাবত ব্যবসায়ীর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি রুচির উপর নির্ভর করিত কিন্তু বিশেষীকরণের যুগে (Age of specialisation) বিজ্ঞাপনও একটি বিশেষ বিষয়বস্তু হইয়াছে। এখন বিশেষজ্ঞগণের হাতেই বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেয়। আবার খুব বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেরাই বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বিশেষজ্ঞ মধ্যগ হিসাবে (Specialised Middle-man) ব্যবসায় করিতেছে। উহাদের বলা হয় বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিষ্ঠান (Advertising and Publicity Concern)। কলিকাতার বড় বড় রাস্তার মোড়ে দেখিতে পাইবে যে বড় বড় ফলকে (Ask for space, Selvel ; Advertise here or else where, Elap) ইত্যাদি নানা প্রকার বিজ্ঞাপন থাকে। Selvel

বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান

অথবা Elap উহারাই বিজ্ঞাপন ও প্রচার বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিয়া সম্ভাব্য বিজ্ঞাপন দাতার অনুসন্ধান করিতেছে।

এই প্রকার বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিষ্ঠানের হাতে বিজ্ঞাপনের ভার ছাড়িয়া দেওয়ার সুবিধা এই যে ইহার। বিশেষজ্ঞ বলিয়া কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারে এবং মক্কেলগণকে তদনুসারে পরামর্শ দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইহার। বহু বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে কার্য করে বলিয়া বিজ্ঞাপনের পড়তাও কম পড়ে। কারণ বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রচার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দাতার নিকট হইতে যেমন দস্তুরি বা কমিশন লয়, অল্পরূপ যে প্রতিষ্ঠানে

বিজ্ঞাপন দেয় (যেমন পত্রিকা, সিনেমা ইত্যাদি) তাহাদের নিকট হইতেও দস্তুরি পায়। সুতরাং বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন মাধ্যমের নিকট হইতে যে দস্তুরি আয় করে উহার সুযোগ বিজ্ঞাপন দাতাও পাইয়া থাকে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দাতার নিকট হইতে মজুরীর হার কম গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যমগুলি নীচে আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, **সংবাদপত্র, জার্নাল, মাসিক পত্রিকা** ইত্যাদি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে উহা প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রসেবীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং প্রচার হয় সর্বাধিক। কিন্তু সংবাদপত্র 'মারফত বিজ্ঞাপন

সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন দিলে সর্বদাই যে সফল পাওয়া যাইবে তাহা নহে। কারণ সংবাদপত্রসেবীর সংখ্যা খুবই অধিক হইলেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন একবার পড়িলেই তাহা মনে রাখা হয় না। বিশেষত কর্ণওয়াল্ড সমাজে মানুষ সংবাদপত্রে বিশেষ বিশেষ সংবাদসমূহ পড়িয়াই ক্ষান্ত হন। সুতরাং সংবাদপত্রে প্রচার করিতে হইলে উহা দিনের পর দিন (প্রায় দৈনিকই) পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। কাজেই ইহাতে খরচ পড়ে বেশী। সুতরাং দৈনিক সংবাদপত্রে সেই সকল দ্রব্যের প্রচারকার্য চালান হয় যাহার চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ সার্বজনিক। নচেৎ দ্রব্যের প্রকার ও যাহাদের লক্ষ্য করিয়া দ্রব্য উৎপাদন হয় তাহার। কি প্রকারের বিশেষ সংবাদপত্র মাসিক, পার্শ্বিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েন সেই সকল পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যেমন রাসায়নিক (Chemical) দ্রব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন

বিশেষ পত্রিকায় দিতে হইলে কোন রসায়ন পত্রিকা (Chemical Journal); ঔষধ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে চিকিৎসা পত্রিকা (Medical Journal); শিক্ষা বিষয়ক দ্রব্য হইলে সাধারণত শিক্ষক ও

ছাত্রদের মধ্যে প্রচারিত শিক্ষামূলক পত্রিকা (Educational Journal) ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষ মাসিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়।

দৈনিক সংবাদপত্রের তুলনায় বিশেষ পত্রিকার সুবিধা এই যে দৈনিক সংবাদপত্রে দৈনিকই বিজ্ঞাপন দেওয়ার আবশ্যক হয় কিন্তু মাসিক অথবা পার্শ্বিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকায় নির্দিষ্ট সময় অন্তে বিজ্ঞাপন দিলে চলে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কম পড়ে। কারণ মাসে একবার বিজ্ঞাপন দিলে যে ব্যয় হইবে তাহার তুলনায়

দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে ব্যয় হইবে অনেক বেশী। তৃতীয়ত, মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে একবার করিয়াই পাওয়া যায় স্বতরাং উহার ব্যবহার একদিনেই শেষ হয় না। একমাস ধরিয়া পত্রিকাখানি পড়া হয় বলিয়া, বিজ্ঞাপনের উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়াই পারে না। আবার এক মাসের মধ্যে বহুবার পত্রিকাখানি নাড়া চাড়া করার জন্য বিজ্ঞাপনও একাধিকবার পাঠ করা হয় এবং পাঠকের মনে ছাপ আঁকিয়া রাখে। চতুর্থত, ভোগকারীর শ্রেণী অনুসারে সঠিকভাবে জার্নাল (Journal) নির্বাচন করিলে প্রকৃত সম্ভোগকারীর সহিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রচার পত্রের মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Circularisation। ইহা ডাক বিভাগের (Postal Department) সাহায্যে, রাস্তায় প্রচারপত্র বিলি করিয়া এবং গৃহে গৃহে প্রচার পত্র বিলি করিয়াও করা হয়। অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে ট্রামে বা বাসে যাইতেছ, জানালার ফাঁকা দিয়া ট্রামের মধ্যে কয়েক খানি প্রচারপত্র ছুড়িয়া দেওয়া হয়। অনেকেই ঐ প্রচারপত্র পড়িলেন। কেহ হয়ত প্রচার পত্রখানি আবার জানালা হইতে

প্রচার পত্র

বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিলেন, আবার কেহ হয়ত ভাজ করিয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। যিনি ছুড়িয়া দিলেন, তাহার উপর যে বিজ্ঞাপনের ক্রিয়া হইল না সে কথা বলা যায় না, কারণ দ্বিতীয় দিনে হয়ত অনুরূপভাবে প্রচারপত্র খানি পাইলে একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেন এবং তৃতীয় দিনে প্রচারপত্রখানা ভাল করিয়া পড়িয়া হয়ত চতুর্থ দিনে সেই দ্রব্যটি খরিদ করার জন্য দোকানে গিয়া হাজির হইলেন। আর যে ভদ্রলোক প্রচারপত্রখানা পড়িয়া পকেটে পুরিলেন তিনি যে সেই দিনই ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করিবার জন্য দোকানে গেলেন তাহা নাও হইতে পারে। তিনি প্রচার পত্রখানি পড়িয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া যদি প্রচার পত্রে উল্লিখিত দ্রব্যের সম্ভোগ হইতে সম্ভব পাইতে পারেন বলিয়া মনে করেন তবেই তিনি খরিদ করিবেন।

রাস্তায় প্রচার পত্র বিলি করার মতই ডাক যোগে প্রচার করা হয়। কিছু সংখ্যক সম্ভোগ্য ক্রেতার নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া ডাক যোগে প্রচার পত্র পাঠান হয়। তোমার সহিত ব্যবসায়ীর প্রকৃত আলাপ পরিচয়ও নাই তথাপি যখন তুমি দেখিতে পাও যে তোমার প্রতিবেশীকে প্রচার পত্র না পাঠাইয়া তোমাকে একখানা প্রচার পত্র পাঠান হইল তখন স্বতই তোমার মনে একটু অহমিকা না জাগিলেও একটু আনন্দ ত হয়ই। তারপর তোমার ঔৎসুক্য দেখা দেয় কেন তোমাকেই প্রচার পত্র পাঠান হইল।

তৃতীয়ত, প্রচার পত্র গৃহে গৃহে লোক পাঠাইয়াও বিলি করা যে হয় না তাহা নহে। দেখিতে পাইবে পুজার পূর্বে সার্ফ (Surf) উৎপাদক গৃহে গৃহে লোক পাঠাইয়া সার্ফের উপকারিতা, সার্ফ কাপড় কাটিলে ব্যয় স্কাচ ইত্যাদি সম্বলিত প্রচার পত্র বিলি করায়।

প্রচার পত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন যে সর্বদাই ফলপ্রসূ তাহা নহে। তাহার কারণ

প্রচার পত্র অনেক সময়ে অপাঠ্যেও বিলি করা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও প্রচার পত্রের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক সন্তোগকারীর সহিত যোগ স্থাপন করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, **প্রাচীর পত্র (Poster)**—প্রচার পত্র যেমন বিলি করা হয়, প্রাচীর পত্র তেমন সাধারণের মধ্যে বিলি করা হয় না। বড় বড় রাস্তায়, দেওয়ালের গায়ে কাগজ মাটিয়া যে প্রচারের ব্যবস্থা হয় উহাকেই প্রাচীর পত্র বলে। রুক করিয়া কালি লাগাইয়া দেওয়ালে ছাপ দিয়া প্রচার কার্যও প্রচার পত্রের মধ্যে আইসে। বিজ্ঞাপন দাতাকে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া প্রাচীর পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

চতুর্থত, **পণ্যসজ্জা (Window display)**—ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে পণ্য সজ্জা কার্যকরী হইবে কিনা তাহা স্থির করা হয়। খুচরা বিক্রেতার পক্ষে, বিভাগীয় বিপণির পক্ষে, পাইকারের পক্ষে প্রচার করার জন্ত, পণ্য সজ্জা পণ্যসজ্জা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পণ্য সজ্জা দ্বারা রাস্তায় চলমান জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হয়, তবে জনবহুল এলাকা ব্যতীত পণ্য সজ্জা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না। কলিকাতায় এসপ্লানড এলাকায়, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, শ্রামবাজার, গড়িয়াহাট ইত্যাদি প্রধান অঞ্চলে দেখিতে পাইবে যে কাচের আয়না যুক্ত আলমারীতে পণ্য সামগ্রী সুসজ্জিতভাবে রাখা হয়। দ্রব্যের মূল্যও উহাতে উদ্ধৃত থাকে।

পঞ্চমত, **চিত্রগৃহে ছায়াচিত্রের ব্যবস্থা করণ (Cinema Slide)**—দর্শক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত এবং ক্ষণিকের আনন্দ দান করার জন্ত প্রায়ই দেখা যায় দ্রব্যের প্রয়োগ বা ব্যবহার পদ্ধতি ছায়াচিত্রের সাহায্যে দেখান হয়। ভারতবর্ষে দেখিবে প্রচার দপ্তরের অল্পজ্ঞা সম্বলিত ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উদাহরণ—লাইফ বয় সাবানের কার্যকারিতা ছায়াচিত্রের সাহায্যে দেখান হয়। প্রাচীর পত্র বা প্রচার পত্রে যে কার্য না করিতে পারে ছায়াচিত্র তাহার অনেক গুণ বেশী কার্য করিতে পারে। চিত্রগৃহের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মাত্রাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠত, **নমুনা প্রদান ও লাভাংশ প্রদান (Samples and Bonuses)**—বিশেষ কয়েক প্রকার ব্যবসায় নমুনা প্রদানের মারফতে বাজার তৈয়ার অর্থাৎ ক্রেতার সংখ্যা বাড়ানর চেষ্টা করা হয়। নমুনা প্রদানের মারফত সকল প্রকার ব্যবসায় সাফল্য লাভ হয় না। যে সকল ব্যবসায় যাহাতে একের নির্দেশের উপর বহুলোকের সন্তোগ নির্ভর করে সেই সমস্ত ব্যবসায় নমুনা প্রদানের ফলে কার্যসিদ্ধি হয়। ঔষধের ব্যবসায় চিকিৎসকগণকে বিনামূল্যে নমুনা প্রদান নমুনা প্রদান করার উদ্দেশ্য, চিকিৎসকগণ যে ঔষধ অনুমোদন করেন, রোগী সেই ঔষধ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। স্বতরাং বহুলোকের সন্তোগ একজনের নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুস্তক ব্যবসায়ীও প্রকাশিত পুস্তকের বহল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কিছু পুস্তক শিক্ষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করিয়া থাকে।

লাভাংশ প্রদান পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী মূল্যের একাংশ ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেয়। অনেক ব্যবসায়ী দেখিবে বৎসরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে সস্তার নিঃশেষ বিক্রয় (Stock Clearance Sale) পদ্ধতি গ্রহণ করে। সস্তার নিঃশেষ বিক্রয় কালে দ্রব্যের মূল্য কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। অল্পসময় হইলে যে দ্রব্য ৫ টাকায় ক্রয় করিতে হইত, সস্তার নিঃশেষ বিক্রয় কালে সেই দ্রব্যই হয়ত ৪ টাকায় ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং ক্রেতাকে ১ টাকা সুযোগ দেওয়া হইল যাহা গ্ৰাহ্যত ব্যবসায়ীর নিজেরই পাওনা ছিল। সুতরাং ঐ ১ টাকাই লাভাংশ (Bonus)। ভারতের খাদি

লাভাংশ

প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্রব্যের জনপ্রিয়তা তৈয়ার করার জন্ত সর্বভারতীয় খাদি বোর্ডের নির্দেশে খাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ টাকায় কয়েক নয়া পয়সা করিয়া বাট্টা দিয়া থাকে। বাংলা সরকারও সরকার পরিচালিত দোকান হইতে তাঁতবস্ত্র ক্রয় করিলে বাট্টা দেয়। মাদ্রাজ সরকারও ভারতের সর্বত্র মাদ্রাজী তাঁত বস্ত্র প্রচারের জন্ত অহরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে।

সপ্তমত, কুপন ও উপহার বিতরণ (Coupon and Free Gifts)—

নমুনা প্রদানের সঙ্গে আরেকটি পদ্ধতিও জড়িত করা হয়—উপহার বিতরণ। কোন দ্রব্যের বহুল প্রচার অর্থাৎ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে দ্রব্যটি কুপন বিলি

মোড়কের মধ্যে রাখিয়া সেই মোড়কে একখানা কুপন দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক কুপন সংগ্রহ করিয়া উহা উৎপাদক অথবা পাইকারের নিকট উপস্থিত করিলে বিনামূল্যে উপহার দ্রব্য পাওয়া যায়। উপহার প্রদান পদ্ধতি বর্তমানে খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে। ক্যাভেন্টার্স মাখনের (Cavenders Butter) প্যাকেটের সহিত একখানা করিয়া কুপন জুড়িয়া দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক কুপন দাখিল করিলেই একটি উপহার দ্রব্য পাওয়া যায়। উপহার দ্রব্যের আশায় অনেকেই সেই দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে।

অনেক সময়ে বালক বালিকাদের উপহার দিয়া বালক বালিকাদের আকৃষ্ট করা হয়। বালক বালিকাগণ খেলনা দ্রব্য উপহার পাইবার আশায় যাহারা উপহার দেন তাহাদের ব্যবসায় হইতে দ্রব্য কিনিয়া থাকে। পিতামাতাও সাধারণত বালক বালিকাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্ত তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করেন। বাটা জুতা কোম্পানী (Bata Shoe Co.) পূজার পূর্বে এই পদ্ধতি অল্পসরণ করে। বালক বালিকাগণ বাটা কোম্পানী হইতে জুতা ক্রয় করিলে খেলনা (যেমন বেলুন, মুখোস ইত্যাদি) পায় বলিয়া বাটা কোম্পানী হইতে জুতা ক্রয় করিতে আগ্রহী হয় এবং অভিভাবকগণও তাহাদের এই আগ্রহ হইতে বঞ্চিত করে না।

অষ্টমত, মেলা ও প্রদর্শনী (Fairs and Exhibitions)—পরিবহণ ও

যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য মেলার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। অধুনা

মেলা ও প্রদর্শনী অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টায় বাণিজ্য মেলার প্রথা পুনরুজ্জীবিত

হইতেছে। মেলায় দূর দূরাকল হইতে ব্যবসায়ী সমাগম হয়। নিজের দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা সম্বন্ধে বহু লোককে ওয়াকিবহাল করিতে পারে। বস্ত্ত, বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনী একই বস্তু। প্রদর্শনীর

সাহায্যে উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্য বহু দূরগত লোকের মধ্যে প্রচার করার সুযোগ পায়। কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে ১৯৪৮ সালে যে শিল্পমেলা হয় উহাতে ভারতের সকল শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী করা হয়। পুরাকালে প্রতি বৎসরে উৎসব ইত্যাদিতে মেলার ব্যবস্থা করা হইত এবং সেই সকল মেলায় নানা স্থানের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইত।

বর্তমানে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রচার ভেদে বিভিন্ন বস্তুর মেলা ও প্রদর্শনী বিভিন্ন জায়গায় হওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। যেমন, শিল্প মেলার মত, ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে কৃষি মেলা হইয়াছিল। এই কৃষি মেলায় পৃথিবীর সকল দেশই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই উপায়ে বিভিন্ন দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিচিতি ঘটে।

বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি বুঝিবার পক্ষে প্রদর্শনী খুবই সহায়ক। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন পদ্ধতি জানিতে পারা যায়। আবার সেই উৎপাদন পদ্ধতি অমূল্য করিয়া উৎপাদন করা অথবা উৎপাদিত দ্রব্যের উন্নতি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে আন্তর্জাতিক মেলা বিশেষ সহায়ক।

নবমত, **ব্যক্তিগত সংযোগ (Personal Touch)**—ব্যক্তিগত সংযোগে সাধারণত কুশলী বিক্রয়ী (Salesman) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় প্রতিনিধি মারফত সন্তোগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বুঝায়। ব্যক্তিগত সংযোগ ব্যবস্থা ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। তবে কতকগুলি ব্যবসায় আছে যাহাতে কুশলী বিক্রয়ীর সাহায্য অপরিহার্য। বীমা ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ না করিলে বীমা গ্রহীতার সংখ্যা বাড়ান সম্ভব নহে। অল্পরূপ ভাবে দেখা যায় যে ঔষধ পত্রাদি উৎপাদকও বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales Representative) নিয়োগ করিয়া ঔষধ বিক্রেতার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে।

দশমত, **সম্পাদকীয় প্রচার (Editorial Publicity)**—সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তরে অথবা সংবাদ প্রদানের মাধ্যমেও প্রচার ও বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। দ্রব্যের গুণ বিশ্লেষণ করিয়া যখন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অথবা সংবাদ প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে সম্পাদকীয় প্রচার বলা হয়। দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তরে ইহার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব নহে। তবে সম্পাদকীয় প্রচার বিশেষ প্রকার পত্রিকায় অনেক সময়ে সম্পাদকীয় প্রচারের সুযোগ পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক সংবাদপত্রে কোন নূতন দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশংসা মূলক আলোচনা খুব বিরল নহে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অনেক সময়েই পত্রিকায় সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে প্রচার কার্য করা হয়। উহাকে ইংরেজীতে 'Write ups' অথবা 'Puffs' বলে। উদাহরণ, 'দিবাতে' বাহাতে পূজার ছুটিতে বহু লোককে আকৃষ্ট করা যায় তদুদ্দেশ্যে বাংলা দেশের সকল পত্রিকায় দিবাতে যে নূতন সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে উহা আলোচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ পরিবেশন করা হইয়াছিল। উহাকে সম্পাদকীয় প্রচার বলা যায়।

অজ্ঞাতে প্রচার (Unconscious Publicity)—বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বহুল প্রচার। প্রচারের মাধ্যমে স্নাম (Goodwill) গঠন প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা। ব্যবসায়ের স্থিতি (situation), ব্যবসা দেখিতে কি প্রকার (appearance), ত্র্যটি কিতাবে মোড়ক করা হইয়াছে, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় আছে যাহা ব্যবসায়ীর স্নাম গঠনে এবং ক্রেতা আকর্ষণে সাহায্য করে।

ব্যবসায় যদি সম্ভোগকারীর বাসস্থান হইতে খুব দূরবর্তী হয় অথবা ব্যবসায় স্থলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা যদি খুব দুৰূহ ব্যাপার হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ের ত্র্য কাটতি (sales) হইতে যথেষ্ট সময় লাগে। তেমনি ত্র্যের মোড়ক যদি ভাল না হয়, দেখিতে স্ত্রী না হয় তাহা হইলেও ত্র্য ভাল হইলেও অনেক সময়েই বিক্রয়ে অস্ত্রবিধা হয়।

ব্যবসায়ের ভিতর ঢুকিলে যদি চলাফেরা করিতে অস্ত্রবিধা হয়, চেয়ার টেবিল দেখিলে যদি মন আপন হইতে সংকুচিত হয় তাহা হইলে বাহিরের বিজ্ঞাপন যাহাই হউক না কেন, ব্যবসায়ের প্রসার লাভ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। অল্পসম্বন্ধের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্নাম নষ্ট হয়। কাজেই এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহারা ব্যবসায় সংগঠন করে তাহাদের স্নাম গঠনে অস্ত্রবিধা ভোগ করিতে হয় না। উহাই অজ্ঞাতে প্রচার (Unconscious Publicity)। •

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তক্তকে অফিসে প্রবেশ করিলে মন যত সহজে ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়, নোংরা যিজি অবস্থায় ব্যবসায়ের অফিস রক্ষিত হইলে ক্রেতার মন আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব।

ট্রেড মার্ক বা ব্যবসায়িক মার্ক বা ছাপ (Trade Mark) : যে নামে বা ছাপে কোনও ত্র্য বহুদিন বাজারে চলিতে থাকে সেই ত্র্যের নাম বা ছাপ নিজেই প্রচারের কার্য করে। যে নামে কোন ত্র্য জনপ্রিয়তা লাভ করে সেই নাম অল্প কেহ যাহাতে ব্যবহার করিতে না পারে তজ্জন্ত প্রত্যেক দেশেই ট্রেডমার্ক ব্যবসায়িক নাম, মার্ক বা ছাপ নিবন্ধন (Registration) করিতে হয়। একবার রেজিষ্ট্রিকৃত হইলে ঐ নাম আর কেহ ব্যবহার করিতে পারে না। ভল্ল হল (Vaux Hall) নামে আর কোন মোটর গাড়ী :প্রস্তুতকারী কোন মোটর তৈয়ার করিতে পারে না।

বিজ্ঞাপনের ফলাফল মাপের পদ্ধতি (Keying in Advertisement) : বিজ্ঞাপনের ফলে ব্যবসায়ের বিক্রয় বাড়িল কিনা অর্থাৎ বিজ্ঞাপন হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল কিনা তাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীই জানিতে বিজ্ঞাপনের ফলাফল উৎসুক। কারণ বিজ্ঞাপনের পুনরাবৃত্তি করা হইবে কিনা, তাহা নিৰ্ভর করে বিজ্ঞাপনের ফলাফল হইতে। বিজ্ঞাপনের ফলে বিক্রয় যদি না বাড়ে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয় সকলই অপচয় (Waste)। বিজ্ঞাপনের ফলাফল কোন ব্যবসায়ীই সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে পারে না তবে

সাহায্যে মোটামুটি আট পাইতে পারে তজ্জ্ঞান নানা পন্থা অবলম্বন করে। ফলাফল জানানর জ্ঞান যে পন্থা অবলম্বন করে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা নীচে করা হইল।

প্রথমত, যদি ব্যবসায়ের কার্যালয়ের একাধিক ঠিকানা থাকে তবে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। যেমন একটি ব্যবসায়ের ৩টি শাখা আছে; ১২নং গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা; ৩৩নং নেতাজী স্মৃতি রোড, কলিকাতা এবং ৪২নং কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। আনন্দবাজার

পত্রিকায় গড়িয়াহাট রোডের ঠিকানা দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া।
বিজ্ঞাপনের ফলাফল হইল, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় নেতাজী স্মৃতি রোডের ঠিকানা
নিরূপণে বিভিন্ন পদ্ধতি দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় কলেজ
স্ট্রিট অফিসের ঠিকানা দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। যখন বিজ্ঞাপনের ফলে অহুসন্ধান
আসিতে লাগিল তখন বুঝা যায় কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ফল সর্বাধিক এবং সেই
ভাবে প্রয়োজন মত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম পরিবর্তন করা যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি ব্যবসায়ীর বিভিন্ন শাখা না থাকিয়া বিভিন্ন বিভাগ থাকে তাহা
হইলে এক একটি পত্রিকায় এক একটি বিভাগের নামে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। কোন
বিভাগের বিজ্ঞাপনের ফলে সর্বাধিক অহুসন্ধান পত্র আসে, তাহা দ্বারা কোন
বিভাগের বিজ্ঞাপন সর্বাধিক কার্যকরী হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপনের নীচে কুপন জুড়িয়া দেওয়া যায় এবং অহুসন্ধানকারীকে
উত্তরের সহিত কুপন যুক্ত করিয়া দেওয়ার জ্ঞান অরোধ করা যাইতে পারে।

চতুর্থত, বিজ্ঞাপনের উত্তরে অহুসন্ধান করিতে হইলে কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন
দৃষ্টে অহুসন্ধান করা হইল তাহার উল্লেখ করিতেও অরোধ করা হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ যে ক্রটিহীন তাহা নহে। কেবলমাত্র কুপনযুক্ত বিজ্ঞাপনের
ফলে অহুসন্ধানের সংখ্যা বুঝা যায়। বিজ্ঞাপনের ফলাফল সাহায্যে বুঝিতে পারা
যায় তাহার জ্ঞান প্রতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন কার্ড তৈয়ার করা হয়।
কার্ডের উপরে অহুসন্ধানের সংখ্যা লিখিয়া রাখা হয়। ইহাতে কোন পত্রিকার উত্তরে
সর্বাধিক সংখ্যক অহুসন্ধানপত্র আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বিজ্ঞাপনের পশ্চাৎধাবন (Follow up in Advertisement) : বিজ্ঞাপন
দেখিয়া অনেক অহুসন্ধিৎসু ব্যক্তি দ্রব্যের বিবরণ জানিতে চাহেন; অহুসন্ধান করিলেই
যে দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং অহুসন্ধানের পর
যত দিন অহুসন্ধানকারী দ্রব্য ক্রয় না করে ততদিনই অহুসন্ধানকারীকে পত্র
মারফত অহুসরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে ক্রেতায় পরিণত করা সকল
ব্যবসায়ীরই কর্তব্য। তাই অহুসন্ধান পত্রের উত্তর দিয়াই ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হয় না, যদি

অহুসন্ধানপত্রের উত্তর দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে অহুসন্ধানকারী
পশ্চাৎ-ধাবন দ্রব্য না কিনেন তবে পুনরায় তাহাকে পত্র লেখা হয়। সে
পত্রের যদি কোন কার্য না হয় তাহা হইলে আবার পত্র লেখা হয়। প্রতিবারেই
মোলায়েম ভাষায় মোটামুটি ভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভাব আনয়ন করার চেষ্টা করা
হয়। অনেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অহুসন্ধানকারীকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে পত্র দিতে হয়

সাহায্যে অল্পসম্মানকারী মনে করে যে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই পত্র। যখন এই উপায়ে ক্রেতার নিকট দ্রব্যটি বিক্রয় হইল, তখনই অল্পসম্মানকারীর সহিত বিজ্ঞাপনের কার্যের সম্বন্ধ শেষ হইল।

বিক্রয় কুশলতা (Salesmanship) : ব্যবসায়ের সুনামের উপর উহার সাফল্য নির্ভর করে। সুনাম গঠনে বিজ্ঞাপন যেমনি সহায়ক তেমনি বিক্রয়কুশলতার দানও নগণ্য নহে। বিক্রয়কুশলতা বর্তমানে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিক্রয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করিতে না পারিলে ব্যবসায়ীর সুনাম গঠনের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতা বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া যখন দ্রব্য সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল তখন বিক্রয় কুশলতা যদি বিক্রেতা খিটখিটে মেজাজে উত্তর দেন, ক্রেতা ত দ্রব্য ক্রয় করিবেই না বরঞ্চ সে তাহার বন্ধুবান্ধবদের ঐ ব্যবসায় হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে নিবৃত্ত করিবেন। অতএব বিক্রয় কুশলতা একটি বিশেষজ্ঞ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষজ্ঞ বিক্রেতা দুই প্রকারের হইতে পারে : (১) খুচরা দোকানে বিশেষজ্ঞ বিক্রেতার সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয় যে দোকানে ক্রেতা আসিলে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহারা দ্রব্যের চাহিদা তৈয়ার করিতে সাহায্য করে না, চাহিদা হইলে যাহাতে দোকানদার চাহিদা মিটাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে। (২) পাইকার অনেক ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় বিশেষজ্ঞ লোক নিয়োগ করিয়া থাকে। তাহারাই নানা স্থানে ঘুরিয়া দ্রব্যের চাহিদা তৈয়ার করিতে সাহায্য করে। এই সম্প্রদায়কে বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales Representative অথবা Agent) বলা হয়। ইহাদের অনেক সময়ে প্রতিনিধিত্ব করার সকল প্রকার স্বযোগ দেওয়া হয়। তাহার সাহায্যে সম্ভাব্য ক্রেতার সকল প্রকার প্রশ্নের সহুস্তর দিতে পারে তজ্জন্ত তাহাদের সহিত দ্রব্য সম্বন্ধীয় সকল প্রকার পুস্তকাদি দিয়া দেওয়া হয়।

বিক্রয় বিশেষজ্ঞের গুণ (Qualities of a Salesman) : সকল বিক্রয় বিশেষজ্ঞের কতিপয় গুণ থাকা প্রয়োজন। বিক্রেতাকে ধনী, মধ্যবিত্ত, স্বল্পবক্তা, নির্বোধ, অতি চালাক, খিটখিটে মেজাজের, নানা ধরনের ক্রেতার সম্পর্কে আসিতে হয়। সুতরাং সফল বিক্রেতা হইতে হইলে তাহাকে সকলের সহিত মানাইয়া চলিতে হয়। আবার সফল বিক্রেতার প্রধান গুণ এই যে গররাজী ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা। কি ভাবে কথা পাড়িলে, কি ভাবে কথার উত্তর দিলে ক্রেতা দোষ গ্রহণ করিবে না ; কোন ক্রেতার মানসিক অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া বিক্রেতাকে ক্রেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। মোটামুটি যে সকল গুণ থাকিলে সফল বিক্রেতা হওয়া যায় তাহা নীচে আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, বিক্রেতার পণ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে দ্রব্য সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান ক্রেতা দ্রব্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে তৎপরতার সহিত জবাব দিতে পারা যায় না। জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর যদি তৎপরতার সহিত পাওয়া না

যায় তাহা হইলে ক্রেতার মনে অসন্তুষ্টি জন্মে। বলা বাহুল্য, ক্রেতার মনে অসন্তুষ্টি জন্মিলে দ্রব্য বিক্রয় করা যথেষ্ট কষ্টকর।

দ্বিতীয়ত, বিক্রেতার স্বভাবজাত মনুষ্য প্রকৃতি ধারণা করার ক্ষমতা থাকা চাই।
কোন ক্রেতার মেজাজ কি প্রকারের, রুচি কি প্রকারের ইত্যাদি মনুষ্য প্রকৃতির জ্ঞান সহজে ধারণা করিতে পারিলেই বিক্রেতা ক্রেতার মনস্তত্ত্ব করিয়া দ্রব্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন।

তৃতীয়ত, আচরণে মাধুর্য ও ব্যক্তিত্ব না থাকিলে কেহই কোন কার্যে সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিত্ব এমন একটি জিনিস যাহা দেখা যায় আচরণে মাধুর্য না, কিন্তু যাহা থাকিলে সকলকে আকৃষ্ট করা যায়। মধুর ও বিনয়ী ব্যবহার না থাকিলে বিক্রেতা ক্রেতার সংখ্যা বাড়াইতে সাহায্য না করিয়া ব্যবসায়ীকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করে। বিক্রেতার ধৈর্য থাকা প্রয়োজন। কোনও ক্রেতা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে একাধিকবার প্রশ্ন করিলে যদি বিক্রেতা অধৈর্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে ক্রেতার মনে বিরূপভাব দেখা দেয়।

চতুর্থত, পোষাক পরিচ্ছদে বিক্রেতাকে সর্বদা ফিটফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকিতে হয়। অপরিচ্ছন্ন বিক্রেতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেতা ভান্সাইতে সাহায্য করে।

বিক্রেতা সর্বদা ক্রেতাকে যত্ন সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া যত্ন সম্ভাষণ ক্রেতার প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যাদি দেখাইবে এবং দ্রব্য বাছিয়া লইবার সুযোগ দিবে। বিদ্যায় গ্রহণ কালেও ক্রেতাতে অভিনন্দন জ্ঞানান প্রয়োজন। এই উপায়ে কোন ক্রেতা একবার ব্যবসায়িক সম্পর্কে আবদ্ধ হইলে আর যাহাতে সে সম্বন্ধ নষ্ট না হয় তাহা বিক্রেতাই করিতে পারে।

বিজ্ঞাপন ও প্রচার (Advertisement and Publicity) : বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রায় এক অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দু'য়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।
বিজ্ঞাপন ও প্রচারের পার্থক্য প্রচারকার্য দ্বারা কোনও কিছুই অস্তিত্ব যেমন জ্ঞানান হয়, তেমনি প্রচারকার্যের ফলে অনেক প্রকার আদর্শ, নীতি ইত্যাদি সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও যায়। বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যবসায়ের দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু প্রচারকার্য দ্বারা ব্যবসায়, রাজনৈতিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্যের প্রচার হয়। বক্তৃতা করিয়া দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা প্রচারকার্য; উহা বিজ্ঞাপন নহে। কিন্তু কোনও দ্রব্যের বিক্রয় বাড়াইবার জন্য প্রচারকার্যকে বলা হয় বিজ্ঞাপন।

সুতরাং পরিধিতে প্রচারকার্য বিজ্ঞাপন হইতে অনেক বড়।

আবার প্রচার কার্যের পিছনে সর্বদা অর্থকরী উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন প্রচারের অংশবিশেষ থাকে না। কিন্তু বিজ্ঞাপন সর্বদাই অর্থকরী উদ্দেশ্য লইয়া দেওয়া হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রচারকার্যের অন্তর্গতই বিজ্ঞাপন। কাজে কাজেই

অংশ যখন সমগ্রের সমান হইতে পারে না তখন বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য সমার্থবোধক হইলেও একই নহে।

বিজ্ঞাপন তৈয়ার করিতে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয় (Important points in drafting advertisement) : সকল বিজ্ঞাপনই সমান কার্যকরী হয় না। বিজ্ঞাপন তৈয়ারের উপরও বিজ্ঞাপনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং বিজ্ঞাপন এমনভাবে তৈয়ার করিতে হয় যাহাতে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য অবিলম্বে ফলপ্রসূ হয়। বিজ্ঞাপন তৈয়ারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে কার্য ভাল হয়। প্রবাদ আছে যে পার্বতী-সুত গণেশ মহাভারত রচয়িতা বিজ্ঞাপন তৈয়ার বেদব্যাসের লেখক (amenuensis) হিসাবে কার্য করিতে রাজী হইয়াছিলেন এই সত্যে যে বেদব্যাস কখনও থামিতে পারিবেন শিক্ষণীয় বিষয় না। যদি কোনও কারণে একবার গণেশের কলম থামে তাহা হইলে আর মহাভারত লেখা হইবে না। এই প্রবাদটির মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় বস্তু আছে। তাই কাজল কালি-উৎপাদক বিজ্ঞাপন দেয় যে কাজল কালি যদি না থাকিত তাহা হইলে কি গণেশের কলম চলিত? সুতরাং মহাভারত রচনাও সম্ভব হইত না।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞাপনের প্রচারমূল্য ত থাকিবেই, তদুপরি অমুকুল প্রতিক্রিয়া বিক্রেতার মনের উপর যেন অব্যর্থ অমুকুলে প্রতিক্রিয়া হয় (Indirect appeal)।

Exercises

1. What are the objects of advertisement ?

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কি কি ?

2. What are the possible media of advertisement ? Will all media suit advertisement of all types of product ?

বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কি কি ? সকল অব্যর্থ কি সকল প্রকার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় ?

3. What is understood by 'keying in advertisement' ? What is 'follow up' ?

বিজ্ঞাপনের ফলাফল বিচার করার কোন উপায় আছে কি ? ক্রেতার পশ্চাদ্ধাবন বলিতে কি বুঝা যায় ?

4. Discuss the qualities of a salesman.

বিশেষজ্ঞ বিক্রেতার গুণাবলী আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাষ্ট্র

(Commerce and State)

ব্যবসায় বাণিজ্যের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ কি হওয়া উচিত তাহা একাধারে ব্যবসায় বাণিজ্য গঠন ও পরিচালন নীতি ও পদ্ধতি এবং অগ্রাধারে রাষ্ট্রের নিজস্ব নীতির উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ী সমাজের অঙ্গ। সমাজের আদর্শ ও নীতি রূপায়িত করিবার জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য পরিচালনায় অথবা ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন এবং সম্ভব কি না তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি মনে করে যে ব্যবসায়ীর কার্যের ফলে কোনও ব্যক্তি বিশেষ অথবা সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অথবা নিগৃহীত হইতেছে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার

সম্মোহকবাব স্বার্থে
সরকারের ব্যবসায়
হস্তক্ষেপ

প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া হইল। সাদাবাজারে সিমেন্টের অভাব আছে ; কিন্তু কালোবাজারে অধিক মূল্যে যত খুসী সিমেন্ট সংগ্রহ করা যায়। এ-ক্ষেত্রে সম্মোহককারীর স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্রের কর্তব্য

কালোবাজার বন্ধ করা। তাই কালোবাজার আইন-অসিদ্ধ। ব্যবসায়ী হিসাবে কালোবাজারী সম্মোহককারীকে সেবা দিতেছে বলিতে পার ; কিন্তু ব্যবসায়ীও জোটবদ্ধ হইয়া সরবরাহ সঙ্কোচ করিয়া কালোবাজারের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সম্মোহককারীর নিকট হইতে অগ্রায়ভাবে অধিক মূল্য আদায় করিতেছে। তাহা হইলে পকেটমার, গাঁটকাটা, প্রতারণা সকলই আইনসিদ্ধ কারবার বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কার্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) আবশ্যিক (Essential) ; (২) ঐচ্ছিক (Optional)।

রাষ্ট্রের কার্য

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)

(১) আবশ্যিক

রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে দেশরক্ষার ব্যবস্থা ; বিচারের ব্যবস্থা ; সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে চুক্তি, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহ, ইত্যাদি কার্য ধরিয়াছেন। আর ঐচ্ছিক কার্যের মধ্যে সেই সকল কর্তব্য ধরিয়াছেন

যাহা অবশ্য করণীয় নহে এবং যে কর্তব্য গ্রহণ করা সম্বন্ধে

(২) ঐচ্ছিক

মতভেদ রহিয়াছে। ঐচ্ছিক কার্যের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য

উন্নতির জন্য পন্থা অবলম্বন করা এবং নিয়ন্ত্রণ করাও আসে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কর্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের (ঐচ্ছিক হইলেও) কর্তব্য গ্রহণ করিতে হয়, অত্যাধিক সমাজ জীবন সুন্দর ও সহজ ভাবে পরিচালন সম্ভব নহে। তাঁহার মতে, একের আধিপত্য

(১) কতিপয় ব্যক্তি অথবা কোনও ব্যক্তির কোন সম্প্রদায়ের উপর যদি আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে, যেমন শিল্প-মালিক আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শ্রমিকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্ত তাই প্রয়োজন শ্রম আইন (Labour Laws) তৈয়ার করা।

(২) সম্ভোগকারীর যখন পণ্য নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে না— যেমন খাত্তদ্রব্য ভাল হউক কি মন্দ হউক, নির্ভেজাল হউক কি ভেজালপূর্ণ হউক সম্ভোগকারীর পণ্য নির্বাচনে অপারগতা খাত্তদ্রব্য সম্ভোগকারীকে ক্রয় করিতেই হইবে। ভেজালপূর্ণ দ্রব্য সম্ভোগ করার ফলে জনসাধারণের যে ক্ষতি হয়, তাহার জন্ত প্রয়োজন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ।

(৩) যেখানে ঘরোয়া ব্যবস্থায় কার্য সর্বদা সম্ভোগকারীর স্বার্থরক্ষা করিতে ঘরোয়া ব্যবস্থায় পারে না; যেমন, পরিবহণ ব্যবস্থা ঘরোয়া উত্তোগে থাকিলে সম্ভোগকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ক্ষতি নাই। কিন্তু ঘরোয়া উত্তোগে পরিবহণ ব্যবস্থা সর্বদা সম্ভোগকারীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না।

(৪) চুক্তিতে স্বার্থ-সম্পর্কিত ব্যক্তির ইচ্ছা কার্যে রূপায়িত করার প্রয়োজন; মালিশী ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা বহুদিন ধাবৎ অত্যাধিক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত। কারণ ব্যবসায় বাণিজ্য ঘরোয়া ব্যবস্থায় থাকিলে অবাধ নীতি ব্যবসায়ী নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্ত যে সকল পন্থা অবলম্বন করিবে উহার ফলে সামাজিক উন্নতি হইবে ইহা অনেক রাষ্ট্রই বিশ্বাস করিত। সুতরাং রাষ্ট্র ব্যবসায় বাণিজ্যে ক্ষেত্রে অবাধ নীতি (Policy of Laissez Faire অর্থাৎ Let alone) মানিয়াই চলিত।

শিল্প বিপ্লবের আরম্ভ হইতেই অবাধ নীতি (Let alone) কার্যকরী ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও স্বার্থের জন্ত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ধীরে ধীরে অবাধ নীতি পরিত্যাগ করিয়া অনেকটা নিয়ন্ত্রণ নীতি (Regulatory Principle) গ্রহণ করিতে লাগিল।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ট্রের মূখ্য কর্তব্য হইলেও বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেকে সমাজ কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্র (Welfare State) বলিয়া গণ্য করে। নাগরিকের সর্বতোমুখী উন্নতি বিধান করাই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্য। ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে নাগরিকের আর্থিক উন্নতি অবনতি ঘটান সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপও প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ (State Interference in Business Activities) : রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া

নাইলে কিভাবে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের সর্বতোমুখী মঙ্গল হইতে পারে তাহা স্থির

ব্যবসায় বাণিজ্যে
রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

করা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে এবং সকল রাষ্ট্রেই যে একই পদ্ধতি গ্রহণে সর্বাধিক ফল পাওয়া যাইবে তাহা নহে।

সামাজিক অবস্থা, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পদ্ধতিও পরিবর্তন হয়। তবে যে পন্থাই অনুসরণ করা হউক, উদ্দেশ্য একই। উদ্দেশ্য সমাজ জীবনের সর্বতোমুখী উন্নতি। যে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তাহা আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প-প্রচেষ্টা, ষাণ্ডারীয় আর্থিক কার্যকলাপ সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিতে পারে। সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই আর্থিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়া আর্থিক কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে। সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্বের অঙ্কুলে না হইলে আর্থিক ব্যবস্থা পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয় না।

জাতীয়করণ বা
রাষ্ট্রীয়করণ

পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আর্থিক ব্যবস্থা সাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহে দৃষ্ট হয়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক (Union of Soviet Socialist Republic)। ইহাকে বলা হয় রাষ্ট্রীয়করণ পদ্ধতি (Policy of nationalisation)। রাষ্ট্রীয়করণ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের

মধ্যে উৎপাদন ও বিলিবন্টন ব্যবস্থার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া উদ্যোগে কোন উৎপাদন ও বিলিবন্টন হয় না।

দ্বিতীয়ত, যেখানে উৎপাদন ও বিলিবন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা সম্ভব অথবা উদ্দেশ্য নহে, সেখানে রাষ্ট্র আংশিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায়

উৎপাদন ও বিলিবন্টন
আংশিক রাষ্ট্রীয়করণ

উৎপাদন ও বিলিবন্টন ব্যবস্থা আংশিকভাবে রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনয়ন করা হয় এবং আংশিক ঘরোয়া ব্যবস্থায় রাখা হয়।

যে সমুদয় শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিলে সমাজ জীবনের অধিকতর মঙ্গল হয়—সেই সকল শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ এবং অবশিষ্ট শিল্প-প্রচেষ্টা ঘরোয়া ব্যবস্থায় পরিচালনের নীতিকে আংশিক রাষ্ট্রীয়করণ পদ্ধতি বলা হয়। ভারতের ও গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থাকে

মিশ্র অর্থনীতি

এই পর্দায়ে ফেলা যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy)। ভারতের রেলপথ (Railways) ও

আকাশপথ (Airways) সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কিন্তু কাপড়ের কল, চিনির কল, ইত্যাদি ঘরোয়া উদ্যোগে পরিচালিত। গ্রেট ব্রিটেনেও অল্পরূপভাবে মিশ্র অর্থনীতিই কার্য করিতেছে।

তৃতীয়ত, বেসরকারী বা ঘরোয়া উদ্যোগে
ঘরোয়া উদ্যোগে
সাহায্য

রাষ্ট্রের সাহায্য দ্বারাও রাষ্ট্র শিল্প বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ঘরোয়া উদ্যোগে (Private Enterprise) রাষ্ট্র সহায়তা দ্বারা শিল্প বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে।

প্রয়োজনমত সাহায্যে শিল্পে অর্থের সংস্থান হইতে পারে ভাঙ্গা অর্থ শ্রবণাহকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা—যেমন Industrial Finance Corporation.

চতুর্থত, আইন প্রণয়ন ও উপদেশ দান করিয়াও রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে।
 আইন প্রণয়ন ইহাতে বস্তুত শিল্প ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর আইনের মারকতে
 নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিনিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষার জন্ত যৌথ
 কারবারী আইন প্রণয়ন করিয়া যেমন বিনিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে
 তেমনি শিল্প আইন পাস করিয়া শিল্পের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক
 বজায় রাখার চেষ্টা করা হইতেছে।

রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ (Control of Business by Nationalisation) : উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য সকল
 প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টা যদি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হয় তবে তাহাকে রাষ্ট্রীয়করণ বলে।
 ইহাতে শিল্প বাণিজ্যের মালিকানা স্বত্ব এবং ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার ভার থাকে
 রাষ্ট্রের হাতে।

আর্থিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়কৃত করা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের
 মতে ব্যবসায় শিল্প এবং বাণিজ্যে মূল্যবান আয়ের প্রেরণা না
 থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্য সফল হইতে পারে না। আরেক
 সম্প্রদায়ের মতে ব্যক্তিগত লাভের স্পৃহা ফলবতী করার জন্ত সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ
 করা হয় বলিয়াই শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়কৃত করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প ব্যবস্থা সরকারী বিভাগীয় দপ্তর দ্বারা পরিচালন করা যায়—আবার
 স্বাধীন সংস্থা স্থাপন করিয়াও পরিচালন করা যায়। বিভাগীয়
 নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারতের রেলপথ, ডাক তার পরিবহন ব্যবস্থা,
 দেশরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত হইতেছে। অপরদিকে স্বাধীন সংস্থা যেমন
 দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন (Damodar Valley Corporation) ; সিন্দ্রি সার শিল্প (Sindri Fertiliser Factory)
 দ্বারা সার উৎপাদন ও বিতরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন
 সংস্থা স্থাপন করিয়া অর্থনীতির বিভিন্ন দিক আয়ত্তে আনা হইতেছে।

বিভাগীয় দপ্তর পরিচালনায় সফল পাওয়া যায় কিংবা স্বাধীন সংস্থা দ্বারা
 পরিচালিত হইলে অধিকতর সফল পাওয়া যায় তাহা শিল্পের প্রকৃতির
 উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয়করণের দোষত্রুটি সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা
 হইল।

রাষ্ট্রীয়করণের সুবিধা (Advantages of Nationalisation) : প্রথমত,
 বরোয়া উদ্যোগে (Private Enterprise) উৎপাদন ব্যবস্থা সর্বদা
 সুপরিকল্পিতভাবে হয় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প মালিক ও
 ব্যবসায়িক উৎপাদন ব্যবস্থা সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করার প্রয়োজন স্বীকার করিলেও,
 আবশ্যকীয় পদক্ষেপ অবলম্বন করে না। সুতরাং শিল্প ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়কৃত
 করা হইলে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে সুপরিকল্পিত উপায়ে
 উৎপাদন সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, দেশের শ্রমশক্তি এবং খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করার সুযোগ রাষ্ট্রীয়করণ হইতে পাওয়া যায়। শিল্প সম্পদের হুঁই প্রয়োগ মালিক ও ব্যবসায়ী আশু লাভের জন্য শ্রম, খনিজ ও অগ্নাশু প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে যাহাতে সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইতে পারে। ভারতে বৈদেশিক শিল্প প্রচেষ্টার (Foreign Industries) বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল এই যে ভবিষ্যতের চাহিদার উপর নজর না রাখিয়াই খনিজ সম্পদ যথেষ্টভাবে ব্যবহার করা হইত। উহাতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে।

তৃতীয়ত, ঘরোয়া উদ্যোগে শিল্প ও ব্যবসায়ের সাফল্য প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। প্রতিযোগিতা না থাকিলে দ্রব্য উৎপাদনে ও বিলিবটনে দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা হয় না। তবে প্রতিযোগিতা সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা স্ববিধা না দিয়া অনেক সময়ে প্রতিযোগী শিল্পকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া নেয়। অগ্নায় ভাবে প্রতিযোগিতা করার (যেমন অগ্নায়ভাবে মূল্য কমান) ফলে দেশের সম্পদের অপপ্রয়োগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অগ্নায় প্রতিযোগিতার ফলে অপচয় (waste) ঘটে। সুতরাং উৎপাদন ও বিলি বটন ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হয় তাহা হইলে অগ্নায় প্রতিযোগিতা এবং অপচয় বন্ধ করা সম্ভব।

চতুর্থত, অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা ও অপচয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও দুর্বল শিল্পসংস্থানসমূহকে বৃহৎ ও সবল শিল্পসংস্থা গ্রাস করিয়া থাকে। ফলে একচেটিয়া কারাবাধ বৃহৎ ও সবল শিল্পসংস্থা বাজারে প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া কারবার (Monopoly) স্থাপনে সমর্থ হয়। একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া দ্রব্যের মূল্য এমনভাবে বাড়াইয়া দেয় যে সন্তোষ-কারীকে গ্রাহ্য মূল্য হইতে অনেক অধিক দিতে হয়। একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাস বা অছি (Trust) গঠন ঐ কারণেই আমেরিকাতে ১৮৯০ সালে Sherman Anti Trust Act পাস করিয়া বন্ধ করা হয়। দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিল্পসংস্থা রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা এইরূপ অবাঞ্ছিত কারবার বন্ধ করা সম্ভব বলিয়াই রাষ্ট্রীয়করণ অনেকেই একটি স্ববিধা বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চমত, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ঘরোয়া প্রচেষ্টায়ই অধিক হওয়ার সম্ভাবনা সন্দেহ নাই, কারণ মুনাফার উদ্দেশ্যে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই সামগ্রিক উন্নতি হয় কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। অব্যবহার্য ও অসং ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব বিরল নহে।

অসঙ্গত আচরণ বন্ধ বিনিয়োগকারীর অর্থ আত্মসাৎ করা, অপপ্রয়োগ করা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট কারবারী প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের গোড়ার দিকে এত অধিক ছিল যে বিনিয়োগকারী শিল্পবাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ থাকিত। ভারতের শিল্পে যত অস্ববিধা দেখা যায় উহার মধ্যে বিনিয়োগকারীর মনে আত্মস্থার অভাবে প্রয়োজনীয় মূলধন সংস্থানের অপপ্রাচুর্য অগ্রতম। সুতরাং শিল্প বাণিজ্য যদি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হয় তাহা হইলে বিনিয়োগকারীর আত্মস্থার অভাব ঘটে না এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চয় উন্নয়নমূলক সংস্থায় বিনিয়োগের অভাব হয় না।

বর্ধিত, শিল্পের অগ্রসর ও উন্নতি গবেষণার উপর নির্ভর করে। ইহা যথেষ্ট ব্যয়-সাপেক্ষ। আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্য প্রথায় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে গবেষণার স্বযোগ

নিতাই আধুনিকতম পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ঘরোয়া শিল্প মালিক অর্থের অভাবে বিশেষজ্ঞের অভাবে গবেষণামূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে না। শিল্প তথা ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়-করণ হইলে আবশ্যিকীয় গবেষণা কার্য রাষ্ট্রই গ্রহণ করিতে পারে। অর্থের অভাবের জন্ত রাষ্ট্রের গবেষণা কার্য গ্রহণে অসুবিধা হয় না।

এই সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণ যে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত তাহা সকলে স্বীকার করে না। যাহারা রাষ্ট্রীয়করণের বিরোধী তাহারা রাষ্ট্রীয়করণের নিম্নলিখিত অসুবিধা আছে বলিয়া মনে করেন।

রাষ্ট্রীয়করণের অসুবিধা (Disadvantages of Nationalisation) :

রাষ্ট্রীয়করণের অসুবিধা প্রথমত, শিল্প অগ্রগতির পক্ষে রাষ্ট্রীয়করণ সহায়ক বলিয়া রাষ্ট্রীয়-করণের পক্ষপাতীগণ দাবী করেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় দপ্তরের কর্মচারি-গণের যে সর্বদাই ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি থাকিবে সে কথা স্বীকার করা যায় নী। সরকারী দপ্তরের কর্মচারিগণের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকে বলিয়াই তাহাদের যে ব্যবসায় পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিবে সে কথা স্বীকার্য নহে। কারণ, ব্যবসায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে করার সুযোগ থাকিলে উত্তমের অভাব হয় না। কিন্তু সরকারী কর্মচারীর সেক্ষেপ কোনও লাভের প্রেরণা থাকে না বলিয়া উত্তমেরও অভাব ঘটে। ফলে অগ্রগতি সহজ না হইয়া ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়ত, মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্য পেশা হিসাবে লোকে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। অতাব ব্যবসায় ও শিল্প সংগঠন এবং উন্নতির ইতিহাস হইতে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে সরকারী উদ্যোগে ব্যবসায় পরিচালনা ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার অভাব ঘটেই। সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য বেসরকারী বা ঘরোয়া ব্যবস্থায় থাকিলেই অধিকতর সফল পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, যে কোনও শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের উপর নির্ভর করে। শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণ হইলে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা আমলাতান্ত্রিক ধারায় চলিতে থাকে। ফলে শিল্প ব্যবস্থাপনা শ্রমিক ও কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগ থাকে না। শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত শ্রমিক ও কর্মচারীর একাত্মবোধ না জাগিলে শিল্প তথা ব্যবসায়ের উন্নতি সম্ভব নহে।^১ এরূপ একাত্মবোধ জাগাইতে কর্মকর্তা ও শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায় উহার অভাব দেখা যায়।

চতুর্থত, ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া প্রচেষ্টায় শিল্প ব্যবসায় ব্যবস্থা চলিলে মালিক

ব্যবসায় পরিচালনে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া উৎপাদন ব্যয় কমাইতে চেষ্টা করে ; কারণ
ব্যয়বাহুল্য উৎপাদন ব্যয় অধিক হইলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান সম্ভব নহে।

কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ব্যয় সঙ্কোচের দিকে আদৌ
নজর দেওয়া হয় না। কারণ ঘরোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থসংস্থানের অসুবিধা
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় না ; কারণ আমলাগণ জানেন যে লাগে টাকা
দেবে গৌরী সেন।

পঞ্চমত, আবার অপচয় বন্ধ করার স্বযোগ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ পদ্ধতি
সুচাৰুৰূপে কার্য করে না। ঘরোয়া প্রচেষ্টায় উৎপাদন ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদক সর্বদা
সচেতন থাকে যাহাতে দ্রব্যের গুণহানি ঘটিয়া বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে
অসুবিধা না হয়। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প ব্যবস্থা থাকিলে অপচয় বন্ধ ত দূরের
কথা, বরং অপচয়ের সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং ঘরোয়া প্রচেষ্টায় উৎপাদিত দ্রব্যের
তুলনায় সরকারী উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনেক সময়েই অধিক দিতে হয়।

ষষ্ঠত, সরকারী বিভাগের কার্য দীর্ঘস্থায়িতার অভিযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে
নাই। সাধারণ কথায় বলে ‘সরকারের বৎসর ১৮ মাসে’। অর্থাৎ, যে কার্য
সম্পাদন করিতে কোনও ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানের যদি ১ বৎসর লাগে,
কার্যে দীর্ঘস্থায়তা সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেই কাজ করিতে অন্তত ১৮ মাস লাগিবে।
একবার সরকারী বিভাগের লাল ফিতায় বাঁধা পড়িলে সে কার্য উদ্ধার হইতে যথেষ্ট
বেগ পাইতে হয়। অবশ্য ইহাতে দোষ দেওয়ারও কিছু নাই, কারণ সরকারী ব্যবস্থা
এতই বিভাগীয় (Departmentalisation) পদ্ধতিতে চলে যে কোনও কার্যের জন্য
প্রকৃত কে দায়ী তাহা নির্ধারণ করা কষ্ট। কার্যে গাফিলতি ব্যতীত স্বজনপোষণ,
ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ইত্যাদির অভিযোগও সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিরল
নহে।

উপরের আলোচনা হইতে একথা বুঝা যাইতেছে যে ঘরোয়া উদ্যোগ ও সরকারী
উদ্যোগ কেহই সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে। এই কারণে বর্তমানে, যে সকল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়-
করণকে ধর্ম হিসাবে (Article of faith) গ্রহণ করা হয় না সেই সকল রাষ্ট্রে উভয়
ব্যবস্থার মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধানের জন্য আংশিক রাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে।
ইহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা মূলত ঘরোয়া উদ্যোগেই চলে তবে বিশেষ কতিপয়
শিল্প ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রীয়করণ হয়। এই প্রকার উৎপাদন ও
বণ্টন ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) বলা হয়। মিশ্র অর্থনীতির
পদ্ধতি অনুসারে ভারতের যানবাহন ব্যবস্থা, দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন
শিল্প যেমন সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে তেমনি লৌহ ইস্পাত শিল্পের আংশিক
সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং আংশিক ঘরোয়া উদ্যোগে চলিতেছে।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের শিল্প ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ : উপরে যে পদ্ধতি কল্পিত
উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হইয়াছে।
ভারতবর্ষ যদিও নীতিগতভাবে রাষ্ট্রীয়করণের পদ্ধতি অকলঙ্কন করিয়াছে তথাপি
স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাহ্যিক ব্যাপ্তি না হইলেও কতিপয় বিশেষ

শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ এবং বাকী শিল্প ঘরোয়া উদ্যোগে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের বর্তমান শিল্প ব্যবসায় নীতি ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

১৯৫৬ সালের শিল্প নীতি (Industrial Policy of 1956) প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিরই সংশোধিত রূপ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (First Five Year Plan) দোষক্রটি বিচার করিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ শিল্পনীতি ও ব্যবসায় (Socialistic Pattern of Society) নীতিকে রূপদান করিবার জন্য ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে সংশোধন করিয়া ১৯৫৬ সালে নূতন শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে ভারতের শিল্পসমূহকে ৩ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

প্রথম তালিকায় ১৭টি শিল্পের উল্লেখ আছে। উহা সরকারী আয়ত্তাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। এই তালিকায় আছে রেলপথ, বিমানপথ, ডাক তার বিভাগ, প্রতিরক্ষা শিল্প (Defence Industries), আণবিক শক্তি (Atomic Energy), লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লা ও প্রস্তুতীকৃত কয়লা ইত্যাদি। যদিও এই ১৭টি শিল্প নীতিগতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইবে তথাপি যে সকল শিল্প ঘরোয়া ব্যবস্থায় পরিচালিত হইতেছে তাহাদের মালিকানা স্বত্ব এবং পরিচালনার ভার তাহাদের হাতেই থাকিবে। কিন্তু এই তালিকার মধ্যে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহা সরকারী আয়ত্তে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

এই নীতি অনুসরণ করিয়াই রাউরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরে লৌহ-ইস্পাত শিল্প সরকারী প্রতিষ্ঠায় স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় তালিকায় যে ১২টি শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ক্রমশ সরকারী আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে আসিবে। তবে আপাতত সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে চলিতে থাকিবে। ইহার মধ্যে আছে রাসায়নিক শিল্প; প্রথম তালিকাভুক্ত খনিজ (কয়লা, জিপসাম, খনিজ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি) বাদে সকল প্রকার খনিজ, মোটর গাড়ী শিল্প, জাহাজ যাতায়াত ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন বোধে জাতীয়করণে অধিকার সরকারের হাতে রাখিয়া, বেসরকারী ও ঘরোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা যাহা কার্যকরী রহিয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এবং নূতন শিল্প প্রচেষ্টা বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকার কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া কার্য করিতে অথবা সরকারী সাহায্য ব্যতীতই কার্য করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় বিভাগে উপরে লিখিত ২৯টি শিল্প ব্যতীত অন্তর সকল শিল্প হইবে সমবায়-ভিত্তিতে। বর্তমানে তৃতীয় দফায় উল্লিখিত সকল শিল্পই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হইলেও সরকারের পক্ষে তৃতীয় দফায় উল্লিখিত শিল্প প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করায় কোনও রূপ বাধা থাকিবে না।

কৃত্রিমতন ও মাঝারি শিল্পসমূহ বাহাতে বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে এবং বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায়

ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ বাহাতে ধ্বংস না হয় তদুদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে কয়েক প্রকার সাহায্যদানের উল্লেখ করা হইয়াছে।
 ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প সংরক্ষণ অর্থ সাহায্য; প্রভেদমূলক শুল্ক (Differential Tax);
 প্রয়োজনবোধে প্রতিযোগী বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধকরণ ইত্যাদি উপায়ে ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পকে সাহায্য করার প্রস্তাব ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সম্পূর্ণভাবে শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব না করিয়া ও ঘরোয়া উद्यোগে শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য স্থপরিকল্পিত উপায়ে চলিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সরকারের শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ। প্রধানত যে কয়টি উপায়ে ঘরোয়া শিল্প ব্যবস্থাকে সাহায্য করা হয় তাহা নিম্নরূপ :

১। রাজস্ব নীতি : রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy) দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) দেশের শিল্প সংরক্ষণের জন্ত নীতি গ্রহণ অর্থাৎ সংরক্ষণমূলক ; (খ) কর আদায় (Revenue)। সংরক্ষণ দ্বারা শিল্প কিভাবে সাহায্য লাভ করে তাহা বিস্তারিত পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ করিতেছি যে সংরক্ষণ শুল্ক বসান হইলে দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য অধিক হয়। ফলে বিদেশী দ্রব্যের সম্ভোগ সঙ্কোচ হয় ; এবং দেশী দ্রব্যের সম্ভোগ প্রসার লাভ করে। কর নীতির ফলে শিল্পকে কোন কোন বিষয়ে কর-ভার হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

সংরক্ষণ নীতি : ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই ভারতের জনমত সংরক্ষণের দাবী করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশী সরকার তাহাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতের সে দাবী গ্রহণ করে নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে গ্রেট ব্রিটেন তাহার ভুল বুঝিতে পারিল যে গ্রেট ব্রিটেনের নিজের স্বার্থেই ভারতীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ভারত সরকার ১৯২১ সালের শুল্ক কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া স্থির করিল। এই সুপারিশ অনুসারে যে সংরক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব হইল তাহাতে আবেদনকারী শিল্পসমূহকে ৩টি প্রধান মর্ত্ব পূরণ করিতে হইত। (১) আবেদনকারী শিল্পকে প্রমাণ করিতে হইত যে শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল প্রাকৃতিক সুযোগ আছে যেমন, কাঁচামাল সরবরাহ এবং শ্রম সরবরাহ ; (২) আবেদনকারী শিল্পকে প্রমাণ করিতে হইত যে সংরক্ষণ ব্যতীত আবেদনকারী শিল্প বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না ; (৩) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইত যে নির্দিষ্ট সময় অন্তে বিনা

সংরক্ষণে কার্য করিতে পারিবে। উক্ত সংরক্ষণ নীতিকে বলা হইত বিচারমূলক বা প্রভেদমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection)। বিচারমূলক সংরক্ষণে লৌহ, স্ত্রীবস্ত্র, কাগজ,

বিচারমূলক
সংরক্ষণনীতি

চিনি প্রভৃতি কতিপয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়। সুত্বের বিষয় অতি অল্পকালের

মধ্যেই যে শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল উহাদের আর সংরক্ষণের প্রয়োজন রহিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কতিপয় শিল্প প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (Natural Protection) ভোগ করিতে লাগিল। অর্থাৎ, বিদেশী দ্রব্য আমদানিতে অসুবিধা এবং নিষেধের স্বার্থে রপ্তানি সঙ্কোচ ইত্যাদির ফলে ভারতে নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি সর্ব পূরণ করা যুদ্ধকালে ভারতীয় শিল্পের পক্ষে সম্ভব হইল না। সুতরাং তখনকার ভারত সরকার বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি পরিহার করিয়া নূতন সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিল। ইহাতে যুদ্ধকালে কোন শিল্প গঠন হইলে শিল্প যে সুসংগঠিত (well-organised) ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে।

১৯৪৮ সালে শিল্প নীতি নির্ধারণকালে স্বাধীন ভারতে শুদ্ধনীতি ও করনীতি (Fiscal Policy) কি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে সুপারিশ করার জন্ত একটি কমিশন বসান হয়। ঐ কমিশনের সভাপতি টি টি. কৃষ্ণমাচারীর নামানুসারে কমিশনকে কৃষ্ণমাচারী কমিশন বলা হয়। ঐ কমিশনের সুপারিশের ফলে শুদ্ধনীতির আমূল পরিবর্তন হয়।

বিচারমূলক শিল্পনীতি পরিহার করিয়া উন্নয়নমূলক শুদ্ধনীতি গ্রহণই কৃষ্ণমাচারী কমিশনের সুপারিশ ছিল। প্রথমত, যে সকল শিল্প দেশের কৃষ্ণমাচারী কমিশনের প্রতিরক্ষা বিষয়ক দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে যে কোনও মূল্যে সেই শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত, মৌলিক শিল্প (Basic Industry) নূতনই হউক কিংবা পুরাতনই হউক, সংরক্ষণ পাইতে থাকিবে। তৃতীয়ত, দেশের সামগ্রিক স্বার্থে যে শিল্পেরই সংরক্ষণ প্রয়োজন সরকার কর্তৃক গায্য বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিল্প ব্যবসায় প্রসারকল্পে সরকার সংরক্ষণের মাধ্যমে সাহায্য দিয়া থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংরক্ষণ পাইলেই শিল্প বাহাতে মনে না করে যে আবহমানকাল পর্যন্ত শিল্প সংরক্ষিত থাকিবে, তজ্জন্ত শিল্পসমূহকে যথাসম্ভব দক্ষতার সহিত কার্য করিতে হইবে।

করনীতি : রাজস্ব নীতির (Fiscal Policy) দ্বিতীয় অংশ হইতেছে করনীতি। ভারতীয় করনীতি বাহাতে শিল্পপ্রসারে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার শিল্পসমূহকে কতিপয় কর লাঘব (Tax Relief) দিয়াছে। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি প্রয়োগ বাহাতে সহজ হয় তদুদ্দেশ্যে ক্ষয়ক্ষতি বাদ করনীতি (Depreciation Allowance) স্থায়ী মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ হারে স্থির করিয়াছে। ইহাতে শিল্পে স্থায়ী যন্ত্রপাতির জন্ত আবশ্যকীয় মূলধনের যোগান অনেকটা সহজ হয়। এমনকি পুরাতন যন্ত্রপাতির উপর শতকরা ২০ ভাগ হারে ক্ষয়ক্ষতি বাদ পাইতে পারে। এমন কি উন্নয়ন কার্য বাহাতে স্বেচ্ছাবে চলিতে

পারে তজ্জন্ত শিল্পে যন্ত্রপাতি যোজনা করা হইলে উহার উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে উন্নয়ন বাদ (Development Rebate) পাইতে পারে।

তৃতীয়ত, দেশের সঞ্চয় বাড়াইবার উদ্দেশ্য এবং সেই সঞ্চয় যাহাতে বাঞ্ছিত পথে নিয়োগ হয় তজ্জন্ত সরকার বীমার চাঁদার উপর কর লাঘব করতঃ (Tax Relief) নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বীমার চাঁদার উপর গড় হিসাবে কর বাদ দিয়া, কর লাঘব সুযোগ দেওয়া হয়।

করনীতি ও সংরক্ষণ নীতির সহিত যুক্ত আরেকটি নীতিও সরকার শিল্পসমূহকে সাহায্য দান করার জন্য গ্রহণ করিতে পারে। উহা হইতেছে বিশেষ শিল্পকে আর্থিক সাহায্য বা সহায়তা দান (Subsidy)। ভারতের শরুকা শিল্পকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমদানীকৃত চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে ভারত সরকার শিল্পকে লোকসান পূরণ করিয়া অর্থ সাহায্য দিয়াছিল।

২। শিল্পে অর্থসংস্থানের পথ (Ways of raising Capital for Industries) : ভারতীয় শিল্পের অগ্রগত অসুবিধার মধ্যে মূলধনের অসুবিধা যে প্রধানতম সে-কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। একদিকে ভারতে সঞ্চয়ের স্বল্পতা অতীতকালে বিনিয়োগকারীর বিশ্বাসের অভাব, উভয়ই এককালে শিল্পে মূলধন যোগানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই কারণেই স্বাধীনতা লাভের পক্ষ ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষ অর্থসংস্থা (Finance Corporation) স্থাপন করিয়া শিল্পে আবশ্যকীয় মূলধন সংস্থানের পথ সুগম করার ব্যবস্থা করিয়াছে। শিল্পে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে যে সমূহ অর্থসংস্থা সাহায্য করিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা নিম্নে করা হইল।

ভারতবর্ষে শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) গঠন করার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিল্প ব্যাঙ্ক গঠন সম্ভব হয় নাই বলিয়াই স্বাধীন ভারতে শিল্প গঠনে সাহায্য করার জন্য প্রধানত দীর্ঘ মিয়াদী মূলধন সংগ্রহের জন্য, ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে শিল্পীয় অর্থ সংস্থা (Industrial Finance Corporation) স্থাপন করে। দেশীয় বৃহদায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করার জন্য শিল্পীয় অর্থসংস্থা (Industrial Finance Corporation) শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় ঋণ দান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পের শেয়ার (Shares) বা ঋণ পত্র (Debenture) অবলম্বন (Underwrite) করিতে পারে; তৃতীয়ত, শিল্প যদি বাজার হইতে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ সংগ্রহ করে তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি (Guarantee) দিয়া থাকে অবশ্য যদি ঋণের মিয়াদ ২৫ বৎসরের অধিক না হয়। চতুর্থত, নূতন শিল্পীয় অর্থসংস্থার আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ সম্পর্কেও এই সংস্থা প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাহতি দিয়া থাকে। ১৯৪৮ সালে এই সংস্থা স্থাপনা হইতে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংস্থা ৬৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়াছে।

রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা (State Financial Corporation) :
শিল্পীয় অর্থ সংস্থা (Industrial Finance Corporation) বৃহদায়তন শিল্পসমূহকে

সাহায্যদান করার জন্ত গঠন করা হয়। কিন্তু ভারতের শিল্প
 রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থার কার্য ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী আয়তন শিল্পের দানও নগণ্য নহে।

এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে রাজ্য অর্থ সরবরাহ
 সংস্থা (State Financial Corporation) স্থাপিত হয়। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই
 একটি রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্পীয় অর্থসংস্থার মতই রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা কোনও রাজ্যের মধ্যে
 অবস্থিত ক্ষুদ্র ও মাঝারী আয়তনের শিল্পের শেয়ার ক্রয়; ঋণপত্র অবলেন্থন করা;
 ঋণ পরিশোধে প্রতিশ্রুতি দান করে। এতদ্ব্যতীত নবগঠিত শিল্পে বিনিয়োগকারীদের
 স্থির হারে লাভাংশ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিও এই সংস্থা দিয়া থাকে। অন্যান্য শতকরা
 ৩৬ টাকা হারে এবং অনূর্ধ্ব শতকরা ৫ টাকা হারে লাভাংশ বিতরণের প্রতিশ্রুতি
 দেওয়া হয়।

ভারতের সকল রাজ্য অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সাহায্যের পরিমাণ
 ১৯৫২ সালে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ২১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

**ভারতের শিল্পীয় ঋণ এবং বিনিয়োগ সংস্থা (Industrial Credit and
 Investment Corporation) :** শিল্পীয় ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা শিল্পীয় অর্থ
 সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকরী করা ব্যতীতও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সাহায্য করে।
 যে শিল্পসমূহ এই সংস্থা হইতে সাহায্য পায় উহাদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ঘটিলে
 এই সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সাহায্য করে।

বিদেশ হইতে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি বাহাতে সহজে আমদানি
 ভারতের শিল্পীয় ঋণ ও করা যায় তাহার জন্ত এই সংস্থা আমদানিকারককে প্রত্যরী
 বিনিয়োগ সংস্থার ব্যয় ঋণ (Documentary Credits) দিয়া থাকে। এই সংস্থাটি
 ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংস্থা ভারতের মোট ৪৩টি ষোড়শ
 কারবারী প্রতিষ্ঠানকে ১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ৫ কোটি ২১
 লক্ষ টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছে এবং ৩৮ লক্ষ টাকার
 প্রত্যরী ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

**শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সরবরাহ সংস্থা (Refinance Corporation for
 Industry) :** শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সরবরাহ সংস্থা সরাসরি কোনও শিল্পকে ঋণ দান

করে না। মাঝারী আয়তনের শিল্প (অর্থাৎ যে শিল্পের মূলধন ও
 শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সরবরাহ সঞ্চিত তহবিল ৫ লক্ষ টাকার অনূর্ধ্ব) সমূহ ব্যাংকের নিকট

হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া যে ঋণপত্র বা রেহননামা দেয় উহাই
 আবার শিল্পীয় পুনঃ অর্থ সংস্থার নিকট জমা রাখিয়া ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

তবে ব্যাংক ঋণপত্র জমা দান রাখিয়া যে ঋণ গ্রহণ করিবে উহা পুনরায় মাঝারী আয়তনের
 শিল্পকে ঋণ দিতে হইবে।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (National Industrial Development Corporation) :

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থার কার্য সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য অথচ সেই সকল শিল্পে মনোযোগ প্রায় দেওয়াই হয় না। সরকারী প্রচেষ্টা অথবা বেসরকারী প্রচেষ্টা কোনটাই এই প্রকার শিল্পে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথে এই সকল শিল্পের উন্নয়নও একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা এইরূপ শিল্পকেই সাহায্য দান করার জন্ত ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়। যে সকল সংস্থায় এতাবতকাল পর্যন্ত এই সংস্থা সাহায্য দান করিয়াছে তাহার মধ্যে (১) ভারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প (Heavy Machine Tools Industry); (২) ভারী শিল্পে প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প (Intermediate Industry)—যেমন রবার, প্লাষ্টিক ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহায্য কাল ব্যতীতও জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা নতুন শিল্প গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। ভারতবর্ষে ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্ত এই সংস্থার রাশিয়া গণতন্ত্রের M/S Technoexportএর সহিত ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সংস্থার প্রতিশ্রুতিতে রাশিয়া হইতে ৮ কোটি রুবেল ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (World Bank) : ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব মিটাইবার জন্ত ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বিশেষ শিল্পকে সাহায্য করিতে পারে। ভারতের রেলপথকে ঋণ এবং শিল্পীয় ঋণ দেওয়ার জন্ত ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ১৯৫৯ জুলাই মাস পর্যন্ত ৬ কোটি ডলার ঋণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।

৩। মুদ্রা ও ঋণদান নিয়ন্ত্রণ (Control of Currency and Credit) : ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারে মুদ্রা ব্যবস্থার হ্রসংহতি যে একান্ত প্রয়োজন একথার উল্লেখ মুদ্রা ও ঋণদান নিয়ন্ত্রণ নিম্নপ্রয়োজন। সর্বজন গ্রাহ্য মুদ্রা ব্যবস্থা না থাকিলে ব্যবসায়ের ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ প্রসার সম্ভব নহে। দ্রব্য বিনিময় (Barter) বা প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থার অহুবিধা এবং পরোক্ষ বিনিময়ের উদ্ভব পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধ ইত্যাদিতে উপযুক্ত মুদ্রা ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

আবার শিল্পের মূলধন সংস্থান ও সাময়িক ঋণও টাকার বাজার হ্রসংহত না হইলে সম্ভব নহে।

মুদ্রা ব্যবস্থার উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার বা সঙ্কোচও নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যেক দেশের পক্ষেই প্রয়োজন। ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা বহু বাধা বিয় অতিক্রম করিয়া আজ স্বাধীন মুদ্রা হিসাবে গণ্য হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদিও স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্তর্দেশীয় লেনদেনে ভারতের মুদ্রা

ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় কাগজী মূল্য। মূল্যমান স্থির রাখিতে না পারিলে বৈদেশিক লেনদেনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ভারতের মূল্য ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

আবার ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত পৃথক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) ব্যাঙ্ক আইন পাশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হইয়াছে।

মূলধনের বাজার (Capital Market) নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে Securities Contract Regulation Act দ্বারা মূলধনের বাজার আর ব্যাঙ্কের হার এবং টাকার বাজার ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে টাকার বাজার (স্বল্পমিয়াদী ঋণের বাজার) নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

মহাজনী আইন (Usurious Loans Act) পাশ করিয়া অতি কুসীদ, সাহকার ও মহাজনদের ঋণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে।

এই প্রকার বিবিধ আইন যদি না থাকিত তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য সুপরিকল্পিত পথে চলিতে পারিত না।

৪। যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন (Development of Transport) : যানবাহন ব্যবস্থার গুরুত্বের বিষয় অধিক লেখা নিম্নয়োজন। যানবাহন ব্যবস্থাকে সভ্যতার বাহক বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক যুগের গোড়াপত্তন হইতে অতীবধি যানবাহন ব্যবস্থাই বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত না থাকিলে পৃথিবীর কোন্ দেশে কিভাবে উন্নতি হইতেছে তাহা জানারও কোন উপায় থাকিত না। কুপমণ্ডল হইয়া থাকিতে হইত।

আজ স্মরণে রাশিয়া ৫০ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ করিয়াছে তাহা পৃথিবীতে কোন দেশেরই জানা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীর কোন্ দেশ কিভাবে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা যানবাহন ও পরিবহণ ব্যবস্থার আশীর্বাদে সকলেই জানিতে পারিতেছে। দূরকে নিকট করাই যানবাহনের কার্য।

শিল্প বিপ্লবের সূচনাও যানবাহনের উন্নতি লইয়া। যানবাহন বাষ্পীয়করণ না হইলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে এত দ্রুত অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হইত কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অর্থনীতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে গ্রামীণ সম্পদ প্রয়োগ করিয়া গ্রামীণ চাহিদাই মিটান হইত। স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির আর যে গুণই থাকুক, শিল্পোন্নত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান যে তাহার পক্ষে সম্ভব নহে এক্ষণে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অর্থনীতির দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই গ্রেট ব্রিটেন দুই শতাব্দিক বৎসর ভারতের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারিয়াছিল।

এত বড় বিরাট দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও যে স্তূপ যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে সম্ভব নহে তাহা বিশদভাবে বিবেচনা করিয়াই তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকগণ প্রতিরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেই প্রথমে রেলপথ স্থাপন করেন।

পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে ভারতে শিল্প কয়েকটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে এবং ফলে শিল্প কেন্দ্রীভূত (localised) হয়। শিল্প গঠনে বন্দরের সহিত সহজে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজ লভ্যতার উপর সবিশেষ নজর দেওয়া হয় সন্দেহ নাই। তথাপি অতীত দেশের মতই, ভারতবর্ষেও গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পাঞ্চলে কাঁচামাল বহন, শিল্পাঞ্চল হইতে ভারতের দূর দূরান্তে শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণের জন্ত রেলপথ গঠন করার প্রয়োজন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কেবল রেলপথ নহে, ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে জলপথ ও স্থলপথও গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই ভারত সরকার যানবাহন ব্যবস্থার স্তূপ পরিচালনের জন্ত যানবাহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহাতে রেলপথ স্তূপভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্ত রেলপথ পুনর্বিভাগ করা হইয়াছে। রেলপথের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইলেও রাজপথ ও জলপথকে অবহেলা করা হয় নাই।

তখনকার যুগে রেলপথ গঠন ও পরিচালন পদ্ধতি জানিত না বলিয়াই রাজপথের যে গুরুত্ব ছিল উহা বুঝিতে পারিয়া সম্রাট শের শাহ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড স্থাপন করেন।

৫। আইনের সাহায্যে ব্যবসায়ে সহায়তা—(ক) যৌথ কারবারী

আইন : ব্যবসায় বাণিজ্য কখনও একতরফা হয় না। ব্যবসায় আইনের মারফতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্য চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় হইলেও ব্যবসায়ের ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বাস ও চুক্তি। চুক্তির মাধ্যমেই ব্যবসায় হয় বলিয়া ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করিতেছে বলিয়াই চুক্তি ও আইনের প্রয়োজন। নৈরাজ্যবাদে (Anarchism) বিশ্বাসিগণ অবশ্য ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে চাহেন না। তাহারা বিশ্বাস করেন যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সমন্বয় ভিত্তিতে কাজ করা। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মানুষ স্ববুদ্ধিগ্রস্ত কার্য করে না বলিয়াই সরকারকে আইন প্রণয়ন দ্বারা হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়।

ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত আইনসমূহকে বাণিজ্যিক আইন (Commercial Law) বপে। বাণিজ্যিক আইনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে দেওয়া হইল।

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে ব্যবসায় সংগঠন পদ্ধতিও পরিবর্তন হয়। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানসমূহই বর্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে। যৌথ কারবারী ব্যবসায়ের সুবিধা গ্রহণ সমাজের পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না যদি যৌথ কারবারী আইন পাশ করিয়া বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা

না হইত। যৌথ কারবারী আইন পাশ করিয়া সমাজের সঞ্চয় কল্যাণমূলক পথে বিনিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ১৮৫০ সালে প্রথমে যৌথ কারবারী আইন পাশ করিয়া যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের প্রথম বৈশিষ্ট্য আইনত ব্যক্তিসত্তা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ আইন অল্পসংখ্যক ভারতবর্ষে ১৮৫৬ সালে ভারতীয় যৌথ কোম্পানী আইন (Indian Companies Act, 1856) পাশ করা হয় এবং যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে সসীমদায় অথবা দায় সীমাবদ্ধের নীতি গ্রহণ করা হয়। দায় সীমাবদ্ধ নীতি গ্রহণ করা না হইলে বিনিয়োগকারী নিশ্চিন্ত মনে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে প্রয়াস পাইত না। বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনও সম্ভব হইত না।

মূল আইনের দোষত্রুটি দূর করার জন্ত ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন বহুবার সংশোধন করা হইয়াছে। ১৮৮২ সালে ভারতীয় যৌথ কারবারী আইন প্রথমে সংশোধন হয়। তারপর ১৯১৩ সালে ব্যাপক সংশোধন হয়। যৌথ কারবারী আইন ও পরিচালন নিয়ন্ত্রণ ১৯৩৬ সালে আবার ১৯১৩ সালের যৌথ কারবারী আইন সংশোধন হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ যাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে আবশ্যকীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্ত নতুন করিয়া যৌথ কারবারী আইন পাশ হয় ১৯৫৬ সালে।

যৌথ কারবারী আইন পাশ করার ফলে ব্যবস্থাপনার উন্নতি হইবে এবং ব্যবসায় স্বর্ভাবাবে পরিচালন হইবে আশা করা যায়। ম্যানেজিং এজেন্সী (পরিচালন প্রতিনিধি) প্রথার ক্রটিসমূহ দূরীকরণের জন্ত ১৯৫৬ সালে যৌথ কারবারী আইনে ম্যানেজিং এজেন্সীর উপর কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। আরার পরিচালকমণ্ডলী যাহাতে যথেষ্টভাবে ব্যবসায় পরিচালন করিয়া বিনিয়োগকারীদের স্বার্থহানি না ঘটায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াও ভারতীয় যৌথ কারবারী আইনে (১৯৫৬) ধারা সন্নিবেশ করা হইয়াছে। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা সঙ্ক্ষে সর্বিশেষ নির্দেশ এই আইনে দেওয়া হইয়াছে। আবার শেয়ার মালিকদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে।

(খ) ভারতীয় অংশীদারী ব্যবসায় আইন (Indian Partnership Act) : অংশীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অসসীমদায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহাতে কোনও এক বা কতিপয় অংশীদারী আইনের অংশীদারের কার্যের ফলে অপর অংশীদারগণের স্বার্থহানি না ঘটে সুফল তদ্বৎপ্রশ্নেই অংশীদারী আইন পাশ করা হইয়াছে। পারস্পরিক সঙ্ঘ, কর্তব্য ইত্যাদি স্থির করিয়া অংশীদারী ব্যবসায় পাশ করা হইয়াছে। ভারতে অংশীদারী আইন ১৯৩২ সালে পাশ করা হয়।

(গ) ভারতীয় চুক্তি আইন (Indian Contract Act) : ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই লিখিত বা অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। স্বতরাং চুক্তি দ্বারা

দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, মূল্য পরিশোধের নিয়ম, চুক্তি সম্পাদনের বিনির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ চুক্তি আইনে আছে। এই আইন ১৮৯০ সালে চুক্তি আইনের হফল পাশ হয়।

(ঘ) **বিনিময়পত্র বিষয়ক আইন (Negotiable Instruments Act) :** আধুনিক যুগে ব্যবসায় ঋণের উপর ভিত্তি করিয়াই আছে। ঋণ পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে সম্প্রদেয় বা বিনিময়যোগ্য পত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। চেক, হুণ্ডি, প্রত্যর্ষপত্রসমূহই বিনিময়পত্র বা সম্প্রদেয় দলিলের উদাহরণ। সম্প্রদেয় বা বিনিময়যোগ্য দলিলাদির মারফতে ব্যবসায় বাণিজ্য সংঘটিত হইলে যাহাতে ব্যবসায় সম্পর্কিত কোনও পক্ষকেই ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয় তজ্জন্ম ভারতীয় বিনিময়পত্র বিষয়ক আইন (Indian Negotiable Instruments Act) পাশ করা হইয়াছে।

(ঙ) **দ্রব্য বিক্রয় আইন (Sales of Goods Acts) :** দ্রব্য বিক্রয় আইন পাশ করিয়া ক্রয় বিক্রয় কি উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে ; ক্রয় বিক্রয়ে প্রস্তাব (offer) এবং সম্মতি (acceptance) কিভাবে স্থির করা হয় ; ক্রয়ের চুক্তি করিয়া কেহ চুক্তি ভঙ্গ করিলে কি পন্থা গ্রহণ করা কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় বিক্রয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(চ) **বীমা আইন (Insurance Acts) :** ব্যবসায়ের একটি বিশেষ সহায়ক অংশ বীমা। বীমার সাহায্য গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমান যায় ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের পক্ষে বীমার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। যাহাতে বীমা ব্যবসায় সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় তদুদ্দেশ্যে বীমা আইন পাশ করা হইয়াছে। বীমায় সম্পর্কিত সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া বীমা ব্যবসায় প্রসার করার উদ্দেশ্যেই বীমা আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইন ১৯৩৮ সালে পাশ হয়।

(ছ) **শ্রমিক আইন (Labour Legislation) :** কোন শিল্পে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক না থাকিলে শিল্পের অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। এক সময় ছিল যখন শ্রমিকের জীবন মরণ ক্ষমতা সকলই মালিকের হাতে অর্পিত ছিল। কিন্তু উৎপাদন প্রথা বতই পরোক্ষ পদ্ধতিতে চলিতে আরম্ভ করিল, শ্রমিক মালিক সম্পর্কও ততই জটিল আকার ধারণ করিল। ফলে শ্রমিকের এবং মালিকের উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠিল।

শ্রমিক এক সময় শোষিত সম্প্রদায় (exploited section) বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত ; আর মালিককে বলা হইত শোষণকারী (exploiter)। উভয়েরই চিন্তাধারা পৃথক। সুতরাং যাহাতে উভয়ের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তাহার জন্তই নানাবিধ শ্রম আইন পাশ করা হয়।

প্রথমে ভারতের কারখানা আইন পাশ করা হয়। কারখানা আইন (Factory

Act) সর্বপ্রথম ১৮৮১ সালে পাশ করা হয়। কৃতিপূর সংশোধনের মধ্য দিয়া ১৯৪৮

সালে কারখানা আইনে শ্রমিকের কার্য সম্বন্ধীয় ব্যাপক নির্দেশ
কারখানা আইন ও শ্রমিকের স্বার্থ দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই আইনটি পাশ করা হয়।

কারখানা আইনে কারখানায় প্রতি শ্রমিকের জন্য ৫০০ কিউবিক ফুট (cubic feet) স্থান রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতি কারখানায় একজন করিয়া শ্রম
কল্যাণ অফিসার (Labour Welfare Officer) নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া
হইয়াছে। তাহার কর্তব্য হইবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য
মালিককে পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি।

এই আইনে শ্রমিক নিয়োগের ন্যূনতম বয়স বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ বৎসরের
নিম্ন বয়সের বালক বালিকাদের কারখানায় নিয়োগ বন্ধ করা হইয়াছে। আবার
শ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘণ্টার (সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা) অধিক খাটান নিষেধ। নিরবচ্ছিন্ন
এক বৎসর কার্য করিলে প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট হারে (প্রতি ২০ দিনে ১ দিন) ছুটি
পাইবে। নির্দিষ্ট ৮ ঘণ্টার উর্ধ্বে যে সময় খাটান হইবে তাহার জন্য অধিহারে অধি-
মজুরী (Overtime Wage) দিতে হইবে। উহার হার সাধারণ মজুরী হারের দ্বিগুণ।

প্রত্যেক শিল্পে একজন করিয়া চিকিৎসক নিয়োগ করিতে হইবে এবং প্রাথমিক
সাহায্যের (First Aid) ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

সমগ্রভাবে শ্রমিক আইন পাশ করিলেও বিভিন্ন প্রকার শিল্পের অবস্থা বিবেচনা
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আইনও পাশ করা হইয়াছে।

খনি সংক্রান্ত আইন (Mines Act) পাশ করিয়া খনিতে শ্রমিকদের, পরিবহণ
আইন পাশ করিয়া পরিবহণ শিল্পের শ্রমিকদের; আবাদী আইন (Plantation Act)
পাশ করিয়া আবাদী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নিম্নতম মজুরী আইন (Minimum Wages Act) ১৯৪৮ সালে পাশ করা হয়।

এই আইন দ্বারা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী কি হওয়া উচিত এবং
নিম্নতম মজুরী আইন মজুরী প্রদানের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (The Workmen's Compensation Act) পাশ
করিয়া শ্রমিক কোনও বিপজ্জনক কার্য করা কালে কোনও প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে
মালিকের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

শিল্প বিরোধ আইন দ্বারা (Labour Disputes Act) শ্রমিকের বিবাদের কারণ
অনুসন্ধান; বিবাদকালে শ্রমিকের মজুরী দান; বিবদমান পক্ষের আবশ্যিক সালিসীর
(Arbitration) ও মধ্যস্থতার (Conciliation) ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতে শ্রমিক সংঘ বহুদিন বে-আইনী বলিয়াই গণ্য করা হইত। বহু চেষ্টার

পরে ১৯২৮ সালে শ্রমিকসংঘ আইন (Trade Union Act)
শিল্পবিরোধ আইন ও শ্রমিক-শ্রমিক সম্পর্ক পাশ করার ফলে শ্রমিক সংঘ আইনও মানিয়া লওয়া হইয়াছে।
শ্রমিক সংঘ মানিয়া লইলে ফলে শিল্প বিরোধের সমাধান কঠিন
হইবে মনে করিয়াই এই আইন পাশ করা হয়।

যে সকল শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাহাদের বিশেষ কতিপয় অঙ্গবিধার কথা চিন্তা করিয়া প্রস্তুতি কল্যাণ আইন (Maternity Benefit Act) পাশ করা হয়।

শ্রমিকের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (Employees State Insurance Act) পাশ করিয়া শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

শিল্পে আবশ্যিকভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গঠনের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা অসময়ে মৃত্যু হইলে শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের (শ্রী, পুত্র ইত্যাদি) যাহাতে কিছু অর্থ সংস্থান হয় বাষ্ট্রীয় বীমা আইন ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তত্ত্বাবধানে কতিপয় শিল্পে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রমিকগণ তাহাদের মজুরী ও মাগ্নী তাতার উপর শতকরা ৬½ টাকা হারে চাঁদা দিবে এবং মালিকও শতকরা ৬½ হারে চাঁদা এই তহবিলে জমা দিবে।

(জ) শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ (Industrial Development and Regulation Act) : এই আইনটি ১৯৫১ সালে পাশ করা হয়। এই আইনের বলে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বেসরকারী বা ঘরোয়া উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পসমূহকে উন্নতির আদর্শ পথে চালিত করার জন্য আবশ্যকীয় পন্থা গ্রহণের এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় আসিবে উহার যদি সরকারের আইন মানিয়া না চলে তাহা হইলে সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণের অধিকার এই আইনের বলে সরকারের হাতে রাখা হইয়াছে।

(ঝ) সালিশী আইন (Arbitration Laws) : ব্যবসায় সম্পর্কিত পক্ষ-সমূহের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে সহজে যাহাতে সালিশী আইন বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে তাহার জন্য সালিশী আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। সালিশী আইনে বিবদমান পক্ষসমূহ আপোশ মীমাংসায় বিবাদ মিটাইবার সুযোগ পায়।

(ঞ) দেউলিয়া আইন (Insolvency Act) : দেউলিয়া আইনে কে দেউলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; দেউলিয়া হইলে কি কর্তব্য ; দেউলিয়ার সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপায় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেউলিয়া আইন আছে বলিয়াই ব্যবসায়ী ঋণের ভিত্তিতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে পরাভূত হয় না।

বাণিজ্যিক আইনের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য তাহার কিস্তি আলোচনা উপরে করা হইল। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের জন্যও বটে আবার সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্যও এই সকল আইনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

নিম্নে সরকারী দপ্তরের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায় প্রসারে উপদেষ্টা হিসাবে সরকারের কার্য কিছু আলোচনা করা হইল।

(১) **শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Industry and Commerce) :** ভারত সরকারের মন্ত্রিদপ্তরের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর একটি।

নিয়ামক দপ্তর

এই দপ্তরের কর্তব্য ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠা; শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জ্ঞাত নীতি অবলম্বন এবং সেই নীতি যথার্থ ভাবে কার্যকরী করা।

মন্ত্রী (Minister); উপমন্ত্রী (Deputy Minister); সচিব (Secretary) এবং কর্মচারীদের লইয়া মন্ত্রিদপ্তর গঠিত। এই দপ্তরের উপরই শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কার্য ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক নীতি গ্রহণ ও নীতি কার্যে রূপায়িত করার ভার। পরিচালনার জ্ঞাত দপ্তরটির কার্য কয়েকটি কমিটি ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর হাতে গুলত করা হইয়াছে।

(ক) **কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (Central Industrial Advisory Council) :** ১৯৫৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতি অনুযায়ী এই পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। ভারতের সর্বপ্রকার শিল্পের উন্নতির জ্ঞাত এই শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ পরামর্শ দিয়া থাকে। তবে কার্যের সুবিধার জ্ঞাত এই পরিষদের অধীনে বিভিন্ন শিল্পের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইয়াছে।

(খ) **অনুজ্ঞা প্রদানকারী কমিটি (Licensing Committee) :** ১৯৫১ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভারতবর্ষে কোন শিল্পই সরকারী অনুজ্ঞা (Licence) না পাইলে কার্য আরম্ভ করিতে পারে না। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলেও অনুজ্ঞা লইতে হয়। পরিকল্পনা কার্যকরী করার জ্ঞাত—যাহাতে দেশের সম্পদ অব্যাহিত পথে প্রয়োগ অনুজ্ঞা প্রদানকারী না হয় তজ্জ্ঞাত এই সতর্কতা অবলম্বন। দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সৃষ্ট প্রয়োগ এবং শিল্প গঠনের ফলে ভারতের আঞ্চলিক আর্থিক অবস্থার ভারসাম্য যাহাতে নষ্ট না হয় সেইজ্ঞাত কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিলে সামগ্রিকভাবে দেশের উপকার অধিক হইবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই অনুজ্ঞা (Licence) দেওয়া হয়।

(গ) **জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থা (National Industrial Development Corporation) :** সরকারী ও বেসরকারী উভোগে শিল্পোন্নয়নের ফলে যাহাতে কোনও প্রকার সংঘাত না আসে এবং সুসমঞ্জস ভাবে শিল্পোন্নতির পথে আগাইয়া যাওয়ার জ্ঞাত আবশ্যকীয় পরিকল্পনা ও নূতন উভোগ জাতীয় শিল্পোন্নয়ন গ্রহণের ভার এই সংস্থার হাতে দেওয়া হইয়াছে। শিল্পোন্নতির পথে অর্থ ব্যবস্থার অনুবিধা দূরীকরণের পস্থা স্থির করাও জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সংস্থার কার্য।

(ঘ) **কেন্দ্রীয় আমদানি-রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ (Central Import and Export Advisory Council) :** বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি পর্যালোচনা করিয়া আমদানি রপ্তানি নীতি নির্ধারণ করা এবং উপদেশ দেওয়া এই পরিষদের

কর্তব্য। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে বিদেশ হইতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন সমধিক। বৈদেশিক মূল্যের অভাব এবং মূলধনী দ্রব্য আমদানির প্রয়োজন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ভারত সরকার এই পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী বৎসরে দুইবার আমদানি নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই নীতি অনুসারে আমদানির অনুজ্ঞা না পাইলে দ্রব্য আমদানি করা চলে না। সুতরাং আমদানি নীতি অনেকটা রক্ষণশীল পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই গ্রহণ করা হয় একথা বলা চলে। তবে বৈদেশিক মূল্যের অবস্থা যদি ভারতের অনুকূলে হয় তাহা হইলেও যে আমদানি বিষয় রক্ষণশীল মনোভাব লইয়া এই পরিষদ কার্য করে তাহা নহে। বৈদেশিক মূল্য আমদানি হইলে সেই মূল্য কি উপায়ে ব্যবহার করিলে সদ্যবহার হইবে তাহার পথ নির্দেশ করা এবং তদনুসারে আমদানির অনুজ্ঞাদান এই পরিষদের কর্তব্য।

আমদানি-রপ্তানি
উপদেষ্টা পরিষদ

রপ্তানি বিষয়ে এই পরিষদের কর্তব্য মোটামুটি দ্রব্য বিষয়ক ও গন্তব্যস্থল বিষয়ক। ভারতের বাণিজ্য উদ্ভূত অবস্থা স্বাধীনতা লাভের পর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন ভারত বাণিজ্য উদ্ভূত (Balance of Trade) এবং আদানপ্রদান সমতা (Balance of Payments) উভয়েই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। আদানপ্রদান সমতার প্রতিকূল অবস্থার ফলে ভারতের মূল্য ব্যবস্থা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্ত রপ্তানি বাড়ানোর পথ নির্দেশ করা এই পরিষদের কার্য।

আমদানি মূল্য রপ্তানি মূল্য দ্বারা পরিশোধ করার উপায়ও এই উপদেষ্টামণ্ডলীই উদ্ভাবন করে।

রপ্তানি বাড়াইবার জন্ত এই পরিষদ আবার একটি সংস্থা গঠন করিয়াছে—উহার নাম রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ (Export Promotion Council)। রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ কোন্ দেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং কি কি দ্রব্যের চাহিদা আছে ইহা গবেষণা করা রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের কার্য।

আবার রপ্তানির খুঁকি গ্রহণ করিয়া রপ্তানিকারকদের সাহায্য করার জন্ত এই পরিষদ রপ্তানি ঋণ বীমার প্রবর্তন করিয়াছেন। রপ্তানি উন্নয়ন রপ্তানি ঋণ বীমা পরিষদ রপ্তানি শিল্পের কাঁচামাল সম্ভার সংগ্রহ করিয়াও সাহায্য দিয়া থাকে।

(৬) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা (State Trading Corporation) : আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতও আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা বিচার করার জন্ত ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার ডা. পি. আর. দেশমুখের সভাপতিত্বে একটি কমিশন বসান। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা নামে একটি সরকারী সংস্থা গঠন করা হয়।

ভারতের রপ্তানি ও আমদানি বহুমুখী করার জন্ত, এবং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন বাজার তৈয়ার করার জন্তই এই সংস্থা গঠন করা হইয়াছে।

ভারতের ব্যবসায়ী মহলে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা খুব সমাদর পায় নাই। কারণ বাণিসায়ী মহল এই সংস্থাকে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়ক বলিয়া মনে না করিয়া প্রতিযোগী সংস্থা (competitive) বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু আমদানি রপ্তানিতে সরকার সরাসরি অংশ গ্রহণ করিয়া আমদানি দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সন্তোষকারীদের মধ্যে ত্রাণমূল্যে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(চ) **শুল্ক কমিশন (Fiscal Commission)** : ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংরক্ষণ নীতি কি হওয়া উচিত তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া স্থপারিশ করার জন্ত ১৯২১ সালে শুল্ক কমিশন গঠন করা হয়। সেই শুল্ক কমিশন কমিশনের স্থপারিশ অনুসারে ভারতবর্ষে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (Principle of Discriminating Protection) গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ঐ নীতি অনুসারেই সংরক্ষণ দেওয়া না দেওয়া স্থির হইত।

স্বাধীনতা লাভের পর নূতন ভাবে শিল্পনীতি গঠন করা হইল। শিল্পনীতির সহিত শুল্কনীতি জড়িত বলিয়া স্বাধীন ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্ত কি শুল্কনীতি হওয়া উচিত তাহা বিচার করার জন্ত একটি কমিশন বসান হইল। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা অনুসারে শুল্কনীতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় বলিয়াই দ্বিতীয় শুল্ক কমিশন একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশন গঠনের স্থপারিশ করে। সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ এবং সেই নীতির প্রয়োগ এই কমিশনের দ্বিবিধ কর্তব্য।

(ছ) **বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংস্থা (Directorate of Commercial Intelligence and Statistics)** : এই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পদবী ডিরেক্টর জেনারেল অফ কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স (Director General of Commercial Intelligence and Statistics)। এই সংস্থার কার্য বাণিজ্য বিষয়ক সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা। তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা ব্যবসায়ী মহলে প্রচার করাও ইহার কর্তব্য। সংবাদ সূত্ৰরূপে বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া ব্যবসায়ী মহলে প্রকাশ করিলে বাহাতে সেই তথ্যসমূহ হইতে ব্যবসায়ী তাহার কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যেই তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়।

(জ) **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা (National Small Industries Corporation)** : জাতীয় শিল্পোন্নয়ন বলিতে বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতিকেই অনেকে বুঝিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থায় বৃহদায়তন শিল্পের স্বার্থে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব নয়; বরং ভারতের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের উভয়ের উন্নতিই প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাঁচামাল যোগান; ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি; বিলম্বিত প্রদান (Deferred Payments) পদ্ধতিতে যেমন ভাড়াক্রয় (Hire Purchase); কিস্তীবন্দীতে ক্রয় (Installment Purchase) ইত্যাদি; ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বহুপাতির সংস্থান করা; ক্ষুদ্রায়তন

বাণিজ্যিক তথ্য ও
পরিসংখ্যান বিভাগ

জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প
সংস্থার কার্য

শিল্পের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদির ভার জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থার হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। এই সংস্থা ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়।

(ক) কয়েকটি বিশেষ দপ্তর : এতদ্ব্যতীতও কয়েকটি বিশেষ শিল্পের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার কতিপয় বিশেষ দপ্তর গঠন করিয়াছেন। আমদানি রপ্তানি নিয়ামক উহার মধ্যে লৌহ ইস্পাত কন্ট্রোলারের দপ্তর (Director of Iron & Steel); আমদানি রপ্তানি নিয়ামক দপ্তর (Inspector of Export Import Control); টেক্সটাইল কমিশনারের দপ্তর (Textile Commissioner); কয়লা কমিশনারের দপ্তর (Coal Commissioner); ডকশ্রমিক বোর্ড (Dock Labour Board) ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি দপ্তরের উপর যে বিশেষ শিল্পের নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই বিশেষ শিল্পের উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপন্থা অবলম্বন করা দপ্তরের কার্য।

২। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দপ্তর (Central Ministry of Finance) : এই দপ্তরটি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর হাতে। ভারতবর্ষে অর্থ বিষয়ক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দপ্তর যাবতীয় কার্যকলাপের ভার ইহার হাতে।

করনীতি; মুদ্রা ব্যবস্থা; আর্থিক লেনদেন (ঋণ) ব্যবস্থা; ব্যাংক ব্যবসায়; টাকাকড়ির বাজার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ভার অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের উপর।

দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা; টাকাকড়ির বাজার; করনীতি, ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার উপর দেশের শিল্পের উন্নতি অথবা অবনতি নির্ভর করে বলিয়াই ঐ টাকাকড়ির ব্যবস্থা সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। এ বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সহযোগিতায় অর্থদপ্তর ঐ সকল কার্য সম্পাদন করে।

৩। এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন যে শিল্পে স্বাস্থ্যপ্রদ শ্রমিক মালিক সম্পর্ক বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্ত সরকার বহুবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ আইন সকল কার্যে পরিণত করার ভার শ্রমমন্ত্রী দপ্তরের হাতে (Minister of Labour)।

৪। পরিবহণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চালিত না হইলে কোন দেশই ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে পারে না ইহাও বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। পরিবহণ ব্যবস্থা সুপরিষ্কৃত ও সুসংবদ্ধ উপায়ে পরিচালনের জন্ত পরিবহণ মন্ত্রীর দপ্তর (Minister in charge of Communication) দায়ী।

৫। শিল্পোন্নয়নে গবেষণা যে একান্ত প্রয়োজন একথা উল্লেখ করা নিম্নপ্রয়োজন। ধরোয়া উদ্যোগে গবেষণা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। আবার গবেষণা পাওয়াও কঠিন। এই কারণে ভারত সরকার শিল্প গবেষণায় সাহায্য করার জন্ত একটি দপ্তর খুলিয়াছেন। ঐ দপ্তরের নাম শিল্পীয় গবেষণা

(Industrial Research)। শিল্পের উন্নতির জন্ত গবেষণা করা এবং গবেষণা অঙ্গুসারে বহুমুখী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এই দপ্তরের কার্য।

৬। দেশের খনিজ, বিদ্যুৎ এবং জালানীর স্ফূট ব্যবহার না হইলে শিল্পের উন্নতি খনিজ বিদ্যুৎ ও জালানী দপ্তর ব্যাহত হয়। খনিজের সন্ধান, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ কার্য আছে যাহা ঘরোয়া উদ্যোগে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই কারণেই একটি পৃথক দপ্তর গঠন করিয়া উহার হাতে খনিজ, বিদ্যুৎ এবং জালানী ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইয়াছে ঐ দপ্তরের একজন মন্ত্রী হাতে—খনিজ, বিদ্যুৎ ও জালানী মন্ত্রী (Minister in charge of Mines, Power and Fuel)। এই দপ্তরের গবেষণার ফলেই নাহেরকাটিয়ার এবং ট্রেশের তৈল খনি আবিষ্কার হইয়াছে।

৭। রেলওয়ে বোর্ড (Railway Board) : পরিবহণ ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শিল্প উন্নতির অশেষ উপকারসাধন করে। তবে পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথের গুরুত্ব অতীব। সেই কারণেই রেলপথের ব্যবস্থাপনার জন্ত একটি পৃথক রেলওয়ে বোর্ড মন্ত্রিদপ্তর গঠন করা হইয়াছে। আবার সেই রেলমন্ত্রী দপ্তরের অধীনে একটি রেলবোর্ড গঠন করা হইয়াছে। রেলবোর্ড কর্তৃক নূতন নূতন রেলপথ গঠন ; রেলপথের মাওল ; মাল চলাচলের জন্ত বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ওয়াগন বন্টন ইত্যাদি কার্য রেলবোর্ডের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। রেলবোর্ড স্বতন্ত্রভাবে কার্য করে। তবে সর্বদাই রেলমন্ত্রী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার কর্মপন্থা গৃহীত হয়।

৮। জাতীয় উৎপাদন পরিষদ (National Productivity Council) : ১৯৫৬ সালে যে উৎপাদন ডেলিগেশন (Production Delegation) জাপানে প্রেরিত হয় সেই ডেলিগেশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি জাতীয় উৎপাদন পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় উৎপাদন পরিষদ এই পরিষদের কার্য ভারতে উৎপাদন বিষয়ে সচেতনতা আনয়ন করা। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং কলাকৌশল প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করাই এই পরিষদের কার্য।

৯। পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) : পরিকল্পনা কমিশন একটি বিশেষ সংস্থা। ঘরোয়া উদ্যোগের (Private Sector) অসুবিধার মধ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদন বিলি বন্টনের অসুবিধা প্রধান। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থকে ঘরোয়া উদ্যোগে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সুতরাং দেশের সম্পদের স্ফূট ও পরিকল্পিত প্রয়োগ দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ নির্দেশ করাই এই কমিশনের কার্য। এই কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী দুইটি পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে। দেশের সাধারণের আয় বৃদ্ধি করা এবং জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন করা এই কমিশনের উদ্দেশ্য।

Exercises

1. Explain 'Nationalisation'. What are the arguments in favour of and against nationalisation of Industries ?

রাষ্ট্রীয়করণ বলিতে কি বুঝ ? রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে এবং বিরুদ্ধে যুক্তি দাও।

2. Discuss the Industrial Policy of Government of India.

ভারত সরকারের শিল্পনীতি আলোচনা কর।

3. Enumerate some of the different ways in which Government can help Industry, Trade and Commerce.

সরকার কি উপায়ে শিল্প ব্যবসা, বাণিজ্যকে সাহায্য করিতে পারে তাহাব কয়েকটি উপায় আলোচনা কর।

4. Explain some (about 3) methods by which the Government can control Business.

ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে সরকার কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে—তাহার অন্তত ৩টি আলোচনা কর।

5. Write notes on :

(a) Planning Commission ; (b) Director General of Commercial Intelligence and Statistics ; (c) Controller of Export and Import ; (d) Central Industrial Advisory Council ; (e) State Trading Corporation.

সংক্ষেপে আলোচনা কর :—(ক) পরিকল্পনা কমিশন ; (খ) বাণিজ্যিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান দপ্তর ; (গ) বণ্টানি ও আমদানি নিয়ামক ; (ঘ) কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ ; (ঙ) বাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা।

পরিশিষ্ট

ইংরেজীতে বাণিজ্যিক পত্রের কয়েকখানি নমুনা (Specimen of some Commercial Letters in English).

1. Quotation and Samples :

3 Woodburn Park

Calcutta-25

15th September, 1960.

Messrs Springel & Sons,

Madras-3

Dear Sir,

We shall be glad to receive quotation for sateens, terelyne, serge and worsted flanel. If possible, please send some samples as well.

As we have been referred to you by our Mr. Sampson, we would be glad to do some business with you.

If your productions suit our trade, you may be assured of order for a considerable quantity of goods.

Thanking you,

Yours truly,

Bonkon & Co.

2. Order for Purchase :

99, North Road

Madras-2

13th October, 1960.

Messrs Bombast & Co.

Bombay-5

Gentlemen,

Please purchase and ship the following articles or as much of them as possible, on our account, for Madras Port.

Please draw on us 3 months' bill. Goods are to be shipped per S. S. Jaladhar. We understand, the ship will leave Bombay port

on 25th next. Packages are to be market [K]; and numbered 003 and upwards.

Special care is to be taken for the execution of the present order. Supply of goods of any inferior quality will create a bad impression among our customers and will react adversely upon our goodwill.

500 doz. of Star Brand Whisky

1000 „ „ Port „ „

200 „ „ White Horse „

Yours truly,
S. Kompton & Co.

3. Acknowledgement of remittance.

1, S. C. Mullick Road
Calcutta-32
The 19th March, 1960.

Messrs Standard Battery & Co.
13, Council House Street
Calcutta-1

re to acknowledge receipt of your remittance (in thousands) only, by Cheque No. $\frac{5}{H}$

India, against our Bill No. 5001/60-61 dated 12th September, 1959.

We would, however, request you to settle Bill No. 3012/60-61 dated 12th September, 1959. It will appear from the report of your Mr. Sen that goods were received by your storekeeper in good order and condition. Supply was, therefore, not of damaged goods as alleged.

As the financial year of our business is coming to a close, we would appreciate very much if the payment of the bill is made at an early date.

With thanks,

Yours truly,
Robins & Co.

**4. Enquiry :
Confidential**

15, Park Avenue
Kanpur-1
The 13th November, 1960.

Messrs Fazle Ali & Co.
Burrabazar
Calcutta-1

Gentlemen,

We understand, you are in trade connection with Messrs Rahimtoola & Co. of 12, Park Avenue, Kanpur for over 20 years.

We would be highly obliged if you could, in confidence, let us know your opinion regarding the financial standing of the business ; particularly whether the party could be allowed credit of Rs. 20000/- at a time,

You can rest assured that whatever you write will be kept strictly confidential. We would be glad to be of any service to you in like manner.

Thanks,

Yours sincerely,
Kabir & Co.

5.

2, Town Road
Capetown
The 13th January, 1960.

Messrs Lloyds & Co.
Barrington-3

Dear Sirs,

Mr Williams saw us with your letter dated 12th December, 1959. He has been introduced to almost all of our accredited customers. We understand, he has already made very favourable impression upon them and has been able to secure orders for supply of considerable quantity of your manufactures.

We would be pleased if you could favour us with your opinion regarding the present market of Transister Radio in your country. We have a mind to send our Mr. Hawks to have a first hand knowledge of the condition of your country but prior to that your valued opinion will be considered by the Board of Directors. An early reply will be highly appreciated.

Thanking you,

Yours sincerely,
Pareto & Co.

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

1960

First Paper (Answer any six)

1. What do you understand by 'Commerce'? Describe in brief the activities considered as commercial activities.
2. Describe the role of a wholesaler as a middleman.
3. How does Fire or Marine Insurance help in the spreading of business risks ?
4. What is a Partnership Deed ? What are the important clauses generally included in a partnership deed ?
5. What is a Prospectus of a Joint-stock Company ? What are its most important contents ?
6. What is a Departmental Store ? What are the advantages of such a store ?
7. What is a Stock exchange ? What are its functions ?
8. What are the functions of a Commercial Bank ? Show how they help the development of trade and commerce.
9. Distinguish between Customs and Excise Duties. What is meant by the term 'Ad Valorem' ?
10. Write notes on : (a) Preference Share, (b) Authorised Capital, (c) Chain Store, (d) Produce Exchange.

Second Paper

Group A (Answer any four)

1. Give a general outline of the procedure you would follow in exporting goods to foreign countries.
2. What is a Bill of Exchange ? How does it facilitate commerce ?
3. Different types of commodities require different modes of carriage for delivery at the buyer's site. Name and explain the various factors or considerations which determine such modes.

4. Distinguish between an open and a crossed cheque. What do you understand by special crossing? What is 'A/C payee-only' crossing?

5. Describe the part played by Warehouses in the development of commerce.

6. Describe the importance of transport in commerce. What are the advantages of Railway transport to the business world?

7. Write notes on: (a) Trade and Cash Discount, (b) Hire Purchase, (c) Documentary Bill, (d) Bank Draft.

Group B (Answer any two)

8. Write a letter acknowledging an order for woolen goods and stating how and when the order will be executed.

9. You received 20 packages of assorted cotton goods from Mehta and Sons of Bombay. The contents of 7 packages are not up to the sample. Write a suitable letter demanding relief.

10. The United Electrical Ltd. desire to advertise a new type of electric bulbs they have manufactured. Draft a suitable form of advertisement to be published in the newspapers.

1960

First Paper (Answer any six)

1. Explain how Division of Labour leads to Specialisation and to Exchange.

2. State clearly the distinction between a Multiple Store, a Chain Store, and a Departmental Store.

3. What is profit? Distinguish between the 'gross' and the 'net' profit of a trade.

Or, Indicate the distinction between 'Family business' and 'Partnerships' and comment on their respective merits and demerits.

4. Write brief explanatory notes on any three :—(i) Memorandum of Association; (ii) *Capital*—Authorised, Issued, Subscribed, Paid up; (iii) Debentures; (iv) Managing Agents.

5. Explain what is meant by (a) Deposit Account and Current Account, (b) Overdrafts, (c) Bankers' Clearing House.

6. Estimate the contribution of Railways to the development of trade and commerce of a country.

7. 'The general principle underlying the different types of Insurance is the spreading of business 'risks'. Explain.

Or, Explain briefly the nature and importance of the following types of Insurance : Fire, Marine and Accident.

8. Write a short essay on the characteristic features of the foreign trade of India.

9. Explain the different ways in which Government may encourage business activities.

Or, Discuss the object of levying Customs and Excise Duties. Explain the distinction between the two. Give examples.

10. Write short notes on any two of the following :

(i) Savings Bank , (ii) The different aspects of a 'buying-selling' transaction ; (iii) The nature and implications of the 'limited liability' principle.

Second Paper

Group A (Answer any four)

1. In a selling transaction for goods, (a) the goods may be present or future, (b) the delivery may be ready or forward, and (c) the payment may be spot or prompt.

Explain clearly what is meant by the above terms.

2 Write short notes on the various departments or sections which are generally found in a big business house. Which of such departments would you expect to see in a small office ?

3. Describe the importance of water transport and motor vehicles transport in the modern business world.

4. Explain what is meant by :—

(a) Insurable Interest, (b) Utmost Good Faith.

5. You are about to import some machineries from West Germany. Describe at least six of the important documents you will have to deal with in this connection.

6. What are Customs Duties ? Describe their types and explain why these are levied.

7. Explain clearly :

(a) C. I. F., (b) Bearer Cheque, (c) R/R ; (d) E. & O.E,

